(তিন দশকের নির্বাচিত গল্প)

সাধন চট্টোপাধ্যায়

অক্ষর পাবলিকেশনস্
প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

Trinabhumi
(A Collection of selected short stories written
by Sadhan Chattopadhya during last 3 decades)

ISBN- 81-86802-57-6

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ২০০৩

প্রচ্ছদ
ইমানুল হক

টাইপ সেটিং ও মুদ্রণ
ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কোলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : অক্ষর সেলস্ কাউন্টার, প্যালেস কম্পাউন্ড, প্রেস ক্লাব রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান : ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-১২

সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশনস, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ □ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০, *email : raixxxx@.dte.vsnl.net.in*

মূল্য □ ১৫০ টাকা

উৎসর্গ

দেবীপ্রসাদ সিংহ
দেবব্রত দেব
শেখর দাশ
অলক গোস্বামী
শুভময় সরকার
— এই পঞ্চপাণ্ডবকে

সূচীপত্র

দেশপ্রেমিক পাঠকদের কাছে

প্রায় তিন-সাড়ে তিন দশক ধরে, চারশ'র মতো গল্প লিখে, সমুদ্রমন্থনে অমৃত তুলে আনা দুরুহ ও দুঃসাধ্য কাজ। প্রথম একশ গল্প না হয় গড়ে উঠবার মক্স বলে ছেড়ে দেয়া গেল, বাকি তিনশ? অনতিযৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের মধ্যপর্বে পৌঁছতে যে সময়ের স্তরগুলো পেরিয়ে এসেছি, তার নানা বিভঙ্গের ছায়াসঙ্গী হয়ে আছে আমার লেখাগুলো, সমাজ ইতিহাস ও বাঙালি ব্যক্তিমানসের রূপবদলের নানা সাক্ষী। লেখার ভাষা আছে বলে লিখছি বা 'বিজ্ঞাপনে নাম জনিয়ে রাখতে হবে' বলে কোনো দিনই কাগজ কলমে মনোনিবেশ করিনি। চলতি হাওয়ার পন্থা থেকে চিরকাল নিজেকে দূরে রেখেছি। যখন তাগিদ অনুভব করেছি, মনে হয়েছে, কিছু বলার কথা উঁকি-ঝুঁকি মারছে তখন এবং তখনই শুধু আখ্যান রচনায় ক্রমাগত ডানা ঝাপটেছি কল্পনা শক্তিতে ভর দিয়ে। আমি এক-বলা কখনই দুটো গল্পে পুনরাবৃত্তি ঘটাইনি। তাই আজ মন্থনক্রিয়া এতটাই দুঃসাধ্য বোধ হচ্ছে। কাকে ফেলে কাকে রাখি! মনে হয়। ইস! এ গল্পটায় সময়ের 'ওই' বিন্দুটা ছিল। বাদ দিয়ে দেয়?

হ্যাঁ, আমার অন্বেষণ, ভঙ্গি, ভাষা, বলবার স্টাইল বয়সের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গেছি। নির্মোহ ভঙ্গিতে বাস্তবতার রহস্য খুঁজতে খুঁজতে আজও অচঞ্চল পথ হাঁটা শেষ হয়নি। যে-দিন এভাবে চলতে ক্লান্তি আসবে নিষ্ফলা দিনগুলো 'শ্রেষ্ঠগল্প'-এর পেছন ফেরার কাজে খৈ-ভাজতে শুরু করব। ততদিন পর্যন্ত, নিজেকে ভাঙবার খেলা থেকে আমার মুক্তি নেই।

কখনো সরাসরি মানুষ বাস্তবের পটভূমিতে মানুষকে দাঁড় করিয়ে কথা বলিয়েছি, কখনও খুঁজেছি দেশকালে তাদের শিকড়, কখনওবা বাস্তবের মধ্যে রহস্যময় ধারার স্তরের খোঁজে সময়ের চিহ্নকে এঁকে গেছি অথবা সময়ের অস্তিত্বটা কেই অস্বীকার করে ব্যাপ্ত পরিসরে আমার গল্পের কাঠামো চালিত হয়েছে।

'ঢোল সমুদ্র' থেকে 'কঙ্কর লাশ' বা 'অটুট মাস্তুল' — যদি একটি লেখচিত্র আঁকা যায়, ক্রমাগত পরাবৃত্তের রূপ পেয়ে যাবে। ভাষাকে সযত্নে ব্যবহার করেছি, কিন্তু আহামরি নিছক গদ্য বানাবার জন্য সাহিত্যকে প্রতিবন্ধী করতে মন চায়নি। ভাষাতো লেখকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে বিলাসিতা করলেও বলার দায় থাকে না কারও। জাতীয় সম্পত্তি বলেই এর উৎকণ্ঠের সঙ্গে জীবনের একটি স্পর্শবিন্দুর কথা মাথায় রাখা দরকার।

সারাজীবন সাহিত্যপত্র বা লিটল্ ম্যাগাজিনে লিখেছি। লিখে যাব। কেন-এ-ব্যাখ্যা এখানে নয়। অনেক সাক্ষাৎকারে জবাবদিহি করতে হয়েছে বলে পুনরাবৃত্তের দরকার নেই। তিন দশকের কঠিন লড়াই এর পর আজ আর আলাদা ভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, লেখক বেঁচে থাকে শততা কঠিন সাধনা ও মহৎ লক্ষ্যে। খুঁদকুড়ো আঁকড়ে থাকার কাজ শিল্পীর নয়।

'অক্ষর' যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছে নির্বাচিত তিন দশকের গল্প ছাপাবার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল, অভিভূত হয়েছিলাম। ভিনরাজ্য থেকে এ-স্বীকৃতিতে শ্লাঘা বোধ হয় বৈকি! এছাড়াও, বৃহৎ বাঙালি পাঠকের কথা ভেবে বাঙলাভাষাকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসা ও জাতীয় সম্পদ বলে মনে হল।

এই সংকলন বাংলাদেশের পাঠক ভাই-বোনদের কথা ভেবে, সাড়ে ছাব্বিশ কোটি বাঙালির জন্য। যদি সাড়ে তিনদশক ধরে আমার যাপিত জীবন ও বিশ্বাসের একছটা উত্তাপ গল্পগুলো বহন করে থাকে, অবশ্যই তা দায়বদ্ধ, দেশপ্রেমিক পাঠকদের কাছে আদৃত হবে। দেশকে তিনিই ভালোবাসবেন, যিনি সংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।

এই সংকলনে নানাভাবে অনেক তরুণ বন্ধু আমায় সাহায্য করেছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ না করলে, আমার অপরাধ হবে। এরা হলেন, বিজ্ঞান-আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, সুলেখক শ্যামল চক্রবর্তী, ছোটগল্পকার শুভঙ্কর গুহ, বাসব দাশগুপ্ত এবং শ্যামল ভট্টাচার্য। এঁরা প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুণী। আমার ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। পরিশেষে যে-সমস্ত লিটল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক দীর্ঘকাল আমার গল্প ছেপেছেন, তাদের ধন্যবাদ। তাদের সহযোগিতা না পেলে, এ সংকলন আজ বাস্তব রূপ পেত না।

সাধন চট্টোপাধ্যায়

পানশিলা

৩১.১২.২০০২

ঢোল সমুদ্র

দামোদর পেরিয়ে দলটা বাঁকুড়ায় ঢুকল। চৈত্রের মাঝামাঝি, ক্ষীণস্রোত । তটিনীর বিশাল বালুকাবক্ষে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে উঁচু মাটির টিপিতে সর্দার একটু থমকে দাঁড়ায়। সামনে ধূ ধূ রুক্ষ মাঠ। ঢেউ-খেলা। ইতস্তত কয়েকটা বাজ-পোড়া তালগাছ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চতুর্দিক ঝিমঝিম।

সর্দার কি যেন ঠাহর করছে। লালছে চোখজোড়া চতুষ্পার্শ নিরীক্ষণ করে নিল। শেষে মৃদু মাথা দুলিয়ে বলল, 'নাঃ, আর একটু পা চালাতে হবে গুণিন— এ মাঠটা পেরিয়ে গেলে মনে হয় জায়গা মিলবে।' গুণিন কিছু ভেবে জবাব দেবার আগেই সর্দার পা বাড়াল। পিছনে তাকিয়ে একটু তাড়া দিয়ে বলল, 'চটপট পা চালাও সব..... ক্রোশটাক পথ সেরে ফেলি।'

ঝোলাঝুলি কাঁধে নিঃশব্দে দল এগোল। কেবল কয়েকজনের মুখে মৃদু লয়ে শিস, আর রহস্যময় হুড়্ড় হুড়্ড় আওয়াজ।

দলের অনেকেই হাঁটতে পারছে না। সারাদিন পা চালিয়ে ক্লান্ত। মস্ত বাঁকটা কাঁধে প্রহ্লাদ রাগে সর্দারের পিছন দিকটায় তাকায়। ধুলোয় ভরা মস্ত একমাথা চুল। মোটা গর্দান। সামনে একটু ঝুঁকে থপ থপ এগিয়ে চলেছে।

'আর কত দূর সর্দার ?—প্রহ্লাদের গলাটা রুক্ষ। সর্দার নিঃশব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। উত্তর করল না। প্রহ্লাদের ফৌজি-মেজাজটা একটু গরম হয়ে ওঠে।

দল এগিয়ে চলেছে। চারদিক স্তব্ধ; কেবল হিস্ হিস্ হুড়্ড় হুড়্ড় আওয়াজ। জনা ছয়েকের মতো লোকের কাঁধে বাঁক, মাথায় মস্ত টোকা—সঙ্গে থস্ থস্ আওয়াজ করে চলেছে পাঁশুটে এক টুকরো মেঘের মতো একপাল শুয়োর।

দলটা উত্তরের জেলা থেকে নেমে আসছে। সাঁওতাল পরগণার পথ বেয়ে বীরভূম। কত মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্ত পাড়ি দিয়ে বর্ধমান ছাড়িয়ে ঢুকছে দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়ার লাল মাটিতে। রুক্ষ, কঠিন মাটি। এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে হুগলীর ভিতর হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে দল চলে যাবে নিজেদের আস্তানায়। আষাঢ়ে গৃহত্যাগী হয়ে চৈত্রের শেষে ফিরে যায়। কত দেশ-দেশান্তর যে পাড়ি দিতে হয়।

ক্রমে ক্রমে মাঠটা শেষ হয়ে গেল। অসংখ্য চড়াই-উতরাই। একটা প্রশস্ত ঢালু ভূমিতে নেমে সর্দার আবার থমকে দাঁড়াল। চতুর্দিক চোখ বুলিয়ে গুণিনকে বলল, ঠিক জায়গা বটে। দেখ তো, ওদিকের নয়ানজুলিতে জল-টল আছে কিনা?' একটা ঢ্যাঙা মতো লোক এগিয়ে যায়।

যে যার কাঁধের বোঝা, টোকা মাটিতে রেখে ধপ করে বসে পড়ল। প্রহ্লাদের সমস্ত মাংসপেশীর মধ্যে যন্ত্রণা। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামিয়ে সে সটান শুয়ে পড়ল।

বড় পাল বলল, 'ভুঁইয়ে গড়িয়ে যে?......মাল পত্তর বার করো?'

'করে নাও......পাইরছি না।'

বড় পাল মৃদু হেসে বাঁকের মধ্যে থেকে খন্তা, তোবড়ান হাড়ি, থালা, চার পাঁচটে শিশি-কৌটা বার কবতে করতে বলল, 'উনুনটা খোঁড়ো.......টোকাগুলো পুঁতে নাও।'

সর্দার একটা বিড়ি ধরাল। চোখজোড়া আধ-বোজা অবস্থায় মোলায়েম গলায় হুকুম করতে লাগল। নইলে যত দেরি হবে, দলটা ততই পড়বে এলিয়ে।

গুণিন গর্ত খুঁড়তে লাগল; বড় পাল, যাদব এবং সোমরাকে নিয়ে সর্দার চলে গেল লোকালয়ে সওদা করতে। চাল, ডাল, আলু, তেল, নুন। প্রহ্লাদ পড়ে রইল। সর্দার একবার আড়চোখে তাকাল প্রহ্লাদের দিকে, শেষে ছায়ার মতো চারটে মানুষ শিশি, থলি নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

উনুন খুঁড়তে গুণিন বলল, 'ওঠ দেখি একটু। জলটা আন তো।' প্রহ্লাদ প্রতিবাদ করল না এবার। ভুষো-কালি পড়া, টিম-টিমে হ্যারিকেনটা দুলিয়ে ভাঙা কলস হাতে চলল জলের সন্ধানে।

সেই পাঁশুটে মেঘের দলটা টুকরো-টুকরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ততক্ষণে মাটি চালতে চালতে পুকুরের দিকে নানান মূলের সন্ধানে চলে গেছে। প্রহ্লাদ একবার ডাকবার চেষ্টা করল হুড়ড় হুড়ড়, কিন্তু শব্দটা খুব ভাল রপ্ত হয়নি। গুণিন গলা দিয়ে শিসের মতো অদ্ভুত আওয়াজ বের করতেই দলটা ঘোঁত ঘোঁত করে উনুনের খানিকটা দূরে ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে পড়ল।

হাওয়া রহস্যময় আওয়াজ তোলে। একটু বাদেই দেখা গেল আগুনের জিহ্বা। চতুষ্পার্শ্বে ঘন অন্ধকারের মধ্যে লিকলিক করছে। প্রহ্লাদ ফিরে দূরে বসে সেদিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল সর্দারের সঙ্গে। বীরভূমে অমনভাবে ঝগড়া করা উচিত হয়নি। কিন্তু তার দাপা-খ্যাপা মেজাজটা নিয়ে করবে কি সে? অমন পাঁশুটে আকাশ, আর রোদ্দুর দেখেই প্রহ্লাদ বুঝেছিল চোত মাস। বাড়ির টানে মনটা তার আনচান করছে। সর্দারকে বলেছিল, 'আর নয়গো সর্দার! হুগলীর পথে নেমে পড়ি। বাড়ি যেতে যেতে চোত মাস কাবার হয়ে যাবে।' সর্দার গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'বন্যাডা কেমন দেখলা?.... কত জানোয়ার মারা পড়ল। ব্যবসা লাটে উঠবে..... বাঁকুড়ার মাটিতে জানোয়ারগুলো একটু চরুক?'

'যেতে তা'লে জষ্ঠিমাস?..... ও বছর না হয় ভাল করে চরিও।'

'বেশ. তুমি কথা কওনাত প্রহ্লাদ। ছোকরা বয়সে অমন ঘরটানের কি আছে?'

'বেশ. তুমি থাকো! দামোদর পার হব না আমরা'—প্রহ্লাদ কথাটা মুখে আনতেই সর্দারের চোখজোড়া কেমন নিথর হয়ে গেল! নাকের পেটিজোড়া ঈষৎ ফুলিয়ে হেসে উঠল, 'বেশি বাড়

ভাল নয়, প্রহ্লাদ!' গুণিন মাঝখানে পড়ে উভয়কে থামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আর গড়াল না।

বড় পাল, যাদব, সোমরা ফিরে এসেছে। সর্দার আসবে পরে। জিনিসপত্তর কিনে ওদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মস্ত এক হাঁড়িতে ভাত চাপান হলো। গুণিন উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে প্রহ্লাদকে বলল, 'হোমনে কিছু ডাল-পাতা আছে..... কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনত, যা হাওয়া!' উঠে গিয়ে বুকে পেঁচিয়ে আনলে, গুণি আগুনে গুঁজতে লাগল।

এ তিনজন ঝিমুচ্ছে। গুণিন আড়-চোখে তাকিয়ে ডাক দেয়, 'ও বড় পাল?

'উ'—

'বলি, ঘুমুয়ে পড়লা যে?'

'বড্ড কেলান্ত!'

'ভাতটা হলি ডাল চাপাব।'

বড়পাল উত্তর করে না। গুণিন একটা কাঠ গুঁজে আবার আড়চোখে তাকাল।

'বড়পাল, এডা কোন্ দেশ?'

'পশ্চিম',

'লোকজন কেমন দেখলা?'

উত্তর দেবার আগেই একটা ছাইরঙা শুয়োরের বাচ্চাকে একটা কালোধাড়ি মুখ দিয়ে চেপে ধরতেই চি চি চিৎকার শুরু হয়ে যায়। গুণিন ছুটে গিয়ে থামিয়ে দেয়। নইলে বেচারাকে হয়ত মেরেই ফেলবে।

খানিকবাদেই টিনের থালাগুলো ধুয়ে ওরা খেতে বসার আয়োজন করতে লাগল। ডাল, ভাত আর থালায় মস্ত একতাল আলুভাতে। যে যার ছোট ছোট দলায় খাবলে নিচ্ছে। ঠিক এই সময় নিঃশব্দে সর্দার এসে হাজির। একটা ঢেঁকুর তুলে বলল, 'খেয়ে নাও তোমরা আমি খাব না।'

গুণিন বলল, 'চাড্ডি খানিক খাও।'

'না'— বলেই সর্দার উনুনের ওপাশটায় অন্ধকারে বসে বিড়ি টানতে লাগল।

খেয়েদেয়ে একটু বাদেই যে যার গড়িয়ে পড়ে। প্রহ্লাদের কোনো হুঁশ নেই। টোকার তলায় কাঁথাটা মেলেই পাজোড়া টানটান করে দিল। শুকনো ঘাসের ডগাগুলো ফুটছে শরীরে। একটু বাদেই চোখের পাতা জোড়ায় রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ যখন জেগে উঠল, কত রাত বোঝা যাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার, হু হু বাতাসের শব্দ আর উজ্জ্বল একঝাঁক তারা। পাশের টোকাগুলো থেকে শোনা যাচ্ছে ঘুমের মাঝে বোবা যন্ত্রণার গোঙানি। প্রহ্লাদের মন মুহূর্তের জন্য ছমছমিয়ে উঠল। আস্তে ঘাড়টা তুলল। পাঁশুটে মেঘের দলটা গোল হয়ে শুয়ে পরস্পর ঠেলাঠেলি আর ঘোঁতা ঘোঁতা আওয়াজ করছিল।

উঠে বসল প্রহ্লাদ। একটু এধার ওধার তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। দু'জন জেগে আছে। হাঁটু গেড়ে গুণিন বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর হুস্‌হাস্ শূন্যে কি যেন তাড়াচ্ছে। এপাশে বসে

সর্দার। অন্ধকারে শুধু মুখের আকারটা বোঝা যাচ্ছে তার, কিন্তু কর্কশ রূপ দেখা যাচ্ছে না। বিড়ির আগুনে অনুমান হয় চোখজোড়া ঘোলাটে লাল। তাকিয়ে আছে প্রহ্লাদের দিকে।

'গুণিন.....গুণিন'—দু'বার ডেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সর্দার মোলায়েম গলায় বলল, 'জেগে উঠলে যে প্রহ্লাদ?'

'পা-টা টান ধরেছে সর্দার।....ঘুমটা ছুটে গেল।'

সর্দারকে প্রহ্লাদের এই মুহূর্তে ভয় করছে। ওর ভেতর চাপা আগুন যেন।

হাতের একটা ছায়া এগিয়ে এল প্রহ্লাদের সামনে।

'ধরো, বিড়ির টান দাও'—সর্দারের গলা।

প্রহ্লাদ খানিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ি টানতে থাকে। গুণিনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। একইভাবে বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

সর্দারই আগাম বলল, গুণিন। জড়ি-বুটি, মন্ত্রতন্ত্রের কাজ চলছে......এলাকাটা ভালো নয়?

প্রহ্লাদ ভূতুড়ে তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শরীরটা ভারি ভারি লাগছে।'

সর্দার খানিক ভেবে বলে উঠল, 'ঢোল সমুদ্দুরের তাবিজটা আছে তো কোমরে?

প্রহ্লাদ কোমরটা হাতিয়ে ছোট্ট বস্তুটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিল। এতক্ষণ আর কোনো খেয়াল ছিল না। এবার শরীর হাল্কা হয়ে গেল। কী এক শক্তি ভর করল দেহে।

সেই গত আষাঢ়ে পথে বেরোবার কালে মালিক যুগল দাস এটি বেঁধে দিয়েছিল। সর্দার, গুণিন সবাই ছিল পাশে। নদীর ধারে ঢোল সমুদ্রের পাতা পাওয়া যায়, তারই তাবিজ। কোমরে থাকলে নাকি মানুষ সর্বশক্তিমান। যুগল দাস হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'এটা তোরর সম্পত্তি, আমার জিনিস হল শুয়োরের পাল। ফিরে এলে আমি আমার সম্পত্তি যাচাই করে নেব আর তোর সম্পত্তির হিসেব পথেঘাটেই তুই টের পাবি।' সর্দার বলেছিল, 'এবার তুমি শক্ত-সমথ পুরুষ..... পথে চোর ডাকাত, দুষ্ট প্রকৃতি তোমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।' গুণিন তার লম্বা জুলফি, গোল গোল চোখজোড়া মেলে সায় দিয়েছিল।

তারপর পথের মানুষ প্রহ্লাদ পথেই প্রমাণ পেয়েছে সে সর্ব শক্তিমান। কত আওড়-বাওড়, মাঠ-ঘাট, লোকালয় পেরিয়ে গেছে, কত চোর ছ্যাঁচোড় লেগেছে, বাউন্ডুলে ভবঘুরে দেখেছে, কত কামিনী; ডাইনি-ডাকিনীর দেশ- শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, এই কালো কুচকুচে শরীরটার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিচ্ছুই হয়নি দলটার। সেবার বীরভুমের এক মাঠে কয়েকটা শুয়োর চোরকে কি মার! দলটা টের পায় কার কোন মতলব। সর্দার মাঝে মাঝেই বলে, 'ঢোল সমুদ্দুরের তাবিজটা আছে 'ত!'

আজও, এই মুহূর্তে কোমরটা হাতড়ে প্রহ্লাদ স্বস্তিতে বিড়ি টানতে লাগল। ভাবল কয়েকবছর আগে এই ঢোল সমুদ্রের তাবিজ কাছে পেলে ফৌজের চাকরিটা যেত না। ঘরে ফিরিও কি দাদার অমন চাবুক খেতে হত ? ঘরের কথা মনে আসতেই চিন্তা ফিকে হয়ে যায়। হৃদয় কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হঠাৎ সর্দারকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'চোত মাসের শেষ করে সর্দার!' সর্দার সম্ভীর

গলায় বলে উঠল, 'শুয়ে পড়.....রাত ভোর হ'তে চলল।'

সকালে উঠে দল আবার কাজে বেরিয়ে পড়ে। এটাকে তাড়িয়ে, ওটাকে সরিয়ে হুড়্ আওয়াজ করতে করতে মস্ত মাঠটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রহ্লাদের মাথায় মস্ত টোকা, হাতে লাঠি। ঘুরতে ঘুরতে অবাক চোখে এ দেশটার লোকজনের নিকে নজর করতে থাকে ।

এই নিয়ে দু'বছর হল সে দলে বেরোচ্ছে। অল্প বয়সে ফৌজে যোগ দেয়। বুড়ো বাপ অন্ধ হয়ে যাওয়ায় দাদা বলেছিল, 'এবার কাজ খোঁজ......গরীবদের ঘরে কেউ বসে খায় না।' প্রহ্লাদ বরাবরের অভিমানী ও স্বাধীনচেতা। পাড়ার অনেকের কাছেই প্রিয়।

'লেখা-পড়া হবে তা'লি?'

ও ঘর থেকে বুড়ো বাপ জবাব দিয়েছিল, 'না না, গরীবের আবার বিদ্যের দরকারডা কি শুনি?' প্রহ্লাদের ঠোঁটজোড়া কী জবাব দিতে গিয়ে থরথর কেঁপে উঠেছিল।

তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফৌজে চাকরি। কিন্তু প্রহ্লাদের স্বাধীন মেজাজে তা-ও টিকল না। পালিয়ে এল। রাগে দাদা চাবুক দিয়ে পিটল। প্রহ্লাদ কাঁদল না এক ফোঁটা। কাজের ধান্দায় ঘুরতে লাগল। অবশেষে যুগল দাসের কাছে এক মাস কাজ শিখে নেমে পড়েছে। দশবছরের দাদন। মাসোহারা পঞ্চাশ টাকা অন্ধ বাপের কাছে যুগল দাস পাঠিয়ে দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে প্রহ্লাদ এক সময় একটা পুকুরের কাছে ছায়ায় দাঁড়াল। জল পান করতে গিয়ে সে অবাক হয়ে যায়। লজ্জাও পায় খানিক। প্রতিটি মানুষ-কি ব্যাটাছেলে কি মেয়েছেলে উলঙ্গ জলে নামছে। পুরুষদের হাতপাগুলো কাঠি, পেটটা উঁচু। মেয়েরা মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী। প্রহ্লাদ দৃশ্য দেখে দূরে সরে যায়। দেশের বাড়িতে মা, দিদিমার কাছে গল্প শুনেছিল এই পৃথিবীতে কোথায় ন্যাংটো দেশ আছে। মানুষ সেখানে উলঙ্গভাবে চলাফেরা করে। এই কি তবে সেই স্থান? কথাটা না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত তার কৌতূহল নিবৃত্ত হচ্ছিল না। শেষকালে এক বৃদ্ধা তার একমাত্র সম্বল কাপড়খানি ছেড়ে স্নান সেরে চলে যাবার কালে, প্রহ্লাদ কাঁচু-মাচু জিজ্ঞেস করে, 'মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বলো—'

'আপনারা সবাই বস্ত্র খুলে স্নান করেন দেখলাম—কারণটা কি?'

বৃদ্ধা তার দীন-হীন মলিন মুখে ম্লান মুখ হাসি টেনে বেদনাটুকু ঢেকে বলল, 'আমরা সব যে গোপিনী বাবা.....কালা-চোরা যে আমাদের বস্ত্র হরণ করেছিল।'

প্রহ্লাদ অবাক হয়ে শোনে। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না! এলাকার অসাধারণ দারিদ্র্যের ব্যাপারটা বুঝতে পারে। গ্রামের লোকেরা প্রহ্লাদের চেহারাটাকে কালাচোরা আখ্যা দিয়েছিল। কিসের ভাবনায় মনটা তার নিবিড় হয়ে যায়।

সন্ধ্যার আগেই লোকগুলো পাঁশুটে মেষের দলটাকে তাড়াতে তাড়াতে আস্তানায় ফিরে এল। সর্দার গেছে লোকালয়ে। বড়পাল, সোমরা এবং যাদব হাতমুখ ধুয়ে আবার শিশি, থলি ঝুলিয়ে চলল বাজারের দিকে। বসেছিল গুণিন আর প্রহ্লাদ। ওরা ফিরে এলে উনুনে আগুন দেবে।

লালচে, ছাইরঙা, কালো-নানা রঙের প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি করছে কচি কুচি বাচ্চারা ধাড়িদের ঠ্যাঙের ভেতর মাথা গলিয়েছে। ঝাপটাঝাপটি, কোঁয়াৎ কোঁয়াৎ আওয়াজ। গুণিন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মৃদু লয়ে শিস দিতে থাকলে জানোয়ারগুলো ধীরে ধীরে ছুঁচলো মুখটা এগিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

প্রহ্লাদ দেখে বিশাল প্রান্তরটাকে। রুক্ষ, অসীম। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠে।

হঠাৎ দূর থেকে জনাচারেক মেয়েকে আসতে দেখা গেল। শ্লথগতি, লাস্যময়ী, পরস্পর গা ঠেলাঠেলি করে কিসের সব রসের কথা বলছে। প্রহ্লাদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গুণিনের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত।

'কি করছিস ভিন্‌দেশের মানুষরা সব?'-

একটা বাচ্চা শুয়োর তির্‌তির্ করে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটল। গুণিন লাঠি হাতে এগিয়ে যায়।

কালো কুচকুচে শরীরের এক ঝাঁক বুনো ফুল যেন মেয়েগুলো।

'তোমাদের চিনতে পারলেম না'ত?' প্রহ্লাদ হাসে।

একজন আর একজনকে ঠেলা দিলে বলল, 'শোনো লো মতি, কোন্ দেশের পুরুষ সব?'

মতির পিটোন স্বাস্থ্য, পাটি করে চুল আঁচড়ান, ঈষৎ ভুরুটা কাঁপিয়ে বলল, 'তুই চুপ করত।'

গুণিন এদের আগমনে খুশি হলো না। কলস হাতে জল আনতে গেল।

প্রহ্লাদ ওদের বসতে দিল। মতি মৃদু হেসে বলল, 'তোরা কেমন দল সব, গান গাইতে লারিস?' একজন মতিকে ঠেলা দিয়ে চাপা হাসিতে ফিসফিসিয়ে হলল, 'কালা কেষ্ট বাঁশি জানে কিনা জিজ্ঞেস করত?' এতগুলো হাসির মাঝে প্রহ্লাদ কেমন অস্বস্তিবোধ করে। হেসে বলল, 'তোমাদের নিবাস?'

মতি বলে, 'হোথায় গো! .....ঐ মাঠটা পেরিয়ে।'

এই মাঠটা পেরিয়ে, সর্দার যেখানে সওদা করতে যায়, সেখানে এদের বাস। জনাদশেক স্বৈরিণীর ঘর। অনেকেরই পড়ন্ত যৌবন। তা ছাড়া এ তো বলতে গেলে পুরুষবিহীন দেশ। অভাবে, রোগে সব পৌরুষ হারিয়ে রোগা, টিঙটিঙে হয়ে উঠছে। স্বৈরিণীদের তাই অভিসারে নামতে হয়। কোনোদিন পেট চলে কোনোদিন চলে না।

প্রতিবার শুয়োর চড়াবার দল হাজির হলে এরা আসে।

প্রহ্লাদ মতির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। 'কি দেখছো গো অমন করে?' প্রহ্লাদ বোকার মতো আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে বলল, 'না। এমনি!' মেয়েদের মুখগুলো থমথমে হয়ে ওঠে।

খানিক পরে সর্দার ফিরে আসে। স্বৈরিণীদের দেখেই মেজাজটা গরম হয়ে যায়। মোটা গলায় বলল, 'এখানে আসবেন না আপনারা।' গুণিনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এসব হচ্ছে কি গুণিন?' গুণিন প্রহ্লাদের দিকে কটমট করে তাকায়।

মেয়েরা উঠে গেল। যেতে যেতে মতি কোমর বেঁকিয়ে প্রহ্লাদের দিকে মুচকি হেসে ফেলল। প্রহ্লাদের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

খেতে বসে সর্দার গুণিনকে বলল, 'কাল-পরশু রওনা দেব গুণিন। আরও দক্ষিণে নাবব....বন্যায় কেমন মার খেলাম! দু'শো জানোয়ার নিয়ে বেরিয়ে মোটে পাঁচশ নিয়ে ফিরেছি।'

'রওনা দিলেই হল..... টোকা কাঁধে বাঁক নিয়ে আমরাও শোরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে চলব'। গুণিন হাসে।

'নাঃ, আজকাল তোমরা বড্ড বেচাল করছ।'

বলেই সর্দার প্রহ্লাদের দিকে তাকায়। প্রহ্লাদ বিশেষ তোয়াক্কা করল না। পাশেই দু'টো শুয়োরের মৈথুন দেখে বড়পাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। চোখজোড়া কাঁপে, নাকের মাথাটা নড়ে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মনের অগোচরেই ঘাসের বুকে পা ঘষতে থাকে। এই কথাবার্তায় তার মন নেই। গুণিন হঠাৎ দেখতে পেয়ে হেসে বলল, 'ও বড় পাল?'

'উঁ—'

'মানুষের কয় জন্ম জান?—'

'না—'

'সাত জন্মের পর মুক্তি। শেষ জন্ম হল শোর চরান। ওসব ভেবে লাভ নেই, এখন শোও।'

বড় পালের নাক থেকে একটা মস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

পরদিন সকালে প্রহ্লাদ খুঁজতে খুঁজতে মতিদের পাড়ায় হাজির। গতকাল মতির বিদায়কালের হাসিটা ভুলতে পারেনি।

কে একজন দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'মতি লো মতি! কালা-কেষ্ট যে তোর দোর খুঁজছে'। মতি উঠানে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। বাটিতে জল, আয়না-চিরুনি, আলতার শিশি। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলে। পাশের ঘরের দু'টো মেয়ে রেগে বলে উঠল, 'মুখপুড়ির ঢং কত!'

দাওয়ায় বসতেই মতি এক বালতি জল এনে দিল। প্রহ্লাদ বলে, 'তোমার জলে পা ধোব কি করে?..... আমরা যে চাঁড়াল, শোর চরাই।'

'ধোও না, সেতো আমার পুণ্যি।'

প্রহ্লাদ হেসে বলে, 'এমন বল্লে মনডা যে কেমন করে!...... আমরা যে পথের মানুষ পথেই হারিয়ে যাব।'

মতি চোখ নামিয়ে বলল, 'মনের মানুষ যে পথে পথেই ঘোরে..... রাধি মুখপুড়িও পথের দিকে চেয়ে দিন কাটাত।'

এরপর দু'জনে অনেক কথা হয়। প্রহ্লাদ কাঁপতে থাকে। হু-হু হাওয়া, অন্ধকার নামছে। হঠাৎ কাঁধে হাত রাখতেই মতি হেসে ওঠে।

'চল-গো ঠাকুর তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি।..... এমন করে আর মন টেকে না।'

'মোদের ঘর তো এ দেশে নয়।—'

'হোক..... তোমার সঙ্গে পথেই নয় জীবনটা কাটাবে।'

প্রহ্লাদ অবাক। মৃদু হেসে মতিকে বলে, 'তা হয় না। ......আমরা তো বেজাত, গাঁয়ের লোক ঘর করতে দেবে কেন?'

'তুমি তো ঠাকুর কালা কেষ্ট, রঙটুকু দেখেই বুঝেছিলাম।...... আমায় ফাঁকি দিও না।'

প্রহ্লাদ ভাবে, একি জ্বালা! মতিকে নিয়ে সে কোথায় যাবে। যন্ত্রণা নিয়ে সে আস্তানায় ফিরে এল।

সর্দার বসেছিল অন্ধকারে; মেঘের টুকরোগুলোর পাশে। বিড়ির আগুনে অনুমান হয় চোখজোড়া, ঘোলাটে, মদির। প্রহ্লাদকে বলল না কিছু, শুধু আড়চোখে ওর দেহটার দিকে নজর রেখে গেল।

আগুনের ছোবল নিভে গেছে। গুণিন মস্ত থালায় মাখছে আলুভাতে। প্রহ্লাদ একটা থালা ধুয়ে, পাখলে বসে পড়ল। কেউ কথা বলছে না; শুধু খাওয়ার শব্দ। হঠাৎ সর্দার বলল, 'গুণিন, তোমার বীরভূমের ওদল গাঁয়ের কথা মনে আছে?'

'আছে—'

'চাষী দু'টোর কি হাল হয়েছিল?'

গুণিন চুপ করে থাকে। সর্দার নিজেই জবাব দিয়ে দিল, 'হাতের পাঞ্জা দু'টো কেটে নেয়া হয়েছিল। আমি হলে চোখ দু'টোও উপড়ে গরম জল ঢেলে দিতাম।.... ভয়ে অন্য চাষীরা কোনোদিন ধানগোলার দিকে চাইতে সাহস পেত না।..... এ হলো বেতাল পাকাবার উপযুক্ত শাস্তি।'

সর্দার এবং প্রহ্লাদ পরস্পরের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকে। সে-ও ঘটনাটা জানে। বীরভূমের ওদল গ্রামে সেবার দেখেছিল গ্রামের কয়েকজন চাষী জোতদারের গোলা লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। শাস্তি হিসেবে প্রাণে না মেরে কিংবা থানায় না দিয়ে জোতদার প্রকাশ্যে তাদের পাঞ্জা দু'টো কেটে নেয়। প্রহ্লাদ বোঝে ইঙ্গিতটা তার উদ্দেশে। তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই সর্দারের মনে ভয়ঙ্কর তোলপাড় হচ্ছে। চরম শাস্তির কথা সর্দার ভাবছে। লোকটা পশু। দলের শৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কিছু মনে আসে না।

প্রহ্লাদ খাচ্ছে। কোমরে ঢোল-সমুদ্রের তাবিজটার অস্তিত্ব অনুভব করে, আবার কটমট করে তাকায় সর্দারের দিকে।

সারা রাত ঘুম হলো না প্রহ্লাদের। উন্মুক্ত প্রান্তরে হু-হু বাতাসের মধ্যে পড়ে থেকে নানান চিন্তায় হৃদয়টুকু তোলপাড় হতে থাকে। মতিকে যেন সে ভুলতে পারছে না।

পরদিন রোদে রোদে শুয়োর চরিয়ে, বিকেলের দিকে আবার মতির বাড়ি হাজির। উদাসভাবে মতি দাওয়ায় বসেছিল। প্রহ্লাদকে দেখতে পেয়েই হেসে বলে, 'কী ভাগ্যি আমার। এস ঠাকুর।'

'ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেম-কবে আবার দেখা হবে কে জানে?'

মতি জবাব দেয় না।

'আওড়-বাওড়ের মানুষ মোরা....বেঁচে থাকলে ও বছর......।'

মতি হঠাৎ প্রহ্লাদের পা জোড়া জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, 'আমায় নে চল.....তোমার সঙ্গে থাকব ঠাকুর।'

'তা কেমন করে হয়? ....আমার দেশের অন্য আচার বিচার।'

মতি ঠোঁট ফোলায়। 'এই তোমার মনে ছিল, ঠাকুর?'

'তুমি থাকতে পারবে?..... মোরা দশ মাস শোর নে মাঠে ময়দানে থাকি। বর্ষা, বাদল, শীত আমাদের শরীরের পর দে' যায়। মনে সাধ হলেও বাড়ি ফেরা যায় না।'

মতি মাথা নাড়ে। সে পারবে। এদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। আর তার কি আছে ....?

থেকে থেকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। আকাশে মেঘের ঘটা। বাতাস থমকান। অন্ধকার বনে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে প্রহ্লাদ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'বেশ, তবে কাল দুপুরে ইস্টিশানে থেকো....বিকেলের ডাকগাড়িতে চেপে বসব।'

'ডাকগাড়ি? কত দূর গো?...সত্যি বলছ? ভুলে যাবে না তো?'

প্রহ্লাদ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, অমন ভুলো মন নয়.....রদ্দুর চড়তে না চড়তে ..... যেও......টিকিটবাবুর ঘরের সামনে থেকো, আমি চলে আসব।'

মতির চোখজোড়ো ভিজে। প্রহ্লাদের চোখেমুখে কিসের আশঙ্কা।

ওকে ফিরে আসতে দেখে সর্দার কোনো কথা বলল না। সে-ও আজ বিকেলে স্টেশনে গেছল। বীরভূমে প্রহ্লাদের সঙ্গে তার বচসা ও এখানে মতির ঘটনাটা 'তার' করেছিল যুগল দাসকে, জবাব এসে গেছে। তাই জানতে গেছল।

প্রহ্লাদ খেয়েদেয়ে উঠতেই সর্দার আচমকা বলে উঠল, 'আজ শেষ রাতে রওনা দেব, প্রহ্লাদ।'

'কোথায়?'

'আরও দক্ষিণে—'

'কেন?'

বন্যায় ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে.... পালে আরও নতুন শোর আসুক. যুগল দাস 'তার' করেছে'।

'আমাদের ঘর বাড়ি ডুবে গেল কিনা, সে খবর?.... বাপ ভাই-এর সংবাদ? তা আসেনি?'

সর্দার গম্ভীর হয়ে বলে, 'মালিকের সম্পত্তি হল শোর.... তোমার বাপ ভাই-এর সংবাদ পয়সা খরচ করে 'তার' করবার কি দরকার? বেঁচে-বর্তে নিশ্চয়ই আছে এক রকম।'

'আমায় তবে ছাড়ান দাও.... আমি টেরেনে চেপে বসি।'

সর্দার ঘাড় বেঁকিয়ে কর্কশ মুখটা ঘোরাল। ভুষোকালিপড়া টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় লাগছে আরও নিষ্ঠুর।

'যে যার খুশি দল থেকে চলে যাবে? সর্দারের গলায় জ্বালা ধরা হাসি।

'কেন, চোত মাসের পর বোশেখ জষ্ঠি ছুটি'—প্রহ্লাদের গলাটা গরম হয়ে ওঠে।

সর্দার অদ্ভুত হাসি তুলে বলল, 'ছুটি? দাদনের ছুটি তো দশ বছরের আগে নয়।'

প্রহ্লাদ মুহূর্তের জন্য থমকে থাকে। শেষে টোকার মধ্য থেকে কাপড় জামার পুঁটলিটা টেনে বলল, 'দেখো, তবে যেতে পারি কিনা।'

একবার কোমর হাতিয়ে ঢোল সমুদ্রের তাবিজটা দেখে নিল। সর্বশক্তিমান সে। সর্দারের মতো কত বদরাগী বেয়াড়া লোক পথে-ঘাটে টিট করেছে। এটা কোমরে থাকলে ভয় কি তার? সর্দার ছুটে এসে পথ আগলাতেই প্রহ্লাদ বলে, 'ছাড়ো, যেতে দাও।'

পাশ কাটিয়ে দু'পা যেতেই সর্দার ঝাপটে ধরল। প্রহ্লাদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাড়ো।'

শেষে লাফ দিয়ে চেপে ধরল সর্দারের গর্দানটা। যেমন করে বীরভূম দু'টো ছিঁচকে শায়েস্তা করেছিল। আচমকা সর্দার নীচে পড়ে যায়। প্রহ্লাদের মূর্তিটা ভয়ানক। গলাটা চেপে সরোষে মাটিতে ঠুকে দিতে দিতে বলল, 'এইবার আমি চললাম....আটকাও।'

গুণিন ছুটে এল। বড় পাল বলল, কী সব্বনাশ! তোমরা সব খেপে গেলে যে!'

সোমরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ছেড়ে দে প্রহ্লাদ, সব্বনাশ করিসনি।'

উন্মুক্ত প্রান্তরে চলছে দাপাদাপি। শক্ত কাঁকুরে মাটি এবং দগ্ধ ঘাস দলে-মলে গেল। হঠাৎ সর্দার এক ঝটকায় উঠে পড়ে! প্রহ্লাদ গড়িয়ে যায়। বাঘের মতো বুকটা খামছে এবার সর্দার চেপে বসল। আওয়াজ উঠল গোঁ গোঁ।

শুয়োরের পাল নিশ্চুপ। শুধু একটা বাচ্চা ভয়ে মায়ের দুধের বাঁটে মুখ লাগিয়ে চুকচুক আওয়াজ করতে লাগল। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা জানান দিয়ে গেল, জল নামছে।

সর্দার ডেকে উঠল, 'গুণিন....ছুরিখানা দাও!' গুণিন বুঝেছে সর্বনাশ। সর্দারকে সে বহুদিন থেকে চনে। এবার কণ্ঠনালীটা ফেড়ে দিয়ে, দল চলে যাবে। পড়ে থাকবে প্রহ্লাদের দেহ। গুণিন তাই হাত জোড় করে বলল, 'একি সর্দার! তুমিও অমন বেচাল হয়ে-গেলে?'

'তোমার ওদল গ্রামের কথা মনে নেই?'

এবার গুণিনও একটু খেপে যায়। 'ছেড়ে দাও সর্দার! অমন করলে কেউ শুয়োর পাল নিয়ে বেরোবে না।'

প্রহ্লাদ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। শক্ত হাঁটুর চাপে বুকটা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চোখজোড়া ঠেলে বেরোচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সে যেন গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ গুণিনের মুখের দিকে তাকিয়ে সর্দার বলল, 'তুমি বলছ?.... বেশ! তবে একদম ছাড়তে নেই।'

নীচে নেমে এসে তলপেটের একপাশে এমন কায়দায় দু'টো চাপ দিল, প্রহ্লাদের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সর্দার পা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে উঠে পড়ে।

এরপর বৃষ্টি নামল। রাত্রির মেঘ রাঢ়ের মাটিতে বর্ষণ ঢালে। সঙ্গে বাতাস। ক্ষণেক আগের রুক্ষ মল্লভূমিটুকু পিছল হয়ে ওঠে। আচ্ছাদনহীন বিশাল প্রান্তরে পাঁশুটে মেঘের টুকরোটার পাশে জীববিবর্তনের উন্নততম পর্যায়ের কয়েকটি প্রাণী জল-বাতাসে একাকার হয়ে গেছে।

শেষরাতের দিকে দল এগিয়ে চলেছে। টোকার পর বড় বড় জলের ফোঁটা। অন্ধকার। কাঁচা সড়ক ধরে স্টেশন পেরিয়ে নেমে যাবে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। রাঙাধুলোর কাদা জড়িয়ে তুর্‌তুর্‌ করে চলেছে লোমভেজা শুয়োরের পালটা। প্রহ্লাদের কাঁধে বাঁক, মাথায় টোকা, হাতে ভুষোপড়া টিমটিমে হ্যারিকেন। ক্লান্ত শরীরে থপথপ করে চলেছে।

ক্রমে লোকালয় ছাড়িয়ে, লাইন পেরিয়ে দলটা ঢালু মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। অন্ধকার, দূরে সিগন্যালের লাল আলো, অস্পষ্ট টিকিট ঘরটার দিকে নজর পড়তেই প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ভোরের আলো ফুটলে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে! হৃদয়টা কে যেন খামচাতে লাগল। হাত দিয়ে কোমরটা অনুভব করল। অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে কি যেন ঝুলেছে। কোনো বিশ্বাস নেই আর তার। একটানে ছিঁড়ে ঢোল সমুদ্রের তাবিজটা হাতের মুঠোয় পিষতে লাগল। তারপর রাগে দূরে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে। যেখান থেকে কোনোদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুলে উঠল হাতের আলো, গায়ে এল বর্ষার ছাঁট, বাঁকটা কাঁধ বদল করে মাঠ ভেঙে সে-ও চলল দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে।

পাতক

মহা-হবিষ্যি, ফলভাঙা, নিরম্বু এবং আজ এই চতুর্থ দিন গাজনের ঝাঁপ। মোট চার চারটে দিনের সন্ন্যাসব্রতর সমাপ্তি। বুড়ো শিবের চরণে, ভোলা মহেশ্বরের উদ্দেশে, ভস্মমাখা গঞ্জিকাবিলাসী ত্রিশূলধারী অনার্য দেবতার পায়ে সমস্ত গ্রামের মঙ্গল এবং আপন-আপন মনোবাঞ্ছায় মোট আটজন সন্ন্যাসী দেবস্থানে এক বিশাল ভিড়ের ভক্তিমাখা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়, গাজনের মাতাল বাজনায় শিবের ছড়ায় দল বেঁধে গলা মিলোচ্ছিল। এর পরই ঝাঁপে উঠবে ওরা।

পুরণো বছরটার শেষ দিনটি একটু পরই মিলিয়ে যাবে। ধূসর পশ্চিম আকাশে, বিস্তীর্ণ বিলের ও প্রান্তে ভূতুড়ে তেঁতুলগাছটাকে ছুঁই ছুঁই করছে টালমাটাল লাল সূর্যটা। মানুষের মনের সঙ্গে সঙ্গে আজ এতবড় অগ্নিকুন্ডের রথটিও নামছে শ্রান্ত, সফেন এক জীর্ণ ঘোড়ার মতো। এখানে ঝুড়ি নামানো বটগাছের ছায়ায় শিবঠাকুরের প্রাচীন থানের ফাঁকা মাঠটা জমজমাট। মেলা, হাঁকাহাঁকি, মাইক্রোফোন এবং ড্যাম-কুড়ুকুড়ু গাজনের বাজনায়, বাবার জয়ধ্বনিতে সন্ন্যাসীদের চেতনায় তখন ঘোর লেগেছে। একমাথা রুক্ষ চুল, কোলভাঙা লাল চোখ, হাতে গলায় আকন্দের মালা, গামছা-গেরুয়ায় কষে কোমর বাঁধা। বিকেলের ছায়া জমাট বাঁধবার আগেই ঝাঁপের কাজটি সারতে হবে। কর্মকর্তাদের মধ্যে তাই হাঁকাহাঁকি, ব্যস্ততা।

গ্রামটি ছোট। কয়েক ঘর বড় চাষী, বেশ কিছু ছোট বা প্রান্তিক চাষী, বাকি সব ক্ষেত মজুর। তিলি, মাহিষ্য, কৈবর্ত, কায়স্থ এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু ব্রাহ্মণও আছে। এরই মাঝে মাঝে দু চারজন সম্পত্তির বাস্তঘুঘু কোলাব্যাঙের মতো আপাতনিরীহ প্রকৃতিতে জনজীবনে মিশে আছে। আছে হাতুড়ে, বদ্যি, নাপিত, প্রাইমারি স্কুল, মুদি ও চায়ের দোকান— যেখানে সন্ধ্যায় মিটমিটে হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় গ্রামীণ কোঁদল থেকে শুরু করে দেশীয় রাজনীতির আদান-প্রদান হয়। বিগত রাজনৈতিক ডামাডোলে এ গ্রামখানি বিশেষ বিপর্যস্ত হয়নি। কেবল ভোলা ঘোষ বলে সামান্য জমি-জমাওলা চাষীর দুই ছেলে — শহরাঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করত — বছরখানেক বাড়িছাড়া হয়েছিল। পাশের গাঁয়ের মোড়ল অক্ষয় মাঝির দাপটটা বেড়েছিল তখন আর উত্তরের ইটখোলার হিন্দুস্থানী মালিক বিরিজলালকে কে বা কারা খড়বাগানের কাছে অন্ধকারে ভোজালির কোপে মাসখানেক হাসপাতালে ফেলে রেখেছিল। পুলিশের খাতায় নকশালি হামলা বলে রেকর্ড

হয়ে আছে। ব্যাস্, উল্লেখযোগ্য আর কিছু না। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চাষীরা কথা গেলে বেশি, মুখ খোলে কম।

ঐ আটজন সন্ন্যাসীর মধ্যে পগা একজন। কালো দুবলা চেহারা, বছর পনের বয়স। চোখের ড্যালাটা লাল ছিটছিটে, মস্ত লাউ বীচির মতো দাঁত হলদে ছোপধরা। ঠোঁটজোড়া কালো। পাঁজরার হাড়গোড়ে চামড়াটুকু লেগে আছে মাত্র। সে ধাওয়া পাড়ার ছেলে। গ্রামের শেষপ্রান্তে, বছরে আটমাস জলজমা বাঁশবাগানের ছায়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কঞ্চি-মাটির গোটা বিশেক ঝুপড়ি নিয়ে পাড়া ধাওয়া শব্দের অর্থ বা ইতিহাস অজ্ঞাত। অদ্ভুত এদের জীবিকা। নির্জন দুপুরে বা বিকেলের ছায়ায় কারও বাগানে ফর-ফরাৎ শুকনো কলপাতা হিঁচড়াবার শব্দ উঠবে।

'কে রে?'

'আমি কেতো....ধাওয়া পাড়ার লোক—'

'কি করিস ওখানে?'

'পাতা লেই।'

আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু 'নূতুন কেউ' হলে অবাক হবে।

'শুকনো পাতায় কি হবে?'

'ছাই হবে গো, বাস্না'। রোগা হাড় জিরজিরে নিরীহ মানুষটা এক গাল হেসে জবাব দেবে।

'দাঁত মাজার মশলায় লাগে গো। কলকারখানায় চলে। তা টাকা ডেড়েকের মতো রোজ হয় বাবু।' ওর চেহারা পোষাকে 'নতুন কেউ' বুঝবে এই জীবিকা নিয়েই ধাওয়া পাড়া টিকে আছে।

সেই ধাওয়া পাড়ার বৃন্দাবনের ছেলে পগা সন্ন্যাস নিয়ে আজ সংক্রান্তির বেলা শেষে শিবের ছড়া গাইতে গাইতে কশায় ফেনা তুলে ফেলছিল।

'বাবা আমার বড্ড ভালো/লোকের ভালো করে।'

থানের পাশে মাটির এক মস্ত কুমির। গায়ে কচি খেজুর পুঁতে কাঁটা। পুজো করে জলে ভাসিয়ে দিলে অমঙ্গল দূর হয়। তাই কুমির পুজোটা সেরেই সন্ন্যাসীরা ঝাঁপে উঠবে-মেলার মেয়ে 'পুরুষ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বুড়ো সিধু হালদার গাজনের কর্মকর্তা। বংশানুক্রমে গাঁয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি সে দেখাশুনো করে। এই থান আর কয়েক বিঘে জমি। সেখানে সারাবছর বাঁশের চাষ করে যা টাকা ওঠে, গাজনের খাই-খরচা তোলে সিধু। এই চারদিন সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণ এবং সন্ন্যাস ভাঙ্গার পর কাল পেটভরে খাওয়ান, একখানা করে গামছা, ধুতি বিলোনোর রীতি চলে আসছে অনেকদিন থেকে। চোত মাস শুরু হলেই বাড়ি বাড়ি সন্ন্যাস নেওয়ার নিমন্ত্রণ পাঠান হয়। মেলার পরিকল্পনা করে, যাত্রার দল ঠিক হয়, চারদিন গ্রাম্য-জীবনের নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢেউ তুলে নববর্ষের আগমন ঘটে।

হঠাৎ ঢাকের পিঠে নতুন ছন্দে কাঠি নেচে উঠল, ভিড়ের মধ্যে দোলা—যে যার ঘিরে দাঁড়াল ঝাঁপের বাঁশের চারদিকে। মাথায় উঠে সন্ন্যাসীরা বঁটির ফলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। এক খন্ড নরম সজনে কাঠের গায়ে গাঁথা, ঈষৎ বাঁকান তিন-তিনটে ফলা গোলা সিঁদুর লাল। জনা দশেক জোয়ান একটা জালকে টানটান পেতে ধরে আছে। নরম খড়ের বালিশ শোওয়ান আছে ঠিক জালের মাঝখানে; তার উপর ফলার কাঠখানা। এই কদিনের সভক্তি কৃচ্ছ্রসাধন এবং অসীম সাহসে লাফিয়ে পড়ার মধ্যে, কথিত আছে, মনোবাঞ্ছা পূতঃ ও পূর্ণ হয়।

ভিড়ের এক কোণে গাঁয়ের বর্ষীয়ান নিতাইচরণ হাঁটু মুড়ে পরম সুখে আইসক্রিম চুষছিল।

বয়সের ভারে চোখ কান শিথিল। পাশের লোকটাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন কোন বাড়ির ছেলেরা সন্ন্যাস নিলে হে? কি মানত করেছে?' পাশের ব্যক্তি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের পঞ্চু; সৃষ্টি খুড়োর ছেলে! ....শূলের ব্যথায় ভুগছে।'

'হুঁ'।

'দীঘির পারের মৃতুঞ্জয় মন্ডল......অজেৎ আলীর সঙ্গে মামলা জেতার মানত করেছে।'

'হুঁ'।

'কানাই মাস্টারের ভাই অনন্ত....বলেই কানের কাছে মুখটা এগিয়ে গলার স্বরটা একটু চেপে দিল, 'বউয়ের গভ্ভ হয়না....'।

'হুঁ।'

'আর ঐ ধাওয়া পাড়ার পগা। ও ব্যাটার খবর রাখি না।'

কেউ রাখে না; এমনকি সিধু পর্যন্ত অবাক। ঝাঁপের মানত গোপন থাকে না, মুখে মুখে রটনা হয়ে যায়। এটাই রীতি। জানার কৌতুহলে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু পগার ব্যাপারে গাঁয়ের লোকের বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই। দিন সাতেক আগে হঠাৎই সিধুর দাওয়ায় এসে সে হাজির হয়েছিল।

'সন্ন্যাস নিবি? ক্যানরে?'

'মানত ছিল বাবু—'

'কিসের মানত?'

পগা চুপ। বুকটা টিপ টিপ করছিল। মনের কথা বলতে ভারি কুণ্ঠা। এই চারদিন তার কপালে গাঁয়ের আর দশজনার মতো ফলমূল হবিষ্যি জুটবে— কোনো চিন্তা নেই। শিশু বৃদ্ধ, যুবক যুবতী এবং কুলবধূসহ সমস্ত গ্রামবাসীর দৃষ্টির সামনে সে এক অন্য পগা। অবহেলা, বঞ্চনা, ক্ষুধা ও গ্লানিমু[illegible] চারটে দিন তার কাছে স্বপ্ন। [illegible]চ পুজোর পর মেলাভাঙা মানুষ গাঁয়ের আঁধার পথে বাঁশ[illegible], পচা ডোবা, আমবাগানের শুকনো পাতা সরসরিয়ে যেতে যেতে আলোচনা করবে, 'হ্যাঁ, ঝাঁপ[illegible] বটে [illegible] সন্ন্যাসী। নাম [illegible]?

[illegible]ন পেটপুরে খাওয়া, একখানা গামছা এবং কাপড়।

[illegible] পেসাদ সাজবি? [illegible] পাড়ায় কোনো ব্যাটাইতো এ মুখো হয় না? পগা চুপ।

'বেশ! নিবি সন্ন্যেস।'

শিবের কাছে কোনো জাত বিচার নেই। ধনী দরিদ্র'র ভেদাভেদ তুলে দেওয়া আছে। মার দিয়া কেল্লা! পগা লেগে পড়ল।

'উঠবে! উঠবে!' চারদিকে গুঞ্জন।

'একটু থেমে!'— সিধু চেঁচিয়ে উঠল। এক ধামা বাতাস মুঠো মুঠো হরির লুঠ দিল ভিড়ের চতুর্দিকে। বৃষ্টির মতো হাতে মুখে মাথায় ছিটকে ছিটকে পড়ল। 'জয় বাবা ভোলানাথের জয়! পগ্গা! মৃত্যুঞ্জয়! অনন্ত পগার চরণে।

'বাজনা! বাজনা! জোরে, আরো জোরে!'

সিধুর তর্জনি মাথার উপর চারদিক পাক খেল।

সঙ্গে সঙ্গে তিন সন্ন্যাসীর দেখাদেখি পগাও খুঁটি ধরে লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করল একতলা উঁচু আড়াআড়ি বাঁধা মাচায়। রোগা হাতটা দড়ির মতো পেশি-সর্বস্ব হয়ে থর থর কাঁপতে থাকল, কনুইটা যেন এইমাত্র ছিঁড়ে খুলে পড়বে।

'ধর! ধর!'

জনাদু'য়েক মানুষ ছুটে গিয়ে পাছাটা ঠেলে ধরতে সে উঠে দাঁড়াতে পারল। খুঁটিটা ধরে মিনিটখানেক অন্ধকার চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁ পাঁজরের উপর নরম হৃদপিন্ডটা ঢিক ঢিক করছে। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু শরীরটা তার হালকা মনে হচ্ছে। নীচে মানুষের মাথায় ঠাসাঠাসি। সব একদিকে তাকিয়ে; পগা তাদের উপর। লাল নীল বিভিন্ন রংয়ের শাড়ি পোষাক গোল, গোল চোখে ভাসতে লাগল। চিৎকারের কুন্ডলি ধাক্কা দিচ্ছে কানে, কারণ আজ সন্ন্যাসীরাই মেলার বহুল আলোচ্য এবং সশ্রদ্ধ।

'দুই বাঁশ! দুই বাঁশ।'

পগার দেহে উত্তেজনায় কাঁটা দিচ্ছে। সে ছেলেকে বছরের অন্যান্য দিন কেউ একবার তাকিয়েও দেখে না, সিকি পেটা আধ পেটা খেয়ে চোরের মতো পাতা কুড়িয়ে দিন গুজরান করে, আজকের আসরে সে অন্যতম পূজ্য ব্যক্তি। অনুরোধ করছে দোতলার সমান উঁচু বাঁশটায় উঠে দাঁড়াতে। এতগুলো মানুষের উৎসাহে থর থর হাঁটুজোড়া নিয়ে দুই বাঁশে উঠে দাঁড়াল। সে আর পগ্গা।

ভিড়ের মানুষ আবার চ্যাঁচাল 'তিন বাঁশ! তিন বাঁশ।'

হাঁড় - চামে ঢাকা দেহটায় একটু পোশাক আর দু'টো দানা যার স্বপ্ন, জল ঝড়ের অন্ধকারে যে টিকে আছে, বিশেষ মুহূর্তে সে এখন নায়ক। হয়ত প্রতিটি মানুষের জীবনেই এমন একটি পরিস্থিতি আসে।

শরীরের শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে বাঁশটাকে জাপটে ধরে এতগুলো উদগ্রীব চোখের সামনে তাদের অনুরোধ রক্ষা করল। ওরা জানে না পগা আর পারছে না। অত উঁচু থেকে আজ আর কোনো সন্ন্যাসী ঝাঁপ দেবে না। ঘাড় ওচানো ভিড়ের সামনে সন্ধ্যার অবস্থা অন্ধকারে ক্ষীণ ছায়াটা স্থির হয়ে রইল।

'ভক্তি আছে। পুণ্যি করেছে ছোঁড়া।'

এবার সন্ন্যাসীদের মোহ মুক্তির পালা। সমস্ত দিন ধরে সে উপচার পেয়েছে, এখন তা মানুষের মধ্যেই বিলিয়ে দিতে হবে। নিরলঙ্কার, নিঃস্ব, রিক্ত। তবেই প্রকৃত সন্ন্যাস। প্রথমে মণিবন্ধে জড়ানো আকন্দের মলাট সামান্য দুলিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কোণে। হুমড়ি খেয়ে শ'য়ে শ'য়ে চঞ্চল উর্ধবাহু বিশৃঙ্খল জট পাকিয়ে পড়ন্ত মালাটার দিকে ধেয়ে যায়। আপন অধিকারে পূণ্য অর্জনের লোভ। এরপর সন্ন্যাসীদের তরফ থেকে কাঠগোলাপ, কচি নিম, ধুতরো। এক বোঝা গলার মালা, নানা অংশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নীচে কাড়াকাড়ি, দাপাদাপি। তারপর ফল বিলির পালা। ঝুলে পড়া কোচরবৎ গামছা থেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার নিয়ম। শশা, কলা, বাতাসা, শাঁকালু, নোনাফল, ডাব কোনো কিছুই নিজের অধিকারে রাখার নিয়ম নেই। শেষে মুক্তমনে বাবার থানের দিকে মানতের কথা স্মরণ করে, শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া।

প্রথমে অনন্ত।

সমস্ত মানুষ শ্বাসরুদ্ধ, স্তব্ধ। একবার সন্ন্যাসী, একবার ফলার দিকে দৃষ্টি। অন্তিম মুহূর্তে ঢাকের কাঠি ক্ষীণ হয়ে আসে। দেহটা সামান্য দুলিয়ে মরিয়া হয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে জালে পড়তেই, সমস্ত অঞ্চলটা জয়ধ্বনিতে কল্লোলিত হয়ে উঠল। বাজনা বেজেই চলল। চারটে লোক পাঁজাকোলে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেই, জলঘটি নিয়ে অপেক্ষারত কুলবধূরা ঝপঝপ ঢেলে দিল অনন্ত'র মাথায়। অদ্ভুত উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ কাঁপতে লাগল; আবার পাঁজা কোলে বাবার থানে শুইয়ে রাখা হল। অজস্র কলকণ্ঠের মধ্যে সিধুর উত্তোলিত তর্জনি শুন্যে ঘুরপাক খেল 'জয়বাবা শিবের চরণে।' নিখুঁত ঝাঁপের মধ্য দিয়ে সবার চোখেমুখে এক সর্বজনীন শুভচিহ্ন দেখা গেল।

অনন্ত, মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চা—এবার পগার পালা। সবার উঁচু থেকে সে এবার ঝাঁপ দেবে। ঢাক আর চিৎকারের বন্যা বয়ে গেল সমস্ত থানের উপর দিয়ে। সমস্ত মানুষ ঘন হয়ে দাঁড়াল। দোকানে-দোকানে আলো জ্বলে উঠছে। থানের সামনে স্থির শিখায় একটি তেলপ্রদীপ। পগার চোখে মুখে অসহায় ভাব। দেহটাকে সামান্য নাড়িয়ে চাড়িয়ে শান্ত মনে গুটোন মালাটা শূন্যে লুফতে থাকে যেন খেলাচ্ছলে কেউ বল লোফালুফি করছে। অত উঁচু থেকে আবছা অন্ধকারে মানুজনের মুখ সে ঠাহর করতে পারছে না। কিন্তু ছায়া উর্ধ-বাহু হাঁসফাঁস করছে এখানে। এ দিকে। হুই বাবা আমার দিকে। পগা জানে ওগুলো গাঁয়ের মানুষের প্রত্যাশার হাত। নগেন স্যাকরা, যে নাকি সারাদিন তিলক কেটে' হরি হরি' বলে, কানাই মাস্টার—পালার গান বাঁধে যে, পয়সাঅলা পশুপতি ও আরও অনেক আছে। নগেনের চোখজোড়া খপিস। পগা জীবনে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল এ চোখের। বাটির ওজনটা হাতে যাচাই করে বলেছিল, 'চুরির মাল?'

'দু'ঘা জুতো দেবেন তাহ'লে—'

'হুম্। খোলো বাটি বলছিস, এ তো ঠুনকো। এ বাঁধা রেখে আমার লাভ? পগার পা কাঁপছিল।

'যাক, এই বর্ষায় না খেয়ে আছিস, নে দু'টো টাকা।'

'দু'টো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাসনা পুড়িয়ে কত কামাস।' খপিস চোখজোড়া জ্বলে উঠতে পগা টাকা দু'টি নিয়ে ফিরছিল বাড়ি।

নগেন এখন মালা ভিক্ষা চাইছে। হরি বোল! হরি বোল!

পশুপতি একজনকে গুঁতিয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করছে, চোখ তার মালাটার দিকে হয়ত কটা চোখজোড়া তেমনই স্থির, যেমন করে পগার বাবা বেন্দাকে বলেছিল, জুতিয়ে মুখ ফাটাব, বড্ড তেল হয়েছে? বাড়িতে চুরি হবার পর দারোগাকে ডেকে এনে বলেছিল, 'স্যার এই ধাওয়া পাড়াটাই চোর। বাসনা পুড়িয়ে কি পেট চলে ? বেঁচে আছে কেমন করে?' বেন্দা দারোগার সামনে বলেছিল', বেঁচে আর আছি কে বাবু...আধমরা। চুরি করে প্রাণডা খোয়াব? এ দুন্নাম দিচ্ছেন কেন?' পুলিশ চলে যাবার পর শাসিয়েছিল পশুপতি। তবে কানাই মাস্টার লোকটা ভালো; রাস্তাঘাটে মাঝে-সাঝে পগাকে একা পেয়ে চলে। 'কেমন গান বাঁধলাম ছোঁড়া শুনবি? চাঁদের আলো তোমার মুখে/কাঁপন জাগে আমার বুকে।'

আজ সবাই পগার দিকে তাকিয়ে আছে। সংকোচ লাগছে, কাকে সে খুশি করবে! ভাবতে ভাবতে এক কোণায় মালাটা ছুঁড়ে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল গুচ্ছের মানুষ।

আস্তে ঝোলা থেকে সবুজ কচি একজোড়া ডাব শুন্যে দুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। এই মুহূর্তে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই যেন নেশা। সারাটা দিন ধরে উপাচার যখন পাচ্ছিল, ফলমূলগুলোর দিকে পগার লোভ ছিল প্রচন্ড। জীবনে সে এর স্বাদ পায়নি। ইচ্ছে ছিল গোপনে নিজের খাওয়ার সুযোগ পেলে দুঃখ, উদরটাকে উজার করে দেয়। শুধু নিজেকে নয়, ধাওয়াপাড়ায় আপন কুটিরে বাপ মা ভাই বোনগুলোর শীতল দৃষ্টির সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বলবে 'খা খা, খেয়েই নে!' চিনিটুকু ভাঙা কৌটায় পুরে মায়ের জিম্মায় দিয়ে বলবে 'রেখে দাও, লুকিয়ে এনেছি!' কিন্তু এখন লোভ উধাও। সবুজ গোল ডাবদু'টো ছেড়ে দিয়ে ভার মুক্ত হল। তারপর শশা, কলা, পুষ্ট শাঁকালু এবং সোনার বর্ণ পাকা নোনাফল। এক বুড়ির মাথায় থক্ করে লেগে ফেটে ফলটা ধুলোয় পড়ল। পাশের জন দ্রুত চিলের মতো ছোঁ মেরে ঘস্ ঘস্ কামড়াতে লাগল।

জনাচারেক জোয়ান জালটা টেনে প্রস্তুত। ভিড়টা থমথমে বাকরুদ্ধ। ঢাকের কাঠি ক্ষীণ, থেকে ক্ষীণতর। অনেকের বুক টিপ টিপ করছে।

থানের দিকে তাকিয়ে পগার ছায়া-ছায়া অবয়বটা মৃদু দুলতে শুরু করল। ফলা তিনটে দুর্বল বুকটা টেনে নেওয়ার জন্য আকাশের দিকে হাঁ করে আছে। তেলের প্রদীপটা ক্ষণচঞ্চল জ্বলছে। ঘাটের মাথায় সবুজ ডাবের গায়ে আলোটা ঠিকরে পৌঁছচ্ছে পগার চোখে। ড্যালাটা লাল ছিটছিটে, মণিজোড়া স্থির। আশঙ্কায় কেমন যেন দিশেহারা। ওই আলোটাকে সে দারুণ ভয় পাচ্ছে, যা সমস্ত চেতনাকে শীতল সাপের মতো আচ্ছন্ন করে রাখছে।

পাপের ভয়। লোভের আর এক নাম পাপ। তার কোনো মানত ছিল না-অন্তর্যামী নিশ্চয় টের পেয়ে গেছেন। এ চারদিন এবং কাল সে প্রাত্যহিক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। উপরন্তু, গামছাটা পাবে এবং ধুতিখানা অর্ধেঙ্গ। বাপকে দিয়ে বলবে, 'এটা জড়িয়ে বাজারে যেয়ো বাবা।'

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পগার অন্ধকার চোখের সামনে চক্কর খাচ্ছে। গাজনতলা, দোকানপাট, মেলা, ওপাশের বাঁশবন, আমবাগান, মাঠ, দীঘি, ধাওয়া পাড়া। চামের তলায় হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করছে। সারাদিন একফোঁটা জলও নেয়নি সে, এখন ভয় ও উত্তেজনায় আর টাল সামলাতে পারল না।

দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। জালধরা যোয়ান ইশারা করছে লাফিয়ে পড়ুক। সিধু আবার তর্জনি তুলল, 'বুড়ো বাবা শিবের চরণে।'

'শিবের চরণে'-ভিড়টা উৎসাহ দিল পগাকে।

পগা পারল না। এ যেন অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের মতো। উত্তেজনায় অত উঁচুতে উঠলেও, নামার সাহস তার নেই। সে এখন অর্ন্তদৃষ্টিতে ফলা তিনটে দেখতে পাচ্ছে। একটু ভুলেই পগার রুগ্ন অপুষ্ট দেহটাকে গেঁথে ফেলবে। সে মরতে চায় না, কিছুতেই না।

গ্রামবাসীর চোখগুলোতে সন্দেহের ছায়া দুলছে। সিধু স্থির, কপাল কুঁচকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে ছোড়াটার দিকে। সর্বনাশ! এগাঁয়ে ঝাঁপের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। কী ঘটতে চলেছে? পরস্পর তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে। প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা কিন্তু নীরব। থানে ঠাকুরের মূর্তি স্থির, রোষনেত্র অমঙ্গল অভিশাপ-ভিড়ের অনেকের মনেই এ চিন্তাটা খেলে বেড়াতে লাগল।

অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর। দিগন্তের ম্লান আলো মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিছু মানুষ ভয় পেয়ে গেল। অশুভ শক্তি কি ওকে উঁচু থেকে শুকনো শক্ত মাটিতে ফেলে দেবে? চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করবে খুলি হাড় থ্যাৎলানো একদলা মাংসপিণ্ড? ঢাকঅলা মৃদু কাঠি বাজাতেই সিধু চেঁচিয়ে উঠল, চুপ!

আবার কঠিন নীরবতা।

আস্তে পগার ছায়াটি নড়াচড়া করল। শ্বাসরুদ্ধ মানুষ দেখল ছোঁড়াটা বাঁশ বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল দুইবাঁশে।

একি? রাগে মানুষ গজরাচ্ছে। মুখে রা' নেই। নতুন বছরে এ অমঙ্গলের সূচনায় স্বামী পুত্র পরিবার নিয়ে গেরস্থরা শঙ্কিত।

কিন্তু পগা এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়েও কোনো সাহস পাচ্ছে না। মাথাটা চক্কর খাচ্ছেই, দুর্বল বুকটার বিরামহীন ধুক ধুক। কোনো বাজনা নেই। আলোড়নহীন, শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ। সিধুর চোখজোড়া জ্বলছে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। সমস্ত মেলাটায় শ্মশানের স্তব্ধতা। এখানে দাঁড়িয়েও পগার হাঁটুজোড়া কাঁপতে লাগল। ফলা তিনটেকে সে ভয় পাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে নেমে এল প্রথমে বাঁশে। দু'বার দুলে অযাচিত ভাবেই ঝুপ করে চোখ বুজে জালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কোনো আওয়াজ জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না।

কিছু পর একজন গ্রামবাসী তাচ্ছিল্য অবহেলায় হ্যাঁচাক টানে তুলে এনে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। তখনও সে কাঁপছে না। জলঘটি হাতে কুলবধুরা এগিয়ে এল না। শুধু এক বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'এ-ও যে মায়ের ছেলে। ঘটিখানেক জল ঢাল না বাবারা।' অনাদরের একঘটি জল পগার মাথায় পড়তেই তার কাঁপা শুরু হয়ে গেল। সেই লোকটাই আবার হিঁচড়ে থানে নিয়ে

বসিয়ে দিল।

ঘোর কাটার পর করুণ মুখে পগা দেখল তার সামনে সিধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন ছিঁড়ে ফেলবে। ভয়ে ভয়ে প্রথমেই সে ফলায় খোঁচা খাওয়া বুকের ক্ষতটা গেরুয়ায় ঢেকে ফেলল। জ্বালা করছে করুক। ধুতি, গামছা এবং পেট পুরে আগামী কালের খাওয়াটা এখনও বাকি আছে।

'পাপী! নির্ঘাৎ উপোস ভেঙেছিল'? —সিধুর ক্রুদ্ধ গর্জনেও জবাব দিল না পগা! শুধু কিসের আশঙ্কায় ভীড়ের কাছে প্রার্থনায় দেহ কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন

হাট-ফেরত, এক বিশেষে মতলবে, পাখুয়া বাঁধের ঢালু পথে নেমে গেল। পাঁচ মিনিটের রাস্তা, তারপর থমকে দাঁড়ায়।

তার আঁশধোয়া চোখজোড়ায়, এখন, পশ্চিমমুখো সুয্যিটার মিহি তেজের ছায়া। যেন হা-হুতাশ, ভাগ্যের দোহাই এবং অতীত রোমন্থনে কাউকে কটাক্ষ হানছে! বুকের নদীতে চাপা ক্ষোভের জ্বালা-ধরা নিঃশ্বাস। পাশে দ্বিতীয় কোনো 'মানু' অর্থাৎ মানুষ নেই। নির্জন। ডাইনে সপুষ্ট, ভারী সবুজপাতার মতিহারী তামাকের ক্ষেত। দূরে কদমছাঁট ধানগোড়ার শূন্য মাঠ। পুবে, ছোট মহকুমা শহরটির শেষ লোকালয়ের কিছু দিকচিহ্ন, আর পশ্চিমে শুটুঙ্কার দ্বীপ-চর, স্রোতবিহীন আঁকাবাঁকা জলধারা। মাটির বাঁধটি এখানে শেষ হয়ে সমতলে মিশে গেছে।

মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন! বুড়ো সুন্দর পাখুয়ার ঘোলা চোখজোড়া পিটপিট করে। মুখে বলে না কিছু—ইচ্ছেটা মনের গভীরে টক্‌টক্‌ করে ওঠে। মহারাজা নেই, বংশধররা বিদেশে, কেবল অস্থাবর স্মৃতিচিহ্ন দেবিকারাণী বেলাশেষে ছায়াস্তূপ হয়ে নির্জন কোণে দাঁড়িয়ে আছে। পাখুয়া ঐ ছায়াস্তূপের গায়ে সস্নেহে দৃষ্টি বুলিয়ে মহারাজা এবং বিগত দিনগুলো দেখতে পায়। আর ফিরে আসবে না কেউ! তাই চোখের ক্লান্ত কটাক্ষে কিছু হা-হুতাশ, ভাগ্যের দোহাই। আর চাপা ক্ষোভ এই মফঃস্বল শহরের সরকারি বাবুদের পর, যেন ভক্তি-ভালোবাসাহীন নেমকহারাম 'গোলামের ব্যাটারা' মহারাজাকে সময়ের বিপাকে নির্মূল, নিঃশেষ, করতে বদ্ধপরিকর। পাখুয়া রাজভক্তিতে নিজেকে টানটান করে রাখে।

সরকারি পিলখানার আকাশমুখীন শালখুঁটিগুলো ছোটখাট হাওয়াকালের মতো। মাথায় ছাউনি উঠছে নতুন টিনের। রোদে দূর থেকে রাংতার ঝিলিক লাগে। এখনও পিলখানার মেঝে পাকা হয়নি, জল-ঝড় বা ঠান্ডার ঘেরাটোপ অসম্পূর্ণ। পাশের পুরণো পিলখানা বদলে, সরকারি বাবুদের হুকুমে মহারাজার স্থিতিচিহ্নের এই নতুন পিলখানা গড়তে সময় কেটেছে তিনমাস, আরও কত লাগবে কর্তারাই জানেন। তবে হ্যাঁ, শালের 'পোই' অর্থাৎ খুটিগুলো মজবুত। পাখুয়া আঁশ তুলে, টোকা বাজিয়ে পরীক্ষা করল। নিশ্চয়ই ধরলা নদীর ওপারে বৈকুন্ঠপুর বিট থেকে শাঁসাল শাল এসেছে, রাজ্য জুড়ে যার সুনাম। এর চেরাই তক্তায় মজবুত কাঠ হয়। এত উচ্চমানের তক্তা, তার

গ্রাম শিকারপুর থেকে এই মহকুমা শহরে, মানুষ চলাচলের এগারো মাইল পথের ছোট বড় ছাব্বিশটি কাঠের পুলের কোথাও নেই। পাখুয়ার এই পঁচাশি বছরের জীবনে মনে পড়ে না। গত বছর, অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর, সরকারি বাবুরা সিতাই গাঁয়ের খালে চাষীদের চলাচলের জন্য যে কাঠের পুল গড়ল—সে তক্তাও এমন মজবুত নয়। দেবিকারাণীর কপাল ভালো!

ছড়ছড়, ক-চ্, কি-চ্, কু-চ্—একটানা শব্দ চলছে। ঢিলে তালে, ভ্রূক্ষেপহীন কিছু চর্বণের শব্দ। পিলখানার মেঝেটা অপরিচ্ছন্ন। পচা পাতা, এক কোণে পেচ্ছাপ ও রাশিকৃত শুকনো মলের ঝাঁঝালো গন্ধ। কুচোন কলাগছের ঢিপি, ভেঙে-আনা অশ্বত্থের ডালপালার মধ্যে দেবিকারাণীর বেঢপ চারটে পায়ের থাম ডুবে আছে; ঝুলে থাকা মাংসল শুঁড়ের ডগাটা নিপুণ ভঙ্গিতে পাক খেয়ে গুটলি পাকিয়ে পাতা, ছাল, খন্ডগুলোকে মুখের ছুঁচলো গহ্বরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর বিশাল চোয়াল নড়তে থাকে, শব্দ ওঠে ক-চ্, কি-চ্, কু-চ্।

মস্ত মাথাটা নির্লোম, ধুলোমাখা, খসখসে। ঢিলে, কুঁচকোন রগতোলা চামড়ায় বিশাল খাঁচাটা ঢাকা। ছোট্ট লেজটুকু আরামে নাড়ায় আর পাখুয়া লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে কুলোর বাতাস চলছে। মস্ত কানের পাতা জোড়া ছেঁড়াফাটা; এঁটুলি পোকায় ধরেছে। মাঝে মাঝে সরে এসে চর্বণের ক্লান্তিতে একঘেয়ে সময় না কাটিয়ে দেবিকারাণী শুঁড়ে ধুলো-জঞ্জাল তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছিল পিঠে। পিলখানায় ধুলোর বৃষ্টি। দেহটা আরও কিম্ভূতকিমাকার হয়। সে তো হবেই। এর বয়স প্রায় আশি হতে চলল। সুন্দর পাখুয়া নিজের দেহ বিচারেই তুলনা করতে পারে।

দাঁত ফোঁকলা, ভুরুঝরা ফোলা চোখজোড়া ধূসর, কাঁপা হাঁটু, মুখের চামড়ায় অসংখ্য জালি-জাফরি। এখন গুয়া পানে রাঙানো দু-একটি নিঃসঙ্গ দাঁতের হাসিতে, কে বলবে এই পাখুয়ার নামই যৌবন 'বিষহরার' পালাগানের দোহার হিসেবে হাজার মানুষের মুখে মুখে ফিরত? যাক্, তার মতো এক হুগলোর ব্যাটা তামাক চাষীর তুলনা থাক, দেবিকারাণী যে মহারাজার পুরণো বাহিক! এই মহকুমা শহরে, হাওদায় বসা মহারাজার ঝলমলে চেহারা এখনও সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাই ফারাকটা চোখে বড্ড ঠেকে।

— পাখুয়া গাঁয়ে যাবেন না? নির্জনে পাশের কোণ থেকে মাহুত রঙ্গুয়া বর্মণ উলিঢুলি বেশে বেরিয়ে আসে। ব্যাটা নদীর ধার থেকে উঠে এসেছে। ফাঁকা পরিবেশে, রঙ্গুয়ার হঠাৎ ডাকে পাখুয়া খানিক চমকে যায়। রঙ্গুয়া পিলখানায় ঢোকে।

—কোথায় ছিলরে ভূত?

—পেছনে আমার কোরটার হচ্ছে। রঙ্গুয়া মাহুত অফিসারের মতো কথা বলে। পাখুয়া কৌতূহলে পিঠে ঝুলোনো সওদার বোঝাটা খালাস করে পিলখানার পেছনে এসে দাঁড়ায়। গুটুঙ্গা ঝোপঝাড়ের সাক্ষীতে শান্ত জল আর বালির খাদে শ্লথ হয়ে আছে। ওপারে শ্মশান, কিছু নিশান পোতা। এপারে ঠিক পিলখানার পেছনেই, নদীর ধার ঘেঁষে রঙ্গুয়া বর্মণের কোয়ার্টার উঠছে। পাকা-পোক্ত, ইট-সিমেন্টের। শুধু রঙ্গুয়ার নয়, তার মেট তিলু বর্মণেরও। বুড়ো উঁকি দিয়ে দেখে লাল টকটকে সদ্যপাকা মেঝে কাদার বাঁধে জলবন্দী হয়ে আছে, জানালা দরজা সবই তৈরী শুধু দালানের মাথায় এখন ছাউনি চড়বে। মোট চারখানা ঘর, রান্নাঘর এবং দু-দু'টো পাকা পায়খানা। বুড়ো পাখুয়ার

বেশ লাগে। জীবনে সে পাকাবাড়ির আস্বাদ পায়নি। সে কেন, মহকুমার কোনো গাঁয়ে কেউ পাকা দালান দেখেছে? বাব্বা! মহারাজার আমলে শহরে কোনো মানুষ পাকাবাড়ি বাঁধার হুকুম পেত না। এখনও প্রায় তাই, এই তিরিশ বছরে পাকা-বাড়ি আঙুলে গোণা যায়।

ফিরে এসে পাখুয়া বলে-এ যে রাজ পাসাদ! ঘি সইবে পেটে, বর্মণের ব্যাটা?

— রাজার হাতির লাগি বাবুরা করি দিলেন। জলে ভিজে কি করে দেবিকারাণীকে দেখি? জেলা থেকে বড়বাবুরা তলব জানালে হাতির দেহ ঠিক থাকিছে না।

—খাঁটি কথাই বটে!

—নতুন পিলখানা গড়ার ডাক পড়িল, আমিও কোরটারের কথা বলিলাম। তবেই তো! পাখুয়া জবাব দেয় না। ব্যথা পায়। মহারাজার সামান্য হুকুমকেও সরকারি বাবুরা আর মূল্য দেয় না। রাজশাসনের চৌহদ্দিতে যে পাকাদালান তোলা যাবে না, সে আদেশ গুটুঙ্গার জলে ভেসে গেছে। ভক্তির সংস্কারে মহারাজাকে সে স্মরণ করে। হাওদায় চেপে মহারাজা শিকারের পথে এই মহকুমা শহরে এসেছেন। সে কি হৈ চৈ! ডাক পড়েছে তার বাপ ক্ষিতি পাখুয়ার, মহারাজার বিশ্রামকক্ষে পাখা টানবার জন্য। বংশগত পাখুয়া যে তারা!

ইতিমধ্যে রঙ্গুয়া বর্মণ পিলখানার অন্ধকার অংশ থেকে হাতিটাকে বাইরে নিয়ে এল। বৃদ্ধ অস্থি-চর্মসার হাতিটা এঁটুলির জ্বালায় কুলোর হাওয়া দেয় আর শুঁড়ে শ্বাস ঝাড়ে ভস্‌ভস্‌। পাখুয়া জীবটার ক্ষুদে শান্ত ডান চোখটা দেখে। তার নিজের মতো, ঐ ছোট্ট চোখটিতে ছাইরঙা ছানির আভাস এসে গেছে। ইতিহাস সঙ্গে লয়ে ভারাক্রান্ত। হঠাৎ সুন্দরের নজরে যায় দেবিকারাণীর বাঁ চোখটি প্রায় বন্ধ, ময়লা আর জলকষের স্পষ্ট দাগ; ছোট্ট তেলপোকারা চোখটাকে ঘিরে উড়েই চলেছে। কুলোর হাওয়া ওখানে পৌছয় না, তাই পোকারা বিনবিনিয়ে যাচ্ছে। ক্রোধের নিঃশ্বাস পাখুয়ার বুকে। মহারাজা দেখলে কষ্ট পেতেন। বহুকাল আগে শিকারে চোখটি জখম হওয়ার সংবাদ সুন্দর জানত। হায়! অবহেলা-অবজ্ঞায় আজ তা অন্ধত্বে পরিণত। মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন।

— হাতি দেখিতে আসিলেন?

—হ। বাস-রাস্তায় পিলখানার নতুন টিনার ঝিলিক দেখি মনে টান ধরিল। মহারাজার লবণ খেয়েছি না? তাই দেখিতে আসিলাম। অন্য একটা কথা ছিল তোর সঙ্গে।

— উৎসবে আসিবেন না?

— হ। মহারাজা চলিয়া যাবার পর বচ্ছরে এই উৎসবের দু'দিন তোদের শহরে আসি। এই দেবিকারাণীর জন্য। শহরে কী আছে? আইজা চ্যাঙজাডা হাটে আসিল না, তাই আসিতে হইল।

হাতি নিয়ে রঙ্গুয়া গুটিগুটি বাঁধের পথ ধরতেই, পাখুয়া আসল মতলব চেপে জিজ্ঞেস করল— রাজামশাই কোথায় চলিল এখন?

—নাজিরবাবুর আপিস।

—কেন?

রঙ্গুয়া স্পষ্ট জবাব দিল না বিরক্তিতে বিড়বিড় করল। কোনো কিছু অব্যবস্থায় রঙ্গু যেন ক্ষুব্ধ।

রাজার আমলের রঙ্গু এখন যেন সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। চলাফেরা, কথাবার্তায় সরকারি মেজাজ। পাখুয়া কথাটা বলেই ফেলল।

—বিলখানার একটা পোই দিবি? বৈকুণ্ঠ জঙ্গলের শাল? ছাম ভাঙ্গি গেছে, নতুন করি বানাম্?

শাল কাঠের এক খানা ছাম! ধান কুটবার ডান্ডা। পুরণোটা ক্ষয়ে গেছে। এই তো চোত বোশেখ থেকে তামাকচাষীর ঘরে ভাত উধাও হয়ে যাবে, ক্ষিদে মারতে হবে বনের লাফাশাক আর চালগুঁড়োয়, নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত। সুতরাং শক্ত ছাম চাই। পাখুয়া শাল দেখে আর লোভ সামলাতে পারে না।

— আসেন পাখুয়া! উৎসবের দিন ও কথা বলিব। দেরি হলে নাজিরবাবুর অপিসে তালা ঝুলিবে। বাস না পাইলে যেতে আন্ধার হইবে আপনার। হাঁটা দেন।

রঙ্গুয়া একাই সিগারেট ধরিয়ে হাতি নিয়ে বাঁধের পথে চলতে থাকে। পাখুয়ার মনে একখন্ড শালের প্রত্যাশা আনন্দ আনে, আবার চারদিকের পরিবর্তন হাহাকার তোলে। একটা সিগারেট আশা করেছিল রঙ্গুয়ার কাছে। দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে।

শহরে মহারাজার বিশ্রামকক্ষটি আছে বটে, এখন সেখানে ফৌজদারী আদালতের মুনসেফবাবু থাকেন। সে জৌলুশ আর নেই। শেষ মহারাজা যে ঘরে মোটর বেঁধে রাখতেন, তা এখন মুনসেফবাবুর চাকরটার গোয়ালঘর। মুনসেফবাবু খাঁটি দুধ খান, দৈনিক দুই লিটার। মহারাজার সম্ভ্রান্ত অতিথিশালা এখন ইঞ্জিনিয়ারবাবুর অফিস, রাজ-আমলের পাকা পিলখানায় এখন নাজিরবাবু বসেন। আদালতে অবশ্য আদালতই বসে, জেলখানা আর কোতোয়ালের কুঠির কোনো বদল হয়নি। এমন কি শেষ মহারাজা দুর্মন্যনারায়ণ আদালতের সামনের মাঠে পিতৃদেব দনুজনারায়ণের যে সাদা পাথরের মূর্তি গড়ে দিয়ে গেছলেন, তা-ও ঠিকমতো সাফসুফ হয় না। তবে ঝাড়পোছ, পালিশ রাখার জন্য মাইনে দিয়ে সরকার বরাদ্দ করেছে যে লোকটিকে সে এমন অপদার্থ, অলস, যে, মাসমাইনে তিনশত 'ট্যাহা' পকেটে পুরছে শুধু! নাজিরবাবু দেখতে পান না?— এস.ডি.ও বাবু কড়া হুকুম দিতে পারেন না? তার পাশের গাঁয়ের প্রধানের ছেলে সে। পাখুয়া একদিন কিছু বলতেই, ছোঁড়াটা বলেছিল—ডিউটি দেই বলে রোজ করিতে হইবে? ত্যানার হাতি দিয়েই নায়েব আমার বাপঠাকুদ্দার ঘরটি ভেঙ্গে দিছলেন। সপ্তাহে একদিন পুছি ওর বাপের ভাগ্যি। এস.ডি. বাবুকে নালিশ জানান, কারো কেনা গোলাম না আমি।

সুন্দর পাখুয়ার পুরণো রক্তে বান ডেকে উঠেছিল। যাক, পাকা রাস্তায়, শুটুঙ্গার ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ গোধূলিতে ভাবল, মহারাজার আত্মা বুঝবেন, সমস্ত লবণ বৃথা যায়নি। চন্দ্র, সূর্য এখনও ওঠে! শুটুঙ্গায় স্রোত বয়! রাজ্যে শেষ ভক্তটি এখনও বেঁচে আছে। বাসের হর্ণে সে কান পেতে রাখে।

শেষ মহারাজা দুর্মন্যনারায়ণের আমলে এ-রাজ্য ভারত ইউনিয়নে চলে আসে। প্রজাতন্ত্রের দু'বছর পর। মহারাজার বংশধরেরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা এবং সুইসব্যাঙ্কের অর্থে এখন বিদেশে দিনযাপন করছেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শুধু দেবিকারাণী পড়ে আছে। পিলখানার দামি হাতিগুলো নেপাল-মহারাজার কাছে মহারাজা স্বয়ং বিক্রি করে গেছেন।

কেবল বৃদ্ধা দেবিকারাণীকে সেখানে চালান করতে না পেরে ফেলে দিয়ে গেছেন। শত হলেও রাজার হাতি তো, আদর আপ্যায়ন সরকারি আইনে পরিণত হয়েছে।

বছর তিনেক পর, প্রজাতন্ত্রের জামানায়, এ জিলার ডি. এম—সম্ভবত মাদ্রাজ ক্যাডারের এক তরুণ আই. সি. এস—অহেতুক খরচ কমাতে, দেবিকারাণীর জঙ্গল থেকে কাঠের গুঁড়ি বইবার কাজে লাগিয়েছিলেন। তারুণ্যের এই অবিমৃষ্যকারিতায় ক্যাডারটির সত্বর বদলির পরোয়ানা আসে এবং পরবর্তী ডি.এম. বা ডি. সিরা আর বিষয়টা নিয়ে ঘাঁটায় না। সেই থেকে সরকারি মাহুত ও মেট-এর মাসমাইনে, বছরে পিলখানা মেরামতির কিছু থোক টাকা এবং হাতির খাদ্য হিসেবে দৈনিক পাঁচ সের চাল, আধাসের গুড়, মাথায় মাখবার এক পোয়া সরষের তেলের খরচ মহকুমার নাজিরবাবুর কাছে থেকে রঙ্গুয়া বর্মণকে নিতে হয়। দেবিকারাণী সেই থেকে মহকুমা শহরের প্রান্তে পড়ে আছে।

বছরের দু'টো দিন শহরের উৎসবে তার ডাক পড়ে। ছাব্বিশে জানুয়ারি এবং পনেরই আগস্ট। মহকুমা কোর্টের সামনে মস্ত খেলার মাঠটায় প্রজাতন্ত্রের পতাকা উত্তোলনের পর, বিশিষ্ট সরকারি অতিথিদের দেবিকারাণী সেলাম ঠোকে। এ-দৃশ্য দেখতে দুর্গম গ্রাম-গাঁ থেকে মানুষ আসে চিড়া আর মুড়ি বেঁধে। শহরে মেলার মেজাজ। বছরে ঐ-দু'টি দিন বাদ দিলে বৃদ্ধ হাতির আহার এবং মল-মূত্র ত্যাগ ছাড়া বিশেষ কিছু থাকে না। ওর পিঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রঙ্গুয়ার কলাপাতা এবং অশ্বত্থের ডাল সংগ্রহের পর, হাতি সেই যে পিলখানার খুঁটিতে শিকল বাঁধা পড়ে, সন্ধ্যায় একবার নাজিরবাবুর আপিস যাওয়া ছাড়া কোনো কাজ নেই। শুধু ঝিমোন, ক্লান্তিকর চর্বণ, সশব্দে মলত্যাগ, এঁটুলির জ্বালা সওয়া আর কুলোর বাতাসে তেল পোকা তাড়াবার চেষ্টা। মাঝে মাঝে গুটুঙ্গার জলে স্নান, শুঁড়ে জলের ফোয়ারা এবং একঘেয়েমি কাটাতে অভিমান। খাবি না? কিছুই খাবি না? সারাদিন শুঁড় এলিয়ে পড়ে থাকলে রঙ্গুয়া আপনজনের মতো জিজ্ঞেস করে। বোঝে ওর অজীর্ণ ও সর্দির বিষয়টা। তখন হাতিকে যেতে হয় সরকারি পশু চিকিৎসকের কাছে। দেবিকারাণীকে পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ ডাক্তার বরাদ্দ আছে।

এ-বছর ছাব্বিশের উৎসব মাত্রা সাতদিন পরই। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে নতুন পিলখানা উদ্বোধনের কথা ছিল। তা আর হয়ে উঠল না। এস. ডি. সি. বিশেষ খোঁজ পাঠিয়েছিলেন উদ্বোধনের ব্যাপারে। কিন্তু মহকুমার মুখরক্ষা হল না। নতুন ডি.সি. এ ব্যাপারে খুব বিচক্ষণ। তিনমাস আগে, একবার, দেবিকারাণীর ডাক পড়েছিল এক বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ডি.সি. সাহেব স্যালুট নেবেন। এছাড়াও, সাহেবের কিছু ঘনিষ্ঠদের হাতির পিঠে জঙ্গল ঘোরাবার পরিকল্পনা ছিল। দেবিকারাণীকে দেখেই তিনি রেগে কাঁই।

—কি এনেছ? হাতি না কঙ্কালটা?

রঙ্গুয়া ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। সাহেবের চোখমুখ লাল, পেশি এবং ভুরু নাচছিল। কিছু আর বললেন না, হাতি ফিরে এসেছিল মহকুমা শহরে। সঙ্গে সঙ্গেই নোট পাঠিয়েছিলেন এস.ডি.ও কে। ওপরওয়ালার স্পেশাল নোট পেয়ে এক সন্ধ্যায়, নাজিরকে কোয়ার্টারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এস.ডি.ও. সাহেব। এই অজ, অখ্যাত ছোট্ট মহকুমা শহরে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এ হৃদ্যতা

আছে। তাছাড়া এস.ডি.ও ভদ্রলোকটি পাকাপোক্ত নন, ঝুট-ঝামেলাও পছন্দ করেন না। নাজির পুরণো এবং অত্যন্ত ঘুঘু ব্যক্তি।

—হাতির খই-খরচা ঠিকমতো দেওয়া হয় না?

—কেন স্যার? পাই-পয়সা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি!

—ডি. সি. ক্ষুব্ধ! নোট পাঠিয়েছেন! বলছে, ক্রুয়েল্টি! হঠাৎ মরে গেলে কি হবে? এস. ডি.-র. মুখে চিন্তা। নাজির গম্ভীর মুখে সব শুনল। অনেকক্ষণ পর চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল—বুড়ো হাতি মরতেই পারে!

— মরলেই তো হাজার প্রশ্ন! লেখালেখি! মাহুত-মেটের নতুন চাকরির সমস্যা!

নাজির ফ্যালফ্যাল করে তার স্যারকে দেখে গভীর দার্শনিকের মতো বলে—মরার কথা কে বলতে পারে? দুর্মন্যনারায়ণ মরে নি? নেহেরু, প্যাটেল, লালবাহাদুর বেঁচে আছে? অতদূরের কথা কি, কোর্টের সামনে অমন শক্ত পুরণো বট গাছটা, এক রাতের ঝড়ে উল্টে গেল না? ডি. সি. সাহেব কিছু বুঝতে চান না।

—আরে তা বলছি না। কাগজপত্র ঠিক থাকলে আমরা দায়মুক্ত।

—ভাববেন না। সে সব জলের চেয়েও পরিষ্কার। মাহুত আর মেটের মাইনে, রোজকার চাল গুড় তেলের হিসেব, সব লেখা আছে। প্রতি বছর অডিট হয় না? কি বলছেন!

— এস.ডি.ও. তবুও খুঁতখুঁত করে বলেন— কোনো সিচ্যুয়েশনে হাতির খোরাকি বন্ধ থাকেনি তো? নাজির এবার উচ্চস্বরে বলে—না, না! এমনকি সেভেন্টি ফাইভের খরায় গাঁয়ের লোক যখন কচুসেদ্ধও পাচ্ছিল না, আমি ঠিক হাতির চাল জোগাড় করেছি। গতসনের বন্যার ব্যাপারটা ভাবুন? কত কষ্ট করে চাল গুড়ের চালান ঠিক রেখেছি। ডি.সি. সাহেব বললেই হলো? ও আপনি ভাববেন না স্যার।

এস.ডি. ও. তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। চোখ বুজে খানিক ভেবে বলেন—একটা কাজ করুন! চাল, গুড় আর এখন থেকে পিলখানায় পাঠাবেন না। রোজ বিকেলে মাহুত আপনার সামনে খাইয়ে নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কন্ট্রোলে থাকবে আপনার।

নাজিরের এই গোপন সুড়ঙ্গটা খেয়াল ছিল না। তাই এস.ডি.র নতুন আইনে রঙ্গুয়া বর্মণ ক্ষুব্ধ, আহত হলেও বলার কিছু নেই। কেবল গাঁইগুই করল—নতুন পিলখানা না তুলে দিলে, হাতির ভ' ।মন্দ আমি জানি না।

—কেন?

—পুরণো ঘরে, জল পড়ে, ঠান্ডা আসে। হাতির কানে জল ঢোকে। রোগা কি এমনি হচ্ছে? এস.ডি.ও. সাহেব রঙ্গুয়ার যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন এবং এই সুযোগ রঙ্গুয়াও নিজের এবং মেট তিলু বর্মণের কোয়ার্টার তুলিয়ে নেয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটু গাঁইগুই করেছিলেন। বন্যার পর মহকুমায় অনেক কাঠের পুল ভাঙ্গা পড়ে আছে, চাষীরা চেঁচামেচি করছে, সে অবস্থায় কোয়ার্টারের পেছনে বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ.......! এস.ডি.ও. আমল দেননি।

ব্যান্ড ! স্টার্ট!

ছেলেমেয়েদের ফরোয়ার্ড মার্চের সঙ্গে বাঁশি। জনগণ....অধিনায়ক। চারটে মোটা থামের মতো পা থপথপ অনুসরণ করে তাদের। সুসজ্জিত নতুন হাওদা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, সিঁদুর, ফুলের মালা, গলায় পেতলের ঘন্টি বাজে টুংটাং। মহকুমার ফুটবল মাঠটা পাক খেয়ে, খাটানো চাঁদোয়ার সামনে আসতেই, কানা ধূসর চোখে এস. ডি. ও. কে দেখে হাতি তার শুঁড়কে গুলটি পাকিয়ে আকাশে তুলে পিঠে ফেলে দেয়। ব্যান্ড, বাঁশি থামে। একবার স্যালুট, দু'বার, তিনবার! চাঁদোয়ার তলে বসে থাকা সরকারি অফিসাররা প্রজাতন্ত্রের সম্মানে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। হাতি তিনবার হাঁটু গাড়ে আবার ওঠে। পাশে মাহুত রঙ্গুয়া বর্মণ! ঘর-কাচা সাদা ফুলপ্যান্ট; সাদা জামা এবং মাথায় রাজার আমলের ছেঁড়া একটি টুপি। লোমখসা, সিল্কের। এত লোকের সামনে নিজেকে সাজাবার লোভ তার বরাবরের। আবার ব্যান্ড, ফরোয়ার্ড মার্চ, মন্থর গতিতে মাঠ প্রদক্ষিণ!

ছাব্বিশের দুপুরে আকাশে সূর্য নেই! ঘোলা মেঘাচ্ছন্ন। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডার রাজ্যে হঠাৎ এ ঘোলা মেঘের চাপ বিপজ্জনক। নাজিরের অফিসের সিঁড়িতে গোটা ছয় আধবুড়ো তামাকচাষীর মধ্যমণি হয়ে সুন্দর পাখুয়া দুর্যোগের ইঙ্গিত দেয়। চাষীদের দু'শ্চিন্তা একটু বেশি। বহুবছর বাদে তামাকের ফলন বেশ মনের মতো হয়েছে। তাই অসময়ের জলে সর্বনাশ! গাঁয়ের মানুষগুলো বয়ে আনা চুড়া এবং গাঁটের পয়সায় তেলেভাজার তৃপ্তি শেষ করেছে খোসগল্পের মধ্যে। সবার অনুরোধ 'বিষহরার' নামকরা দোহার সুন্দর পাখুয়া বাঁশির সঙ্গে 'কুপীটা' আটকে গৌরবের দিনগুলো স্মরণ করছিল।

—— শুধু বাঁশিতে হয়? খোল চাই, মুখা চাই মহাশয়রা! দেখতেন বুড়া হাড়ে ভেল্কি! জরাজীর্ণ, শ্লেষ্মাঠাসা বুকে যত সে হাঁপায় ততই অতীতের গর্ব বাড়ে। ছাই! আজ সকাল থেকে ঠান্ডায় এমন গুঁতুনি দিচ্ছে, বুঝি বুকের ফুসাটা এখনই ফাটে! বিষহরার দু'চারটে গান শোনায় কি করে? মহারাজার আমলে এ মহকুমায় সুন্দরেরই ছিল শ্রেষ্ঠ মনসাগানের পালা-বিষহরার দল। নায়েব, গোমস্তা জমিদার এমনকি বৃদ্ধ দনুজনারায়ণের মৃত্যুর আগের বছর জেলাশহরে রাজবাড়ির মাঠে সে গান শুনিয়ে এসেছে। পাখুয়ার বৃত্তি কোনদিন সে করেনি, শিল্পী হিসেবে সারা রাজ্যে তার কদর ছিল! তেনারা চলে যাওয়ার পর, এই হতশ্রী জেলায় পালাগানে যখন পেট আর চলছিল না, পাখুয়া সেই থেকে তামাকচাষী। মহারাজা নিষ্কর জমিদান করেছিলেন, কোনদিন খাওয়ার দুঃখ ছিল না। আজ জমি ভাঙ্গিয়ে পরিবারের দুর্ভাগ্যেই তা কয়েক বিঘেয় নামিয়ে এনেছে। পালাগানের খাতা আর বাদ্যযন্ত্র কুড়ো-ধুলোয় মস্ত এক মাটির কলসির মধ্যে পড়ে থাকে। সুন্দরের ছেলেরা খোঁজও রাখে না। কেবল পুরণো শখের টানে বছরের দু'দিন এই উৎসবে সঙ্গে আনে। সুযোগ পেলে পুরণো সাথীদের শোনায়।

গুড় গুড় গুড়ুম্! আকাশ ডেকে উঠল। হাওয়ার কামড়। পাখুয়ার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সুন্দর বসে আছে রঙ্গুয়ার জন্য। পিলখানার একখন্ড শাল দেবে রঙ্গুয়া। আকালের দিনে ভাঙ্গা ছামে কাজ হবে না, চাই নতুন মজবুত শালকাঠ। দু'বার মাঠের পাশে রঙ্গুয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, কোনো কথা বলে নি। যাক্, ভিড়টা একটু কমুক। সুন্দর পাখুয়া তাই চাষীদের নিয়ে মশগুলে ব্যস্ত। সে

তাদের শোনাচ্ছিল মানুষ পাল্টে গেলেও, পশুরা প্রভুভক্তি ভোলে না। পুরণো দিনের সঙ্গে আজকের উৎসবে দেবিকারাণীর আদবকায়দায় আন্তরিকতার ফারাক সে বোঝাচ্ছিল।

— বলেন, দেবিকারানীর শুঁড় বিঘৎ বেশি আকাশে উঠেছে কি এস. ডি. ও. বাবুর সামনে?

— কি লিম? চাষীরা বুঝতে পারে না।

— না। শুনেন কথাখানা আমার! মহারাজার আমলে উপরে দু'হাত তুলি সালুট করিতেন এ হাতি। পশুরাও প্রভুভক্তি জানে, আর আমরা মানুষ!

—হক কথাই কহিলেন পাখুয়া।

—দেখিলেন রঙ্গুয়ার কান্ডখানা? কেমন সং সাজিয়া আসিল?

একজন রসিকতা করে—পাখুয়া, দেবিকারাণী কয়খান বাঘ মারিয়াছিল?

—পাঁচ। ডুংড়ি জঙ্গলে একখান, বৈকুন্ঠ পুরে দুইখান, মানসাইয়ের চরে আর সিঙ্গিমারায় একখানা করে। ঐ সিঙ্গিমারার শিকারেই বাঁ চক্ষুখানে নখের গুতা খাইল। এখন হাতি অন্ধ, গোলামের ব্যাটা রঙ্গুয়া ওষুধ পর্যন্ত দিল না। হাতি কাঁদে দিনরাত। দিন আর রহিল না স্যাঙ্গাৎরা!

পাখুয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মহারাজা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছিল সত্যিকারের মানুষ, আর এখন? পোশাকে-আসাকে, দানে-ধ্যানে, ন্যায়-অন্যায় বিচার এই সব নাজির, এস. ডি. ও. বাবু, হাকিমদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। আজ কিনা তাঁর রাজ্যে এরা তাঁকেই নির্মূল করে দিল। সব দুঃখ মনে চাপা থাক। অন্তত মহারাজার আত্মা দেখছেন তাঁর রাজত্বের শেষ ভক্তটি এখনও বেঁচে আছেন।

গুড় গুড় গুড়ম্! পাখুয়া ওঠে।

— কোথায় চলিলেন পাখুয়া?

— আসি।

পাখুয়া রঙ্গুয়ার খোঁজে চলে যায়। তাছাড়া মেলা থেকে নাতনীটার জন্য দু'গাছা চুড়ি-ফিতে কিনতে হবে। ছ'মাসে অপুষ্টির হাগায় মেয়েটা মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে বটে, ডিগডিগে চেহারায় দিনরাত চ্যাঁচায়। মেয়েটার এই সাধটুকু পূরণের জন্য পাখুয়া আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেই এসেছিল। বলা যায় না, কোন্ দিন চোখ উলটে হেলথ্ সেনটার ফেরত মেয়েটাকে শুটুঙ্গার তীরে নামিয়ে রেখে আসতে হবে। তখন এ-দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। তা ছাড়া, এ শহরে আর ভালো লাগছে না তার। দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

মাঠে খুব হৈ চৈ হয়ে গেছে। এস.ডি.ও সাহেব আনুষ্ঠানিক পর্বের পর হাতির পিঠে মাঠ পরিক্রমা করেছেন। খুব শখ ছিল তাঁর। এই তিন বছর মহকুমা শহরে আছেন, কোনদিন হাতির হাওদায় বসেন নি। রাজারাজড়ার কথা শুনেই এসেছেন। আজ বদলির আগের ছাব্বিশে তিনি শখ মেটালেন। বহু লোক পেছন পেছন ছুটছিল। হঠাৎ ব্যান্ড এবং চিৎকার বোধ হয় এ জন্যই। ডি.সি. সাহেব জেলা শহর ছেড়ে আসতে পারেন নি, তাই এস.ডি.ও. সাহেব মনের শখ মেটালেন। এরপর হাসপাতালের রুগী ও কয়েদিদের ফল বিতরণ হবে। হাতিটার শহর ঘোরার কথা ছিল; কিন্তু এস. ও. সাহেবকে নামিয়ে দেয়ার পর রঙ্গুয়া লক্ষ্য করল বড্ড পাতলা হাগছে দেবিকারাণী। বিশ্রী

ব্যাপার! কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে এলে একটু মুশকিল। নাজির চেপে ধরবে ওষুধের খরচা কোথায় যায়! এ-সব কি হচ্ছে! হাতিবিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুও উৎসবে উপস্থিত, তাই আকাশের দোহাই দিয়ে সে হাতি নিয়ে পিলখানায় চলে গেল। ভিড়, গুঞ্জন ও চিৎকার ঠেলে পাখুয়া টুকটুক করে দনুজনারায়ণের শ্বেতপাথরের মূর্তিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। যাক্‌, আজ একটি সাফা-সুফা করেছে মনে হয়, চোখের কোণে জমে থাকা শহরের জঞ্জাল এখন নেই; কিন্তু কোন আহাম্মক খুঁটি পুঁতবার সুবিধায় মস্ত দড়িটা টানা দিয়ে রেখেছে। ফিতে আর চুড়ি কিনে সে রঙ্গুয়ার উদ্দেশে ছোটে।

গুটুঙ্গার ব্রিজের কাছে সে একবার দাঁড়াল। দূর থেকে পিলখানা দেখা যাচ্ছে। বাঁধের পথে মোটা শিরীষগাছের গোড়ায় আসতে দিগবিদ্দিগ কাঁপানো শব্দে পাখুয়ার কান খাড়া। অসম্ভব ঠান্ডা।

পাথর পড়ছে! গোল গোল থাবা-থাবা! বরফ-পাথর! ভীমবেগ! মরণ ঠান্ডা! পাখুয়া জীবনে এতবড় পাথর দেখেনি। ধোঁয়া-সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। মাথার ওপর নেমে আসা আকাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গোলা ছুঁড়ছে! অন্ধ ক্রোধে মাটি বিদীর্ণ! পাখুয়া জরাজীর্ণ দেহে অসহায়! গ্রামের দিকচিহ্ন ধোঁয়া! কোথাও ধারে কাছে আশ্রয় নেই। ক্ষেত সাদা স্তূপ হচ্ছে। বাতাসের তান্ডব। শ্লেষ্মা-ঠাসা বুকে পা কাঁপছে। দেহ জমে কাঠ। মাথা, কাঁধ, শরীরের আঘাতে ঘাড় নিচু করে পাগলের মতো ঘুরপাক খায়। তার ক্ষেত, মতিহারী তামাকের ক্ষেত! সবুজ সপুষ্ট আটপাতার ক্ষেত! নাতি-নাতনী! কুপী, বাঁশি, খোল! কিছু ধরার জন্য বাতাস হাতড়াতে থাকে।

জেলার ইতিহাসে এই প্রথম বিশ মিনিট ধরে অস্বাভাবিক, পাথর প্রমাণ শিলা-বৃষ্টির তান্ডব। অসম্পূর্ণ পিলখানার খুঁটিতে হাতিটা শুঁড়ে মাথা-পেটে অসহ্য আঘাত খেতে খেতে চিৎকারে শিকল ছিঁড়ে ছুটেছিল শহরের পথ ধরে। আহত হয়েছে। রঙ্গুয়া বর্ষণ ছুটে, তান্ডব নরম হয়ে পড়লে, শেষ প্রান্ত থেকে ধরে এনেছিল। ·

উৎসব মাঝ পথে পরিত্যক্ত হওয়ায়, সরকারি অফিসাররা যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেল। ঠিক তখনই জরুরী খবর আসে—ফ্ল্যাশ ফ্লাড্‌ হঠাৎ বন্যা! মহকুমা বিচ্ছিন্ন! পাহাড়ী নদী ক্ষেপে গেছে! হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন।

সুন্দর পাখুয়া আহত, রক্তাক্ত অবস্থায় টলতে টলতে পিলখানার কাছে এসে দেখে সরকারি দলটা দ্রুত জিপ চালিয়ে সবার আগে পিলখানা ও হাতির জন্য সরেজমিনে তদন্তে এসেছেন। রঙ্গুয়া ব্যস্ত। পাখুয়া কাছে ঘেঁষবার সাহস পেল না। রঙ্গুয়া যেন চিনতেই পারছে না তাকে। সব ঝাপসা দেখছে পাখুয়া। তারপর টলতে টলতে, শক্ত হাতে ফিতে এবং চুড়িজোড়া আঁকড়ে, পিলখানার পাশে জ্ঞান হারাবার পূর্বে অস্পষ্ট শুনতে পেলো এস. ডি. ওর জিজ্ঞাসা—হাতি?

— আহত !

— পিলখানা?

ভীষণ তৎপরতায় দেবিকারানীকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেবল বৃদ্ধ পাখুয়ার মতো মুখে তাঁরা উচ্চারণ করলেন না — মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন।

মেহগনি

পুরণো ফটকের কাছে ভট্‌ভটিয়া থামল। এতক্ষণ, ইঁট-পাথরের ট্যারা-বাঁকা পথে ধুলো উড়িয়ে লাল বাইক্‌টা ছিল ফ্যাসিস্টের মতো ডোন্টকেয়ার। ইস্ত্রি করা খাকি উনিফর্ম, চামড়ার খাপ, রিভলবার, তক্তার কাঁধ, পাট্টা গোঁফ—সব কিছু। টাকটা ক্যাপে ঢাকা।

এখন লোমশ গিটের কালো থাবাজোড়া ব্রেক কষে, মিহি ধুলোর লাল বুটের ডগা মাটি ছোঁয়া, ভুরু ধনুক হয়, ত্যাড়চা গর্দানে হাঁকোর ওঠে—আই! আই বুঢ্‌ঢা ! ফটক থেকে বে-শ দূরে উঁচু পুরণো দালানটা। মাঝের মস্ত জমিটায় ঝোপঝাড়, ঘাস জঙ্গল। বাকল শ্যাওলার আদিম কিছু বৃক্ষ। অর্জুন, ভুরকুন্ড আর সাদা সরল শান্ত গোটা তিন ইউক্যালিপ্‌টাস্‌। রাস্তার ডানপাশে উদোম ফাঁকা মাঠ, দূরে ঝাঝা-কিউল লাইনের রু রু হাওয়ায় ক্যালিপটাসের ডগাল পাতা দিন দুপুর শুনশান করে তোলে।

উঁচু বারান্দায় কিছু ছুটির মুডের মানুষ—ভিনপ্রদেশী। লাল বাইকটায় তাদের ঢিমেল মেজাজে চায়ে চুমুকের কিছু হরফের হয়নি; কেবল সিঁড়ির কোণে কাঠ ফাড়তে থাকা বুড়োটা ধুলো পায়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল রাস্তার দিকে। ভুরুর ঘামে ছোট চোখজোড়া ভয়ে গভীর। হাতজোড় করে বাইকটার সামনে যখন দাঁড়াল বুধান মুসাহারের পাঁজর আর ফুসফুসে কুড়ুল চালানোর হ্যাপা বেরোচ্ছে।

—লড়কা কোথায়?

—হুজৌর, এখানে নেই।

—কোথায় আছে?

—কি জানি? মহল্লায় থাকতে পারে। দূরে ন্যাড়া পাহাড়ের পাশে মুসাহার টোলার দিকে বুধান মুসাহার আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

—খবর রাখিস না?

—না, হুজৌর! বুধান মুসাহার হাসতে চেষ্টা করে।

—বেট্টিচুতের কপালে এই গোলি সাজিয়ে রেখেছি, বুঝলি বুঢ়া? চামড়ার খাপটা আলতো ছুঁয়ে দেন। ভালো চাস তো থানায় পাঠিয়ে দিস! পান্ডে ভয় দেখান।

—হুজৌর! বুধান কি যেন কাকুতি জানাতে চায়। হয়তো 'তুই আমার মা-বাবা!' এ ধরণের কিছু। পান্ডের চোখজোড়া হঠাৎ দূরের বারান্দার লোকজনের দিকে ঘোরে।

—কারা?

—হুজৌর, কলকাত্তার আদমি। পরশু উঠেছে।

—স্টেশনের কাছ ফেলে এতটা ভেতরে?

পান্ডের চোখজোড়া নাচছে, ঘুরছে; কখনো বুধান মুসাহারের দিকে, কখনো বাকল ও শ্যাওলাধরা গাছে। হঠাৎ চাউনিটা পড়ল সীমানার একটি বৃক্ষ-গুড়িতে, যেন চেটে খেল গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত। কালো কুমিরপিঠের মতো সোজা গাছটা তিন মানুষের বেড় হয়ে জল-ঝড়, খরায়, 'ধুপ' আর 'জাড়ে' আদিম বৃক্ষ; ধনুকভুরু মিলিয়ে গেল। পান্ডের চোখজোড়া এখন কাদা, পাট্টাগোঁফ সকাল আটটার বাতাসে ঝুরঝুর।

—বুঢ়া?

—হুজৌর !

—কি গাছ? ঐ ! হ্যাঁ, মোটা লাম্বা!

—মেহগনি।

বুধানের চোখে সটান তাকিয়ে দারোগা সাহেব পান্ডেজি বললেন— দে। আমায় দিয়ে দে।

তাঁর চোখে ভাসে চকচকে পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার—বিরাট আসবাবপত্তরের গুদাম। লড়কির শাদিটা কাটিহারের এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। বরাত আসবে সাড়ে তিনশো লোকের।

নগদ আর সোনা-দানা, জমি বাদেও, মেহগনির পালঙ্ক ও আসবাবপত্তর দাবি করেছে। বার্নিশ, ফুল আঁকা, টাটকা চেরা কাঠের গন্ধে পান্ডের মনে ভাবনার প্যাঁচ জাগে। দরকার হলে ভুটান মুসাহারকে....হ্যাঁ, বলবে ধরতে পারলো না। মুসাহার টোলার একটা সামান্য হরিজনের বাচ্চা খরার তান্ডবে যদি ছিঁচকে চোর হয়, বয়েই গেল। পান্ডে গত রাতের ভূমিহার ও রাজপুত ব্যবসায়ীদের বাড়ির গোপন মিটিং-এর 'সিদ্ধান্ত' গোলি মারলেন! ও শালারা কম খচ্চর! ছোট্ট চৌসা শহরটার জোঁক! হাঁ করে কম রক্ত গিলছে? তবে? .....যাক্, ছুপা রুস্তমের মতো তলে তলে তিনি ওদের সাহায্যে ঝাঝা থানায় বদলিটাও হাতাবেন, আবোর, বুধান মুসাহারের এই মেহগনি গাছটাও।

—হুজৌর, ইতো বাবুর গাছ! আপনি বলছেন.....কেমন করে! বুধান মাথা চুলকোয়।

—হুজৌর, কিন্তু মালিক.....

পান্ডের কানে বুধানের কথা ঝাপসা হতে থাকে। শোনেন না। চোখের সামনে শুধু গাছটা। প্রয়োজনে সব ভেটই মুঠোয় আসার অনায়াস অভ্যাসে, পান্ডের মগজে মেহগনি সংক্রান্ত হিসেব একে একে শেকল গাঁথতে থাকে। গুঁড়িখানা কত সি এফ টি-র? হ্যাঁ, শাদির আসবাব হয়েও,

পাটনার নতুন বাড়ির দরজা-জানালা হবে না? নিজেই বলেন—হবে। বড় ছেলে পাটনায় বাড়ি করছে। কিন্তু ট্রান্সপোর্ট কস্ট নিয়ে.....তা, মোহর সিং— চৌসার একমাত্র পেট্রল-পাম্পের মালিক, তার ঘনিষ্ঠ সাকরেদ.....হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সস্তায় লরির ব্যবস্থা করে দিলে পাটনায় গিয়ে কত খরচা পড়বে?

চোখের সামনে গাছটা হাওয়ায় নাচছে। তেজি, জাতঘোড়া, বুকে পা তুলে যেমন লাফিয়ে ওঠে! ঐ মোটা ডালটা। চৌসার পাথুরে মাটির পেট ফাটিয়ে শিকড় পাতাল চমকাচ্ছে, বাকলে সময়ের ফাটল, মানুষকে ঘাড়-কাত-করানো আস্পর্ধায় গুড়ির মেজাজটা পাহাড়; পাতা, শাখা আর তার জটাজাল—এই বাগানের আকাশ যারা আঁকি-বুকি দিয়ে রেখেছে—দুপুরের হলকানো তাতে দাঁত কামড়ে থাকে, জ্যোৎস্নায় চোখ মারে, আঁধি আর পাথর বৃষ্টিতে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াইয়ের পর ফিক্ করে হাসে—ফের দেখা হবে! ঘুঘুরু—ঘু—ঘু! আবডালে বসা নির্ভীক, স্বাধীন ঘুঘুটা ঘাড় বাঁকিয়ে ফটকের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ডেকে উঠল।

—মালিকের কাছে কি জবাব দেব হুজুর? গোসা করবেন না। দশ রোজ বেগার দিব আপনার কাছে, গাছ আমি কি করে দেই?

পান্ডে হাসলেন। দাঁত, ঠোঁট গালের পেশি অনড়, কেবল গর্দানের গুহা থেকে খুক্ খুক্ শব্দ আর কপাল চিরে শিরাটা দপদপিয়ে উঠল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

—ছোড় দে। তোর বেট্টিচুতকে আমার চাই! এ গোলিয়া রেখে দিলাম, কেমন! ফের লৌটেগা হাম!

বাইকটা ছুটল কাঁচা রাস্তায়। ঝাঝার দিকে। সিঁড়ি থেকে ছুটে এসেছিল যে পথে, ফিরতে মনে হলো চারগুণ হয়ে গেছে বুধানের। আন্ডারওয়ার পরা কলকাতার বাবু জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার? ভোলেভালা বুধান সব চেপে গিয়ে বলে—দারোগা বাবু! আপনাদের খোঁজখবর নিচ্ছিল।

— কেন? এখানে নক্‌শাল আছে?

বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে, দ্বিতীয় বাবুটি বলে— গোলিমার? তুই বাবা একটু বাংলো ম্যানেজ করে দিবি?

চৌসায় খরা চলছিল। ছোট্ট পাহাড়ী স্টেশনটায় এখনও রুক্ষ ছাপ কামড়ে আছে। ঘাস জ্বলছিল, নদী তালাও ছিল শুকনো হাড়ের করোটি, ধান, মকাই, বাজরার ক্ষেত এখনও সেই প্রলম্বিত দগ্ধবাণী বহণ করে চলেছে। ভাদ্রের শেষে নিয়ম রক্ষা করেছিল বটে, তা নামে মাত্র। ফলে আশ্বিনের মাঝামাঝি, বাঙালি চেঞ্জারদের সংখ্যা খুব কম। অন্যান্য বার এ সময়ে বাড়ির সন্ধান পাওয়া মুশকিল, এবার অনেক ফাঁকা। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। প্রকৃতি বলে রক্ষে, নইলে ভূমিহার ও কিছু রাজপুত— লোক্যাল মার্কেট যাদের মুঠোয়—খরার বিরুদ্ধে মামলাই করে বসত। দাদনের টাকাও হয়ত উঠবে না। পেটরোগা বাঙালিরা প্রোটিন-প্রেমিক, তাই ঝাঝায় এদের মাছের দাদন দেওয়া আছে, গাঁয়ে গাঁয়ে মুরগী, পাঁঠা, ছানার। লোক্যাল লোক সারা বছর এ সময়টার জন্য চেয়ে থাকে, নইলে অজ অঞ্চলে কী আছে? ভূমিহার আর রাজপুতদের বেশ কয়েক হাজার টাকা এবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে জমা। যে দু'চার জন চেঞ্জার আসতে শুরু করেছিল, তা-ও হয়ত পাততাড়ি

গুটিয়ে ডাউন এক্সপ্রেস কি মেল ধরে হাওড়া পালাবে। চুরি হচ্ছে খুব। শহরের চতুর্দিকে দুসাদ, মুসাহার, খাড়িয়া আর অসংখ্য গরীবগুরবোদের টোলা থেকে আইন শৃঙ্খলায় ঘুণ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুব বড় রকমের কিছু নয়; ভাত, থালা গেলাস, ঘড়ি, কনডেন্সড মিল্ক, গন্ধ তেল, লুঙ্গি ইত্যাদি। চেঞ্জে এসে চুরির উৎপাতে—তা যে ধরণেরই হোক—মানুষ আতঙ্কেই তড়িঘড়ি ফিরে যাচ্ছে। লালা আর ভূমিহারদের মাথায় হাত। এভাবে কয়েক হাজার গলিয়ে দিয়ে নিছক তারা 'শিউজির' চরণামৃত বা হরিকীর্তন গেয়ে চুপ থাকতে পারে না। কাছেই একটি চৌকি আছে বটে—সিপাইগুলো দিন রাত খৈনি টেপে, এক চোখ বুঁজে বাঁ হাতের পয়সা ট্যাকে ফেলে—তাই থেকেও নেই। ফলে গতরাতে, আটমাইল দূরের চৌসা-সিরোহি থানার বড়বাবু পান্ডেকে সঙ্গে নিয়ে মুখিয়া শিউকান্ত নিজের বাড়িতে শলাপরামর্শে বসেছিল। আর এ মতলব বাতলে দিয়েছিল লালা ও ভূমিহাররা, লোক্যাল মার্কেট যাদের কব্জির মুঠোয়।

—দারোগা সাব, লো-অর্ডার আপনার দেখভাল করার কথা! বেওসা মার খেলে আমরা কি বাজরা খেয়ে লড়কা-লড়কি বাঁচিয়ে রাখব? বৃদ্ধ শিউকান্ত পদমর্যাদায় কথা বলে। বয়স সত্তর পেরিয়েছে, তবু চওড়া হাড়ে দুধ-ঘিয়ের দাপট যায়নি। ভাই মুন্নিয়া মাছের এবং মাংসের বড় কারবারী। চৌসায় একমাত্র এজেন্ট। গাঁয়ের লোক মাছ, ছাগল সরাসরি বাজারে নিয়ে এলে গলাধাক্কা খায়, মাল সিজ্ হয়। এছাড়া স্টেশনের পাশের জ্বালানি কাঠের মস্ত গোলার মালিক জগৎ লালা, ছানার কারবারী মুঠা সিং, কেরোসিন, স্টোভ, হাঁড়ি কড়াইয়ের গোপাল সরাফ—আরও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

—চৌকিতে সিপাইরা কি তুলসীদাস পড়ে? ছিঁচকে চুরি নজর রাখতে পারে না? পান্ডে জিজ্ঞেস করেন।

শিউকান্ত ক্যাপস্টেন ধরায়। কালো আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ফক্ ফক্ করেগ প্যাকেট এগিয়ে দেয় পান্ডের দিকে। পান্ডে ধূমপান করেন না, সরাব ছোঁন না। খাঁটি বাউন। তবে পেটুক। লুচি, লাড্ডু আর নরম খাসির তৃপ্তিকর ঢেঁকুর তুলে বলেন— আমি ডাকছি সিপাইদের।

—কোনো ফায়দা নেই। শিউকান্তের কঠিন ধূসর চোখজোড়া স্থির। আপনাকে সব করতে হবে।

চৌসার নির্জন রাত, দু'চারটে কুকুরের ডাক, সাড়ে দশটার দিল্লি এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার ঝমঝম লোহার ঘসটানি দূর ফাঁকা মাঠে মিলিয়ে গেছে। পান্ডের মনে হয়েছিল শিউকান্ত কিছু আদেশ করছে। সে অধিকার ওর আছে— পান্ডে বোঝেন। জগৎ লালা কফ ঘড়ঘড়ে গলায় বলে— সাব, কাঠের গোলাটা দেখেছেন আমার? অন্য বছর আদ্দেক হয়ে যেত, এবার দেখুন কাঠের টাল যে কে সেই! লোকে না কিনলে জ্বালানি চিবিয়ে খাবে?

সবাই যে-যার দুর্দশার বিবরণে ব্যস্ত। তাছাড়া মুসাহার, দুসাদ—যাদের টিপে মারা যায় তাদের উৎপাত অসহ্য। মুন্নিয়া খোলাখুলিই বলল— ঝাঝা থেকে রোজ বিকেলে চার টুকরি রুই কাতলা আসতো আমার। এবার বরফ গলে জল হচ্ছে, টিপে দেখারও লোক নেই। শুয়োরের বাচ্চা দুসাদ, মুসাহারদের ভয়ে ভূমিহার রাজপুতরা বাপ ঠাকুদ্দার ব্যবসা বন্ধ করবে? চৌসা আমাদের

রক্তে গড়া দারোগা সাব!

পান্ডে চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ শিউকান্তকে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন—এম.এল.এ. সাব সুলতান সিং নাকি আপনার দোস্ত? পাটনায় ওঁর দহরম-মহরম আছে?

—কেন ? কিছু কাজ করিয়ে নিতে চান? শিউকান্ত হাসে।

—বদলির ব্যাপারে.....

—কোথায়?

পান্ডে হেসে বলেন— আমার ইচ্ছায় কি হবে? পেলে ঝাঝা যেতাম। চৌসা-সিরোহি ক্ষেতি এলাকা। ঝাঝায় কিছুদিন থাকলে...বুঝতেই পারছেন?

—এ আর এমন কি? কোথায় যেন ইঙ্গিতে বোঝাপড়া হলো। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পান্ডে দাপিয়ে উঠলেন—চৌসা ঠান্ডা করে দিয়ে যাবে। কিছু ইনফরমেশন চাই।

সে রাতে যে গোপন পরিকল্পনা হয়েছিল, যে ডেঞ্জারাস পার্সনদের নাম উঠেছিল—ভুটান মুসাহার তাদের একজন। বুড়ো মুসহারের বছর বিশেষ ছেলে। পান্ডে বুধানকেও চেনেন না।

জগৎ লালা বলে— বুঢ্ঢা সচ আদমি। চালিশ বছর জঙ্গলের দিকের বাড়িটা আগলাচ্ছে...কলকাত্তার এক বাঙালি বাবুর।

বুধানকে সার্টিফিকেট দিল সবাই। আজ পর্যন্ত মুখ তুলে কথা বলতে দেখেনি কেউ। ধার্মিক ব্যক্তি। তারই ছেলে কিনা ভুটান মুসাহার।

সে রাতে দরজা পেরিয়ে বাইকে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধ মুখিয়া শিউকান্ত। গড়ানো রাতে ঠান্ডার আমেজ। টর্চের আলো অন্ধকার ছ্যাঁদা করে রাস্তা পর্যন্ত এল। শিউকান্তের গলা থেকে গিট্টির মতো এক-একটি কথা ঝরে পড়ে—দারোগা সাব! আমাদের চৌসাকে নওয়াদা, রোটাস বা বিহার শরিফ হতে দেওয়া যায় না। দুসাদ মুসাহাররা ওখানে ক্ষেতিয়ালদের ওপর গোলি চালাচ্ছে। আপনি ব্রামহন, আমি ভুমিহার। আমাদের মধ্যে যাই থাক না, আমি কিন্তু চৌসার এ অবস্থা ভালো চোখে দেখছি না। এভাবে চললে—কথায় বলে পহেলা রাতে বিল্লি ঠ্যাঙানো দরকার—বর্ষা পড়লে ক্ষেতির কাজ করাতে পারবেন এদের দিয়ে? আঁখ ফেরে কথা বলবে। আমাদের সরকারও তেমন ভেড়ুয়া। ঝাঝার ব্যাপারটা ভাববেন না...এ আর এমন কি! কিন্তু...

জমানো অন্ধকার চিরে চাকা ছুটেছিল চৌসা সিরোহির পথে।

দারোগা পান্ডের শিরার দপদপানি ফিরে আসার পথে আর নেই। বুঢ্ঢার সরল স্বভাবে তিনি খুশিই হন। দেশের সব আদমি যদি শিউকান্ত বা জগৎ লালা হয়ে যেত, কিংবা দেশ বললেই যদি চৌসা-সিরোহি বোঝাত, সে এক অসহ্য ব্যাপার খাট্টা, মিঠাই, নিমক—সব না হলে কি জিভ মজা পায়? তবে বুধানদের মতো মানুষদের কাছে কার্যোদ্ধার কী প্যাঁচে করতে হয় পান্ডে জানেন। ঘিউ কি বাঁকা আঙুলেই শুধু ওঠে, আগুনে গলালে পড়ে না? ভয়-ধর্ম-মিষ্টি কথা—অনেক পথ। আর নিজের ছেলের প্রাণভিক্ষা কে না চায়? মুসাহার দুসাদ হলে কি, বাপ আর ছেলে তো! গাছটাকে সে পাবেই। এই চৌসা-সিরোহিতে কোন্ কামনা তার মুঠো ছাড়া হয়েছে? গাছটাকে বিস্ময় ও লোভের

জিভে বাইকের স্পিড কমিয়ে চাখতে চাখতে গেল।

দূরের একটা মস্ত কান্ড অদ্ভুত এগিয়ে আছে, যেন ঘোড়ার লেজ। বাতাসে পাতা ডাল ছির-ছির করে। পথের উড়ানো ধুলো পশ্চিমা বাতাসে ভরে করে মেহগনির ঝুঁকে পড়া অংশ গৈরিক করে দিতে চায়। ঝাঝা-কিউল রাস্তায় যখন সে দাপটে ছোটে, মেহগনির ডালপাতার বুক পেতে সাক্ষ্য ধরে রাখে। পান্ডের বাইক, থানার জিপ, লালাদের লরি, এমনকি একশ বছর আগে ভুজগড়ের রাজা রায়বাহাদুর দীপনারায়ণ সিংয়ের ঘোড়সওয়াররা যে কিউল-ঝাঝা পথে আনাগোণা করত, সে ধুলোর চিহ্ন ও বাকলের গভীর খাঁজে-খাঁজে জমা।

ইঁদারায় জল তুলে বুধান যখন বারান্দায় এল ঝোলে ফুট ধরেছে। স্বাদু গন্ধ। আশপাশের ইঁদারাগুলো প্রায় শুকনো, ভালো সিদ্ধর জন্য দেড় মাইল দূর থেকে বুধান এদের জল এনে দেয়। এক ফুটেই গন্ধ। সিঁড়ি আর উঠোনে কিছু কাচ্চা-বাচ্চা আর মেয়েছেলে। বুধানের বংশলতা, কিছু প্রতিবেশী। এখানে রান্না চাপলেই টৌলা থেকে দলটা হাজির হয়। বুধানের কালা-বোবা বউটা অঙ্গারের মতো চেহারা নিয়ে সিঁড়িতে দিনরাত বিড়ি বাঁধে। মাঝে মাঝে রান্নার দিকে তাকায়, ক্যালিপটাস ছাড়িয়ে আকাশ দেখে, যন্ত্রের মতো আঙুল নাড়িয়ে যায়। কেবল গুণে দিতে বুধান সাহায্য করে।

বুড়ি এক থেকে ছয় পর্যন্ত গুণতে পারে, পরেই সব গুলিয়ে যায়। ফলে বুধান পঁচিশটি বিড়ি গুণে দিয়ে যায়। সারাদিনে ওকে কেউ দাঁতে কাটতে দেখে না। বোবা দৃষ্টিতে রান্নার দিকে তাকায়, কারও সঙ্গে চোখাচুখি হলে ফিক করে হেসে ফেলে।

—বাবু, পানি আর চাইবেন না। অত কে টানবে? বুধান দম ছেড়ে - ছেড়ে বলে।

—একা টানবি কেন, ঐ ছোঁড়াগুলোকে পাঠা। বল না ওদের চা খাওয়াব। দশ বছরের নাতিটাকে দেখিয়ে, একজন অভিযোগ করতে বুধান হেসে জবাব দেয়—চৌসায় মাত্র দু'টো ইঁদারায় পানি আছে। আর কোথায় বালতি ডোবে না। কলজের জোর চাই বাবু।

তবু ছেলেমেয়েগুলো ফাইফরমাস খাটতে বসে থাকে। যতবার খুশি বাজারে পাঠাও, কাঠ টানাও, ইট বওয়াও, জল আনতে বলো—মুখে রা নেই। অদ্ভুত হাসিতে ক্লান্তি চেপে রাখে। অতিরিক্ত ভাতও দাবি করে না। বুধান আর তার স্ত্রী-র বরাদ্দ ভাত, ঝোল, নিজেরা কুণ্ঠায় বোঝা-পড়া করে নেয়। কেবল চঞ্চল হয় ভাতের গন্ধে। চাল বা ঝোল ফুটে উঠলেই, মুসাহারদের ছোট্ট দলটা কেমন যেন স্থির। যেন কিছুতে ওম্ দিচ্ছে। ছুক ছুক করে না। চোখের পাতা, ঘাড় গলায় ঘা নিয়ে ফরমাইস তালিমের জন্য হাঁ করে বসে থাকে।

গত দু'দিন ধরে বাবুদের অনেকেই লক্ষ্য করে দারোগা পান্ডের দ্বিতীয় রাউন্ডের পর, ঠিক সুনসান্ দুপুরে, রান্নাঘরের পেছনের ঝোপঝাড়ের সরু পথে একটা ছায়া ঘুরে সিঁড়িতে উঁকি দেয়। সাপের চেয়েও নিঃশব্দ। বুধানের বউ উঠে যায়। শুধু মশলার কুলোটা কেন্দু পাতার ছড়ানো ছাটে পড়ে থাকে। ভাঙ্গা ঘরটায় খুট-খাট্ ছাপছুপ কিছু গেলার শব্দ হয়। একটু পরই বুড়ি কুলোটা তুলে নেয়, বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে ছায়াটার সন্ধান পাওয়া যায় না।

চুরি কিন্তু কমে না। চেঞ্জারদের দু'এক বাড়িতে বা গাঁয়ের দিকে ছোটখাট সিঁদ দেয়ার খবর বাজারে আসতেই থাকে। মরশুম এখন মধ্য পর্বে, তবু চৌসার বাজার হাট জমছে না। মুখিয়া শিউকান্ত লোক মারফত চৌসা-সিরোহি থানায় খবরা-খবর দেয়, নয় তো মাঝে মাঝে দারোগা পান্ডেকে ডেকে পাঠায়। ঠারে ঠোরে ঝাঁঝ ঢালতেও ছাড়ে না।

—দারোগাসাব, আপনার লুচি-পুরির অভাব হচ্ছে না তো? গলতি থাকলে বলবেন! দারোগা পান্ডের লোমশ কান এবং গালের ভুঁড়ি অপমানে টসকে বেগনি হয়ে যায়।

শিউকান্ত বলে চলে— চৌসা-সিরোহি থেকে বদলির আগে কিছু কৃপা করে যান? মেহমানরা যদি আমাদের মতো রাম-শ্যামদের কৃপা না করে, কোথায় যাই বলুন তো!

—আপনি লজ্জা দিচ্ছেন চৌধুরী!

—ছিঃ ছিঃ! শিউকান্ত জিভ কাটে। তা করতে পারি আমরা? হ্যাঁ, সেদিন এম এল এ সাব আমার কোঠিতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন; ওর মুখেই নওয়াদা, বিহার শরিফের খবর কিছু পেলাম।

পান্ডের মেজাজ অনুগ্রহের প্রত্যাশায় লালায়িত হতেই ঝিমিয়ে আসে। এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। শালা, পদমর্যাদা ছেড়েই দেওয়া যাক, খাঁটি ব্রাহ্মণের রক্ত নিয়ে একটা ভূমিহারের মিষ্টি বিদ্রুপ শুনতে হচ্ছে? কিন্তু আজ এই চৌসায় মুখিয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। ঝাঝায় বদলির প্রয়োজনটা অনেক বেশি। সমস্ত ঝালের বোঝাটা পড়ল মুসাহারদের উপর। বুধানের ধর্মভীরুতা বা সৎ চরিত্রের প্রশংসা মনে ফিকে হয়ে গেছে। ঘি একই ভাবে তুলতে হয়—বাঁকা আঙুলে। চৌসার কর্মজীবনে পান্ডের গোঁয়ার্তুমি সামান্য এক মুসাহারের জন্য উস্কে উঠল।

থানায় এসে পরদিনই অর্ডার করল চৌসার মুসাহার টৌলার সমস্ত মাল-পত্তর কেড়ে নেওয়া হোক। ঘটি-বাটি তৈজসপত্র যা আছে, থানায় উঠবে। দেখা যাক্, ডাল টেনে ধরলে ফল হাতের কাছে আসে কিনা। চৌসার পুলিশ পোস্টকে জানানো হলো না, ওসব গদ্দারদের পান্ডে এক ছটাক বাজরার দামেও বিশ্বাস করেন না। দশেরার সন্ধ্যারাতে থানার জমাদারের নেতৃত্বে পান্ডের নিজস্ব সেপাইরা মুসাহার টৌলা ছিঁড়ে-খুড়ে চলে এল। পুরুষদের বিশেষ পাওয়া যায়নি, দশেরার মেজাজে অধিকাংশই ভাটিখানায়। ঘর আগলাচ্ছিল মেয়ে-বউ-বৃদ্ধরা। ন্যাড়া পাহাড়ের নিচে, টৌলার অন্ধকারে ভয়ে কেউ চেঁচামেচিও করেনি। অসহ্য যন্ত্রণা, যোনির রক্তক্ষরণ, দাঁত নখের আঁচড় কামড় খেয়েও প্রাণে বেঁচে যাওয়ার ভাগ্যে ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঘন্টা চারেক পর, থানায় ফিরে এসে দলটা খবর দিল, সমস্ত মুসাহার টৌলা চষে ফেলেও কেড়ে আনার মতো কোনো সম্পত্তি পাওয়া গেল না। চালের খড় যে টেনে নামিয়ে আনবে, তা-ও পচা, তিন বছরের। সারা মহল্লায় উনুন মাত্র তিনখানা। ছাগল নেই, বলদ নেই; কেবল গোটা চারেক মুরগির কড়্কড়ানি শোনা গিয়েছিল। যতত্র ধর্ষণের মাতামাতিতে তারা অন্ধকারে মাঠে উড়ে গেছে। একজন সেপাই শুধু ঝুপড়ি থেকে দু'পসেরী বীজধান পেয়েছিল, এনে পান্ডের সামনে জমা দিয়েছে।

পরদিন সকালে এ বাড়ির ট্যুরিস্টরা এতো কাছে থেকেও বিষয়টা টের পায়নি।

প্রতিদিনের মতো ভাত ফুটতেই মুসাহার টৌলার ছোট্ট দলটা নিঃশব্দে উঠোন আর সিঁড়িতে চুপচাপ। ফোটা ভাতের গন্ধে আজ ওরা যেন ঈষৎ ছটফট করছে। দশেরার পরদিন বলে জুটেছিল

চা এবং লাড্ডু। সেই যোশেই সূর্য মাথায় চড়া পর্যন্ত ইঁদারায় দড়ি-বালতি ফেলতে ফেলতে হাঁপিয়েছে, কাঠ এনেছে, ফেড়ে দিয়েছে, বাসন মেজে দিয়েছে। বুড়ো বুধান মুসাহার সামান্য রংয়ে ছিল। দশেরার উৎসবে এ বাড়ির লোকেরা যে উৎসবের গেলাস উড়িয়েছিল, সকালে ভাগ্যে জুটেছিল বেশ খানিকটা। বুড়োর মুখ চোখ লাল, নাকটা খুব ঘামছিল। মুখে ফুটছিল কথার খৈ। ধর্ম আর অধ্যাত্ম দর্শনে টইটম্বুর হয়েছিল সে।

—হুজুররা, এই মায়াজাল ছিঁড়ে, সব জঞ্জাল কাটিয়ে যে চলে যেতে পারে, সেই খুশি। পুণ্যবানেরাই পারে জগতের মায়া মোহ-র বন্ধন কাটাতে। সে হেঁড়ে গলায় হাত নাড়িয়ে গান ধরে—ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে!

রাস্তা দিয়ে পাশের গাঁয়ের জগদীশ—রেল বিভাগের গ্যাংম্যান—চলেছিল স্টেশনের পথে। বুধান দেখেই চেঁচায়—জগদিশোয়া! জগদিশোয়া!

কলকাতার এই বাবুদের সামনে এ ধরণের সম্বোধনে জগদীশ ক্ষুণ্ণ—জগদিশোয়া, জগদিশোয়া করে চেঁচাচ্ছ, কেনা গোলাম তোমার? আমার নাম নেই? তারপর বুধানকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে খবর দিল ভুটানের। গত রাতে সিরোহি থানায় তিনজনকে ধরা হয়েছে; ভুটানের হদিশ কবুল করাতে এমন ধোলাই চলেছিল, রক্ত বমি করে ওরা পুলিশ পাহারায় হেল্‌থ সেন্টারে। প্রথম ধাক্কায় বুধান মুসাহারের ঘোলা চোখ গভীর হয়, গালের পেশি নিশ্চল, ফের টসকে ওঠে, হাসতে হাসতে ক্যালিপটাস, ভুরকুন্ডের ছায়া পেরিয়ে মেহগনির তলায় দাঁড়িয়ে গুণগুণ করে—ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে! গাছটা গম্ভীর, কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। জগৎ লালা চেরাই করবার জন্য লোভ দেখিয়েছিল, কত লোকের নজর শাঁস ডালপালায়! এখন দারোগা পান্ডে! বুধান রুক্ষ বাকলে হাত বুলিয়ে কি এক অপার অনুভূতিতে ধ্যানস্থ হয়ে যায়।

দশেরা পার করিয়ে চৌসায় বৃষ্টি এল। শাল, শিশু এবং কুসুম গাছের মাথায় আকাশ নেমে যায়। ন্যাড়া পাহাড় বিষণ্ণ। লাল জমিন গলতে শুরু করছে। চেঞ্জারদের মরশুম শেষ—ফের জমবে ডিসেম্বরের শেষে। ভূমিহার আর রাজপুত ক্ষেতিয়ালরা রবি মরশুমের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেওসার যা হাল, উশুল করতেই হবে। দারোগা পান্ডের বদলির সব ব্যবস্থা হয়েও, কোথায় যেন সামান্য সুতোয় আটকে আছে। শিউকান্ত মুখিয়া একটু বেঁকে আছে মনে হয়। এদিকে লড়কির সাদির দিন এগিয়ে আসছে, কিন্তু মেহগনি?

তক্কে তক্কে তিনি চৌসা আসেন, ওঠেন ভূমিহার রাজপুতদের কোঠিতেই। এদের এখন ব্যস্ত সময়। সিঁদুরে লেখা 'শুভ লাভ'—এ মরশুমে ছিল মরীচিকা। এখন তারা ক্ষেতিয়াল। মুন্নিয়ার সাতান্ন বিঘা জমিন, জগৎ লালার বিয়াল্লিশ, শিউকান্তের পঁচাত্তর, এমনকি এম এল এ সাব সুলতান সিংয়েরও চৌসায় জমি আছে। এখন আশার সমস্ত রক্ত হৃৎপিন্ডে জমিয়েছে মুগ, ছোলা, মটর তুলবার জন্য; খরা গেল, গঁহুর মার্কেট চড়বে। তাই উনো জমির দুনো ফসল তোলা চাই। চৌসার লাল, ঝুর ঝুর মাটি কয়েক দিনের বর্ষার ঝলকানিতে গলতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্ষেতে নামানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। দুসাদ, মুসাহারদের আব্দারে এদের ব্রহ্মতালু চিড়বিড় করে ওঠে।

—চাল আর ছাতুর মজুরিতে কাজ চলবে না?

—হুজুর, খরায় খড় খুঁটি জ্বলে গেছে, ঝুপড়ি না সারালে ছাতু রাখবো কোথায়? রুপিয়া দিতে হবে।

—চৌসা বাজারে কাঁচা টাকার কল বসিয়েছি আমরা! জগৎ লালা হেসে বলে। খরায় তোরা জ্বলে মরলি, আমরা বুঝি পানি মাথায় ছিলাম? মিলেমিশে যখন আছি দুখকেও ভাগ করে নিতে হবে।

বুড়ো রামভল দুসাদ বলে—মালিকরা যদি এ কথা বলেন! মাটির ড্যালা আর পাথর, এক হলো? রুপিয়ার মজুরি না দিলে আমরা ক্ষেতে নামতে পারব না।

মন্নিয়া চমকে যায়। পান চিবোনো বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ।

—খরায় আমাদের বেওসা মার খায়নি? একথা না বলে গলায় কাঁচি বসিয়ে দে! চৌসায় টাকার মজুরি বাপ-ঠাকুদ্দারা শোনেনি। রোজ তোদের নিয়ম পাল্টায়?

—নওয়াদা, বিহার শরিফে কি করে দেয় হুজুর?

মুখিয়া শিউকান্ত খাটিয়ায় হুঁকো টানছিল। পাকা গোঁফ, ভুরুর মাঝে চোখজোড়া টিকার আগুন। এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিল। আস্তে টান থামিয়ে বলে—নওয়াদা, বিহার শরিফে আমিররা থাকে, ওরা দিতে পারে। আমরা গরিব আদমি! পারলে আসবে, না হলে আর কি! ঝুটমুট ঝামেলায় কি লাভ?

তিনদিন ওরা ক্ষেতে নামেনি। চতুর্থ দিন পান্ডেকে ডাকিয়ে আনল শিউকান্ত। আজ আর পুরি, লাড্ডু কিংবা কচি খাসির মাংস নেই। বিপদের দিনে আতিথেয়তা থাকে না। পান্ডে এ অভাবটুকু বোঝেন, ক্ষুব্ধ হন, তবু ভাব-ভঙ্গিতে গায়ে মাখতে চান না।

—অনেক তো করলেন দারোগাবাবু, এবার আমাদের ভাগ্য আমাদেরই সামলাতে দিন।

—এ দেশে তাই তো সবাই করে! হঠাৎ কি হলো চৌধুরী? পান্ডে হেসে হালকা হতে চান।

—সরকার বাহাদুরের অনেক দেখলাম! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে—তিনদিনে জমিনে যদি লাঙল না নামে, চৌসা লাল হয়ে যাবে! আমরাও মায়ের দুধ খেয়েছি!

—আপনি চটবেন না।

—জরুর চটব। তিন মাহিনা হতে চললো, কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি আঁধির মেঘ টের পাই। আজ সত্তর বছর বয়সে চোখ রাঙানি শুনতে হলো রুপিয়া ছাড়া ক্ষেতির কাজ হবে না। দোহাই, আমরা যা করব, চুপ করে থাকবেন।

পান্ডে বেকায়দায় পড়েন। সত্যিই তিনি ভুটানদের পাননি। আর আজ যদি চৌসার ইমানদাররা ক্ষেপে যায়, কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন? অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার উপর।

—চৌধুরী একটা আইন তো আছে?

—ও আপনারা কিতাবে লিখে রাখুন।

—আপনি একজন মেহমান হয়ে....

—থাক দারোগা সাব! ও আইন আমরা মানি না, থুকে দিই।

—মুখিয়া হয়ে কি বলছেন? আইন-কানুন, বিচার....

—আমাদের বিচার আমরা করব। আপনার কোনো ভয় নেই দারোগা সাব, আপনি শুধু চোখ বুজে থাকুন। পান্ডের মুখে কথা জোগায় না। শিউকান্তের উত্তেজনা হঠাৎ আড়ালে চলে গেছে। হুঁকোটা খাটিয়ায় রেখে উপদেশের ভঙ্গিতে হেসে বলে—যুধিষ্ঠিরও সগ্‌গে যাওয়ার আগে পেছন তাকায়নি। জীবনে কিছু করতে গেলে খুঁত খুঁত করবেন না। ঝাঝা যান, কাটিহার বদলি হোন, চাই কি বড়িয়া অফ্‌সার হয়ে খোদ পাটনায় বসুন। ভগমানের করুণা আর নিজের তেজ—জগতে আর কি আছে? এক গ্লাস ভয়সা দুধ খাইয়ে পান্ডেকে বিদায় জানান হলো। বাইকে চেপে দারোগার মনে হলে ভাগ্য গড়তে নিজেকে যত্নবান হতে হবে।

দিওয়ালির সন্ধ্যা ছিল কুয়াশায় ঢাকা। সূর্য চলেছেন দক্ষিণায়ণে, হিম নামছে, সন্ধ্যার মুসাহার টোলার আকাশ হাত বিশেক উঁচু সাদা ধোঁয়ায় হামা দিচ্ছে। ক্ষেতের আল ধরে আসা, খাঁকি উর্দি পরা জনাচারেক মানুষের দলটাকে কোনো দাওয়া থেকে ঠাহর করা গেল না। টোলার মুখেই এক বুড়ি থমকে দাঁড়াতেই কর্কশ প্রশ্ন আসে—এ মুসাহার টোলা?

—হাঁ, হুজুর।

—ভুটানের কোঠি কোথায়?

—কেন? কেন?

একটা শব্দ হলো। রক্তে ভেজা নুড়ি শনের চুল নিয়ে, বুড়ি দলা পাকিয়ে উল্টে পড়ল। দলটা টোলায় ঢোকে। ভুটান টাট্রি করছিল ক্ষেতির মধ্যে। চমকে উঠে দাঁড়ায়। চোখজোড়া লাটুর মতো ঘোরে। কানে আসে মুসাহার টোলার চারপাশ ঘিরে ঝিমোনো বাতাস ফুঁড়ে ক্যাট ক্যাট শব্দ। কিছু কান্না, চিৎকার—গোলা পাকিয়ে আতঙ্কে ছোটাছুটি করেছে। প্রদোষের অন্ধকারে, ফাঁকা মাঠে ভুটানের আঙুলের ডগা কাঁপছে। আর কোনো শব্দ নেই। ন্যাড়া পাহাড়ের মতো কিছু সময়ের বোঝা নৈঃশব্দ মাথায় চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই আগুনের ফুলকিগুলো কালো আকাশে ছিটকে ছিটকে ভস্মের কণা হয়ে যায়। ঝুপড়িগুলোর মাথায় আগুনের লতা ফনফনিয়ে ওঠে, এগিয়ে যায়, বাঁশের গিঁট ফাটে—মুসাহার টোলা জ্বলে। তার গাঁও! সে কেঁদে ফেলে দু'বার অন্ধকারে এধার ওধারে ঝুঁকল। নিশ্চয়ই মাঠ ঘের দিয়েছে! মুহূর্তের জন্য সব ওলট পালট হয়। ধরুক তাকে, খাটুক জেল, এর বেশি তো নয়। তবু টোলা বাঁচানো দরকার। শুধু হো-হো চিৎকার আসছে। ঘন্টাখানেক পর, আট মাইল পাড়ি দিয়ে, সে যখন চৌসা সিরোহি থানার দোরগোড়ায় এল, দিওয়ালি জমছে জুয়ো আর মদে। আজ কোনো নিষেধ নেই। পুলিশ ঢিলে ঢালা, থানা মিট মিট করছে, পান্ডে উঠি উঠি করে চেয়ারে বসে কি যেন লিখছিলেন। ভুটানের বুকের ছাতিতে ঢেঁকির পাড়েও তার হুঁশ ভাঙে না।

—হুজুর, আগ!

—কোথায়?

—চৌসা মুসাহার টোলা!

—কি করে দেখলি? পান্ডে মুখ তুলে খেলাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন। ফের লিখতে থাকেন!

—হ্যাঁ হুজুর, আমি দেখলাম। টোলা সব জ্বলে যাচ্ছে।

—তুই দেখলি? কি করে দেখলি? লিখতে লিখতেই তিনি নিরুদ্বেগ প্রশ্ন ছোঁড়েন। কি নাম তোর?

—ভুটান মুসাহার....। না, হুজুর!

একজোড়া আরক্ত চোখ টেবিল ছেড়ে ছিটকে উঠল। ইউনিফর্ম ঢাকা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতির বাঁ দিকের ভাল্বগুলো হঠাৎ রক্ত চাপে থরথরিয়ে ওঠে। হিসোনো গলায় পান্ডে যাচাই করে নিলেন— ভুটান মুসাহার ? না, কিরে?

টেবিলের সামনে মিটমিটে আলোয় বছর বিশে'র একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। কালো, টিকালো নাক, সাদা দু'টো ঢ্যালা, ভাঙা কোলে ঘাম জমে আছে। লোমশ জোড়া ভুরু, সরু গোঁফ। ঘাড়ে, পাঁজরায় ঘা। কণ্ঠা থেকে বুক বরাবর দৌড়ানোর ফলে ভেজা। ঠোঁট ফাঁক করে দম নিচ্ছে। পান্ডের চেয়ার সরিয়ে উঠবার শব্দ হলো।

—বস ! এই বেঞ্চে!

দূরে দিওয়ালির বাজি ফাটার শব্দ হয়।

পরদিন চৌসায় ডি. এম, এস. পি, এম এল এ, পান্ডে, শিউকান্ত, ভূমিহার, রাজপুত, দুসাদ, খেড়িয়ারা ভিড় করল। ছাই ঘেঁটে আধপোড়া, এলোপাথারি ক্ষতচিহ্নের জনা এগার পুরুষ, মহিলা ও বালবাচ্চার সঙ্গে একটি দেহও গুণতি হয়ে গেল; তার পোড়ার চিহ্ন নেই, এলোপাথারি ক্ষতও ছিল না। দেহে কেবল আঁকা ছিল কপালের নিচে, জোড়াভুরুর মাঝে ক্লোজ রেঞ্জের একটি শট্। সরু রক্তের ধারাটি নাকের পাশ গড়িয়ে ইঞ্চি দুয়েক এসে থমকে কালচে। ঢ্যালা দু'টো স্থির, ধ্বসা আকাশ। আঙুলগুলো কিছু বাধা দেওয়ার মুদ্রায় শীতল, বিভঙ্গ। নিশ্চিন্তে তদন্তের জন্য শিউকান্ত বড়িয়া অফিসারদের প্রস্তাব দিল—আপনারা সব ভুখা আছেন। যদি কৃপা করে গরিবের কোঠিতে পায়ের ধুলো দেন! দলটা খানিক বিশ্রামের জন্য চলে আসে।

পান্ডে সাতদিনের মাথায় ঝাঝায় বদলি হয়ে গেলেন। আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ভগবানের করুণা আর নিজের তেজ! হার তিনি মানেন নি, মানেবেনও না। মোটর সাইকেল কিউল, ঝাঝা রোডে চৌসা ত্যাগ করার দিন মনে হলো সবকিছু সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। প্রতিবার বদলির সময় এটা মনে হয়। অনায়াস শান্তিতে মন ভরে থাকে।

ফটকের সামনে বাইকটা থমকে দাঁড়ায়। চমকে দেখেন সবকিছু নিয়ে গেলেও একটা জিনিস রয়েই গেল। ছুঁতে পারেন তিনি। মেহগনি। আদিম বৃক্ষ, প্রাচীন বল্কল, গভীর শিকড়, অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও পত্ররাজি বিস্তীর্ণ আকাশমুখী! অন্ধকার পাতালপুরীর গভীরে দীর্ঘদিনের ধ্যান ও মৌন প্রতীক্ষায়, ঝড় ও রৌদ্রের শাসন উপেক্ষা করে আপন মূল গ্রোথিত। বুড়ো বুধান মুসাহার এক মনে জঙ্গল পরিষ্কারে ব্যস্ত। কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। —ঠগিনী কোঁ নৈনা ঝমকাবে!

সামান্য আপশোষ নিয়ে দারোগা পান্ডে ইট-পাথরে ঠোকর খেতে খেতে চলতে থাকেন। সুমুখে প্রসারিত ঝাঝার একমাত্র পথ।

অনীক, ১৯৮২

অতিক্রমণ

আজ সেই মুহূর্তে, কালচক্রের সামান্য একটি ক্ষণে, ব্যস্ত দিনটির গম্ভীর মধ্যাহ্নে আবু তালেবের আড়াই কুড়ি বছরের পুরণো হৃৎপিন্ডটা বন্ধ হয়ে গেল....।

আগের দিন ছিল শবেবরাত্। প্রায় চৌদ্দশ বছর আগে এমন দিনটিতে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মক্কার মরুপ্রান্তরে আল্লার বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। তাই উৎসব ও আনন্দের মিলন ঘটেছিল গতকাল। গাঁয়ের বন্ধু খোদাবক্স আবুকে নিয়ে এসেছিল শহরে। তাদের গ্রাম জামতাগড় ছাড়িয়ে মাইল পাঁচের মধ্যে কল-মিল ঘিঞ্জির শিল্পাঞ্চল এলাকায়। কলকাতার উত্তর বরাবর যে রেললাইন ছুটে গেছে, তার পশ্চিমধারে গঙ্গার সমান্তরালে ধোঁয়া-ধুলো আর গড়-দেয়া বস্তির মাঝে মাঝে চিমনির নিশান গেড়ে শিল্পশহর—সটান পঁচিশ তিরিশ মাইল চলে গেছে। পূর্ব ধারে গ্রাম। মাইল তিনচার পরই সে গ্রাম মফঃস্বলের দিকচিহ্ন হারিয়ে সন্ধ্যার বাঁশঝাড়, তেঁতুলের ছায়া, কবর ও দরগার নিভুনিভু সাঁঝবাতির পরিবেশে যথার্থই গ্রাম। সেই গ্রাম থেকেই শহর-জীবনের উত্তেজনার লোভে আবু খোদাবক্সের সঙ্গে শহরে এসেছিল। খোদাবক্সকে প্রতিদিনই আসতে হয় পেটের টানে। শিফ্‌টের সময় মেপে হপ্তায় ছ'দিন সে সাইকেলে পাড়ি দেয় জামতাগড় থেকে এ অঞ্চলের একটা কারখানায়। তাই খোদাবক্সের কাছে শবেবরাতের দিন শহরের অতিরিক্ত আকর্ষণ কিছু ছিল না—টুকিটাকি কেনাকাটা ছাড়া। উৎসবের মেজাজে আবুকে হাঁটার সঙ্গী পেয়ে খোদা বলেছিল—যাবি? টিটেগড়? আবু উটকো বসেছিল ভরা এক নয়ানজুলির পাশে।

—খাওয়াবি? হলদে দাঁতে হাসে।

—বিড়ি আর চা।

—হাঁটা দাও দিনি! বিড়ি আর চায়ে তোমার পোঁদে পোঁদে এখন তিন কোশ হাঁটি আর কি!

—আচ্ছা! আচ্ছা! খোদা হেসে আবুর পিঠে চাপড় মারে। আবুর চোখজোড়া লোভে চকচক করে। নাইকুণ্ডলের বাতাস নাকের ফুটোয় আওয়াজ করে ঝরে, পট্‌পট্ হাড়ের ঝনঝনি তুলে উঠে দাঁড়ায়। বড্ড আপন মনে হয় খোদাকে। শহরের ঘিঞ্জিপথে খোদা আঙুল উঠিয়ে বলে—ঐ আমাদের চিমনি! কারখানা! আবুর অজানা নয়, তবুও চোখ পিট পিট করে ঘাড় উঁচিয়ে বলে—কত ঢ্যাঙা-রে! আমাদের কাকদানির অশত্থ গাছটার সমান হবে না?

—হুঃ। আর রকমফের পেলিনে? কাকদানির গাছ ওর হাঁটুর সমান। মাথায় উঠলে রাস্তার মানুষ এটুকুন লাগে! দু'টো আঙুলের মুখ ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে দেখায়।

—বাবাঃ ! রোজ উঠিস তুই?

—মাঝে-মাঝে।

এ কলের খুব পুরোণো ফিটার মিস্ত্রী হল খোদাবক্স। চুলে পাক, মুখে কত জটিল আঁকিবুকি! অম্বলের রোগ থাকলেও মোটামুটি পেটানো স্বাস্থ্য। মাঝে মাঝে যখন সত্যিই সে চিমনির মাথায় ওঠে, আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মতো লাগে। ওর মনেও ভয় বিস্ময়! নিজেকে বড় মনে হয় তখন, আর তার প্রতিদিনের পরিচিত শহরটা ছোট ছবির মতো! কিছু যান্ত্রব শব্দ ছাড়া বাতাসের এই উঁচু স্তরে মানুষের কোনো কোলাহল নেই। চলমান ধূলিকণার মতো সব নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। দু-একদিন সে পুবে তাকিয়ে নিজের গ্রামের দিকচিহ্ন অশত্থগাছটা খোঁজার চেষ্টা করেছিল; পারেনি। দূরবৃত্তে সবুজ ঢেউয়ে সব যেন লেপা-পোঁছা হয়ে আছে। প্রথম-প্রথম পতন ও মৃত্যু-ভয় থাকত, এখন গা-সওয়া। তবে ছাড়িয়ে ওঠার রোমাঞ্চে এখনও অভিভূত হয়ে যায়।

ঘুরে ঘুরেই কিছু সওদা করে নিল খোদাবক্স। লাইটারের পাথর, বুটের একটা সোল, এক বান্ডিল পদ্ম-ছাপ-মার্কা বিড়ি এবং ফুট থেকে এক বোতল বি, চ্যাটার্জির লিভার কিওর।

ঘুরে ঘুরে আবু হতাশ হচ্ছিল। শালা যা কিপ্টে, শুধু চা খাইয়ে ফাঁকি দেবে না তো? তাই হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পরোটা ও শিককাবাব অর্ডার দিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ঢোকার মুখেই কি ঝাঁঝালো খুশবাই! কতদিন সে গোস্ত....!

দোকানে ঢোকার মুখটায়, এই উৎসবের দিনে ভিখিরিদের ভিড়। ভাঙা মগ আর লাঠি ঠুকে ঠুকে 'আল্লা তেরা ভালা করেগা!' 'মালিক তেরা ভালা করেগা!'—ঘ্যান ঘ্যান করে নাক উঁচিয়ে আছে। খোদা দু'টো পয়সা ঠং করে ছুঁড়ে দিয়ে বিড় বিড় করে— 'ভালো কে-ই বা করছে!'

আবুর এসব দিকে খেয়াল নেই। তার চোখের সামনে বেঞ্চ দখল করা খদ্দেরের মাথা আর কিছু দূরে ঘামে-জ্যাবজ্যাবে একটা লোক গণগণে আঁচে শিকে গাঁথা কাবাব ঝলসাচ্ছে, পুরু একটা তাতানো চাটুতে ডালডার ময়ামে পরোটা ভাজছে। বেঁটে মতো একটা লোক। ওরা গা ঘেঁষে সামান্য একটু জায়গা দখল করে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো গরম গরম কলায়ের থালা। আবুর চোখের সাদা জমিনটুকু বর্ষাকাল থেকে অস্বাস্থ্যকর হলদেটে; জলের চাপে গাঁয়ে কোনো কাজকম্ম নেই। সেই হলদে জমিনটুকু খুশি ও লোভে ঝিলিক দিয়ে উঠল। ডানহাতের আঙুল কাঁপে, তৃপ্তির জল আসে জিভে এবং এক গ্লাস জল ঢক্‌ঢক্ খেয়েই হাসি হাসি মুখে ভাপ বেরোনো পরোটার টুকরো ও কাবাব মুখের গর্তে ঢুকিয়ে দেয়। কানের তলা দু'টো অসম্ভব ওঠা-নামা করে এবং দেখতে দেখতে গোঁফ ও ঠোঁটে তেল-মশলায় মাখামাখি। কচ্ কচ্ চাপা শব্দ উর্দ্ধশ্বাসে চার-চারটে সাবাড় করে খোদার অনুরোধে ও ভয়ে আর ঘাড় নাড়তে পারে না। বোকার মতো হাসে। গোস্ত কি আর নাসিবে জোটে? সেই কত মাস আগে বক্‌রি ঈদের দিনে গাঁয়ের ধনী মুসাসাহেব পাঁচখানা খাসি কুরবানী করেছিলেন, সে সুবাদে জিভে পড়েছিল কয়েক টুকরো।

খোদা আর উৎসাহ দেখাল না, পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে।

রাস্তায় আবু তালেবের শরীর-মনে কেমন শান্তি নামে; কিন্তু গুরুপাকে পাকস্থলি গুড় গুড় ডেকে উঠতেই বউ ছেলেমেয়ের জন্য সামান্য দুঃখ হয়। বেচারারা স্বাদ পেল না। সেই দীর্ঘ বর্ষা ধরে আটাগোলা, অর্ধাহার কিংবা মাঝে মাঝে রুটি।

হাঁটতে হাঁটতে খোদা বলে—দিলি তো শালা পকেটের দফা-রফা সেরে? কত গেল জানিস?

—গেলে আর তোর কি? অমন কাজ-কম্ম থাকলে আমি রোজ খেতাম।

—কাজকম্ম ? ছাই জানো, মিল শুনছি বন্ধ হয়ে যাবে।

— কেন?

—কি জানি ভাই, সুমুন্দির পুতদের মতলব!

খানকিগলির মুখে পানের দোকানটায় পান, বিড়ি কিনল আর আবু তালেব ড্যাব ড্যাব করে তাকায়; কে একজন নাকি বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাতের টুস্‌কি জানিয়েছে। খোদা পাছায় চিমটি কেটে বলে— পালা দিনি, রঙ্গ আর দেখে না!

শহর শেষ, গাঁয়ের আঁধারপথ পেরিয়ে বাড়ির কিছুটা আগে ওরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছল। সারা বিকেলটা খোদাকে খুব ভালো লেগেছিল আবুর। একটু রগচটা আর কিপটে বলে গাঁয়ে দুর্নাম থাকলেও, মাঝে মাঝে হুজুগ চাপলে খোদার পয়সার হিসেব থাকেনা। আবু দীন-দরিদ্র মানুষ, সবার সঙ্গে মিলিযে ঝুলিয়েই চলে। গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যায় না। রাতে পচাটে, হুমড়ি খাওয়া চালের তলায় মরিজান বিবিকে শহরের আশাতীত ঘটনাটি বলবে কিনা ভাবছিল। হয়তো ওর জিভেও লোভ জাগবে, কষ্ট পাবে মনে। মরিজান বিবি আবু তালেবের দ্বিতীয় পক্ষের। বিবি নয়—বউ; কথাটা শুধরে দিয়েছিল মুসা সাহেব। এক সন্ধ্যায় তার মস্ত মুদি দোকানের মজলিসে ব্যঙ্গ করে বলেছিল—হুঃ! বিবি! ল্যাঙোটের আবার বুক পকেট! বউ বলতে সরম লাগে? সেই থেকে দশজনের সামনে ভুঁলেও সে বিবি উচ্চারণ করে না। কেবল নিকট পৃথিবীতে যখন ওরা খুব কাছাকাছি, নিবিড়, তখনই ফিস ফিস করে—বিবিজান!

— সে গোস্ত তোরা খাস নি বিবিজান! পরোটার কি কায়দা! নর-ম!

—আমার কী পয়সা আছে? খোদা নিয়ে গেলে টিটেগড়, তাই!

— কেন?

—পরবের দিন গাঁয়ে কি আছে? বি.টি রোডের মসজিদটা কি সাজিয়েছে! মাইকে নামাজ পড়ে, সব্বাই শুনতে পায়। আমাদের হাফিজ সাহেবের তেমন ঝাল নেই। ভাগ্যিই খোদা ডেকেছিল!

—শুনি, মানুষটা নাকি তেমন জুতসই না?

— হোক গে! আমাদের কি। গরিবদের কাছে সব সমান।

অনেক কথা বলতে বলতে শহরের সব আশ্চর্য ব্যাপার নিয়ে কথা হয়। গোস্ত তখন আবুর দেহে ফুর্তি এনে দিয়েছে। সেই বিড়ি ফোঁকা মেয়েটার হাতের টুস্‌কি মনে পড়ে। মরিজানকে একথা বলে না। ওর পেটের ধুকরো চর্বির দিকে তাকিয়ে ওম মেরে থাকে। চালা নিঝুম হয়। নানা কথার খানা-খন্দ পেরিয়ে, ঝমঝম করে যখন বৃষ্টি নামে, আবু মরিজানের সমস্ত বাধা সরিয়ে আদরের

হিসানি দিয়ে ওঠে। পরদিন সকালে আর নাস্তা-ফাস্তা জুটল না। কয়েকটা তাল আর কিছু ওল ডাঁটা নিয়ে কাচ্চা-বাচ্চা সহ মরিজান গেল বাজারে, আবুও বেরিয়ে পড়ল শহরে উটকো কাজের ধান্দায়। গাঁয়ে কোনো কাজ থাকেনা এ সময়টা । দেহে তার ছেঁড়া লুঙ্গি আর ময়লা গেঞ্জি, সারা মুখে ছুঁচের মতো দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। লুঙ্গির ট্যাকে ছিল সাকুল্যে সতেরোটি পয়সা। পথে নাস্তা সারবে। দিনের প্রথম ভাগ না হলে কি কাজ জোটে! কারখানার গেটগুলো তার লক্ষ্য। কোনো ঠিকেদার জানা নেই তার। বদলির কাজ জুটবে না। স্রেফ 'কিজুয়ালে'র কাজ যদি জোটে! পায়ও সে মাঝে মাঝে। আজকাল শিল্পাঞ্চলে এমন কাজ পাওয়া যায়। মালিক তরফের আগ্রহই বেশি। নামধাম লেখা নেই, দায়-দায়িত্বের অংশিদারও নয় মালিকরা । যন্ত্রে আখ মাড়িয়ে দিনের শেষে পাঁচটি টাকা ঠেকিয়ে দিলেই ব্যাস্ সব দায় মুক্ত! ফান্ড নেই, ই.এস,আই, নেই, ডি.এ. বোনাসের ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয় না—কত সুবিধে। খোদাদের কারখানাতেই আজ আবুর কাজ জুটে গেল। কয়েক মাস আগেও সে তিন দিন খেটে গেছে। সকাল আটটা থেকে চারটে পর্যন্ত বড় বড় ভারি বস্তা টানা। এই কাজের জন্যই খোদাকে সে ধরেছে কিন্তু সে গা করে না। ব্যাটার দুনিয়া কেবল নিজেকে নিয়েই; গাঁয়ের লোক কি এমনিতেই ওকে বাঁকা চোখে দেখে?

...যাক্ আজ একাজ করতে করতেই ভাদ্দরের গুমোট দমচাপা গম্ভীর মধ্যাহ্নে খোলা আকাশের নিচে কোনো এক মুহূর্তে আবু তালেব মস্ত এক বোঝায় আচমকা কাঁধ দিতে গিয়ে উল্টে শক্ত হয়ে পড়ল; কয়েক সেকেন্ড উলিট-পলিট খেয়ে ঠোঁটের কষায় কালচে রক্ত গড়াল। একটু পরেই কপালে অবিন্যস্ত ঘামেভেজা কাঁচা-পাকা চুলের রাশি, আকাশমুখিন ঠোঁটজোড়া যন্ত্রণায় থমকে রইল। এসব ঘটল কয়েকটা সেকেন্ডের মধ্যে। এখনও যেন স্বপ্ন, সাধ আহ্লাদ দেহটিকে ঘিরে আছে। গতকাল শিকপোড়া মাংসের স্বাদ, মরিজান বিবির গলার স্বর এমনকি গাঁয়ের হাফেজ সাহেব আলতাফ মিঞার মুখে শোনা বেহেস্তের স্বপ্ন মস্তিষ্কের দূরবৃত্তের মধ্যে রয়ে গেছে। জীবন-মৃত্যুর সীমারেখাটা এত কাছাকাছি! কেবল ঘিরে ধরা চারপাশে মজুরদের চোখ, কান, গলার মধ্যে অনুভূতির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

—মরে গেছে।

—কলিজা ফট্ গইল।

একজন আবুর দেহটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চুকচুক করে বলল—শালার এই চেহারা! বস্তা টানতে গেলি!

দেখতে দেখতে কুলির দলটা কাজ ঝেড়ে ফেলল—বন্‌ধ। কেউ ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়নি, যে যার মুখ ঘুরিয়ে নিল কাজ থেকে। একটা দল ছুটে এল অফিসের দিকে।

—কলিজা ফট্ গইল। ক্ষতিপূরণ চাই! চাই!

—এত চিৎকার কেন! আইনে থাকলে হবে। কোনো ইউনিয়ন বলতে পারবে কোম্পানি আইন মানে নি? অফিসঘর থেকে বেরিয়েই মালিকের পক্ষ হয়ে একজন অফিসার মজুরদের সামনে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল। শ্রমিকের কোনো দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই, এ দাবি তাদের আইনগত। মালিকরাই স্বীকার করে নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে যেখানে আগুন, অ্যাসিড, যন্ত্রদানবের মুখে ঠেলে

দেওয়া হয়, প্রতিদিন হাড়-মাংসের ছোট বড় আহুতি, মাঝে মাঝে দু'একটি মৃত্যুও ঘটে, ফলে শ্রম-আইনের পন্ডিতরা এ বিষয়টা নিয়ে নানা ধারা উপধারার সৃষ্টি করে গেছেন। আর তা মানতে মালিকরা সদা প্রস্তুত। তাতে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। মজুররা আর যাই হোক, মানুষ তো!

এই গৌরচন্দ্রিকা দিয়েই শুরু করলেন সেই অফিসারটি। বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হন না। আইন তাঁর ঠোঁটের ডগায় থাকে সবসময়।

—কিন্তু লোকটি কে? কারখানার কেউ নয়। ব্যাটা কী মতলবে ঢুকেছিল, কে জানে?

—কারখানায় খাটতে আসেনি? কি বলছেন!

—না না, কারখানার কেউ নয়—আমরা খোঁজ নিয়েছি। খাতায় নাম নেই, টেম্পোরারি বা ঠিকেদারের লোকও নয়। বাইরের কে না কে মরেছে, কোম্পানি টাকা দেবে? এ্যাবসার্ড, আপনারা কাজে যান। বিনা জবাবে শ্রমিকরা ফিরে এল বটে, দেখতে দেখতে সমস্ত কারখানায় টুল-ডাউন; মেশিন ছেড়ে যে যার চলে এসেছে।

রুক্ষ, কাঁকর-বালির চত্বরটায় মৃতদেহ ঘিরে সবারই এক দাবি—ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনের বদলির চাকরি। আইনে যাই হোক, আবু তালেব এ কারখানারই উৎপাদনে সাহায্য করতে এসেছিল। এর মুনাফা মালিকরাই ভোগ করত।

সেই অফিসারটি অবিচল, সাহসী। এত গন্ডগোল, চিৎকার, অফিস ঘেরাও তার মনকে একটুকু গলাতে পারেনি। কেবল উৎপাদন বন্ধ হওয়ায় ঈষৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তবু এত ঝঞ্ঝাটেও, দু'চার জন অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে চাবি দিয়ে কিছু যন্ত্রবিশারদকে পাঠিয়ে দিয়েছেন অ্যাসিড প্ল্যান্ট চালু রাখতে—মানুদের হৃৎপিন্ডের মতো যা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে কারখানার প্রাণ-ভোমরাটা ছটফট করে উঠবে।

অফিসারটি ছিপছিপে, মাথায় সামান্য টাক, গায়ে বিষ্ণুপুরী বাফতার ঘিয়ে রংয়ের বুশ শার্ট, সাদা ধবধবে ট্রাউজার। একই ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইছেন— একটা উটকো লোক, কারখানার কেউ নয়, কি জন্য ঢুকেছিল তা-ও জানি না, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? বড়জোর ডেডবডি সরাবার খরচ দেয়া যেতে পারে। গেটের বাইরে দু'টি পুলিশ ভ্যান ইতিমধ্যেই হাজির! তবে তারা ভেতরের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে না। অফিসারটি ফোনেই বারণ করেছিলেন— নো, নো। ইনটারফেয়ারের দরকার নেই। আমরাই ট্যাক্‌ল করব। তবে...।

খোদাবক্স মৃতের নাম-ঠিকানা জানল বেলা তিনটের পর। কারখানার দীর্ঘ জীবনে সে বড় নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। এই কারখানার সীমানায় কত উত্তেজনার ঢেউ গেছে, এমনকি গেটে বোমা ছুরির খন্ডযুদ্ধেও খোদা মাথা ঘামায়নি। সব শালা ক্ষমতার জন্য ছুকছুক্ করে। ধান্দাবাজ! শ্রমিকদের মাথায় টুপি পরাতে ওস্তাদ। এই মানসিকতায় সে বরাবর নিজেকে নিয়ে থাকে। কোনো বিপদের ঝুঁকিতে যে নেই। কিন্তু লোকটা সে হৃদয়হীন তা-ও বলা যায় না।

খুব আঘাত পেয়েছে খোদা। গতকালও যাকে নিয়ে শবেবরাতের বিকেলটা খুশি মনে কাটিয়েছে, যার পচাটে হুমড়ি খাওয়া চালা প্রতিদিনই চোখে পড়ে এবং যার অর্ধ-ভুক্ত ভবিষ্যতহীন একপাল

ছেলেমেয়ে ও অভাগী বউটার সঙ্গে কথা বলে তার দুর্ঘটনায় সে চমকে গেল। ইতিমধ্যে মেঘভাঙা রোদ, ঝিরঝির বৃষ্টি ও বায়ুমন্ডলের ভ্যাপসা গরমে মৃতদেহ বিকৃত হতে শুরু করেছে। খোদা নিঃশ্বাস চেপে ভিড়ে মুখ গলিয়ে থমকে রইল। আজ বিকেলে চিমনির মাথায় ওঠার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে আর ওসব কিছু ভাবতে পারছে না।

—চাচা, তোমার গাঁয়ের লোক শুনলাম? চেনো?

এক মজুরের জিজ্ঞাসায় খোদা মাথা নাড়ে।

—ও কি চুরি করতে ঢুকেছিল? বাঞ্চোতদের কি কথা! কারখানার কেউ নয়! শালা রোজ সকালে নয়া কিজুয়ালরা কি বানে ভেসে আসে? খাটাস কেন তবে?

একটা প্রচন্ড চিৎকারে চত্বরটা চৌচির হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দু-দুটো ইউনিয়নের তরফ থেকে কথা চালাবার প্রতিনিধিরা এসেছেন। নিরুপায় অফিসারটি ডেকে পাঠিয়েছে তাদের। কয়েক হাজার মজুরের মধ্যে কার সঙ্গে কথা বলবেন? কে এই এলোমেলো ক্রোধের রাশ টেনে রাখবে? দুই প্রতিনিধিই টেবিল চাপড়ে বললেন— ক্ষতিপূরণ দেবেন না? কাজ করতে করতে মরলে কম্‌পেন্‌সেশন্‌ দেবেন না? আপনার আইন কি বলে?

—হ্যাঁ কোম্পানি সব দেবে। অফিসারটি হাসেন। কিন্তু কোম্পানির শ্রমিক হলে তো? উট্‌কো পথের লোক মরলে কোম্পানি করবে? আবু তালেব বলে এ কারখানায় কেউ নেই।

প্রতিনিধিরা প্যাঁচে পড়ে যান। সিগারেট জ্বালিয়ে বলেন—তবে একস্ট্রা ক্যাজুয়াল সিস্টেম চালু কেন?

সে তো কোম্পানির পলিসিগত প্রশ্ন। তা নিয়ে বাইপারটাইট টক্‌ হতে পারে!

—সামনে পূজো, বোনাসের বাইপারটাইট ডাকছে না, আবার এর জন্য?

— বোনাস? সে ব্যাপারে ডিসিশনে আসতেই হবে। কিন্তু সামান্য সব ব্যাপারে ট্রাবল্‌ তৈরি করলে, আপনাদেরই ক্ষতি। বোনাস-মীমাংসা এক বাইপারটাইটে হয় না। বলুন ওদের ডেডবডি সরাতে, এক্সট্রা পঞ্চাশ একশ যা লাগে দেখা যাবে। আপনারা কনট্রোল করুন। পরে আমরাও কিছু করতে পারব না।

এক নম্বর প্রতিনিধি বাইরে মজুরদের সামনে বক্তৃতা দিলেন, সবাই শুনল; দ্বিতীয়জনের বক্তব্যেও সবাই চুপ করে রইল, কিন্তু অফিসারটির ডাকে আবার বৈঠক।

বিকেল, সন্ধ্যা, রাত, পরদিনের সকালও কেটে গেল। মৃত আবু তালেবকে মজুররা পাহারা দিচ্ছে। এক অদ্ভুত ব্যাপার। খোদাবক্সও কাল বাড়ি ফেরেনি। কেন বাড়ি গেল না নিজেও ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বারবার ভেবেছে মরিজানকে কি বলবে? ওর নির্বাক চোখের সামনে খোদা দাঁড়াতে পারবে না।

দুর্ঘটনার ঠিক চব্বিশ ঘন্টা পর, আইন ধারা এবং মালিক-মজুরদের মধ্যবর্তী কোনো সিদ্ধান্তে আসা যখন সম্ভব হলো না, প্রতিনিধিরা দু'টো বক্তৃতা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সে এক হৈ চৈ বিশৃঙ্খলা অবস্থা। কে একজন ভিড়ের মধ্যে চিৎকার দিল— কলিজা ফট গইল মজদুরো কোঁ,

লেকিন কারখানেকো কলিজা চল রহি হ্যায়! ঝকঝক অ্যাসিড প্ল্যান্টের শব্দে দলটা কান পাতে।

—বন্‌ধ করো! ইয়ে ইজ্জত কা....!

বৃদ্ধ মজুরটির অঙ্গুলি নির্দেশে চব্বিশ ঘন্টার অবসাদ, ক্লান্তি, ক্রোধ গতি পেয়ে গেল। এবং গতি— সঠিক, কি ভ্রান্ত, যাই হোক— খুব ভয়ঙ্কর। দীর্ঘদিনের ছোট ছোট চাপা অসন্তোষ, অবিচার ও দম্ভের ক্রমিক যোগফলে এই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠা— যে কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেই হতে পারে, যে কেউ ঘটাতে পারে। রড, লাঠি নিয়ে প্ল্যান্টমুখী ধাওয়া করতেই অফিসারটি নিরুপায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামনে, হাত দু'টো তুলে। দলটা আবার থেমে যায়।

ক্ষতিপূরণ দিতে কোম্পানি এখন রাজি। এই মুহূর্তে সে পুলিশের হাতে আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টা তুলে দিতে পারতেন, দৃষ্টি অনেকেরই সুদূরপ্রসারী। বাইবেলের শাসিত সমুদ্রের মতো ওনার এ সিদ্ধান্তে মজুররা শান্ত হয়ে গেল।

—ওর বন্ধু, আত্মীয় কে আছে? আমি কথা বলতে চাই।

উত্তেজনার শেষে এগিয়ে আসতে সবাই যখন ভয় পাচ্ছে, দেখা গেল একজন ভিড় ঠেলে চলে এল— সে খোদাবক্স। হাতে ছোট্ট লোহার রডটা রয়েই গেছে, ঘটনার টালমাটালে ফেলার কথা মনে আসেনি। পাশ থেকে কারা যেন চাপা গলায় সাবধান করল—এই চাচা! ইঙ্গিতে ঝপ্ করে ফেলে দিল সে। অফিসারটি অন্যান্য কথাবার্তা সেরে বললেন— বেশ, এবার ডেডবডি সরিয়ে ফেলা হোক!

গাঁয়ের মসজিদের খুনখুনে বুড়ো ওস্তাদজি অজেত আলীর কাছে মন্ত্র পড়িয়ে, লাশ ধোয়া-পাখলার পর কাফন জড়িয়ে পাঠানো হলো, তার আগেই খোদা গাঁয়ের তিনচারজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাঁশঝাড়ের তলায়। তালেবের উঠোন ঢুকতেই শুনল মরিজানের ঘুনঘুনে কান্না। আশপাশের চালার কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ মুখে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে অন্ধকার আকাশের তলায় মৃতের স্মৃতিতে কাঁদছে— তাদের বুকের সপ্‌সপানিতে খোদাবক্সের ভেতরটা চিরে গেল। এরা তারই দেশ-গাঁয়ের মানুষ। মরিজানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— কাঁদিসনে বউ। আমরা তো মরিনি। বাঁচিয়ে রাখবো তোদের। দুঃখ করিস না।

কথা কটি বলেই কি এক চিন্তায় খোদার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অদ্ভুত প্রশান্ত অনুভূতি। জীবনে বহুবার শহরের সবকিছু ছাড়িয়ে চিমনির মাথায় উঠলেও, মনে হলো নিজেকে অতিক্রম করল এই প্রথম।

অপরাজিত, ১৯৮২

চব্বিশ ফুট

তিনতলার ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে নৌকো হয়ে মণিময়বাবু মধ্যদুপুরে খেয়াল করলেন না উঠোনলগ্ন পুকুরটায় হঠাৎই ছায়াগুলো ভেঙে ভেঙে গেল। দেখতে পেল শুধু বরেন। বারান্দায় খেয়েদেয়ে দাঁত খুঁচতে খুঁচতে সে ঘাসের বুকে নিঃশব্দে একটি হেলে সাপের পেছনে পা টিপে টিপে নেমে এসেছিল; পুকুরধারের গর্তে হিলহিলে জীবটি ঢুকে যেতে সে ছায়ায় দাঁড়িয়ে অস্বস্তিকর মাংসের আঁশগুলো খুঁচতেই থাকে আনমনে। তখনই দেখতে পায়। ছোট্ট পুকুরটি ঝিম দুপুরে আকাশের স্বপ্ন দেখছে। ওপারের চারটে সুপুরির ছায়া, সুরঞ্জনবাবুদের তিনটে কলাগাছ, মাঝপুকুরে শুকনো বাঁশখন্ডের ডগে ঠ্যাং তোলা তপস্বী বক— সবই বরেন জলের বুকে দেখতে পাচ্ছিল। মধ্য চোতের টান টান দুপুরের রোদ পুকুরটিকে ঘিরে মজে উঠেছে। আশপাশের ঘিঞ্জি দালানকোঠায় বিশৃঙ্খল চেঁচামেচির এই শব্দহীন বৃত্তটির নিষেধ ভাঙতে পারছে না। এমনকি বরেনদের দোতালায় ছোট্ট বোন রুমির টেপে মায়া সেনের 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে' পর্যন্ত ঝঙ্কারহীন মৃদু লয়ে এখানে রোদ ও নির্জনতায় হারিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই ছায়াগুলো ভেঙে গেল। চকিত মুহূর্তের ধাক্কায় বরেন ঘাড় ঘোরায়। একটি কোণা থেকে ঘব ঘব শব্দ, সজাগ বকটির চম্পট এবং সারা পুকুরের জল লেপাপোঁছা ছায়ায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাড়ের মাটি ধাক্কা দিতে ছুটল। বরেনের চোখে পড়ে লোকটা জলেডোবা সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে ময়লা পা দুটো ধুচ্ছে। অনেকটা ধনুক হয়ে আছে। মুখটা ধুলো; অপরিষ্কার জলেই কুলকুচি করল। ধুলোট রুক্ষ চুলে থাবড়ে দিল ভেজা হাত ; শেষে কোদালখানা যত্নে ধোয়া-পাখলা করে সিঁড়ির ধাপ টপকে আসে । প্রতি ধাপে এক একটি ধ্যাবড়া পায়ের জলছাপ, কোদাল ও কনুই গড়ানো ফোঁটা ফোঁটা জলের ছড়া ।

লোকটা পুরনো পথে চলে গেল না। এই পুকুর, সুপুরির সারি এবং নতুন দালান কোঠার অসংগতির মধ্যে কিছু বেভুল মুহূর্ত পাকিয়ে ধরল তাকে। হয়তো জলে নামার পর থেকেই শুরু হয়েছিল, বরেন খেয়াল করেনি। মানুষটা দাঁড়িয়ে চারধারের নতুন বসতি, নানান মাপের ঘরবাড়ি, সামান্য টিকে থাকা গাছপালার দিকে চোখ জোড়াকে ভাসিয়ে দিল। একবার শুধু হাত দিয়ে আঁচাছা গালের খোদল থেকে জল মুছে হাসল আপন মনে। তারপর চোখজোড়াকে আরও উৎসুক ঢংয়ে, কিছু খুঁজে পাওয়ার ভঙ্গিতে ছোট করে দিল। বরেনদের উঠোনের তারে দু'টো দামী শাড়ি, ফুলবাগানে

একটা স্টিলের জগ, গ্রিল খোলা বারান্দায় বাপ্পার ট্রাইসাইকেলটা, আশপাশের উঠোন বারান্দাতেও এরকম টুকিটাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কৌশলে বরেন সাপটাকে ফলো করার মতোই সরে এসে আড়ালে ছায়ায় দাঁড়াল। নিজেকে লুকিয়ে ফেলল যেন। লোকটা নির্বোধ ভঙ্গিতেই সামান্য ঝুঁকে কোদালটা ঝুলিয়ে, পেরিয়ে গেল বরেনদের উঠোন। ঘাড় দুলিয়েই উঁকিঝুঁকি মেরে চলে গেল সোজা তিন-তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা ভেতরে। বরেন জানে, রাস্তাটা ডেড। চলে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘাড় লম্বা করে দেখতে পেল লোকটা এখন সুজিৎ দাশগুপ্ত, চার্টাউ অ্যাকাউনটেন্ট-এর বাড়ির ছায়ায়। কুকুরটার সন্দিগ্ধ চিৎকার । ফের ঝোলানো কোদলটা দ্রুত এ মুখে। বরেন এই সুযোগে রাস্তা আটকে দিতেই লোকটা দৃষ্টির যুগলবন্দীতে মিচকি হেসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বরেন দেখে জলধোয়া সাদা-কাঁচা প্রকট দাড়ির সূঁচগাঁথা চোয়ালে অপ্রস্তুত হাসি। লোকটার বুকের খোদলে ঘাম শুকিয়ে নুন হয়ে আছে। টেকসই কালো চামড়া—বয়সের ভারে এখন দেহের মাংস কামড়ে ধরে নেই, ঢিলে মেদহীন।

কিন্তু কাঁধ দু'টো বলির বেদীর মতো সলিড, কালো কড়া'তে আক্রান্ত। চোখজোড়া রোদের ঝলসানিতে লাল।

—কত টাইম হলো বাবু? লোকটা হেসে জিজ্ঞেস করল।

—দুটো দশ।

—ঠিক হ্যায় !

কী ঠিক হলো, কীইবা বেঠিক হতে পারত, বরেনের অস্পষ্ট লাগে। তবে লোকটা বেলার আন্দাজে ঘড়ির সূক্ষ্ম মাপের মিলে খুশি।

—নাহালে না?

—আখুন নাহালে বিমার হয়ে যাবে। বেঁটে হলদে দাঁত কথার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে যাচ্ছে।

— কেন?

—শরীর গরম! সেই সাঁঝে ঠান্ডা হলে নাহাবো, খাবো—ব্যাস্!

বরেন ফোলা ফর্সা হাতটা ওর চামড়ায় ঠেকিয়ে দিতেই টের পেল ভেতরটায় সিদ্ধ আলুর গরম। চমকে ওঠায় লোকটা হাসল।

—ধুপ মাথায় কাজ করলাম আট ঘন্টা।

কিন্তু বরেন খুশি হলো না। যে সন্দেহে সে নিজেকে আড়াল করে ফেলেছিল, মনে হচ্ছে যাদুমন্ত্রে মানুষটা বারেনকে তা থেকে ভোলাতে চাচ্ছে।

সরাসরি জিজ্ঞেস করল—কী নাম?

—ত্রিলোক যাদব।

—আহির?

ত্রিলোকি খুশিতে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবু।

—হরিজন তো?

আঁতে ঘা লাগলেই মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলে—না সাহাব। আহির কি হরিজন?

—মুলুক?

—ভাগলপুর জিলার নৌটুরিয়া।

—এখানে কেন?

—কাম করি। উধারে এক বাবুর মকান হচ্ছে।

—ত্রিলোকির উঁচু হাতটা দক্ষিণে প্রসারিত হলেও বরেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কথাও নয় তার। বছর দশেকের মধ্যে অঞ্চলটা আলাদিনের সাম্রাজ্যের মতো এমন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, পড়শীদের পরিচিতি এতো দ্রুত সীমিত হয়ে পড়েছে, কে বাড়ি তুলছে ভিত কাটাচ্ছে কি ছাদ ঢালাই করাচ্ছে— খবর রাখা সম্ভব নয়। তা ছিল বছর বিশ-পঁচিশ আগে।

বরেন লক্ষ্য করল ত্রিলোকি কথার সুতো ছড়াতে ভালোবাসে। পুকুরটা আন্দাজ রেখে বাববার তাকাচ্ছে বরেনদের বাড়ির মাথায়। রোদের ঝাঁঝে মামুলি আলাপ সাঙ্গ করে সরে পড়ছে না। বরেন ভাবে, তুমি আর কত চালাক।

— দেশ গাঁয়ে হরিজনরা কেমন আছে?

—খু-ব আচ্ছা। সরকার ওদের জন্য কোঠি বানিয়েছে, বিজলি দিয়েছে। আহিরদের মতো মাটি আর খাপরার ঘরে থাকে না। ওরা ভালো থাকবে না কি আমরা?

বরেন জাতপাতের ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাল না। বুঝল, সরকার সমাজ এবং অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে ওর সঙ্গে তর্ক জড়িয়ে লাভ নেই।

ঠিক অভিযুক্ত করে নয়, কৌশলে মামুলি গলায় জিজ্ঞেস করল, —এ রাস্তায় ঢুকেছিল কেন বাপু?

ত্রিলোক জবাব দিল না। সে তখন চোখজোড়াকে ভাসিয়ে দিয়েছে বরেনদের তিনতলায় পাশের ফ্ল্যাটের কার্নিশে। স্মৃতিতে কিছু শুঁকবার ভান করেছে। এই রোদ যেন খেলার সঙ্গী—কোনে ভ্রুক্ষেপ নেই। যত্নে এক চিমটি খইনি মুখে গুঁজে আপন মনে মাথা নাড়ল।

—আপনার মুলুক কোথা, বাবু?

—এখানে। এটা আমাদের কোঠি।

—না, না। পয়লা টাইম কোথায় ছিলেন? বরাব্বর তো এ কোঠি ছিল না।

—বরাব্বর কি তুমি ছিলে? আমি ছিলাম?

—হা হা! ত্রিলোকি সঠিক শব্দে না বোঝালেও, বরেন ধরতে পারে।

— দেশের কথা? ওপার—বাংলাদেশ—মানে পকিস্তান ছিল যখন।

ত্রিলোকি হেসে বলে—পাকিস্তান আমি চিনি।

—গ্যাছ?

—দিনাজপুর জিলা আছে না? আমি গেছি। মালদা গেছি, বালুরঘাট গেছি।

—ধ্যুৎ, মালদা বালুরঘাট তো এ পারে।

—হাঁ, উ আভি হিন্দুস্থান।

—বরাবর হিন্দুস্থান। তা এত দেশ ঘুরেছো। কী মতলব?

—আমরা কাট্‌নির দলে ছিলাম। ধান-উন্ কেটে তুলে দিতাম। গাঁও থেকে ঠিকাদার নিয়ে যেত। ছ'মাহিনা বাংলা মুলুক ঘুরে পানির টাইমে দেশে ফিরতাম। পাকিস্তানের পর আমাদের নোকরি চলে গেল।

— কেন?

—এ দেশে উ কাজে লোক ছিল না তাখুন। পাকিস্তান হোনে কে বাদ মুসলমানরা ওপারে চলে গেল, চাষী এল এখানে, উসব আদমি কাট্‌নির কাজ জানে, তো আমরা সব বেকার। তাখুনসে, ঘুরে ঘুরে মাটির কাজ করি। বিশ বরষ আসে আপনারই এলাকায় মাটির কাম করতে এসেছিলাম।

—এ পাড়ায়?

—হাঁ বাবু।

—তা হবে । দেশে তোমার জমি কত ?

—দু'তিন বিঘা।

বরেন পাল্টে যাচ্ছে। পুরনো ধারণার মাপে ত্রিলোকিকে যাচাই করা যাচ্ছে না। লোকটা যেন রহস্যময়, মজার। সহজ-সরল এক বৃদ্ধ—মাটি ও বাতাসের গন্ধেই যার ঘাম ও রক্তের পরিচয় ঘটেছে ষাট-সত্তর বছর। হ্যাঁ, তিনকুড়ি বয়স তো হবেই।

আন্দাজেই ধরতে পারছে বরেন।

—সারা বছর চলে যায়?

—না বাবু। দুসরা আদমির জমিনে ভাগে চাষ করে।

— কে চাষ করে?

— লেড়কা আছে। আমার চার লেড়কা, তিন লেড়কি।

—সারা বছর ঘুরে বেড়াও, এত বাচ্চা হয় কী করে? চিট্‌ঠি মে?

ত্রিলোকি বরেনের খোঁচাটুকু ধরতে পারে না। এইসব কোঠির বাবু যে ত্রিলোকির সঙ্গে এত গল্প করছে, তাতেই লোকটা খুশি। আর বাবু নিশ্চয়ই কোনো দামি কথা বলেছে। আন্দাজেই, হাঁ বাবু, বলে— সামান্য মাথা কাত করতেই বরেন হো হো করে হেসে উঠল। দোতালায় ছোট বোন উঁকি দিয়ে বলে,— কী রে দাদা? - কিছু না। হাসি থামিয়ে চোখের কোণে দুষ্টুমি নিয়ে ত্রিলোকিকে দেখতে থাকে।

দাশগুপ্তর বাড়ি থেকে অ্যালসেশিয়ানটা এবার বাজখাঁই গলায় ডাকল। কোদাল হাতে মানুষটাকে অনধিকার প্রবেশকারী ভেবেছে। প্রথম পর্বের সন্দেহ কেটে যাওয়ায় ওকে নিয়ে একটু মজা করার ইচ্ছে হলো বরেনের। শব্দজব্দ। সে একটা নামী কনসার্নের ইঞ্জিনিয়ার। অফিসের আড্ডায়, বন্ধুসার্কেলে, বা ব্লুসার্ক, কিএ.ই.আই. ক্লাবে স্কচ্, ভদকা নিয়ে যেসব আলোচনা করে—ত্রিলোকিকে একজন পার্টনার ভাবলে কেমন হয়? লোকটার কী হাল হবে? ভাষার গ্যাপে মানুষ কাৎ হয়ে পড়লে কেমন লাগে দেখতে? এ একটা খেলা বরেনের কাছে। সুযোগ পেলেই নিজস্ব খেলার চালটি সে ছাড়ে।

— তোমার গাঁয়ে ভি.ডি.ও আছে?

ত্রিলোকি অন্য কিছু ভেবে বলে, —হাঁ বাবু। জমিদারের লেড়কা পাঁচ সাল আগে টাট্টু চড়ত।

—অমিতাভ বচ্চনকে দেখেছ?

— দেশে আমি নি চার মাহিনার বেশি থাকি না।

—অনুপ জালোটার ভজন?

— কেহি হবে।

—মারুতি ?

—কা বাবু? ত্রিলোকি যেন ফের শব্দটি শুনলে বলে দিতে পারবে।

—গান্ডু! যাও কেটে পড়।

—কা বাবু? হেসে ত্রিলোকি জিজ্ঞেস করতেই, বরেন নিজের অফুরন্ত হাসি চাপতে পারে না। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রবিবারের সাপ্লিমেন্টে একটা আর্টিকেল সকালে খানিক পড়েছিল, এখন শুয়ে ঘুমোবার আগে শেষ করতে হবে। খানিকটা রিলাক্স করা গেল। তবে শেষ দিকে ত্রিলোকি আন্দাজ পাচ্ছিল বাবু মজা করছে ওকে নিয়ে। হাসি মিলিয়ে মুখটা করুণ হয়ে পড়তেই, বরেন খেলায় সাক্সেসফুল। এ খেলায় প্রতিপক্ষের করুণ অবস্থাতেই মজা। এবার সে ঘরে ঢুকে পড়বে, ফিরে দেখে লোকটা ধীরে উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এসেছে।

ভুরু কুঁচকে বরেন জিজ্ঞেস করল— কী খুঁজছ?

ত্রিলোকি আকর্ণ হাসিতে বলে, —এক বড়িয়া আদমিকে।

—বড়িয়া? কী নাম?

—নাম পতা কুচ্ছু মালুম নাই। ভুলে গেছি। বিশ-বাইশ বরষ আগে ওনার কোঠির এই পানিতে দাঁড়িয়ে খেয়াল হলো, আশপাশ কোথাও হবে।

— দেখতে কেমন?

ত্রিলোকির হাতের মাপে হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে বেঁটেই ঠেকল বরেনের চোখে। তখনকার দিনে রং একটু কালো ছিল। মনে পড়ছে সময়টা ছিল শীতকাল; গরীব বাবুটি একটি কোট দিয়েছিল ত্রিলোকিকে যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখনও ত্রিলোকির ছেলেরা গায়ে জড়িয়ে নৌটুরিয়ার

শীতের কামড় থেকে বেঁচে আছে।

বরেনের চোখজোড়া কুঁচকে আছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসে জড়িয়ে বলল,—গুল দিচ্ছ না তো?

—কা বাবু?

—ঝুট বলছ না তো?

ত্রিলোকি ময়লা জিভটুকু বার করে দেয়। ব্যথা পেয়েছে। এ জবাব বরেনের কাছে প্রত্যাশা করে নি হাসির ফিকে আভা বুলিয়ে খাটো গলায় বলে, —সজনরে ঝুট্ মত্ বোলো। খোদাকে পাস্ যানা হায়! বাবু, আমরা সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে কাজ করি। বহুৎ তখলিফ! কেউ তো ইয়াদ্ করে না। দু'চার আদমি যখন ভালোবাসে, জনমভর আমরা মনে রাখি। কভি কভি মন চায় দেখা করতে। তা ইলাকায় কাজ করতে এসে ফের মনে পড়ল। তালাও এর পাশেই কোঠি হয়েছিল সে বাবুর।

—মণিবাবু? বরেন নামটা ছুঁড়ে দিতেই ত্রিলোকির চোখ-মুখ স্মৃতির ছায়ায় উজ্জ্বলতর হলো।

—হাঁ, মুনিবাবু! মুনিবাবু!

পাহাড়চূড়ায় আচম্‌কা সূর্য ডুবে টুক করে আঁধার নামার মতো, বরেনের ভেতরটা যেন পাল্টে গেল। জলের ছায়া যেমন দোলে, অনুভূতির পাল দুলতে থাকে ত্রিলোকিকে দেখে।

মণিময় যখন এখানে আসেন, অঞ্চলটা ছিল জনবিরল, গাছপালাচ্ছন্ন নির্জন। এ পাড়ায় প্রথম বসতকারীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। সংসারে সবাই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, কিছু মানুষ আছেন স্বপ্নের জন্য ঘুমোতে পারেন না। না ঘুমোনোর খেসারত দেয় অর্থে, অত্যাচারে, যন্ত্রণায়। মণিময় ছিলেন দ্বিতীয় দলের একজন. বেড়া ও টালির ঘর, সামান্য একটা চাকরি করতেন— কিন্তু জীবনটা ফুটত টগ্‌বগ্ করে। বিশেষ করে মাটি ও বাতাসের গন্ধে যাদের ঘাম ও রক্তের পরিচয় ঘটত —মণিময় অদ্ভুত আকর্ষণে আপন করে নিতে পারতেন তাদের। সে একটা যুগ বা পর্ব গেছে মণিময়ের। টালি ও ভাঙা বেড়ার ঘরে প্রথম ভিত কাটতে এসেছিল ত্রিলোকি যাদব। ছোট্ট দলের সঙ্গে। বরেন তখন ছোট, নেহাৎই বালক, কিছুই মনে নেই তার। আজ উঠোনের ঘাসে দাঁড়িয়ে ত্রিলোকির মনে পড়ে এই খোকাবাবু খেলতে খেলতে একদিন ত্রিলোকির পিঠে কলার ছোলা ছুঁড়ে মেরেছিল। মুঠি করা দুরমুজের ওঠানামায় ত্রিলোকির সারা দেহে ঘামে নাইছিল। থপ্ করে ছোলাটা খানিক ঘামে লেপটে থাকায় খোকাবাবুর কি হাসি! মণিময় ঠিক দেখে ফেলেছিলেন। রাগে গোটা তিন চড় কষিয়ে ছেলেকে পাঁচমিনিট রোদে কান ধরিয়ে বৈঠকি দিয়েছিলেন সংকোচ লাগছিল ত্রিলোকির। অপরাধী ভাবছিল নিজেকে। কেন পিঠটা সরিয়ে নিল না সে! এইসব টুকরো টুকরো অংশ। যেমন, একদিন ঠিকে-দার মিস্ত্রি ত্রিলোকিদের কামাই-এর পয়সা আদায় করতে এলে বাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভয়ে ত্রিলোকি বলেছিল, —কী করলে বাবু! মিস্ত্রি আমাদের ভাগিয়ে দেবে।

—দিক্ অন্যের সঙ্গে খাটবি। তাই বলে, কমিশন খেতে দেব?

—দুসরা মিস্ত্রি দেখ না বাবু। ঝুপড়ি থেকে ও হটিয়ে দেবে।

—দিলেই হলো? আমার বাড়ি থাকবি। দুনিয়ার সব মিস্ত্রি কি ওর বাপের?

সত্যিই মণিবাবু সেদিন উঠোনের পেছনে ঝুপড়ি বানিয়ে, যতদিন মিস্ত্রির বন্দোবস্ত হয়নি,

রেখেছিল নিজের খরচে। রাতের দিকে হু-হু ঠান্ডায় বাবু এসে বসতেন। খুব গপ্‌বাজ ছিলেন বাবু। শীতকালে ঝুপড়িতে একটা তাওয়া জ্বালিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প চলত। ত্রিলোকি অনেক কাহানি জানে। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পরী, রাজার মেয়ের গহীন জঙ্গলে স্বর্ন-কন্যায় পরিণত হওয়া, দেবতার মাহাত্ম্য—বাবু কাহানি শুনতে চাইলেই ত্রিলোকি সাজিয়ে গল্প বলত। একবার সে শুনিয়েছিল পৃথিবীতে প্রথম ঘাস কি ভাবে জন্মে। মাঝে মাঝে বাবু বলতেন অনেক কথা। সে সব কাহিনী দুর্বোধ্য ঠেকত ত্রিলোকির। কোনো রাজা নেই, জমিদার, দেবতা—কিছু নেই। কেবল ওদের দুঃখের কথা মনে ভাবত ত্রিলোকি, সত্যি কি দুঃখে আছে ওরা? শীতের শেষে বৃষ্টি হয়েছিল। মাটি গলে ভিতে এক হাঁটু কাদাজল। কি মমতায় ত্রিলোকি এবং দলটা বাবুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল! যেন বুক দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছিল সেই অকাল বৃষ্টির দিনগুলো।

বাবু একবার বলেছিলেন, —থেকে যা ব্যাটারা। এলাকার জমি বিক্রি হচ্ছে সব, কত কোঠা বাড়ি উঠবে।

কিন্তু থাকা হয়নি। মুলুকের টান—চাষের মরশুম। বিদায়ের দিনে বাবু এদের উপার্জিত অর্থ, প্রচুর রুটি এবং ত্রিলোকিকে দিয়ে বলেছিলেন, —ভুলিস না। ফের এলে খুঁজিস আমায়।

—হাঁ বাবু। ত্রিলোকি আপ্লুত হয়ে গেছল। কান্নার গুমোট। এককণা ভালোবাসা ওর কাছে মস্ত পৃথিবী।

চব্বিশটা বছর কেটে গেছে, ফিরে আসা হয়নি। মাঝখানে কত কি ঘটে গেছে ত্রিলোকি জানেও না। মাটি, জঙ্গল, রোদ আর শূন্য আকাশের তারার সাক্ষাতে ক্ষেত শষ্যের মধ্যেই সময় গড়িয়ে গেছে। জানেনা, ইতিমধ্যে কটা চুনাও হয়েছে, সাফল্য ঘটেছে কটা পাঁচশালার। মাটির কোথায় তেল, লোহা, শিসা মিলেছে। কজন মহারাজই বা ইতিমধ্যে গদীতে বসেছেন। শুধু ইঁদিরা মাইজির নাম সে জানে, বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা শুনেছিল। কারণ, তখন ওরা এক ঠিকেদারের অধীনে কাটিহারের দুর্গম অঞ্চলে। কেরোসিন পাওয়া যেত না। শুনেছিল যুদ্ধের কথা। আর একবার নাশবন্দীর ব্যাপারে ওরা খুব চিন্তিত এবং খেপে গেছল। ক্যাম্পের মজুররা তাড়া করেছিল কিছু বাবু লোককে। আর কিছুদিন আগে শুনেছে ইঁদিরা মাইজির গোলির কথা।

ইতিমধ্যে মণিবাবুর নাম ভুলে গেছে, চেহারাটাও অস্পষ্ট, কেবল অরহর ডালের বুনো গন্ধের মতো স্মৃতি রয়ে গেছে ত্রিলোকির। বড়িয়া আদমিকে সব লোক জনমভর টুঁড়তে থাকে! আজ হঠাৎ তালাও-এ নেমে পুরণো গন্ধ ঠেলে উঠতে, সে যেন আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়িঘর বা এলাকা দেখে চেনার উপায় নেই। তবু পুকুরের কিছু পুরণো ছবির চিহ্নে ত্রিলোকির সামান্য আন্দাজ মিলেছিল। কিন্তু সে কি এসব কোঠি?

সত্যিই না চেনার কথা। মণিময়ের এ বাড়ি একদিনে হয়নি। ধাপে ধাপে, বলতে গেলে তিলে তিলে। একতলার লিন্টন হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন, তারপর ছাদ। বিশ্রাম—অর্থ সংগ্রহ। দোতলার লিন্টন, বিশ্রাম, লোন এবং ব্যালকনি। টি.ভির জটাজাল এবং 'মণিদা'! বা 'বরেন'! বলে, অপরিশীলিত চিৎকার বন্ধের জন্য মস্ত কলিংবেল। টিপলেই টুং টিং—নকল পাখি ডাকে। মণিময় অবসর নিয়েছেন বেশ কিছু পুঁজি নিয়ে। এখন তিনতলায় আবসরিক শান্তির জীবন।

বরেনের দৃষ্টিতে ত্রিলোকির মুখে অতীত সুখের ছায়া। মানুষটা পিট্ পিট্ করে মস্ত কোঠিটা দেখেছে। যে খেলায় বরেন তাকে স্কচ্-ভদকার পার্টনার বানিয়েছিল, এখন করুণা বা আশ্চর্য ফের মানুষটাকে যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে ভাবল, বাবাকে ডাকবে কি? বলবে, তোমার বন্ধু এসেছে? বাড়ির সবাই মজা পাবে খানিকটা। আবার ভাবে, কি জানি, কাকে খুঁজতে কোথায় এসেছে, কে জানে। দু বছরের ব্যবধানে মানুষ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়, আর ব্যাটা বলছে বিশ-বাইশ বছর! ধুর! নিশ্চয় পেটে হাঁড়িয়া ঢেলেছে। ত্রিলোকিকে চলে যাও বলতে গিয়েও বাধল বরেনের। এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে চাইল না। এটা বাবার পাঁঠা, ল্যাজে কাটুক, মুড়োয় কাটুক, তিনি বুঝবেন। দিই না একটু লড়িয়ে।

উঠোন দু'পা এগিয়ে, আকাশে মাথা তুলে ডাকল, বাবা! ডাকছে!

মণিময়ের চোখে সবে তন্দ্রা-ঘুঙুর বাজতে শুরু করেছে। অনেক সময় ধরে নীল আকাশের বহু শূন্যে, এক ঝাঁক তিল বিন্দুর মতো ভাসমান পাক-খাওয়া শকুন-বৃত্ত দেখছিলেন। তিনতলায় বাতাস আছে, একটু ঠান্ডাও বা। বরেনের আচমকা ডাকে সুর কেটে গেল। সামান্য বিরক্ত হয়ে বললেন,—কে ডাকে?

বরেন কোনো ঝামেলায় না গিয়ে বলল, —মিস্ত্রি।

—মিস্ত্রি! কোন মিস্ত্রি?

বরেন তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। জবাব না পৌঁছতে মণিময় ভাবতে থাকেন। চেয়ার ছেড়ে নিচে তাকাতে ভয়ানক আলস্যি। কিন্তু মিস্ত্রী? এই দুপুরে কি জন্য? প্রথমেই ভাবনায় এল তিনতলার ছাদ-ঢালাই-করা রোশন আলীকে। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। তাই মনে আছে। তাছাড়া লোকটা ঠগবাজ। মণিময়কে বসিয়ে দিয়েছে। মেশিনে ঢালাই, তবু দু' বর্ষাতেই জল শোক্ করে। পেলে ব্যাটাকে টাইট্ দেবার ইচ্ছে মণিময় পুষে রেখেছেন। কেউ তাকে ঠকাতে বোকা বানিয়েছে বুঝলেই মাথা গরম হয়ে যায়। শোধ নিতে ভোলেন না।

রুক্ষ গলায় ছুঁড়ে দিলেন,— কে, রোশন আলী?

কোনো জবাব নেই। বার দুই উত্তরোত্তর স্বরগ্রাম উঁচু করতে বরেন বিরক্তিতে বারান্দায় এসে বলে, —না।

ত্রিলোকি দাঁড়িয়েই আছে। তিনতলায় বসে মণিময় ধাক্কা খেলেন। তবে? এ যুগের শিক্ষিতরা এত ক্যালাস্, উঠে এসে বলে যা, তা নয়, পেটে আধখানা, মুখে বাকিটুকু। তবে কি, তিনতলার লিন্টন পর্যন্ত বানিয়েছিল, রামপিরিত! মণিময়ের খেয়াল হয় লোকটা কিছু পেমেন্ট পাবে এখনও। হয়তো খোঁজ নিতে এসেছে।

এবার ঠান্ডা মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, রামপিরিত বুঝি? ও খোকা? দু'মিনিট তিনবার তাগাদা দেয়ায় বরেন বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেলল, —না, না! চেঁচাচ্ছো, উঁকি দিয়ে দেখতে পারো না?

তবে? মণিময় ভাবতে থাকেন। এরও আগে বানানো হয়েছিল দোতলার ছাদ। কে যেন

করেছিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ রহমতুল্লা। আচ্ছা, দোতলার লিন্টন? সারা বাড়িটার হিসেবের চেষ্টা করেন তিনি। মকসেদ আলী...মকসেদ...তাই তো। স্মৃতিতে আসতে চায় না। দোতলার প্ল্যাস্টার? কি জানি। যতই সে নিচে নামার চেষ্টা করে, তালগোল পাকিয়ে যায়। একতলার ছাদ? মুখ, নাম কিছুই মনে আসতে চায় না। এমনি করে একতলার ছাদের নিচে তিনি আজ নামতেই পারলেন না। সব অস্পষ্ট। ভুলে গেছেন। ভিত গড়ার পর্ব তো দূরের কথা। এই মস্ত বাড়িটা গড়ে তুলতে কম কারিগরের আনাগোনা হয়েছিল? চব্বিশটা বছর কি সামান্য কথা!

পুকুরে ফের জল-ছায়ারা স্থির হয়ে গেছে। বাঁশখন্ডের ডগে নিশ্চল তপস্বী বক। ঝিরঝিরে বাতাস। কলাপাতার একান্তে মাথা ওঠা-নামা! রুমির টেপে দিনরাত কি যে ছাইপাশ। ভজনের ক্যাসেটটা চালায় না কেন। একবার সামান্য ঘাড় তুলে নিচের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাইলেন। বুঝতে পারলেন না। ভাঙা অবয়ব নিয়ে কে একজন উটকো লোক যেন দাঁড়িয়ে আছে। ছেলের প্রতি বিরক্তিতে, আপন মনেই, ধ্যাৎ বলে, আবার ইজিচেয়ারে নৌকা হয়ে গেলেন। যার দরকার উঠে আসুক, আমার নামার কি দরকার।

ত্রিলোকি যাদব বিষ্ময়কর প্রত্যাশা নিয়ে চব্বিশ বছরের পুরণো ভিতের দাঁড়িয়ে আছে। মণিবাবু শুধু দুই যুগের ব্যবধানে ধাপে ধাপে চব্বিশ ফুট উঁচুতে এখন কাগজটা মুখে জড়িয়ে উটপাখির মতো নির্জনতায় মুখ গুঁজে রইলেন।

অনুষ্টপ, ১৯৮৫

স্টীলের চঞ্চু

'বাঁচতে গেলে স্নানটা খুব জরুরী? কী যা-তা বকছ? চুপ করে থাক!'

রুনু! আমার পুত্র রুনু! কিছু বললেই আমাকে অপমান করতে চায়। পদে পদে, প্রতি ক্ষেত্রে। তাচ্ছিল্যের অপমানে, মনে হয়, এ সংসারে আমি ভারবাহী পশু মাত্র। আমার অতীত—সব কিছুতেই ওর তীব্র শ্লেষ বৃদ্ধবয়সের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় আমার। আঙুলের ডগা গোপনে কাঁপে, হৃৎপিন্ড ফোঁসে, প্রচন্ড মাথা ধরলে, আমি শুকনো মুখে নিজেকে সরিয়ে ফেলি। মর! নিজেই নিজেকে শেষ কর!—এ আমার অভিশাপ নয়: জ্বালাময় নীরব স্বগতোক্তি। উত্তেজনা ঝিমিয়ে গেলে বুকটা খাঁক। আমার স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ ভাবনা— সব কিছুই তো রুনু। এভাবে ডানা ভেঙে দেবে, কল্পনা করিনি। আমি আঘাত করি না, যতটা সম্ভব মানিয়ে চলি, জানি, সামান্য উত্তেজনা ওর প্রভূত ক্ষতি করবে। হাসি-আহ্লাদ, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা, আমার বাইরের জীবন—সব কিছু বিসর্জন দিয়ে উদয়াস্ত সংসারের আঙিনায় নতজানু। নিজের দেহ কেটে কেটে রক্ত ঢালছি এদের সুখের জন্য। ব্যর্থ স্বামী হিসেবে গঞ্জনা, পিতা হিসেবে অভিযোগ মুছে ফেলার জন্য। কিন্তু মাংসের শরীরে মাঝে মাঝে ভালো মন্দ বলতে ইচ্ছে করে। একরাশ চুল-দাড়ি, বড়ো বড়ো নখের বুকে মাটি, ঘামের চাপা গন্ধ—আড়াই মাস স্নান না করলে কদ্দিন না বলে নীরব থাকা যায়? এই তার উত্তর। রুনু। আমার পুত্র রুনু। উচ্চমাধ্যমিকে স্টার পেয়েছে, আজও মনে আছে, গৌরব ও ভরসার কঠিন মাটিতে বুক বেঁধেছিলাম। জোয়াল টানার দিন শেষ হতে চলল! অবসরের মধ্যে নিশ্চিত ওর চাকরি, এবং ছোট্ট সংসারে আমার হাঁফ ছাড়বার সুযোগ। সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ঘুণে ধরছি।

বেলা দশটায় পাড়াময় ঝাঁঝালো রোদে, বন্ধ জানালার অন্ধকার কুঠুরিতে বিছানায় চিৎ হয়ে থাকতে, ওর মা ডাকে—দশটা বেজে গেলো। আজও অফিস যাবি না?

—দেখি!

—ওঠ?

—উঠি ?

—খেয়ে নে, ওষুধের সময় হলো।

—যাই।

এই 'উঠি-উঠি' 'যাই-যাই'-এর মধ্যে ঘড়ির কাঁটা যখন দশটা ছাড়িয়ে বারোটার ঘর ছুঁই-ছুঁই, রুনু উঠে আধঘন্টা ধরে চোখ-মুখে জল দিয়ে ফিরলে, মাকে জল খাবারের থালা এবং জিঙ্ক-ফয়েল মোড়া ক্যাপসুলটি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যতক্ষণ না তার দীর্ঘলয়ের চর্বণ শেষ হয়।

ওর মা অনুনয় করে—ধর একটু! রান্না পুড়ে গেল!

—দাঁড়াও।

—এতক্ষণ লাগে?

—জানো আমি দ্রুত খেতে পারি না?

—রইল ওষুধ, জলের গ্লাস, কেমন?

—তোমাদের সব কিছুতেই তাড়া হুড়ো।

মর্জি ভালো থাকলে নিজেই ফয়েলটায় চোখ বুলিয়ে ওষুধের গ্রেডিয়েন্টগুলো দেখে, মোটা একটা বই ঘাটে এবং জল দিয়ে গেলে। ওর মা বলেই হয়তো এই ক্ষমাটুকু পেয়ে যায়। জানি আমার কপালে ঐ উদারতা জুটত না। যদি বলতাম—খেতে আধঘন্টা লাগে?

ভাবলেশহীন, চোখজোড়ায়, ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়ে বলত— খাওয়াটা সায়েন্টিফিক ব্যাপার, জানো তা? চিবোবার সময় যে প্যারোটিড গ্রন্থি, সাব ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি, এবং সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি থেকে লালা ঝরে, তার রেট কি বলো তো? তারপর পাকস্থলীতে পরিপাক। তুমি একটা ইডিয়ট!

ও আমাকে যা খুশি বিশেষণে ব্যঙ্গ করে। এক-একদিন আত্মক্ষোভে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সহকর্মীদের ঘনিষ্ঠ দু'একজনের কাছে বলতে বলতে হাউ-হাউ কেঁদে ফেলি। অঝোরে। তারপর বুকটা কিছু সময়ের জন্য হালকা হয়। ও বলতে চায়, আমার সমস্ত অতীত ভুল, সামাজিক ভাবনা, অশুভ, অচল; সংসারে আমি মূল্যহীন ঘষা পয়সা। অথচ রুনুর চেহারা এবং মার্জিত কথাবার্তায় বাইরের মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে না। ভাবে, বয়সের ভারে আমি ছুচিবাইগ্রস্ত। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছেলের উপর চাপাতে চাই বলেই সংঘাত। বছর তিরিশের রুনু দেখতে টকটকে ফর্সা, একগাল নরম কালো দাড়ি, আয়ত চোখ—প্রথম দর্শনে মাঠের কোনো তরুণ মহারাজ বলে মনে হয়। কথা বলে ধীর কণ্ঠে, স্মিত হাসিতে। প্রতিটি বিষয়ে ওর যুক্তি খুব সংহত। কাউকে আঘাত করে না। পৃথিবীর পুঞ্জিভূত ক্ষোভ শুধু আমার উপর— কি করে বিশ্বাস করাই তাদের ? এমনকি ওর ডাক্তার মিঃ গাঙ্গুলি একদিন আমায় বললেন— আপনি বেশি কিছু বলবেন না ওকে।

—কিছুই বলি না ডাক্তারবাবু।

—ওষুধ খেতে, অ্যাডভাইসের রেকর্ড শোনাতে কখনও পেছনে লাগবে না। খুশি মতো চলুক। আপনি কিছু বললে আপসেট্ হয়, ওর পক্ষে খারাপ।

—সহ্যের তো সীমা আছে ডাক্তারবাবু! ঘুমোবার আগে আপনার অ্যাডভাইসের রেকর্ড শোনা কর্তব্য। —রাত ১২টা-১টা পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে খামখেয়ালিতে যা খুশি করবে? বাবা হয়ে

কিভাবে মুখ বুজে থাকি?

—কিন্তু আপনি যা বলেন, ওর সঙ্গে কথা বললে তো মনে হয় না?

—ইচ্ছে করে কেউ ছেলেকে পাগল বানায়? দুঃখের কথা, ছ'মাস অফিস যায় না। চাকরি থাকবে?

—তা'লে কি ও আমায় ডিসিভ করছে। অদ্ভুত।

আমি গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ও আমাকেও ডিসিভ করেছে। প্রতিমাসে ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে একবার সিটিং, ওষুধ, রাতে ঘুমোবার আগে ক্যাসেট বাজিয়ে অ্যাডভাইস শোনানো— পাঁচশ টাকা ওর পেছনে চিকিৎসা খাতে ব্যয়। কিছুদিন পরই নির্দিষ্ট থোক টাকা এবং পেনসনের উপর আমার সংসার চলবে। ঘাটতির পরিমাণ যত ভেজা কম্বল ভারি হয়, আমি হা-হুতাশে ক্রমশ ভাঙতে থাকি। অথচ এই খড়্গাঘাত আমার ভাগ্যে লেখা ছিল না। বি. এস. সি. পাস করে, রুনু নিজের সামর্থেই যখন রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে, অ্যাকাউন্ট ক্লার্কের চাকরিটি হাতে পায়, ভেবেছিলাম আমার দীর্ঘ ঘানি টানার দিন অস্তমান। জয়েন করার পর, এক রাতে আমি, রুনু, স্ত্রী-পুতুল এবং কন্যা-রঞ্জনা ভবিষ্যৎ সুখ পরিকল্পনায় বসেছিলাম।

—তুই আমার হাতে দেড় হাজার দিবি। বাকি দায়িত্ব আমার। পারবি না?

—দেখি।

—জমিয়ে আমি দোতলার ঘরটা করব। ভবিষ্যতে স্পেস দরকার হবে।

—রঞ্জনার দায়িত্ব?

—আমার।

রঞ্জনা চিররুগ্না— কিছুটা জড়ভরত গোছের। অপূর্ব সুন্দরী। ঠকিয়ে হয়তো বিয়ের বাজারে চালিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু ওর প্রাণের সংশয় হতো। ভাবলে গভীর মমতায় বুক তোলপাড় হয়। বিয়ে না-ই দিলাম। অবসরের থোক টাকাটাই ফিক্সড করব ওর নামে। একটা পেট চলে যাবে। পুতুল কোনো উচ্ছ্বাস দেখায়নি সেদিন। চিরকাল আমার প্রতি ওর নীরব উপেক্ষা। ভাগ্যের মতো আমি তা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলের মধ্যে সেই তাচ্ছিল্যের বীজ পুঁতে দিয়ে, আমার এমন প্রতিশোধ নেবে, আশা করিনি। আজ রুনু বলে মূর্খ, ইডিয়ট। অথচ, ওদের সামান্য সুখের জন্য, কী আমি করিনি! আজ রুনু শ্লেষের হাসিতে বলে— রঞ্জনার দায়িত্ব আমার ওপর ঘাড়ে চাপিয়েছ কেন? উত্তেজনায় বলি—আমার টাকায় ও বেঁচে থাকবে। তোর দায়িত্ব কিসের?

—টাকাটাই সব? বুদ্ধি আর হলো না!

জানি, উত্তেজনায় রুনুর ক্ষতি হয়। কিন্তু আমার তো রক্ত-মাংসের শরীর!

চার মাস আগে জানতে পারি ও অফিস যায় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিনটা কাটায় কিভাবে, আজও রহস্যময়। কেবল আড়াই মাস স্নানবিহীন, চুল-দাড়ি নিয়ে সেই অভিনয়টুকু বন্ধ করেছে। অথচ তিন মাস আগেও আমার হাতে হাজার টাকা তুলে দিয়েছিল বেতন হিসেবে।

—কোত্থেকে দিয়েছিলি?

—বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে।

—কেন ?

—কেন আমার কী ? অফিসের আইন-কানুন তুমি কি বোঝ ?

ওর চেহারা চাউনিতে ডিপ্রেশনের লক্ষণ ধরতে পেরে, ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করি।

অমন যুক্তিনিষ্ঠ, স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে ডাঃ গাঙ্গুলির ধন্দে পড়েছিলেন প্রকৃত রুগী কে? আমি, না রুনু। আজও সমস্যার পুরো সমাধান হয়নি ওনার কাছে। প্রতিমাসে সিটিং-এর পর, আমাকে ডেকে তাই অনেক উপদেশ দেন। বার্ধক্যজনিত খিটখিট মেজাজ আমার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে! জেনারেশন গ্যাপটা বোঝা দরকার আমার। এই আড়াই মাস, প্রতিদিন সকালে আশায় বুক বাঁধতাম, আজ বোধহয় রুনু অফিস যাবে। যদি কোনোদিন সকাল আটটায় উঠত, পতুলকে ফিসফিস করে বলতাম— মাছ কুটে, ভেজে ঝোল করে দিচ্ছি। তুমি ভাতটা করতে পারবে না ?

—কেন ?

আজ বোধহয় রুনু অফিস যাবে।

হুঃ! পুতুলের অবিশ্বাসটুকুই দেখতাম, বাস্তবে টিকে যেত। একঘন্টা ধরে বাথরুম, ছাদের উপর অলস দাঁড়িয়ে থাকা, আপন চিন্তায় দাড়ি পাকিয়ে গুলটি বানানোর মধ্যে রাস্তায় বাজার ভেঙে যেত, এগারোটার জল আসত ট্যাপ কলে, ভিড় শুরু হত স্নানের। ভঙ্গ আশার আঘাতে আমার চোখের রেখা গোপনে ভিজে উঠত। সব কিছুই মেনে নিই, কিন্তু, ওর বিদ্রূপমাখা উপদেশ আমাকে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ-বিচলিত করে।

—আমি তো কিছুই করিনি কারও জন্য, মুর্খ, পাঁঠা! তুই বুদ্ধিমান হয়ে সুস্থ বেঁচে থাক— তাহলেই শান্তি পাবো। এঁচোড়ে পাকলে তোর মতো দশা হয়।

—লজিক দেখালেই এঁচোড়ে পাকা ? পাতিবুর্জোয়া ধারণায় এর বেশি কি হবে।

আমি হোঁচোট খেলাম 'পাতিবুর্জোয়া' শুনে। রুনুর বর্ণমালায় তো এ শব্দটি থাকার কথা নয়। চিরকাল 'গুড বয়' হিসেবেই স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল এবং পিতার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কেন্দ্রস্থান হিসেবে জীবনযাপন করেছে। এমনকি কলেজে কমনরুমেও আড্ডা দেয়নি। বরাবরের অর্ন্তমুখীন; বন্ধু খুব কম। পুতুল, রঞ্জনা—এই ছিল তার খোলামেলা ভাবনা-চিন্তার জগৎ। বাড়ির সামনে একটু বাগান করার হবি ছিল আর বই। মামাবাড়ির প্রতি টান, বরাবরের। মাসখানেক হলেই বলত— যাই, দাদু-দিদিমাকে অনেকদিন দেখি না! বিবাহিত মাসীদের কাছেও ছিল অবারিত দ্বার! ও শব্দটা আমার, আমার অতীতের; সংস্কার যদি মানি, বর্তমানেও মনের গভীর স্তরে চাপা শব্দটা ক্বচিৎ-কখনো চেতনার স্তরে ভেসে ওঠে। একটু পিছিয়ে আসা যাক।

আমার বয়স এখন চৌষট্টি। ৪২-এ ম্যাট্রিক পাস করে সংসারে অর্থ উপায়ের জন্য পড়াশুনো আপাত বন্ধ করে নানা জীবিকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। সেচ ইঞ্জিনিয়ারের সহকারি থেকে শুরু করে ট্রামের কন্ডাকটরি—সব কিছু। কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম অধিক বয়সে। গ্রামের ছেলে, কলকাতাকে তখন বিচিত্র এক সমুদ্র মনে হত। প্রতিদিন মিছিল, মিটিং, স্ট্রাইক আর সদ্য স্বাধীনতার ও দেশবিভাগের

ভাঙচুর। রোমাঞ্চিত হয়েই আজও মনে আছে, কাগজের মাথায় বড়ো হরফে পড়েছিলাম 'দক্ষিণ কলকাতা মুক্ত' মুক্তির বাস্তব রূপ-কাঠামো চিনতাম না, আবেগের বিপুল বাতাসে উড়ে, কলেজ সাঙ্গ করেই, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম দেশের কাজে। কমরেড। সারা পাঁচের দশক মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, কত সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশ্বাস করতাম, মানুষের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। সেবা, দায়বদ্ধতা, রাজনীতি — যে বিশেষণই দেয়া হোক না কেন। আজও এলাকার ইতিহাসে আমার ক্ষুদ্র পরিচয় সেই দিনগুলোর জন্য। আজও পুরণো দিনের আলোচনা নিন্দা বা নন্দন — যে ভাবেই চিহ্নিত হই না কেন, আমাকে উপেক্ষা করে অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হয় না। উন্মাদনার প্রাথমিক বেগ কিছুটা স্তিমিত হবার পর, নিজের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম — বয়স হয়েছে, চাকরি ও সংসার দু'টোই প্রয়োজন মানুষের জীবনে। তখন ঐ পরিচয় মেখে সরকারি চাকুরি মেলা ভার, তাই সুদূর গ্রামাঞ্চলে পাড়ি দিলাম স্কুল মাস্টারি নিয়ে। কিছুদিন পর বিয়ে— একটু বেশি বয়সে।

আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন সচ্ছল এবং প্রতিষ্ঠিত। ছ-ছ'টি মেয়ে। প্রতিটি মেয়েরই রূপ ও সাচ্ছল্যের ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা ছিল। পুতুল বড়। বিয়ে কি কারণে ঘটেছিল, বলতে পারব না। আমার কাছে এসে পুতুলের কল্পনার রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছল। যেন তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে! ভাগ্যের গাফিলতির প্রধান লক্ষ্য আমি হয়ে গেলাম। মুখ ফুটে বলেনি কোনোদিন। তাহলে তো বোঝা লঘু হয়ে যায়। মনের গহণে নীরব অসন্তোষের মেঘ জমে ছিল। বর্ষণ হয়নি— শুধু জমে বরফ। তারপর, চার-চারটি বোনের বিয়ের পর, তুলনামূলক দৃষ্টান্ত পেয়ে, নীরবতা ভেঙেছে। আমার ভাগ্যে জুটেছে অভিযুক্ত হওয়া, আর অযোগ্যতার ভূষণ। আমি সবকিছু মানিয়ে নিতে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে, সংসারের ঘানিতে জুড়ে দিয়েছি। যদি ক্ষোভ পুষিয়ে দেয়া যায়! ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। মুছে গেছে পুতুলের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা। সময়ের স্পর্শ বড় কথা। কিন্তু রুনুর মধ্যে পুরণো আক্ষেপ সঞ্চারিত করে, তাকে যে এমন উগ্র অস্ত্র বানাবে আমার বিরুদ্ধে বুঝিনি। পুতুলও বোধহয় এটা চায়নি। ফলে, রুনু যখন অপমান করে, তখন ও মাঝে এসে দাঁড়ায়; কিন্তু রুনু আজ পুতুলের কথায় নিছক নিয়ন্ত্রিত হবে কেন? দীর্ঘ বয়সের শেষে, আজ কিছুটা আমি ভগ্নস্তূপ। দেশ ও অঞ্চলের ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। আমার পুরণো দিনগুলো প্রায় হারিয়ে গেছে নব প্রজন্মের কাছে। তবু সেইসব দিনের কিছু ভালোবাসার মানুষ, বন্ধু এখনও আমাকে স্মরণ করে। মাঝে মাঝেআলোচনা করি, আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না? ওসব নিছকই আলোচনা। তবে রাস্তাঘাটে ক্লান্ত অবসরে ওদের স্পর্শ ভালো লাগে। রুনুর তাই ক্ষোভ। যারা আমার প্রশংসা করে রুনু মনে করে তারাও অযোগ্য, নির্বোধ। জীবনে কিছুই করিনি। অতীত শুধু ভুল আমাদের। অথচ রুনুর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য যেটুকু সম্পত্তি—তিনকাঠা জমিসহ ভগ্নস্থ বাড়ি, এমনকি তিরিশ বছর পর্যন্ত ওর ওষুধ, পোশাক, জুতো, ফলমূল, ভালোমন্দ আহার, বিন্দু বিন্দু রক্তের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছি। তবুও মাঝে মাঝে বলে— কি করেছো আমার জন্য?

শরীরে ময়লা জমলে অসুখ সারবে না। ভালো করে চান কর, দশটা মানুষের সঙ্গে মেশ, মনটাও ফর্তিতে থাকবে।

ভূপতি বাড়ুজ্যে! আমার বাপ ভূপতি! বস্তাপচা বুলি শুনলেই ঘিলু জ্বলে যায়। মুর্খের মতো জ্ঞান। সমাজ না পাল্টালে অসুখ সারে? মেশার মানুষ কোথায়? এরা সব অন্ধ, বধির! অতীত সম্পূর্ণ উপড়ে সব কিছু বদলে না দিলে শরীরের ময়লা যায় না। ঐ তো মরা গাছটার শুকনো, কঙ্কাল শাখায় কাকটা বসে আছে, কত দিন ধরে, মানুষগুলোর নজর পড়ে? আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। কী ভয়ঙ্কর বিপদ যে শিয়রে দাঁড়িয়ে, বোঝায় কার বাপের সাধ্যি। বলতে গেলেই আমার অসুখের প্রশ্ন তোলে। এতবড় বিশাল কাক সহসা চোখে পড়ে না। ঝিম কালো। সন্ধানী চোখজোড়া সম্পূর্ণ বর্তুল। তীক্ষ্ন স্টিলের চঞ্চু। ঝকঝকে। রোদের ঝিলিকে চোখ অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি স্পষ্ট জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। চতুর্দিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। কঠিন চঞ্চুতে পেট, নাড়ি-ভুঁড়ি চিরে, খুবলে শেষ করে দেবে। একটু আগেই বোধহয় ইঁদুর ধরেছিল, তাজা রক্তের দাগ। এখন খুঁজছে শিশুদের যকৃৎ। ঘরে-ঘরে বাপ-মায়েরা কত নিশ্চিন্তে আছে; জানে না কী ভীষণ বিপদ ওৎ পেতে দরজার সামনে। এ সমাজে কিসের নিরাপত্তা? আর আমার বাপ ভূপতি ইঁদুরের মতো কেবল নিরাপত্তা খুঁজছে। মুখ তুলে কাকটাকে দেখতেও পায় না। অতবড় পাখিটা চোখ এড়ায় কি করে? আমি সব বুঝি, সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাঃ গাঙ্গুলির অ্যাডভাইজের রেকর্ড আমার জানা, ওষুধের গ্রেডিয়েন্টে কী গেলানো হচ্ছে বুঝতে পারি, অফিসের আইনকানুন আমার মুখস্থ, আমি ভূপতিকে চিনি, ওর বন্ধু-বান্ধব, ইতিহাস—সব কিছু। ওরা শুধু ছেঁড়া কাঁথায় তালি লাগাবার কথা বলে। সমাজের ওষুধের মূল খোঁজে না। সমাজ পুরো পাল্টে না গেলে কোনো কিছুর সমাধান হবে না। মাঝপথে কিছু নেই। ঐ কাক এবং স্টীলের ঝকঝকে চঞ্চুই তার প্রমাণ। অথচ মানুষগুলো অন্ধ।

বাঃ এক ঘুমেই বিকেল! রোদ ঝিমিয়ে বেশ ঠান্ডা বাতাস বইছে। একটু বেরোনো দরকার। তিনদিন চক্রে যাওয়া হচ্ছে না। কোনো গোপন নির্দেশ, হয়তো অপেক্ষা করে আছে। আমি হাঁটি পথ ধরে। ট্রেনে পরের স্টেশনে নেমে, কিছুটা দূরে আমাদের গোপন চক্র। আমি রাস্তায় প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করি— আমরা যে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে, ওদের জন্যই কাজ করছি, ওদের সপক্ষে ভাবছি—চাপা থাকা দরকার। নইলে নেতা বনবার লোভ জন্মায়; ভূপতির মতো পাতিবুর্জোয়া-সুলভ ফসিলে পরিণত হতে হয়। চারদিকে নেতার গ্ল্যামারে জনগণের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পলিটব্যুরোর প্রেসিডেন্ট ঠিক কথাই বলেন। দেশের পুরো অতীতটা পচা—নির্মম সার্জারি চালালে নতুন রক্ত সঞ্চালিত হবে না।

টালি আর দরমা বেড়ার ঘরে ঢুকতেই, প্রেসিডেন্ট 'আসুন' বলে বিনা আওয়াজে হাসলেন।

—আজও অফিস যান নি তো?

—না।

—সাবাস! তিনদিন আসেননি, ভাবলাম বাপের সুপুত্র হয়ে ফাইল ঘষছেন।

প্রেসিডেন্ট এবং আমরা চার সদস্য—এই নিয়ে আমাদের পলিটব্যুরো। পাঁচজনই আজ উপস্থিত।

আমি বললাম—তা নয়, নতুন কোর্সটা দিয়েছে ডাঃ গাঙ্গুলি খেলেই বড্ড ঘুম পায়।

—এ সমাজে দিনরাত ঘুম পেতেই পারে। অন্য এক সদস্য বলল।

—তা ঠিক। প্রেসিডেন্ট বলেন। ঘুম মানুষের সংস্কার; আর বুর্জোয়া সমাজ সবকিছু সংস্কার ধরে রাখতে চায়। বুঝলেন রুনু, আমি তাই বলি অফিস করা মানে, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখা। আমরা কেন নিজেদের যুক্ত রাখব সেখানে?

—নিশ্চয়। আমি সায় দিলাম।

চক্রের দু নম্বর সদস্যটি সগর্বে বলল—আমি তো সুযোগ পেলেই ডুব দিই।

—ইয়েস। ভেতর থেকে ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করো।

আমি কিছু পর প্রসঙ্গান্তরে কাক ও স্টীলের চঞ্চুর কথা বলতে প্রেসিডেন্ট বললেন—খুবই যুক্তিপূর্ণ! সমাজটা পচে গেছে বলেই তো কাকের আবির্ভাব। মানুষ কি করে দেখবে! ওরা তো মরা আগলাতে ভালোবাসে।

আমাদের কথাবার্তা, হাসি অত্যন্ত গোপনে। অনেকটা তন্ত্রসাধনার মতো। প্রেসিডেন্ট নতুন প্রস্তাব দিলেন। আমাকে উদাহরণ টেনে বললেন,

—ভালো কাজ, জনগণের কাজ, সর্বদা ক্যামোফ্রেজে করতে হয়। রুনু অসুস্থ, বুর্জোয়া ডাক্তারের-ওষুধ খাচ্ছে—এটা যেমন ছদ্মবেশ, কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজেকে অংশীদার না করা। এই চক্রও সে রকম দাতব্য হোমিওপ্যাথি খুলতে চায়। জনগণের জন্য ফ্রি চিকিৎসা। উপরে ওষুধ-পত্র থাকবে আর মাটির নীচে রাখব অস্ত্র। কেমন আইডিয়া?

আমরা রোমাঞ্চে সমস্বরে সমর্থন জানাতেই, প্রেসিডেন্ট ঠোঁটে আঙুল তুলে গোপনীয়তার নির্দেশ দেন।

—এমন আইডিয়ার পর চা দরকার! আমি বললাম।

প্রেসিডেন্ট সোজা, সপাটে জবাব দিলেন—চা দুধ চিনির পয়সা কে দেবে?

আমাদের চক্রের মহিলা সদস্যাটি, তড়াক করে উঠে 'আমি আনছি' বলে চলে গেল। প্রেসিডেন্ট আস্তে-আস্তে চাপদাড়ি আদর করতে থাকেন।

—পুরণো মানুষগুলো শুধু হাত শুঁকতে চায়। কবে ঘি খেয়েছি।

—আমার বাপ একজন! বললাম আমি।

সেবা, হেল্প, মানে পচা সমাজকে টিকিয়ে রাখা। আমাদের সায়েনটিফিক হওয়া দরকার।

—সম্পর্কগুলোও সংস্কারে বাঁধা। ওখানে নাড়া দেয়া উচিত। বাপ, ছেলে, মা মেয়ে—এগুলো ফিউডাল ধারণা।

—চ্যারিটেবল্ ডিসপেনসারির ব্যাপারে আমরা কি মানুষের সঙ্গে কথা বলব?

—না, না এখন নয়। তা'লেই জানাজানি হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে দোকান থেকে ফিরে এল মেয়েটি। প্রেসিডেন্টের স্ত্রী রূঢ়কণ্ঠে বলে—কেরোসিন তেল কোথায়?

প্রেসিডেন্ট হেসে বলেন—কুছ্ পরোয়া নেই।

মেঝেতে কাগজের স্তূপ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালানো হলো। জল গরম হয়। আমার শ্রদ্ধা নিবিড় হলো প্রেসিডেন্টের ওপর। বললাম— বৈপ্লবিক অনেক ব্যবস্থা আছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। কি বলেন?

—নিশ্চয়। বিশেষ সিসটেমে বেঁধে দেয়া বুর্জোয়া কৌশল। ওটা ভাঙতে হবে।

আমি তখন বাপের কথা চিন্তা করি। এই সমাজে কেবল নিরাপত্তা খুঁজছে।

আমূল পাল্টে না ফেললে কিছুই হবে না।

প্রেসিডেন্টের বউ ফের উপস্থিত। ঝামটা মেরে বলে—রাতে কি হবে? ঘরে কিছু নেই।— নো চিন্তা। সুতপা আলু, রুনু চাল, আর বিমল ডাল—কিনে দিয়ে যান। এই সমাজে পকেট শূন্য থাকাই স্বাভাবিক। নইলেই বুর্জোয়া ভাইরাস ঢোকে। সুতপা হেসে বলে—বাবার একশ' টাকা ঝেড়ে এনেছি।

—বাপের টাকা মানে? বাপ-মেয়ে-ফিউডাল সম্পর্কটা পাল্টাও। জনগণের হাতে ক্ষমতা এলে নতুন সমাজে এ সম্পর্ক থাকবে না। একটু আগেই বলছিলাম।

এরপর ঠিক হলো, চক্রের পরবর্তী গোপন বৈঠক, পচা অতীত পাল্টে, সমাজ আমূল বদলালে, সম্পর্ক কি হবে, এই নিয়ে আলোচনা। বাইরের রাস্তায় ক্রমাগত কোলাহল জাগতে থাকলে আমরা ঠিক করলাম, একে একে নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করা দরকার। কেউ যেন টের না পায় মস্তিষ্কে এই ধরণের বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে হাঁটা-চলা করছি আমরা। জনগণ নিজের ভালো বুঝতে পারে না, যে কোনো উপায়ে ক্ষতি করে দিতে পারে।

রাত বারোটা পর্যন্ত আমি পড়াশুনো করি। তখনই ফিউডাল সম্পর্কের কথা ট্যাক ট্যাক করে ডাঃ গাঙ্গুলির উপদেশের রেকর্ড শোনাবার জন্য। ভিক্ষুকের মতো ওর কল্যাণ প্রত্যাশা আমার জন্য, মাথায় কর্কশ আঘাত করে। দরজা খুলে বলি—তুমি যাবে?

—তুই ঘুমিয়ে পড়লেই যাবো!

—গার্ডিনাল খাইয়ে ঘুম পাড়াতে চাও? জানো, ঘুম কিছু কনডিশনের ওপর নির্ভর করে? সমাজ না বদলালে কেউ সুস্থভাবে ঘুমোতে পারবে না?

—তুই সুস্থ হ' রুনু, সমাজের কথা ভাববি। আমি আর বোঝা টানতে পারছি না। মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে পাগল সাব্যস্ত করলে, চাকরিটি নট্। নতুন চাকরি জুটবে না।

—আমার জন্য বোঝা টানছ? তুমি একটা ইডিয়ট, লায়ার! পচা সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য দিন-রাত খেটে মরছ।

—এটা আদর্শ সমাজ না, আমিও জানি। তোর কাছ থেকে শিখতে হবে তা? কি করবি তার? ঘরে বসে একাই পাল্টে ফেলবি?

—সার্জারি করব। তোমাদের মতো পচা রক্ত বাদ দেবো। তোমরা হলে জনগণের প্রকৃত শত্রু।

—শত্রুর পয়সায় খেয়ে পরে আছিস! মুখ সামলে রাখ। ইতরের পরিচয় দিস না। তোর মাথাটা কে খেয়েছে খবর পাইনি ভেবেছিস?

আমি ইতর? প্রতিক্রিয়া ধ্বংস হোক। প্রেসিডেন্টের অপমান? হাতের কাছে টেবিল থেকে তুলে উষ্ণ একগ্লাস জল, ভূপতির থোবড়ে ছুঁড়ে দিলাম ফ্যাচ্ করে। নির্বোধের মতো বজ্রপাত দাঁড়িয়ে, ডুকরে কাঁদতে শুরু করল। আর তখনই জানালা গলিয়ে ক্যাসেট, ওষুধ, জামাপ্যান্ট ছুঁড়ে দিলাম। রঞ্জনা পাশে না দাঁড়ালে কি হতো জানি না। আমি ওর সহজ শান্ত মুখটিকে ভয় পাই। সারারাত ছাদে রইলাম। বুঝলাম বাপ যাকে অপমান করল, আমরার প্রেসিডেন্ট কতটা সাইন্টিফিক চিন্তায় মানুষ। একবারেই আমি কত পরিবর্তন দেখলাম চারদিকে। ঝড়। বৃষ্টি। তুষারপাত। কখনও রুক্ষ রোদ। ধু ধু বালি। কিন্তু আশ্চর্য, গাছের কঙ্কাল-ডালে ষ্টীলের চঞ্চু নিয়ে কাকটি বসেই আছে। আলোর ঝিলিক মারে। রক্তপিপাসু দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে ডানায় ঘষে চঞ্চুটি তীক্ষ্ণতর করছে। অথচ কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ক্যাসেট, ওষুধ ছুঁড়ে ফেলা ভুল হলো বোধহয়। ওগুলো টেবিল সাজিয়ে রাখা দরকার। আমার নিজের কাছেই। ওগুলোর নিচে, কিছু অস্ত্র লুকিয়ে রাখব। অশুভ কাকটাকে তাড়াবো এবং ঘুম ভেঙ্গে একদিন মানুষ বিস্ময়ে দেখবে সমাজটা পুরো বদলে গেছে।

সাতদিন ধরে ভূপতি, সেই রাতের ঘটনায়, ভগ্ন মানসিকতায় আছে। হার্টের চারপাশে চিনচিনে ব্যথা, একনাগাড়ে কথা বললে অক্সিজেনের অভাব। ঘটে। ডাক্তার বলেছে হার্টের ইস্কিমিয়া। তেমন বিপদ কিছু নয়। সামান্য চিকিৎসা ও বিশ্রামের দরকার। খবরটা প্রচারিত হলে ভূপতির পুরণো বন্ধুরা দেখা করতে আসে। শুধু বন্ধুরাই নয়, আসে অনেক সাধারণ মানুষ—যাদের সঙ্গে ভূপতির কোনো কারণে পরিচয় হয়েছিল অতীতে।

রুনু বাড়ির কর্তা। অসুস্থ মানুষটার প্রতি কর্তব্য আছে। প্রথমেই সে বারান্দার গ্রিলে মস্ত তালা ঝুলিয়ে, বারান্দায় পায়চারি করে এবং পরিকল্পনা করে হার্টের ব্যাপারে এলাকার কোন কোন ডাক্তারের সুনাম। কার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বন্ধুত্বপূর্ণ। মনে মনে ছক বানিয়ে একে একে নাকচ করতে থাকে। উঠোনে কাউকে দেখলেই বলে— এখন তো দেখা হবে না। কি করবেন দেখে? চলে যান।

—একটু দেখেই চলে যাবো, রুনু।

—দেখবার কিছু নেই। আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।

কাউকে রুনু রূঢ়ভাষায় তাড়িয়ে দেয়। এবং এ নিয়ে ভূপতির পাড়ায় মুখরোচক আলোচনা। একদিন তো রুনু স্বাধীনতা সংগ্রামী, একাকালের এম.এল.এ., ভূপতির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তেড়ে এলো। উনি হাসতে হাসতে রুনুর পিঠে হাত বুলিয়ে, এক ঝলক দেখে গেলেন। তারপর, নিজের উদ্যোগে হাসপাতালে বিশেষ বেডের ব্যবস্থা করে, এক সকালে অ্যামবুলেন্স পাঠিয়ে দিলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে বলে। অবাধে ঢুকতে পেরেছিলেন শুধু রুনুর পলিটব্যুরোর প্রেসিডেন্ট। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুড়ুৎ করে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভূপতি চেনে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুনেছিল ছেলের সঙ্গে।

কিছু না। হার্টের সামান্য গোলমাল।

—এ সমাজে হার্টের গোলমাল স্বাভাবিক। নরম্যাল থাকলেই ভাবতে হতো। রঞ্জনাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে, বেশ কিছু সময় ফিসফিস করেছিল রুনু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

অ্যামবুলেন্সে ভূপতিকে নেয়া যায়নি। রুনু ফিরিয়ে দিয়েছে। এই সমাজে, পরিচয়ের সুবাদে, বাবার ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা জুটেছে, সাধারণ মানুষ হলে পেতো? তাছাড়া অতীতের পচা-গলা মানুষদের সাহায্য নেওয়াও দুর্বলতা, উঠোনে দাঁড়িয়ে, ভূপতির এক পুরণো বন্ধু, অ্যাম্বুলেন্স ফিরিয়ে দেয়ায় ক্ষুব্ধ হতেই, রুনু কাছে এসে বলে—বিমলকাকু, আমি প্রথমে দেখব ঐ হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, সমস্ত ব্যবস্থাটা কতটুকু সায়েন্টিফিক, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো। আজ অ্যাম্বুলেন্স ফিরে যাবে।

ভূপতি বিছানায় শুয়ে, বিতর্কের কথাগুলো শুনতে শুনতে ভাবে, ঘরে অশান্তি তৈরি করে কি লাভ! রুনুর সিদ্ধান্তই সঠিক বলে জানিয়ে দেয় পুতুলকে এবং বোঝাতে বলে বন্ধুদের।

এইসব কথাবার্তা, টেনশনে রুনু অসুস্থ বোধ করে। শরীরে বল পায় না। সামান্য নিরিবিলি দরকার। গ্রিল টেনে, মস্ত তালাটা লাগিয়ে দেয় বারান্দায়। তারপর ছাদে উঠে তখন একাকী। হঠাৎ নজরে পড়ে উর্দ্ধবাহু শুকনো গাছের কঙ্কালটায় ঝিম কালো কাকটি। অনড়। স্টীলের চঞ্চুটি ঝিকঝিক করছে। অথচ এতগুলো মানুষ, ঐ দৃশ্যটা না দেখে, ছুটে এসেছে এখানে। এইসব নির্বোধদের মুখে ঠুকে দেয়া দরকার!

নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, একাই সে চোখ, চঞ্চু ও পালক ছিঁড়ে অশুভ পাখিটাকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আকাশ বেয়ে উড়তে শুরু করে। পকেটে অস্ত্র আছে তার।

ছাদের মাথা থেকে টাল খেয়ে, জঙ্গল, ঘাসজমিতে, ধপাস করে কিছু পড়তেই তীব্র আর্তনাদ। পুতুল ছেটে বাইরে।

শুধু ভূপতি টের পায় হার্টে ক্রমাগত অসহ্য যন্ত্রণা।

অনুষ্টুপ ১৯৯২

শহরে বৃষ্টি হয়

ভীষণ মুডে আছেন বলে ড. এম. চাকি ঠিক করলেন আজ আর রাজপথে উঠে বাঁয়ে ঘুরবেন না। কিচ্ছুতেই না। তাঁর পাকা সিদ্ধান্তটুকু ফুটে উঠল প্রতি ধাপে স্টেপ্ ফেলার সলিড শব্দে। দোতালার সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। ধাপগুলো কাঠের; পুরণো এবং লম্বাড়ে। পায়রার গু এবং ধুলোয় মলিন সরু রেলিং। আঙুল ছোঁয়াতে গা ঘিন ঘিন করে। এম.চাকি যখন নামছিলেন, দুপুরের বৃষ্টির পর শেষ বিকেলে সামান্য আলো জড়িয়ে আকাশে শান্ত রঙ ফুটে উঠেছে। চাকিমশাই-এর ঘরখানা, বারান্দা, দেয়াল এমন কি দরজার কোণায় বহু পুরনো কাঠের ফলক—ড.এম.চাকি—প্রত্নতাত্ত্বিক নির্জনে পড়ে রইল।

এজমালি উঠোন পেরিয়ে, টিপেটিপে, সদর দরজাটা খুললেন। যেমন ভঙ্গিতে খোলেন তিনি; প্রতিদিন শেষ বিকেলে গুহা থেকে নেমে বেরিয়ে পড়তে চান যেমন; এবং আরও দু-চারটে 'যেমন' আছে প্রতিদিনকার অভ্যাসগত। দারুণ মুডে থাকায় সেগুলো প্রকট নয় আজ। বড় রাস্তায় উঠেই ডান দিকে—তারপর সোজা কিংবা ডানে-বাঁয়ে শহরটা ক্রমাগত ফুরোতে থাকবে—অনেকদিন পর পা রাখলে অঞ্চল ঘরবাড়ি, ছোটখাট দোকানপাট, মানুষজনকে নতুন মনে হয়—একটা কিছু অর্থ খোঁজা যায়—এই রকম কিছু অনুভূতি এখন এম. চাকিকে জড়িয়ে ধরেছে। তাঁর হাঁটার ছন্দে গড় মানুষের প্রতিমুহূর্তের যাবতীয় দরকারের ছাপ নেই। কখনই থাকে না। তাই পথে নামলেই অনেকেই এম. চাকিকে মতলববাজ মনে করে। তাস, ধর্ম, রাজনীতি বা টাকা জমানো থেকে শুরু করে সস্তা খোঁজার নেশা—কোথাও মানুষটাকে পাওয়া যায় না বলেই দশটা মানুষের চোখে সন্দেহ বা বিদ্রূপের ছায়া।

সাড়ে সাত মিনিট হাঁটার পর একি! প্রতিদিনের একঘেয়ে রাস্তা? ভেবে নিয়তির ব্যর্থতায় চাকি মশাই রুখে দাঁড়ালেন। কোথায় আজ ডান দিকে ঘুরবেন, না সেই বাঁয়ে নির্দিষ্ট স্টেশনের পথ? দুপুরের হঠাৎ পাওয়া মুডটি সামান্য টোল খেল।

এই দিকভ্রমের কারণ, উনি বড় রাস্তায় উঠে থমকে, ডান দিকে কতদূর, কোন কোন শাখা পথ ধরে ঘন্টা তিন-চার ঘুরপাক খেয়ে ফিরে আসবেন—মনে মনে ছক কাটছিলেন। কিন্তু 'কোন মতলবে চাকিমশাই দাঁড়িয়ে আছেন?' 'শুধু শুধু ধোপদুরস্ত পোশাকে কেউ শহরে ঘোরে?' 'রোজ

রোজ দেখার কী আছে এখানে?' —পরিচিতদের সন্দেহ ও জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতে তিনি ঠিক করেছিলেন, বাঁয়ে কিছুটা হাঁটি-হাঁটি পা-পা সেরে, নকশাটা চূড়ান্ত হলেই ডানে। ব্যাপারটা টের পেতেই, চাকি মশাই গোত্তা মেরে পুবের পথে ঢুকে পড়লেন। প্রতিদিনের মতো এক বুক কান্না নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে না। গোঁয়ারের মতো খানিকটা পা চালিয়ে নিজেকে টপকাবার উল্লাসে হাঁপাতে থাকলেন। দাঁড়ালেন। বুক ভরে প্রশ্বাস নিলেন এবং আচমকা টের পেলেন পুরণো, স্মৃতিময় একটি সেলুনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। একসময়ে ড. চাকি নিয়মিত খদ্দের ছিলেন এখানে। এ-দিকটার শহর তেমন আগ্রাসী নয়। পরিসর আছে। কি অদ্ভুত! দোকানের মালিক, যুবক ছেলেটি — ব্যবধানে মুখটি যদিও পাক ধরেছে—সামনেই অলস দাঁড়িয়ে। অথচ তৎপর একজোড়া চোখ।

—পঞ্চু যে! দাঁড়িয়ে?

ডুবে যাওয়া বিকেল, লোডশেডিং। একটু আগেই পঞ্চানন হাতের কাঁচি, ক্ষুর, পেতলের চিরুনি, ফটকিরির ডালা, সস্তা আফটার-শেভ লোসন-টিউব গুছিয়ে একটি অ্যানামেল জগের মধ্যে সযত্নে— যেন ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজাচ্ছে—রেখে ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। হিসেব মতো না-রাখলে, উটকো মস্তান এবং বেকার ছেলেরা বাপের সম্পত্তি মনে করে। হঠাৎ কুশল জিজ্ঞাসায় পঞ্চানন কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—আপনি কোত্থেকে?...আর দেখতে-ফেকতে পাই না?

—এ দিকটায় আসা হয় না ভাই। কারণ নেই কিছু, এমনি।

—আমিও এমনি দাঁড়িয়ে আছি। লোডশেডিং-এ যাব কোথায়? কিছুই বদলাতে পারলেন না।

—তুমি বদলেছ! নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন চাকিমশাই। ভয় পাওয়া গোছের আত্মরক্ষায় পঞ্চানন বলে, কেন...মানে...বদলাতে যাব কেন?

এম.চাকি আশা করেছিলেন মাথাটির দিকে তাকিয়ে ছোকরা বলবে, বসবেন নাকি? ধরে কাজ করতাম? নতুনদের কাছে যাচ্ছেন তো, দেখবেন পুরণো চাল আজও ভাতে বাড়ে দাদা! সত্যিই পঞ্চুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতেন তিনি। সুদীর্ঘ জীবনে রাতে চুল কাটিয়ে, ভালো করে সাবান-স্নানের অভিজ্ঞতা নেই। এটুকুই এখন পড়ে পাওয়া বৈচিত্র্য!

ফরেণের লাইন চলছে? পুরণো প্রসঙ্গ তুলতেই, পঞ্চু কঠাক্ষে 'কিসের ফরেণ? কি গাবলাচ্ছেন?' বলে দোকান ফাঁকার ওজর দেখিয়ে চলে গেল। এড়াতে চায়। এম. চাকি সামান্য হাসলেন। দুপুরের অদ্ভুত মুডটি এখনও চনমনে স্রোতে কোষে কোষে হালকা হিল্লোল তুলছে।

পঞ্চুর দোকানটি তখন আরও ভাঙচোরা, অপরিসর। দক্ষিণের ঝাঁপ খুলে রাখলে সমস্ত মাঠটির হাওয়া ঘোড়া হয়ে উঠত। কাঁচির শব্দ, কাপড়ের খন্ডে পেঁচানো ঘাড় নিয়ে পিট্ পিট্ দৃষ্টিতে তৃণভূমির টানে কি মজা। আকর্ষণ!

কিছু চাইলে বলবেন দাদা। আস্লি ফরেণ! কাঁচি থামিয়ে ফিস্ ফিস্ কানে যেন বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দিত পঞ্চু।

—কিছু মানে?

—টেপ্ ফেপ! ভি.সি.পি.! আপনি তো শুনেছি গান-বাজনা পছন্দ করেন!

—চ্যানেল আছে তোমার?

—আছে।...দাঁড়াতে গেলে হিঁয়াকি মাটি হুঁয়া চাই—কি বলেন?...খদ্দেরের মাথা সাফ করে তো পয়সা করা যায় না। মি. চাকি সেদিনই টের পেয়েছিলেন পঞ্চানন ভেতর ভেতর দৌড়োবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পঞ্চু চলে যেতেই, চাকিমশাই তৃণভূমির দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং দুপুরের মুডটি অদ্ভুত কাকতালীয় দিগন্ত ফুটে উঠল। সাড়ে সাত বর্গমাইল পৌরাঞ্চলে সত্তর একর মাঠটিই এখন সম্বল। এর দু-পাশ ঘিরে রাস্তা—যানবাহন চলে। চাকি মশাই পুবমুখো রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে। মাইলখানেক হাঁটলেই ব্রজলালের বাড়ি, এবং এই পথ ধরে যতদিন তিনি ব্রজলালের বাড়ি গেছেন—দেখতে পেয়েছেন অতীত যুগের নদীটি; আধুনিক ঘন বসতির মধ্যেও গর্ভচিহ্ন অস্ফুট রেখে গেছে মালার মতো কিছু পুকুর এবং নিম্ন জলাভূমির অস্তিত্বে। এই শহরটির আদি শিকড়কে খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন, শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যের আমলে এটি ছিল সমৃদ্ধ নদীবন্দর। আর ঐ নদীটি ছিল গঙ্গার সঙ্গে দক্ষিণের নোনাজলের যোগসূত্র। আজও স্পষ্ট, হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পান, এইসব উটকো কলোনি ও আধুনিক দালানকোঠা ভ্যানিস হয়ে সন্ধ্যার স্রোতে নদী বেয়ে মালবোঝাই নৌকা চলেছে। কল্পনা তাঁকে টেনে নিয়ে যায়।

তাঁর বহু যত্ন, শ্রম ও গবেষণায় খুঁজে পাওয়া আপন সিদ্ধান্তটি বহু বছর আগে স্থানীয় ছোট্ট একটি পত্রিকায় যখন পাঠিয়েছিলেন, ছাপার পর তো অবাক! লেখকের নাম ড. এম. চাকি। হোক না মন্মথ চাকি পৌর প্রতিষ্ঠানের মিউটেশন। ডিপার্টমেন্টের সামান্য কেরানি, এমন ইতিহাসসন্ধানী মন যার, নিশ্চই ডক্টরেট হবেন।-পত্রিকা-সম্পাদক এমন কিছুই ভেবেছিলেন। সেই থেকে মন্মথ হয়ে গেলেন ড. এম. চাকি। এই পড়ে পাওয়া সম্মানে, শ্লাঘা ও গৌরব একদিকে অন্য পক্ষে পরিবার ও প্রতিবেশীদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও কৌতূহলের সমস্ত যোগফল নিয়ে জীর্ণ কাঠের ফলকটি ঝুলে আছে দরজার কোণায়। মন্মথ কিন্তু সেই থেকে শহর, মানুষ, এই রাস্তাঘাটের শিকড় খুঁজবার নেশায় কেমন বুঁদ হয়ে গেলেন। প্রতিদিন এই শহরের বুকে এলোমেলো না ঘুরলে হাঁপিয়ে ওঠেন। অথচ অদৃশ্য কোনো শক্তির কবলে প্রতিদিন বাঁয়ে স্টেশনে এসে আটকে পড়েন। লক্ষ্মণের গন্ডির মতো। ঘণ্টা দুই পর এক বুক কান্না নিয়ে ফিরে যান।

আজ দুপুরের মুডটি তাকে দারুণ ইম্‌পেটাস দিয়েছে। ভারি খুশিতে, পঞ্চুকে ছেড়ে ঠিক করলেন ব্রজলালের বাড়ির পাশের পথটি দিয়ে হেঁটে যাবেন। উঁহু, ব্রজর বাড়িতে উঠবেন না। মানুষটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ইদানিং। তবে পথটি খুব মজার। কিন্তু আন্দাজই করতে পারলেন না ড.এম.চাকি, এই সিদ্ধান্তটিই আজ মধ্যরাতে ওনাকে ফের একটি উদ্ভট বৃষ্টির রাজ্যে নিয়ে যাবে।

আজ ঘোর মধ্যাহ্নে এম.চাকি দোতলার দক্ষিণের জানালাটি খুলে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর অবসর জীবনে প্রতিদিনের অভ্যেস। সারা বাড়িটার ফাঁক-ফোকড় এবং কার্নিশের আশ্রয়ে পায়রাদের বক্‌বক্‌ম। সেই অর্ধগম্ভীর শব্দগুলো চাকির দেহে অন্নের রসে মিশে গেলেই তিনি ধীরে ধীরে ঝাঁঝি,

শ্যাওলা এবং শালুকের ডাঁটা বেয়ে পাঁক-প্রাচীন জলের পুরীতে অদ্ভুত আরামে ডুবে যেতে থাকেন। ওনার রুগ্ন স্ত্রীর হাঁটা-চলতি, টুকটাক কাজকম্মের শব্দ— তুলোর স্পর্শ মনে হয়। আজ সেই কোমল স্পর্শটুকু কখন মিলিয়ে গেছল মনে নেই। হঠাৎই জানালার উড়ন্ত বাতাস, বৃষ্টিকণার ঝুরু ঝুরু পেলব আরাম ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ঘোর বিজড়িত চোখে মাথাটি তুলে দূরে দেখতে পেলেন আকাশ অদৃশ্যপূর্ব কিছু মেঘের নাগপাশে আক্রান্ত, এবং তা পৃথিবীর সমস্ত আলো শুষে নিয়ে পাকা পাতিলেবুর বর্ণ ধারণ করে আছে। ধারণা ঠিক নয়, বায়ুমন্ডলের সেই রং বিকিরণ করছে। আর ৪৫° কোণে, ঝাঁপিয়ে চলেছে বৃষ্টি; প্রতিটি জলরেখা যেন ঝালরের স্পষ্ট সুতো। বৃষ্টিফোঁটা বাঁকছে, মোচড় খাচ্ছে, নেচে-নেচে দিক পাল্টাবার নেশায় মশগুল। পাঁজাকোলে কোনো যুবতীর খুশিতে নানা বিভঙ্গের মতো। এটা স্বপ্ন। স্বপ্নের বৃষ্টি! হঠাৎই এম.চাকির মনে হলো। আর তখনই ওনার চেতনার অন্ধি-সন্ধি বেয়ে অদ্ভুত একটি মুড টইটম্বুর। মনে হলো উল্টো স্রোতে অতীত সময়ের কুঠুরি খুলে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ আলোড়িত হতে থাকল। জীবন বাস্তবের তীরে দাঁড়িয়ে ঘুমের সমুদ্র থেকে স্বপ্নকে টেনে তুলতে পারেননি। ঘুমের স্বপ্ন ঘুমেই মিলিয়ে যায়। এম.চাকি তাই প্রথম অভিজ্ঞতায় টের পেলেন-না কোথায় আছেন। এই অদ্ভুত মুডের স্থান-কালপাত্রহীনতা আসলে ঘড়ির মাপে কয়েকটি সেকেন্ড মাত্র। চেতনায় ঠেকল এটা জুন মাসের মধ্যদুপুর, পিতৃ-পিতামহের দালান-কোঠার শরিকি টুকরোর দোতলায় বিছানা। লাফিয়ে উঠলেন। তাহলে এটা সত্যি'র বৃষ্টি! কিন্তু উপরি পাওনা হলো মুডটি, যা তার শিরাবাহিত হয়ে সব কিছু ধোয়াপাখলা টাটকা সফেন স্পর্শ রেখে গেল। ঠিক করলেন, বাঁয়ে ঘুরে শহরের পথে আজ আর একঘেয়েমির অসহায় রক্তক্ষরণ নয়, ডাইনে ঘুরে...।

মাঠটি ছেড়ে মি. চাকি যখন পুবের পথ ধরে সোজা হেঁটেই চলেছেন পথেঘাটে অল্প আলো। চলাচলতি মানুষ অপেক্ষাকৃত কম, কেবল ঘরে ফেরার তাড়ায় গাদাগাদা সাইকেল, রিকশা এবং ভ্যানগুলোর গা ঘেঁষে ছুটে যাওয়া। শনিবার। টি.ভি.-তে হিন্দি সিনেমা 'গুম্‌নাম'। সপ্তাহে শনি, রবি শহরের এই সন্ধ্যা যেন মজার নেশার একটি ডিমে ঘন্টা তিনেকের ডানায় ঘিরে তা দেয়।

মি. চাকি যখন মিউটেশন ডিপার্টমেন্টের কেরানি—এ-সব অঞ্চল কি ছিল। কিংবা তাঁর বাল্যকালে? ৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশের পর থেকে ময়দানবের ক্রিয়াকান্ড চলছে যেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে সে আমলে সবাই অবজ্ঞায় বলতে গুয়ের অফিস! এখন কি ইজ্জত তার! দাপট! মিউটেশন ডিপার্টমেন্ট তো সোনার খনি। ব্রজ প্রায়ই আপশোস করে—আর দশ-বারো বছর পর দাদা!

...যদি রিটায়ার করতাম!

—দুঃখ হচ্ছে?

—সাতকড়িকে মনে আছে? রোগাক্যাংঠা? ...ফাইল বইত, কাগজ ট্যাগ করত আমাদের সেকশনে? আপনি ডাকতেন ফড়িং? সে-ও উপরি এক'শ টাকা রোজ কামায় শুনি!

—গুয়ের অফিস এখন নোট ছাপাচ্ছে নাকি?

—দু-লাখের ওপর মানুষ। জমি তো বাড়ছে না। ...কেবলই টুকরো হচ্ছে। মিউটেশনের চাপ।

প্ল্যানিং মিউটেশন এবং স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টে যারা আছে...ঘাড়ে ডাবল লক্ষ্মী, দাদা!

—দু-লাখ? বল কি! এম. চাকি চমকে ওঠেন। একদিন ভায়া দেখতে পাবে চাপে শহরটা গর্তে ঢুকে যাচ্ছে...এর অতীত জানো তো? নোনা নদীর ধারে ছোট্ট গঞ্জ। ব্রজ এম.চাকির গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানে খুশি হলো না।

ফড়িং যে এত সব জ্ঞানের কথা জানে না, কোনো অসুবিধে হচ্ছে?.. কী যে ভূতে পেলো আপনার!

হা হা হেসে উঠতেন এম. চাকি। চায়ের পর, ব্রজলালের বিবাহিতা মেয়ের হাতে সাজানো পানটি তুলে নিতেন। স্বামী খ্যাদানো বলে বাপের গলগ্রহ হয়ে আছে। সঙ্গে আবার তিন বছরের কন্যা।

—ব্রজ ভায়া, ও-জন্মে না হয় মিউটেশনে ফের চাকরি নিও...খেদ থাকবে না।

—মাফ করুন! মুটেগিরি করব, তবু ঐ নরকে ?

ব্রজলালের বাড়িতে উনি আজ ঢুকবেন না সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। ভালো লাগছে বহু দিন পর, এই জনপদ দিয়ে হেঁটে যেতে। কত পরিবর্তন অতীতের নদীর বুকে বর্তমানের ঘরবাড়ি। জঙ্গলের লেশমাত্র নেই। কিছু বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ অঞ্চলে নতুন ঘরবাড়ি তুলেছে— ছোট্ট একটি মঠও দেখা গেল। গড়ে উঠছে—সম্পূর্ণ হয়নি। মাসছয়েক আগে এ অঞ্চলে মঠ গড়া নিয়ে যে টেনশনের খবর রটেছিল, তা কি এখানেই? বাঁয়ের পরিচিত একটি শাখা পথ ধরে এম. চাকি বেশ উৎসাহে অতীতচারণায় হেঁটে চললেন। ব্রজদের বাড়ির আগেই রাস্তাটি বেঁকে গেছে। ব্রজলালের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি নাদু গাঙ্গুলিদের চার পুরুষের বাড়িতে আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগে প্রথম এম. চাকি এসেছিলেন—এই পথ ধরে। অবাক হয়েছিলেন কয়েকটি সুন্দরী গাছ, বনবিবির থান এবং পোড়ামাটির কিছু ঘোড়া দেখে। বিলের ধারের দরিদ্র মল্লিক-মুসলমানদের কেউ কেউ সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে যায়, এবং সেই প্রবল, কৌতূহলী ছমছমে দৃশ্যটি দেখে এম. চাকির মস্তিষ্কে প্রথম ফুটে উঠেছিল যে আইডিয়াটি—অতীত এ জনপদটি সুন্দরবনের অংশ ছিল—ক্রমে নেশার মতো জড়িয়ে ধরে। ব্রজলাল সেই পর্বে কত সাহায্য করেছিল! বুড়ো থুত্থুড়ে মানুষদের স্মৃতিচারণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে পুরণো ডায়েরির সন্ধান, ছেঁড়া-খোড়া দানপত্র জোগাড় এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের ধুলো ঘেঁটে ফাইল ও রেকর্ড বার করা! স্থানীয় পত্রিকার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো 'ড.এম.চাকি' বিশেষণটি ওর বছর খানেক পর পাওয়া।

এম. চাকি অনেক কিছুই জানেন। গঙ্গার তীরের ঘাটগুলোর নির্মাণের ইতিহাস, বহু দূরের অতীত কোন কোন উপজাতির বাস ছিল, কিন্তু লুপ্ত করে দেয়া হয়েছে— ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ বা সুভাষচন্দ্র কতবার, কোন কোন উপলক্ষে এ শহরে পদধূলি দিয়েছিলেন—সব কিছু। পুরোটাই যে এম. চাকির নির্ভুল এবং তথ্যনির্ভর জানা— এমন নয়। অনেক কিছুই কল্পনা, মনগড়া এবং অনৈতিহাসিক। এটা কি তার উন্মাদনার লক্ষণ? সত্যিই তো ফড়িং যে কিছুই জানে না, কি কাঁচকলা ঠেকে আছে তার? এ শহরের হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিন্তে খাচ্ছে-দাচ্ছে, তারিয়ে ভোগ করছে, ভোগের দাপটে বেশ শাঁসালো এবং তাদের দিন রাতে কোনও হেরফের হচ্ছে না এ

শহরের ইতিহাস-ফিতিহাস না জানা থাকলেও। তারা দৌড়াচ্ছে। স্পেকুলেশন করছে। মিলিট্যান্ট হয়ে উঠেছে ভাবনা চিন্তায়, ধর্মে। মরেও যাচ্ছে পট্ পট্। কী এসে যায় স্থান-কাল-পাত্রের শিকড় না-জানা থাকলে?

একদিন ব্রজলালকে ড. এম. চাকি এ-বিষয়ে আপন অভিমতের সামান্য আভাস দিয়েছিলেন হু হু কান্নার মধ্যে। মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত দোতালার ঘরে এম.চাকি গুম হয়ে বসা, সামনে ব্রজলাল। সকালেই পুরনো বসত দালান জ্ঞাতিদের মধ্যে চূড়ান্ত কলহে টুকরো-টুকরো হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছেন বেশি এম.চাকি। এজন্য ছেলে তাকে সমস্ত দোষারোপ করে ফলকটি টেনে খুলে ফেলেছিল। এম.চাকির হৃৎপিন্ড যেন উপড়ে গেছল! ঝাঁপিয়ে, মলিন টুকরোটি যথাস্থানে গেঁথে, চরম গ্লানিতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভাটিখানা থেকে সস্তায় মদ গিলে দক্ষিণের জানলায় যখন নিঃসঙ্গ বসেছিলেন, ব্রজলাল হঠাৎ উপস্থিত।

—অতীত মানে জিন্! জানো ব্রজলাল?

—হুঁ।

—মানুষের জিন্ই সত্যি।...অতীত বুঝতে পারে। আর দেশের জিন্ জানলে দেশকে। দেখবে, তখন মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা কমে যাচ্ছে,... এ শহরে আজ চোদ্দ আনা মানুষ তোমায়-আমায় চেনে না।....তালে একটু মায়া দয়া হত....পাঞ্জাব.... আসাম... শহরটাকে যে যার খুশি মতো...। এম. চাকি নেশাগ্রস্ত আঙুলে সঙ্গমের মুদ্রা দেখিয়েছিলেন ব্রজলালকে।

আজ নাদু গাঙ্গুলির বাড়ির কাছে এম. চাকি লক্ষ্য করলেন, কোথায় সেই পুরণো জঙ্গল, বনিবিবির থান, দরিদ্র মল্লিকপাড়া, ছায়াগুল্ম আদিম বাগান? দালান কোঠায়, সেফ্‌টি ট্যাঙ্কের কুরুশ চিহ্নে সরু সরু ইট বাঁধানো রাস্তার মানুষ-কীটের আশ্রয়। এটা বর্তমানে পৌরাঞ্চলের ৩০ নম্বর ওয়ার্ড। এম. চাকিদের আমলে ওয়ার্ড ছিল মোট ১৬ টি। ব্রজলাল ঠিকই বলেছিল। শুধু ফড়িং নয়, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, কেন্নোরাও দৈনিক ১০০/২০০ টাকা উপরি কামাতে পারবে। এত মানুষের চাহিদা ভোগ স্বার্থপরতা এবং হাগানো-মোতানোর দায়িত্ব ছোট্ট পৌরসভাটির উপর। সম্ভব? ফলে গুরুত্ব, খাতির, পলিটিক্স এবং নোট গুজে দেওয়া চলবেই। যে যেমন ভাবে পারে শহরটিকে...! এম. চাকি মনে মনে নেশাগ্রস্ত আঙুলের মুদ্রাটির কথা ভাবলেন।

একটু বিষণ্ণ মনে চাকি মশাই ফিরে, সোজা ব্রজলালের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। সমস্ত পাড়িটার সুইচ্গুলো কি অন্ করা? ঝলমল করছে। বাড়িটা পিছনে ফেলে, মিনিট তিন-চার হাঁটতেই রাস্তাটা শেষ—একটা তিন মাথার মোড়। মোড়টাকে ঘিরে সামান্য দোকানপাট, আলো—একটু জমজমাট বটে অপেক্ষাকৃত। বলে বটতলার মোড়। বটগাছ নেই, নামটুকু জড়িয়ে আছে। নাদু গাঙ্গুলিদের জমিদারি ছিল অঞ্চলটা, এক কালে। বহু বছর আগে নাদুর বৃদ্ধ ছোড়দাদু বলেছিলেন এম. চাকিকে— তাদের পরিবার ছ-পুরুষ আগে এখানে বসত গড়তে নৌকায় ঐ বটগাছের তলায় প্রথম নেমেছিল। ব্রাহ্মণ হিসেবে ভুঁইএরা রাজাদের কাছ থেকে জমি পেয়েছিল দানপত্র হিসেবে। ঐ মোড়টায় এক সময়ে ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত ছিল বলে— কেউ কেউ ঠ্যাঙাড়ের মোড় বলত। এম. চাকির মনে পড়ে ছেলেবেলায় এ অঞ্চলে ছিল ঘন দেবদারু বন এবং বাগ্দিদের বসতি। তার

সামান্য চিহ্নটুকুও মুছে ফেলা হয়েছে।

আজকাল এ-পথেও অটোরিকশা চালু হয়েছে। মানুষ এ-শহরে জমির সন্ধানে কতদূর যে ভেতরে চলে গেছে! এইসব চিন্তাভাবনায় যখন হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন একটা ফাঁকা অটো সামনে দাঁড়াল যাত্রীর আশায়। যেন ঘাটে নৌকা ঠেকল, এম. চাকি উঠে পড়লেন। এঁকে বেঁকে, দেখতে দেখতে, হর্ণ বাজিয়ে গাড়িটা চলল এবং ক্রমবর্ধমান রাস্তার আলো, মানুষের ভিড়, দোকানপাটের প্রাচুর্যে চাকিমশাই একটু একটু শহরের আভাস পেতে শুরু করলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্টেশন। নামলেন। পরিচিত পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। পান চিবোতে শুরু করলেন। সামান্য ঘোর কাটতেই মনে হলো, পঙ্কুর দোকান থেকে অটোয় এখানে দাঁড়িয়ে পড়া—একটি অর্ধবৃত্তকার পথ। এখন প্রতিদিনের কান্না-নিয়ে-ফেরা পুরনো পথ ধরে বাড়ি পৌঁছলে, গোল্লাটা সম্পূর্ণ হবে। আজও এড়ানো গেল না।

অদৃশ্য আলপিন দিয়ে এম. চাকি নামক একটি পোকাকে এখানে গেঁথে রাখা হয়েছে যেন। শুরু হলো প্রতিদিনের একঘেয়ে অসহায়তা এবং অদৃশ্য রক্তক্ষরণ।

ড. এম. চাকি এক্ষুণি, এই মুহূর্তে, নিজেকে ভাঙচুর করে ছিটকে চলে যেতে পারেন। সামনেই রেল লাইন; টপকালে স্টেশন চত্বরের অংশ, ভিড়, সরু রাস্তা, বাজার, ষাঁড়, দোকানপাটে ছয়লাপ। টপকালে স্টেশন চত্বরের অংশ, ভিড়, সরু রাস্তা, সব ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে মাইল খানেক হাঁটার পর গঙ্গা। ওখানে বসলে অনুভূত হয় অন্ধকার গর্ভে ঢাকা বিপুল জলের আভাস। সমুদ্র ঠেলে নিপুণ নিয়মে আসে, আবার ভাঁটার টানে চলে যায়। অনিমেষ তাকিয়ে কেবলই মনে হয়, এ-সংসারে কোনো কিছুই স্থির নয়—বদলাচ্ছে। দেশ, কাল—সবকিছু। সেই ভাবনায় মানুষ 'আমি'র খোলস হারিয়ে কেমন যেন ইতিহাসের স্রোতে পরিণত হয়। সেই অদৃশ্য স্রোতের উৎস এবং পরিণতি খুঁজে না পেয়ে, ঘাট থেকে যখন ঘরমুখো হয়, মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় কীভাবে ষাঁড়, মানুষ ও থরে থরে প্রয়োজনের বাধা ফুঁড়ে এখানে হাজির হয়েছিল।

প্রতিদিনই এই পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালে, কে যেন এম. চাকিকে একটি অবরুদ্ধ দেয়ালের সামনে স্থবির করে রাখে। সারাদিন সংসারের পেছনে ব্যয় করে, বিকেলে মন ছটফট করে একটু বেরোবার জন্য। আজও শহরটাকে উল্টে-পাল্টে দেখবার কি নেশাও কোনোদিনই গড় মানুষের মজায় সময় কাটাবার অভ্যেস নেই—বড্ড একা, বড্ড অসহায় বোধ হয়। 'গড় মানুষ' হতে না পারাটাই তো দশজনের চোখে সন্দেহের বিষয়। তাছাড়া, ক্রমশ পলির স্তরে যেমন ভূমি জেগে ওঠে, অতীত চাপা পড়ে যায়, নতুন মানুষদের দাপটে, শহরে আজ এম. চাকি অপরিচিত, অকিঞ্চিৎকর। বিকেলে বেরিয়ে, অমোঘ টানে বাঁয়ে ঘোরেন। এই বাঁধাধরা পথটুকু দিয়েই দিনরাত মানুষ ছোটেক বাজারে, স্টেশনে, অফিসে—প্রয়োজনের দাবি মাথায়। এ-রাস্তার হাঁটলে কেউ জিজ্ঞেস করে না, কোথায়? সন্দেহ করে না। নতুন পথে, ভিন্ন দিকনির্দেশে পা ফেললেই জ্বালা। তাই প্রতিদিনই প্রবল সিদ্ধান্ত নিয়ে এম. চাকি বড় রাস্তায় উঠে ডাইনে বা অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় শহরে ছড়িয়ে পড়ার প্রবল সিদ্ধান্ত নিয়েও কিসের অনিবার্য টানে নির্ঝঞ্ঝাট বাঁয়ের পথে এসে স্টেশনে আটকে পড়েন। রাত সামান্য বাড়লে, যখন বাড়ি ফিরতে হয়, কি যন্ত্রণা! শূন্যতার ক্ষোভ! কান্না!

আর পান চিবোতে চিবোতে দেখতে পান নামহীন পরিচয়হীন কত মানুষ যে ট্রেন উগরে পিলপিল হেঁটে আসে। গুণেগুণে এম. চাকি এক সময়ে ক্লান্ত, হাল ছেড়ে দেন। ৬০০ নাক, ১১০০ থুতনি, ৮০০ জোড়া হাত, ৫৫০ ব্রিফকেস, ১৮শত থলি, বাজার। হাতের চেটো পয়সা দেয়, আঙুল সিগারেট তোলে, নাকের ফুটো ধোঁয়া ছাড়ে — চাকি মশাই এইসব দৃশ্যের পাশে দাঁড়িয়ে পানই চিবোন। টি.ভি., প্রেসার কুকার, ফ্যান, গহনার ঠাসাঠাসি দোকান, নিয়ন ও মেসোনাইটের কাউন্টার। ফাইল, ক্যাপসুল, ফয়েলে মোড়া ওষুধ; এসে কাউন্টারে ওঠে। ক্যাসেটের দোকানে গাঁক গাঁক, ১০০ ডেসিবল ক্ষমতার শব্দ; কিছু ভিড়। এর মধ্যে চোর, চিটিংবাজ শনাক্তকরণ হলে তাড়া দেওয়ার ঢেউ ওঠে। ফ্রড, জালি ও দু'নম্বরিদের জন্য অবিশ্বাসের কঠিন চাউনি চোখের তারায় ঘোরে। তবু পালিশ ফার্ণিচার, সোফা কাম বেড কিংবা শহরের প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পোশাকের কাউন্টারে মানুষের ঠোকাঠুকির অভাব হয় না। এম. চাকি এইসব থুতনি, দাড়ি বা কণ্ঠার হাড়ে ঘাম এবং ঘামের মধ্যে সালফারের গন্ধ পান। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিং-এর ঝকঝকে পালিশেও এ কটু গন্ধ যায় না। এই শহরে তিনি ৭২ বছর আছেন— কেউ বিশ্বাস করবে? কিংবা এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে যদি বলতে শুরু করেন— এখানে নদী ছিল; রবীন্দ্রনাথ এখানে বাগানবাড়িতে বসে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে আমরা শহরবাসীরা গর্বিত—এইসব ঠোঁট থুতনিদের কেউ কেউ মৃদু হেসে বলবে, সো হোয়াট? ড. এম. চাকির মনে হয়, অটো কিংবা রিকশার জন্য গড়ানো রাতে ঘরমুখো মানুষগুলো যখন লাইন দিয়ে তিতিবিরক্ত, কি মার্জিত ভাষায় সৃষ্টি হয়! অধ্যাপক চার অক্ষরের বোকা উচ্চারণে বুকের বাষ্প ত্যাগ করে, উকিলের মুখ গুহ্যদ্বারের প্রতিশব্দে মুখর, অফিসের মাঝারি বস্ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর পায়ুমর্দনে আহ্বান জানায়। এইসব গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা রাষ্ট্রতন্ত্রের বে-নিয়মে এমনই তেতে ওঠেন, মনে হয় হাতের মাখন-প্যাকেটটি বুঝি এক্ষুণি উত্তাপে গলে গেল।

এম. চাকি দেখতে পান প্রত্যেকের গলার পাশে একজোড়া পচা টনসিল। ফুলে নারকোলি কুল হয়ে আছে। এদের আওয়াজগুলো তাই শ্লেষ মাখানো।

হঠাৎ কখন পরিচিত কেউ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে—চাকিদা, এখানে?

—এমনি।

—এমনি?

—পান খেতে।

অবিশ্বাসের ছোট্ট কাঁধ ঝাঁকানো উত্তর আসে—এক মাইল ঠেঙিয়ে পান খেতে? স্পেশাল কোনও পান? কেউ কেউ সূক্ষ্ম রসিকতা করে—কি পান দাদা? ক্রিয়াপদ না বিশেষ্য?

আজও, এম. চাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত এবং অসহায় হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে হাঁটতে থাকেন— সব্বাই যে পথে বাড়ি ফেরে। বটতলার মোড় থেকেই যদি আজ ফিরে যেতেন, এতটা গ্লানি বোধ হত না। কিছুতেই টপকানো যাবে না নিজেকে? শহরে যে তিন চারটে পাবলিক লাইব্রেরি আছে— বিকেল সামান্য গড়ালেই কর্মকর্তারা ঝাঁপ ফেলে চলে যান। সরকারি দায়িত্ব বলে কথা! আচ্ছা এত দোকানপাট, কত ভিন্ন পেশার আড্ডা! বৃদ্ধ চাকির কোনো স্থান হবে না?

এম. চাকি রিকশার ধাক্কা খেলেন, ঠিকমত পথ চলবার জন্য জ্ঞান শুনলেন দু'একটি অটো চালকের কাছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, এবং কেউ উটকো মুখে ঝামা ঘষে দিলে যা হয়, চাকির সেই অবস্থা। এত চেষ্টা করেও, একটি দিনের জন্য এ পথকে এড়াতে পারলেন না? বয়স হলে নিজেকে বদলাবার কোনো হাতিয়ার থাকে না? তখনই দমবন্ধ হয়ে আসে, হেরে যাচ্ছেন!

মানুষদের গভীর অন্তরে কিছু টান-টান তার আছে। কেবলই আঘাতের সুর বাজতে বাজতে, এক সময়ে ভিন্ন ঝোঁকে ক্ষোভের ঝঙ্কারও রণিত হয়ে ওঠে। হেঁটে এসে, বিকেলে যেখানে গোত্তা দিয়েছিলেন, আবারও ঘুরে গেলেন। চুল ছাঁটাবেন। চান করবেন। জলের ধারায় সুগন্ধী ঘন সাবানের ফ্যানা গলে গলে পড়বে। তারপর লঘু, স্নিগ্ধ ঘ্রাণের ট্যালকম! এই বৈচিত্র্যটুকু তার ক্ষমতায় আছে। কেউ বাধা দিতে পারবে না।

পঞ্চানন ঝাঁপ টানছিল। পেছনের মাঠটি এত রাতে শুনশান, রহস্যগর্ভে ঢাকা। চাকিকে দেখে পঞ্চুর ভুরুতে গিট্—আপনি? ফের?

—চুল।

—এত রাতে? সব তুলে দিয়েছি।

—দশটা মিনিট! চুল বড় হলে ঘুমুতে পারি না।

হাত ঘড়িটা দেখে, বিরক্তিতে পঞ্চু উত্তর দেয়—কি যে করেন আপনারা! আমাদের অন্য কাজ নেই? নেহাৎ পুরণো খদ্দের....আসুন!

সেই ঐতিহাসিক স্নান, সাবান এবং ট্যালকমের গন্ধের মধ্যে মধ্যরাতে ড. এম. চাকির দরজায় পুলিশ উপস্থিত। না, কোনো অপরাধে নয়। ড. এম. চাকির বিরুদ্ধে দীর্ঘ জীবনে কাউকে ধমক দেওয়ারও রেকর্ড নেই। তবে? পুলিশ অফিসারটি বললেন, আপনার বাড়িতেও বলতে পারি!...আমরা কিছু জানতে চাই।

—বলুন? এই শহর সম্পর্কে?

—বাড়িতেই বসতে চাচ্ছেন?

সামান্য হেসে চাকি মশাই বললেন—বেশ চলুন, থানাতেই বসি।

গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বড় রাস্তায়। বন্ধুতার গলায়, অফিসারটি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন—আমাদের খবর, আপনিই লাস্ট খদ্দের ছিলেন। ওর ডেড বডি পাওয়া গেছে।...পেছনের মাঠটায়।...থামস-আপ এর ভাঙা একটি বোতল দিয়ে খুন করা হয়েছে!

বাকি পথটুকু? এম. চাকির গা ছমছম। পা ওঠে না। গাড়িতে বসে শুনলেন অফিসারটির গলা—ক্ল্যু দিতে পারবেন?...ওর সাইকোলজি তখন কেমন ছিল?

হঠাৎ খুন?

জানতে পারলে কি মাঝরাতে আপনার মতো ভদ্দরলোককে জ্বালায়? পাশের লোকটি হাই তুলে বলে হিস্‌সা! হিস্‌সা!...শালা তো লাইনের ছিল...নেশা পাচারের দলে...বদলা-ফদলা নিয়েছে।

আপনাদের শহরটা হয়েছে, শাল্লা নরক! অফিসারটি যেন ধমকে দিলেন চাকি মশাইকে। আর এম. চাকি যেন চাপা পলি ভেদ করে আধুনিক অপরিচিত ভূ-ত্বকে দাঁড়িয়ে মধ্যরাতের যাত্রায় দেখতে পেলেন আকাশে বৃষ্টি। শহরটি উল্টে মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে মেঘ হয়ে ঝুলছে। কেবল নিয়ন আলোর রঙে জলদরেখা উজ্জ্বল । টনসিলফোলা মানুষদের হাত থেকে ক্রমাগত স্খলিত হয়ে সোজা, নাচতে-নাচতে বাঁকানো বিভঙ্গে ঝরে পড়ছে ব্রিফকেস, টি. ভি., ভি.সি.পি এবং ক্ষুর ছুরি-কাঁচি ও চিরুনির বর্ষণ! রিমঝিম!...

আজ মধ্যাহ্নে এম. চাকি জেগে উঠে বৃষ্টিকে স্বপ্নের ভেবেছিলেন, এখন গভীর রাতে স্বপ্নের মধ্যে বৃষ্টি দেখে জেগে উঠলেন।

কুঠার, ১৯৯৩

কাল, আজ এবং কাল

এগার দিন পর। চায়ের চুমুকে বিষম খেতেই, শৈল ভাবল—মনে করছে কেউ।

মায়া? পরের ঝি'র অত মন পোড়ে না। নাতনিটা ভাবছে। ন'বছরের কচি মুখটা একঝলক। ...ছাদটা ন্যাড়া, প্রতিদিন ধারে বসে রোদে তেল মাখে...আসার আগে সাবধান করেছিল পইপই...মহারাণির তো রান্না ঘরেই বেলা কাবার, ছেলেমেয়েদের যে একটু...ঠাকুরের জল-আসন দিতেই ভুলে যায়!

ছোট্ট ঢেকুর উঠল। জ্বালা নেই। ভারি স্বস্তি। বঁটিতে পালং শাক কুটছে—ক্ষেতের সদ্য তোলা এবং গোড়ায় ঝুরো মাটি। এখানে বড্ড শীত। ধবধবে সাদা খোলের শাড়ি, হাফ হাতা সোয়েটার, মোটা নস্যি রংয়ের চাদর জড়িয়েও হিহি। ভঙ্গুর সীমানা পাঁচিলের ওপাশে উঁচুনিচু দেহাত অঞ্চলের জমিন বহু দূর ঢেউ খেলান। পাহাড়ের রেঞ্জ পর্যন্ত চলে গেছে। ছড়ান নিঃসঙ্গ দু চারটে ঝাঁকড়া বৃক্ষ। গত রাতের শিশির ও দূরময় পাতলা কুয়াশা এখনও বেলা দশটার রোদ্দুরে লুপ্ত হয়নি।

—দীপু, ও দীপু!

—কেন?

—আর কী কুটব, দ্যাখ!

সাদা চওড়া সীম, পুরু মিষ্টি কুমড়ো, থোলো বেগুন এবং পালং শাক। ভাগে ভাগে কুটে শৈল ডাকতেই দীপ্তি ভেতরের কোনো একটা নিঃশব্দ ঘর ফুঁড়ে বারান্দায় হাজির।

—গোড়াগুলোও? কেন? দীপ্তির চর্বিঝোলা গাল খুশি খুশি।

—মোটা, টাটকা ফেলে দেব? আমি রাঁধব। সরষে দিয়ে, দেখিস।

—বাবার ছোট খুড়িকে মনে আছে, ছোট্‌ঠাকমা? পালংয়ের গোড়া যা রাঁধত!

—আহাঃ! তোর মনে আছে, আর আমি ভুলে যাব? শৈল মৃদু হাসে। পুরু কাচের ওপাশে, ছানিকাটান বড় চোখটা স্মৃতিতে টলটল।

উঠো থেকে বারান্দাটা খুব উঁচু। সম্পূর্ণ বাড়িটা দুর্গের মতো। এমন মজবুত গাঁথুনি ইদানিং

বাহুল্য। কড়ি-বর্গা, থাম, পলেস্তারা ভগ্নজর্জর না হলেও, যে কেউ ঢুকে পড়লে বাড়িটার মর্মে-মজ্জায় গম্ভীর অতীত অনুভব করবে। বড় চার পাঁচখানা ঘর, সামনে-পেছনে বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম—সবাই দুর্গাকারে, এক ছাদের নিচে। এতবড় দরজা-জানলা দেখা যায় না কোথাও। মেঝেতে বয়সের কিছু ফাটল ও বসন্তের দাগ ধরলেও তরমুজের পিঠের মতো অভিজাত, পাথরশীতল। পা ছোঁয়ালেই কনকন করে। ঠ্যালায় পড়ে ঘরের মধ্যেও শৈলর মুজো ও চটি। ইঁদারার জলের সর্দি আজও যায়নি, দীপ্তি গরম জল করে দেয়।

কাজের বউটি হেঁটে এল উঠোন পেরিয়ে। শৈল অনেক্ষণ ক্যামেরার মতো চশমা পেতে রাখে। ধীরে, সরু কালো ঠ্যাং পেতে পেতে, সিঁড়ির প্রান্ত বেয়ে সোজা রান্নাঘরে। কাছা দেয়া, শাড়ি, হাতে উল্কি, পেতলের নখ, তেলচপচপ চুল, সিঁথিতে ইটরংয়ের সিঁদুর। শীতবস্ত্র নেই, জোড়াহাতের ওমে বুকটা প্যাঁচান। দশদিন ধরে শৈল একই দৃশ্য ঠিক সময়ে দেখে ভারি মুগ্ধ। কাজের মানুষ নিয়ে কোনো টেনশন নেই এখানে। ঠিক যেন ঘড়ি ধরে আসে।

—চা বানাই? দীপ্তি বলে। 'আবার?' শৈলর নিমরাজি উত্তরে, 'এখানে অম্বল হয় না' বলে দীপ্তি উঠে গেল।

চায়ের কাপ এবং দক্ষিণায়ণের কুণ্ঠিত রোদ বারান্দার যেখানে ম্লান ঠোকর দিয়েছে—দু'টো মোড়া মুখোমুখি ঠেলে আনে দীপ্তি।

—আমার হাতে সর্ষে-বাটা তেতো হয়ে যায়। পারি না।

—মা'র হাতেও। শিল-নোড়া ধরলেই, মনে আছে, বাবা বলতেন সরষে যে শৈল বাটে?

—সর্ষের বাটা দিলে বাবার কি খুশি! বিশেষ করে কৈ মাছে!

—দেশের বাড়ি কাসুন্দি কত হত! বাব্বা! কুটে কুটে হাত ব্যথা!... আমার বিয়ের বছরও...

শৈলর বিয়ে দীপ্তির স্মৃতিতে ঝাপসা। সে কি আ-জ? ৫০ বছর হবেই। নেহাৎই বালিকা তখন। খুব ক্ষীণ, তুলোট স্মৃতি জানায় বড়দির বিয়ের পরও এক মাস বাড়িভর্তি কুটুম। বিশেষ করে জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতার জ্ঞাতিরা। শ্যামবাজারের জহর মামা—মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই—ডান হাতে ঘড়ি ও ম্যাজিক দেখাত বলে ঐ এক মাস গ্রামজীবনে ভিন্নগ্রহের মানুষ।

—জহর মামাকে মনে আছে?

—কুট্টির বিয়েতে বড় দুলি এসেছিল।...তারপর কে কার খবর রাখে?

কুট্টির এদের চতুর্থ-ভগ্নি। বিয়ে হয়েছে ২৪/২৫ বছর আগে।

—কাশীতে যেবার ঝুনো ছিল, দীপ্তি বলে, ঐ দুলির বড় ছেলের সঙ্গে আলাপ...কথায়-কথায় লতাপাতার সম্পর্ক বেরিয়ে গেল....

—জহর মামা? শৈল জিজ্ঞেস করে।

—সেও কবেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী...আজ কি আর বেঁচে আছে!

—দীপ্তির ছোট ছেলে ঝুনু। বড় নন্তু। একটি মাত্র মেয়ে ডলি—বিয়ে দিয়েছে পালামৌতে। এই

দুর্গের মতো বাড়িতে তারা অবরে-সবরে আসে। কারও ৩০০ মাইল, কারও, ৫০০ মাইল, কারও বা সীমানা ছাড়িয়ে ভিন্ন রাজ্যে 'বর্তমান'—কর্মব্যস্ততা, ও নিজ-নিজ সংসারের দায়-দায়িত্ব ফেলে মা-বাবার পাশে 'উঠল বাই তো কটক যাই' হয় না। তবে নিয়মিত টাকা, চিঠি, উৎকণ্ঠা ও উপদেশ আসে। বিশেষ করে, বাবার দুরারোগ্য ব্যাধিটির ফের আক্রমণে ডাকবাক্সে ছেলেমেয়েদের আন্তরিক দুর্ভাবনা দীপ্তি ও পরমেশের বুকে, শেষবেলার অস্তিত্বেও, ভরসা ও সার্থকতার আলাপ সৃষ্টি করে। এই বাসস্থান—দুর্গবাড়িটা—তখন অপর্যাপ্ত শূন্যতার বোঝা হয় না। সাত-আট দিন ধরে, নানা প্রসঙ্গে বড়দি কিছু জানলেও কতটুকু গভীরে ঢুকতে পারে? রক্তের সম্পর্ক হলেও দীপ্তির বিবাহিত চল্লিশ বছরের শখ-আহ্লাদ, টেনশন, পরিণতি এবং খন্ড মন—শৈলর অজানা ভুবনেই। তার নিজেরটুকু? সেকথা পরে।

হঠাৎ থামের মাথা থেকে একটা চড়ুই কাৎ বঁটির আড়ালে সীমের একটি হারিয়ে থাকা সবুজ দানার লোভে ঝাপটে পড়তেই, ডানার শব্দে ঘরের চুপচাপ প্রবাহটুকু কেঁপে উঠল। পাখিটা ছোট্ট চঞ্চু, ঘাড় ও উজ্জ্বল সতর্কতায় এগোতেই দীপ্তির বেড়ালটা সিঁড়িতে কানখাড়া। ছুটতেই, শূন্যে দু'টো ঝাপটা মেরে পাখিটা থামের নিরাপদে হাঁপায়; মাঝপথে দানাটা ফসকে অভিকর্ষের টানে, মেঝেতে ড্রপ খেয়েই হারিয়ে যায় শৈল'র চোখ থেকে। ঈশ্বর সর্বজীবেই ক্ষুধা ও বিপদ মেপে রেখেছেন! শৈল ভেবে খুশি হয়।

—সময় কাটাস কি করে?

—অভ্যেস! দীপ্তি হাসল, সামান্য আওয়াজে এখন মাথা ধরে!

—কেমন পাল্টে যায় সব! আমার বাড়ি হট্টশালা!... আর সংসারে আমিই নিরিবিলি ভালবাসতাম। তুই থাকতি দৌড়-ঝাঁপ নিয়ে! যেবার হাত ভেঙে ছিলি...মনে আছে? সবে বিয়ের কথা উঠেছে। তোর জামাইবাবুও সেবার দেশবাড়িতে আছে তিনদিন ধরে...

দীপ্তি হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। জামাইবাবু'র রোগভোগের সময় হাজির ছিল না, এমন কি মৃত্যুসংবাদ পেয়েও। পরিবারের পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে কুট্টি উপস্থিত ছিল কেবল। দীপ্তি তখন পালামৌতে, মেয়ের দ্বিতীয় সন্তান পেটে এসেছে। তাছাড়া দীর্ঘ দূরত্বে যাব বললেই হয়ে ওঠে না।

—পরমেশকে খেতে দিসনি? শৈল যেন বোনের দুর্বলতাটুকু ভুলিয়ে দিতেই প্রসঙ্গ পাল্টায়। মনে পড়েছে, এগার দিন আগে, এ বাড়িতে পা দিতেই—ট্রেনজার্নির পোশাকও বদলাতে পারেনি—বৈধব্যের বেশে অনভ্যস্ত চোখ দীপ্তির থরথর কেঁপে উঠেছিল। অপ্রস্তুত শৈলও আলোড়িত। পেছনের লম্বা পথটা—সারা ট্রেনজার্নিতে যা টুকরো টুকরো গ্রন্থনায় মধুরতা লাভ করেছিল— রূঢ় বাস্তবে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে গেল। এই এগার দিনে কে যেন ফের জুড়ে দিয়েছে। কেন এসেছে শৈল এক মাসের অবসর নিয়ে? পঞ্চাশ বছরের সংসার ফেলে? যেখানে শুধু 'বর্তমান'-এর ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিকট সম্পর্কগুলোর টানাপোড়েন চলছে? এভাবে বোনের বাড়িতে আচমকা চলে আসার সিদ্ধান্তে শৈল'র সংসারের মানুষ আদৌ খুশি ছিল না।

—কী সাহায্য করবে মাসীকে? বড় ছেলে অলকেশ চার্জ করেছিল মাকে।

—পাশে থাকাটাও সাহায্য।

—মাসী সময় পেয়েছিল আসতে? এখানে? বাবার হাসপাতাল...

—হিসেব-নিকেষ থাক অলক!

—কেবল আমার বেলা চলবে, না? ...এ মাসে কিছু দিও, দরকার।

—টাকা নেই। দীপুর ওখানে খালি হাতে যাব?

—যাচ্ছই?

রাত্রে পাশের ঘরে মায়া—তুমি চাইলেই থাকবে না।...খোঁজ নিও বোনের বাড়ি কী খরচা করে! পেনশন তো কম আসে না!

—তুমি বলতে যেও না কিছু।

—আমি এ সংসারে বলার কে? পেটভাতার ঝি।

—ফালতু বকো না।

—দেখব ও বাড়ি থেকে এখানে কুটোটিও আসে কিনা!

এদের সন্তান জয়া। ঘুমিয়ে আছে শৈলর পাশে। মেয়েটা দু'দন্ড চোখের আড়ালে হলে শৈল কেমন ছটফট করে। বাঁধনের এ কি জ্বালা। অসহায় শৈল মাঝে-মাঝে ঈশ্বরকে ডাকে।

দীপ্তি রান্নাঘরে; কাজের বউ ধোয়াপাখলা করে দিয়েছে। এবার উনুনে চাপান দরকার। ওদের ভাষায় কিছু বলতে, বউটি শিলনোড়ার কাঁচফল সহ একঝাড় ধানেগছে বাটতে শুরু করল— সঙ্গে তেঁতুল, লঙ্কা। বিশাল উঠোনের প্রান্তে ধনেক্ষেত। ফুলের আড়ালে কচি ফল ধরেছে। দু বোন আজ বিকেলে মাইল দুয়েক পুবে শিবকুন্ডে যাবে। যে দীপু পান্ডববর্জিত অঞ্চলের জন্য আজও খেদ জানায়, শিবকুন্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কালেভদ্রে আত্মীয় কেউ এলে, একবার টেনে না এনে ছাড়ে না। ছোটপাহাড়ের মাথায় উষ্ণ প্রস্রবণ। মন্দির এবং ধ্বজা। উন্মুক্ত চত্বরে বসে থাকলে, চারপাশের জঙ্গল, বাতাস, বুনোগন্ধ সুদূর ব্যাপ্তিময়তা অহংবোধ ছোট করে দেয়।

শৈল দেয়ালের ওপাশের মস্ত ঘরটায় ঢুকে গেল। বিছানায় পরমেশ। বালিশে কাৎ। সোজা দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে শিবকুন্ডের ধ্বজা দেখা যায়। পরমেশের চিঠি পেয়েই শৈল এসেছে কলকাতার উপকন্ঠ থেকে। যখন পরমেশের ৬৫ বছর, ক্যান্সার অপারেশন সাকসেস্‌ফুল করে ডাক্তার হেসেছিলেন, 'অন্তত পাঁচ বছর আয়ু বাড়িয়ে দিলাম!' বর্তমানে ৭৩-এ পৌঁছে রোগ পুনরায় উপস্থিত। ডাক্তার জবাব দিয়েছেন। চেষ্টা হয়েছিল না জানাতে, পরমেশ ধরে ফেলেছে।

কালশিটে কোটরের মধ্যে, একজোড়া কালো অঙ্গার, ফর্সা, চামড়ায় অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা, সারা মুখে ছিটোন আঙুল খানেক ধবল দাড়ি। মোড়াটা বিছানার কাছাকাছি টেনে, শৈল জিজ্ঞেস করে— চা খেয়েছ?

পরমেশ উঠে বসল।

—চা তো খাই না। পুরনো অভ্যেস...মন নেই?

—তাই তো! তাই তো! এত সহজে ভুলে যাওয়ায় শৈল লজ্জা পেল।

বাবা দেশের বাড়িতে মজলিশে বলতেন— আমার তিন দেবতা তিন ফুলে সন্তুষ্ট! একজন চায়ের কাপ ধরতে পারলেই খুশি, দ্বিতীয় নৈব নৈব চ, তৃতীয়কে দাও ভালো, না দিলেও শিব-ভোলা।

বাবা থাকতে-থাকতে তিন বোনের বিয়ে। শৈল, দীপু আর লাইলির। কুট্টি আর রাধা—বাকি দু'জনের পরে।

লাইলি আজ নেই। ছেলেমেয়েরাও যোগাযোগ রাখে না— সম্ভবত আসামে থিতু হয়েছে।

দেশের বাড়ি পুজো বা বড়দিন, তিন মেয়ে-জামাই, নাতি নাতনি...আজ পাঁচ-সাত দিন সেইসব অতীতের স্থান ও পাত্র দুর্গের মতো বাড়িটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কিছুই পালটায়নি।

প্রথম দু'তিন দিন— শৈল পৌঁছে—খুব বিশ্রি কেটেছিল। পরস্পর দুই বোনের অচেনা অথচ নিজ বিবাহিত জীবনের উগ্র সত্য, —৪০-৫০ বছরের ভাঙাচোরা অভিমান প্রত্যাভিমান—সম্পর্ক ফেড-আউটের নতুন সম্পর্ক—মৃত আদিনাথ—জীবন্মৃত পরমেশ— বৈধব্যলাঞ্ছিত শৈলব, বয়সভারের চোখ, চুল, সাদা থানের পোশাক — বেতো, পুলো, পাথর ধরা দাঁত এবং চলাফেরায় বুকে হাঁপ ওঠা দীপ্তির দাম্পত্য জীবন—প্রথম দু'দিন তিনটি হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল, জুড়ে একটি সেতু বানাতে পারেনি। তিনটি প্রাণী যেন ছোট্ট সময়টার চাপে শুকোচ্ছিল। তারপর পাতালের রস শেকড় বেয়ে তিনজনকে সঞ্জীবিত করল। দুর্গের মতো বাড়িটায়, বহু মানুষের আলাপে, সৃষ্টি হলো লম্বা পথ—যার বুকে পা রেখে বহুদূর ছুটে যাওয়া সম্ভব।

—বারান্দা আর ঘর, একটি মাত্র দেয়াল—মনে হচ্ছিল তুমি... তোমার খাট-বিছানা ক-ত দূরে! টের পাচ্ছিল দীপু আর আমি...?

—পালংয়ের গোড়া আর সরষে...?

ফ্যাসফ্যাসে হাসিতে, শৈল, যৌবনের হা হা হাসিতে ফাটবার চেষ্টাতে ফের বিষম। মোড়াটা বিছানার এত কাছে, পরমেশ মাথায় হাত রাখার ভঙ্গি করতেই, শৈল নিজেকে সামলে বলে—মনে পড়ছে!

—ছেলের বউ! এগার দিন কম কথা। কী?

—হবে।

খেলা জমল না দেখে পরমেশ খুলে বলে—আমাদের সান্ত্বনা! কেউ ভাবে না! সে মন কোথায় আজকাল? ধুর ধুর!

পরমেশ! বিষয়টা এড়িয়ে শৈল জিজ্ঞেস করল—এ দুর্গটা কিনলে কেন?

—সস্তায় পেয়েছিলাম।

—সস্তা? তোমার আদিনাথদা যে বলেছিল এটা খ্রিস্টান সাহেবের সম্পত্তি? খাঁটি বিলেতের?

—খাঁটি না ছাই! ট্যাশ!... কেন কিনলাম? সব কেন উত্তর মেলে না বড়দি! পরমেশের করুণ

হাসিতে মৃত্যুর প্রতিবিম্ব।

শৈল বলল—এত বড় জায়গা পেলে বর্তে যেতাম! তোমার আদিদাও কয়েকটা বছর বেশি বাঁচত।

—ভুল। মানুষ জায়গা পেলেও কাজে লাগায় না।

—লাগায় না?

—পেছনে পড়ে থাকা সময়টা কি কম জায়গা? কে ভ্রুক্ষেপ করে!

—পেছনে? স্মৃতির কথা বলছ?

—তবে?

—বলেছিলাম...গাছ যেমন... ছোটাছুটি করে...মাটি থেকে ফুলে! দীপ্তি ঢুকল। ঠিক ঢোকা বলা যায় না, পা রাখল।

—সর্ষে, বারোটা কিন্তু বাজে, বাটবি না?

—একটু গল্প করি। বস। খাওয়া তো...

—বুরখা ঠিক দু'টোয় আসবে....হ্যাঁ, কাজের বউটার স্বামী...মাথা খারাপ? টাঙ্গা ছাড়া যেতেই পারব না।... কেন আবার কি, আমার শরীর হাঁটলেই..শিবকুণ্ড কম দূর? পরমেশ ম্লান দৃষ্টিতে বলে—গল্প করছে করুক। না হয়, রাতে সর্ষে হবে।

—রাতে সর্ষে বাটতে নেই। দীপ্তি গম্ভীর ।

ক্ষেত তো আর উড়ে যাচ্ছে না ! একদিন হবেখন।

দীপু বড়দির মুখ চেয়ে থাকতে, শৈল আলস্যে 'থাক দু'টোয় যখন বেরচ্ছি'...বলে 'তরকারিটা চাপিয়ে আয়...বরং গল্প করি'—লম্বা শ্বাস ফেলল। পরমেশ মাঝে -মধ্যে ওঁ—ঠিক ওঁ নয়, কাছাকাছি ভঙ্গির বিষণ্নময় ধ্বনি তুলে সিগারেট ধরায়।

খেও না পরমেশ।

— কেন বাধা দিচ্ছেন। যা হবার হয়ে গেছে!

—বাধা ভাই কে কাকে দিতে পারে। মানুষটাকে রাখতে পেরেছি? চারশ, সুগারেও লুকিয়ে মিষ্টি খেয়েছে।

হেসে উঠল পরমেশ।

—আদিদা বরাবরের পেটুক।...একবারই এসেছিল এ বাড়িতে...সস্তাগন্ডার দিন তখন...চুটিয়ে খেয়ে গেছে। ওরাই প্রকৃত সুখী মানুষ।

— কেন?

বেঁচে থাকাটা দশজনকে টের পাইয়ে দিতে পারে।

—আর হঠাৎ মরে যাওয়াটা একজন টের পায়—স্ত্রী। গলগ্রহ!

শৈল কিছুই ভাঙল না আর। অনুক্ত রেখে দিল, আদিনাথের তৈরি আড়াই কামরার বাড়িতে এখন কোনও স্পেস নেই। ছোটা যায় না। দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনী, এবং দুই মেয়ে। যদিও দু'ভাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে সংসার করছে এবং মেয়েরা বিবাহিত। এখানে সময়ের অগ্রপশ্চাৎ কিছু নেই, প্রয়োজন দাঁতে চেপে বর্তমান হয়ে আছে শুধু। এই টেনশনেই শৈল অভ্যস্ত। তাতে কখনও বেনিয়ম ঘটলে ঘুমের ট্যাবলেট দরকার হয় রাতে। অথচ আদিনাথের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকার তার একার। বিধবা পেনশনও কম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এ টাকায় শৈল প্রাণধারণ করে না—অতিরিক্ত স্বাধীনতা আসে মাত্র। অলকেশের কাছে অন্ন বাঁধা, প্রণবেশ হাতখরচা পাঠায় মাসে মাসে। মেয়ে-জামাইরা মাঝে মধ্যেই দেয়-থোয় মন্দ না। তবু টেনশন! প্রতিমুহূর্তে সম্পর্কের নতুন টানপোড়েন। সামান্য টোকায় ঝন্ঝন্ বেজে ওঠে। এর চেয়ে সম্পর্ক বাতিল বা তালগোল পাকিয়ে থাকা ভালো। প্রত্যাশা থাকে না তখন। পরমেশেরও এমন ভাবনা—হবহু নয়—ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে। অথচ আন্তরিক দুর্ভা বনার চিঠি পেয়ে মনে মনে সার্থকতার আলাপ সৃষ্টি।

দুপুরে ডাইনিং টেবিল তিনজন। অথচ দূরে দূরে চেয়ারে কত মানুষ! আদিনাথ শীতের সিজনে খেজুর রসের পায়েস খাচ্ছে শ্বশুরমশাই অনুকূল চাটছেন তৃপ্তিসহ সরষে কৈ; এমন কি লাইলিও আছে আসরে। শৈল এমন প্রগলভা হয়ে উঠল, অতীত চাবি খুলে ক্রমাগত সময়কে টেনে ছড়িয়ে ফেলছে। টেবিল ঘড়ির জোড়া কাঁটা কখন যে ডেডস্টপ— টের পাচ্ছিল না কেউ বুরখা তখন বস্তিতে, রওনা হবার আগে ছেঁড়া কোট, চাবুক এবং টাঙ্গা জুতছিল। ঘোড়াটাকে শীতের রোদে আদর জানিয়ে, লোমের এঁটুলি মারছিল টিপেটিপে।

...বাবা বলতেন, মনে আছে, চুনের দেশের ছেলে! বিয়ে দেব? আমাদের মত চাইলেন। মত দিলাম আমরা, বুঝলে পরমেশ, দেশ যেখানেই থাক, ছেলের তো আর চুনের মতো ধক্ নেই।

—নেই মানে? দীপু হেসে বলে—তুই কি বুঝবি তার দিদি! আমার শ্বশুরবাড়ি ভূতের সংসার।

দেহাত অঞ্চলটা চুনাপাথরের জন্য বিখ্যাত।

লাইলি কম কথা বলে। বিয়ের পর পরমেশের ইয়ার্কির শালি বলতে ষোল বছরের লাইলি। আদিনাথ এবং শৈল তখন বজবজে। লাইলির ওপর যত্ন-আত্তির ভার নতুন জামাইয়ের। ওর চোখজোড়া ছিল খুবই সুন্দর। পরমেশ পালঙ্কের বাজুতে হেলান দিয়ে বসলেই 'কি মশাই, দিদি পাকাচুল দেখলে কী বলবে?' বলে লাইলি পেছনে দাঁড়াত।

এক দুপুরের নিকট সম্পর্কের জোরে পরমেশ চুম্বন করেছিল; কবুতরের মতো উষ্ণ স্তনে কথাঞ্চিৎ স্পর্শের শিহরণে একঝলক রক্তের ছায়ায় সেই যে মেয়েটা পালাল, দু'দিন কাছে ঘেষে না। দীপ্তি দেখেনি; তবু সন্দেহ এবং অভিমান। বউয়ের কাছে কত রাত মিথ্যে শপথ করতে হয়েছিল।

হঠাৎ পরমেশ বলে—আজ কে কোথায়! লাইলিকে একদিন... মনে পড়ে!

—ভোল নি? দীপুর কথাটার মধ্যে ঈর্ষার অসংযম স্পর্শ ছিল।

শৈল সাড়া দিল না স্বামী-স্ত্রীর রহস্যময় কথাবার্তায়। এঁটো বাসনে মৃদু হাত বুলিয়ে বলে—ওকে মেরেছে! যে যাই বলুক.....গলায় দড়ি সাজান।

—এবং তা রমেন। লুফে নিয়েই পরমেশ এবার মন্থর ভঙ্গিতে অভিমত ছুঁড়তে থাকে—ওর বরটাই খুনি।...বরাবরের রহস্যময়।

—যাঃ! রমেনের কী স্বার্থ? দীপু তাড়িয়ে ধনেপাতা বাটা জিভে ছোঁয়ায়।

—তোমরা কেউ বুঝবেনা, বললাম তো! চোখজোড়া মনে আছে? কুৎকুৎ করত, ঝেড়ে কাশত না কোনোদিন। বলতে আজ বাধ্য, বাবা মেয়েটাকে স্রেফ গোবিন্দায় নমঃ...

শৈল আপত্তি জানায়—না পরমেশ। বাবা নিমিত্ত, সব ভাগ্য। কেউ জেনে-বুঝে সন্তানকে জলে ফেলে না।...মেয়েসন্তান হলেও না।

—আমি ঠিক দোষ দিচ্ছি না...তৃতীয়বার শ্বশুরবাড়ি না পাঠালেই পারতেন।

—আজ এ আলোচনা কেন? দীপু প্রায় ধমকে উঠল।

—কিসের আপত্তি? পরমেশ বিরক্ত হলো বাধা পেয়ে।

—জীবিত বোনদের নিয়ে তো কথা বল না?

—দেখো দীপু, পরমেশ সিরিয়াস হয় বলে, আমি কোনোদিন এ প্রশ্ন তুলিনি।

—তাই বলে এখন পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবে?

—ঘাঁটব। তোমার সে বোধ নেই।...জীবনের পেছন ও সুমুখ, দু'টো সময়...আসলে একটা। পেন্ডুলামের মতো দুলবে। তবেই না মানুষ!... দেশটাকে দেখেও শিক্ষা হচ্ছে না?

বুরখা হাজির। দুর্গবাড়ির অভ্যন্তরে খাওয়ার টেবিল ঘিরে যারা বসেছিলেন হঠাৎ সভা ভেঙ্গে চলে গেলেন। ঘরটা নিঝুম হয়ে যেতে দুই বোন এবং পরমেশ স্তব্ধতায় ডুবে গেল। অথচ দীপুর সংকল্প, পরমেশের দীর্ঘায়ুর জন্য পুজো দেবে। বিশ্বাস বিজ্ঞানকেও নাকি হারায়। বুদ্ধিতে সব কিছুর ব্যাখ্যা নেই—দীপু ভাবে।

কিন্তু পরমেশ সামান্য আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধও বা, লাইলির প্রসঙ্গ দীপু চাপা দেয়ায়। আজও ওর সন্দেহ যায় নি? হায় মানুষ!

দুই প্রৌঢ়া—শাড়ি এবং সাদা খোলের বৈপরীত্যে, শীতের প্রস্তুতি নিয়ে—ধীরে উঠোন পেরিয়ে ভাঙা টাঙ্গাটার সামনে দাঁড়াতেই ভূতসর্বস্ব চেহারার বুরখা হলদে দাঁতে একগাল হাসে। এ বাড়ির সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কে। বউ কাজ করছে ঝুনুর জন্ম থেকে। বিপদে-আপদে বুরখা 'মাই জি বলে মাথা চুলকোলেই দীপু উদার।

সাবধানে উঠে বসতেই ঘোড়া দৌড়য়। লাল, কাঁকুড়ে, মাটির রাস্তায় গাছ-গাছলির ছায়া সামান্য পশ্চিমে ঢলছে। শৈল বলে দীপুকে—ইস্! দেখতে দেখতে এগারটা দিন?

—কার জন্য সংসার-সংসার করিস?

—কার জন্য আবার? পোড়া অভ্যেস?

— কেউ দুঃখের রাতে পাশে থাকে না। যারটা তার!...যদ্দিন চায় মন, থেকে যা। ঘোড়া দৌড়য় ক্ষুর ও চাকার শব্দে।

জনবসতি ছাড়িয়ে যেতেই তাপমাত্রা আরও কম। দু'ধার ফাঁকা। ঢেউখেলান রুক্ষ মাটি মুক্তি পেয়ে ছুটে গেছে দিগন্তে। মনে হলো চুনাপাথরের খনিকেন্দ্রিক ছোট্ট শহরটা ফুরিয়ে গেল ঝপ্ করে। টাঙ্গা-পথ যেখানে শেষ, পাহাড়ী ক্যাকটাসের পাশে বুরখা গাড়িটা থামায়। ওরা দু'জন সামান্য পাকদণ্ডীর পথ হেঁটে যায়। টাঙ্গাটা মুখ থুবড়ে থাকে, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। চোখের কোণে মাছি ও ঘা নিয়ে প্রাণীটা নিঃশব্দে ঘাস খায় আর পাতলা পায়খানা করে।

আড়ম্বরহীন, ছোট্ট মন্দির। পুরোহিত পাশের ঝুপড়িতেই। শিবলিঙ্গ ছাড়া বিগ্রহ নেই। নিম্নজনগোষ্ঠী, গরিব অথবা নিত্যান্ত তাপিত কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মন্দির চত্বরে বসে আছে। পুরোহিত দীপুর পরিচিত। ওদের ভাষায় কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর, মানতের জন্য বিশেষ আরতির ব্যবস্থা হলো। নইলে, যা কিছু অর্ঘ্য, লিঙ্গদর্শনের পর, ভক্তরাই ছড়িয়ে দিয়ে যায়; খুব ভোরে পুরোহিত কুড়িয়ে নিয়ে টাটকা পুজোয় বসেন। কোনো গাছের আড়ালে কিছু মাটির ঘোড়া বা শাখায় বাঁধা আছে অসংখ্য পাথর, ছোট ছোট।

দুই প্রৌঢ়া মন্দির প্রদক্ষিণ শেষে, শীতের গোধূলিতে পশ্চিমমুখো চ্যাটালো পাথরটায় শান্ত বসে রইল। বেশ লাগছে। কাঁপতে কাঁপতে সূর্যটা ঝপ করে অদৃশ্য হতেই, বিধুর রক্তরাগে দিগন্তের জঙ্গলরেখা ঘন কালো হয়ে উঠল। এই দিনটা আর ফিরে আসবে না।

—ঐ আমাদের বাড়ি!... দু'টো ঝাঁকড়া গাছের ফাঁক দিয়ে... হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তারপর পরস্পরের কোনো আলাপ নেই। মৌন। যে যার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শৈল, গভীর একবিন্দু ঈর্ষা, দীপুর ওপর। এগারো দিনে যতই ঘনিষ্ঠতার গাঁটছড়া বাঁধুক, কিছুতেই অলিখিত ব্যবধান ভুলতে পারছে না। দীপু হয়ত জীবনে অনেক বেশি পেয়েছে, সিঁথিতে আজও সেই রক্তিম চিহ্ন স্পষ্ট। সে? অতৃপ্ত। জীবনের যে পর্ব পরস্পরের ব্যক্তিগত,—ঈর্ষা, অতৃপ্তি তখন থেকেই মনে চেপে আছে। এ ব্যাধি থেকে পরমেশের মুক্তি নেই। নিশ্চিন্ত জেনেও কি করে দীপু পুজো দিতে এসেও সোনার জোলাবালা পরল কে জানে! শৈলকে ব্যবধান বুঝিয়ে দেয়ার জন্য?

—মটররুলি? কবে গড়ালি?

অস্পষ্ট আবছায়ায় শৈল বোনের মণিবন্ধ স্পর্শ করতেই, দীপু সচকিত। সে-ও অনুশোচনায় মগ্ন। এমন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও উপেক্ষা দাম্পত্যজীবনে দিদিকে ভোগ করতে হয়নি। পরমেশ মানুষটা...থাক, আজ শেষপর্যায় তার। তবু দীর্ঘশ্বাস ও ব্যথা মোছে না দীপুর।

—গত পুজোয়। ঝুনুর বউয়ের জন্য...

—মেয়ে ঠিক হয়েছে?

—না, না। কোন্ রাজকন্যা যে পছন্দ, ছেলেই জানে!... তবু ভবিষ্যৎ রেখে যাই। এরপর দীপু বলে, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি—সারাজীবন পরমেশকে লুকিয়ে— ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, এমন কি অনাগত নাতি-নাতনিদের জন্যে কেমনভাবে তিলে তিলে জমিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান্তেই নিজেকে কেমন এগিয়ে দিচ্ছে রিলের ব্যাটনের মতো। পরমেশ কি তাই বলেছিল, পথ একটাই?

শৈল তখন চত্বরের শীর্ষ থেকে নিজের বাড়িতে—আদিনাথের স্মৃতিজড়িত বাসস্থানে—চলে

আসে, এবং হিসেব কষে, সে-ও স্বামীর পেনশন গোপন-সঞ্চয় করে যাচ্ছে জয়া কিংবা জয়ার বিয়ের কথা ভেবে। বাঁচবে কিনা ততদিন, শৈল ভুলে যায়। প্রতিমাসে, ডাকঘরে নির্দিষ্ট ক'টি টাকার ওপর অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। সে-ও নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে ঐ ব্যাটনের মতো। দুই বোনের গোপনীয়তার মিল পেয়ে শৈল হাসল। শুধু কি পার্থিব সম্পত্তি, শৈল দিদিমার মুখ থেকে যে পরনকথাগুলো শুনেছিল সুদূর শৈশবে, বিছানায় জয়াকে তা শোনাতে শোনাতে এখন মুখস্থ মেয়েটার। বড় ছেলে প্রণবেশ পুজোয় মাকে দেখতে এসেছিল। দুপুরের তন্দ্রায় শৈল টের পায়, জয়া চার বছরের ভাইকে 'পরণকথা' বলছিল।

ফেরার পথে জ্যোৎস্না উঠল। ঠান্ডা এবং ব্যাপৃত অজানায়, জঙ্গলের ছায়া, গন্ধ এবং ঝিঁঝির ডাকে ভাঙা টাঙ্গাটা ঘিরে মাত্র চারটে প্রাণী।

এরা দু'জন, রুগ্ন ঘোড়াটা এবং ভূতসর্বস্ব চেহারার বুরখা। মাঝে মাঝে সে অদ্ভুত শব্দ করছিল মুখে। শৈল চারপাশের পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহ্বল। নানারকম বিশ্বাস ও ভাবনায় মিহি চন্দ্রালোকপথে হঠাৎ সে পরি হয়ে গেল। অদ্ভুত দু'টি ডানা পেয়ে উড়তে থাকে। যেন এতদিন সে পথ হারিয়ে ছিল। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে লাইলি, আদিনাথ, বাবা এবং কত মানুষ একঘরে বসেছিল। এই মুহূর্তে অদ্ভুত ডানা দু'টি মেলে এমন সব পরিচিত ও আত্মীয়দের মুখ ছুঁয়ে গেল, যারা পৃথিবীতে আসবে। ডানাজোড়ায় আলো পড়েছে। শৈলর যাত্রাপথ জেটপ্লেনের মতো আকাশে শুভ্রখচিত হয়ে রইল।

অন্ধকারে দীপু দেখে, অসুস্থ পরমেশ দরজায় উৎকণ্ঠিত। 'আমায় ভুলে গেছলে?' চিৎকার করছে। অথচ পথ যেন শেষ হয় না, ঘোড়াটা নড়ে না, বুরখা যেন ভুলে গেছে বাড়ি পৌঁছতে হবে। কিন্তু শৈল কিছুই দেখতে পেল না। পরমেশ, দুর্গবাড়ি, টাঙ্গা, দীপু—সব লুপ্ত। কেবল অলকেশ এবং মায়াকে লুকিয়ে মধ্যরাতে চুপিচুপি জয়ার পিঠে ডানা দু'টি বেঁধে, ছোট্ট চুম্বনে বলল 'আমি মরলে কাঁদবি না তো!

মুক্তাক্ষর, ১৯৯৩

জ্যোৎস্নায় পার্লামেন্ট

দ্বিতীয় রক্তপাতের ঠিক ১৪ ঘন্টা আগে ওঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ইনিই যে অম্বুজাক্ষ প্রধান— ধলঘাটের এম. পি.—দূর থেকে বাতলে না দিলে বুঝে ওঠা শক্ত। সাধু সন্ন্যাসী, টিকিটচেকার বা বিয়ে করতে যাওয়া বরের মতো এম.পি.দেরও চিনে ফেলা যায় কী ভাবে! সাইরেনসহ কনভয় বা মঞ্চ ময়দান-টিভিতে বিশেষভাবে ফলাও না হলে ভি.আই.পি-দের শনাক্তকরণের চটজলদি কোনও কায়দা নেই। বিশেষ দু-চারজনের কথা নিপাতনে সিদ্ধ। জামার কলারের পেছনে ছোটছোট ব্যানার, পকেটের ওপার স্টিকার বা কাঁধের কাছে লোগো— মেম্বার অব দি পার্লিয়ামেন্ট—লিখবার বাধ্যতামূলক আইন চালু থাকলে পরিচয়বিভ্রাট হত না। সুতরাং বাতলে দেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই ভুজেন্দ্র ব্যক্তিগত চিঠি শুরু করেছিলর, এই প্রসঙ্গে, এই ভাবে...

মান্যবরেষু,

ব্যক্তিগত পরিচিতির সূত্রে পত্রলেখককে শনাক্তকরণ সম্ভবে না। ইহা ঘটে নাই। আপনিই অম্বুজাক্ষ প্রধান—চাক্ষুস উপলব্ধি করিয়াছিলাম সপ্তাহখানেক পূর্বে, ধলঘাটের বাসস্ট্যান্ডে। এই গৌড়ভূমিতে একটানা তিনবার নির্বাচিত হইবার সাফল্যে আপনার নাম কিঞ্চিৎ বিদিত। আপনার দল দেশের তুলনায় অতি ক্ষুদন হইলেও ধলঘাট আপনাদের কব্জায়; স্বাধীনতার পর হইতেই। তথাপি ৪৫ বছরে দলের কোন্দল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও বিতাড়নে তৃণমূল সংগঠন বেশ খানিকটা লুজ হইয়াছে। নিছক সংগঠনের জোর নয়, আপনি জেতেন ব্যক্তিগত কৃৎকৌশলেও।

যাক্, অম্বুজাক্ষ প্রধান বলিতে ঠিক কোন মানুষটিকে বোঝায়, কী তাঁহার চেহারার বিশিষ্টতা, নেতা হইবার কী কী বাড়তি গুণ উপস্থিত—চোখজোড়া মুহূর্তে চারপাশ ধরিতে পারে কিনা, হাঁটা-পোশাক চুলছাঁটা এবং উপস্থিত বুদ্ধি কেমন—মানুষের স্বাবিক কৌতূহল থাকিবেই। রাজনীতি-বিদদের মুন্ডুপাত করিলেও একেবারে চোখের ওপর দেখিবার সুযোগ পাইলে জনগণের বুকের মধ্যে সামান্য বিস্ময় মোচর দেয় বৈকি।

আপনার ডাইনে এবং বাঁয়ে মাত্র দুইজন কাডার—দলীয় কর্মী; উহাদের তোষামুদে কথাবার্তায়

আপনার আকর্ষণ ছিলনা—উভয়ের মাথা টপকাইয়া আপনি চোয়ালের ছোট ছোট উঠা-নামায় পান চিবাইতেছিলেন। আপনি এবং আমরা একই বাসের অপেক্ষায় ছিলাম।...

ভুজেন্দ্র এবং সঙ্গীরা দাঁড়িয়েছিল। মোট চারজনের ছোট্ট দল। জিলাশহরে কবি সম্মেলন সেরে ফিরছিল কলকাতায়। সারাদিন ধরে স্বল্প সুরাপানে হালকা ভাব। বিকেল সাড়ে তিনটায় বাস—তিনটা পঁয়ত্রিশেও গ্যারাজ থেকে স্ট্যান্ডে ঢোকেনি। ঝুপড়ি থেকে সিগারেট কিনে বিশ্বজিৎ ভুজেন্দ্রর কানে কিছু বলতেই 'তাই!' ভুজেন্দ্র সামান্য ঘুরে 'অম্বুজাক্ষ প্রধান? কে বলল্? সন্দেহ প্রকাশ করতে করতে বিশ্বজিৎ বলে—নাম-ফাম জানিনা। দোকানদার বলল—লোকাল এম.পি. যাচ্ছেন।

—ঐ সামনের ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা! আচ্ছা! ধলঘাটের এম.পি. তো অম্বুজাক্ষ প্রধান।

—হবে।

ভুজেন্দ্র দেখতে পেল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর নজরবন্ধ একটি অ্যারিস্টোক্রেট। বাজেট সেশন শুরু হবে। হয়তো শাসকদলের বিরুদ্ধে শাণিত প্রশ্নবাণ এবং পরিসংখ্যানের বারুদে ঠাসা। টালমাটাল পর্বে, বলা যায় না, বর্তমান সরকার গদিচ্যুত হতে পারে বাজেট পর্বের লড়াইতে। ওঁর একটি ভোটই অত্যন্ত ফলবান এবং সত্যিই যদি পার্লামেন্টে ঘটে যায়—মিডিয়া ও জনমানসে টালমাটাল শুরু। কে ভাবতে পারছে ভারতের প্রত্যন্তে ধলঘাট বাসস্ট্যান্ডে ফাল্গুনের সাড়ে তিনটায় যিনি দাঁড়িয়ে হাব্বা মুডে পান চিবোচ্ছেন, যার পোশাক বলতে ফর্সা, ইস্তিরিপাটের খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং ধুতি, কলকব্জা ও রক্ত- রসের সরু মোটা পাইপ নিয়ে দৈহিক খোলটি চকচকে মেদের পাটিসাপটায় বিট-গাজর ও শশাপিঁয়াজ পাকানো পরোটা মনে হয় যাকে, সরকার পতনের সম্ভাব্য বিস্ফোরণের আগে কানাচের টাইমবমের মতো সাধারণ মানুষটি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন? এম. পি. থেকেও স্ট্যান্ডের কর্তৃপক্ষের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ইতিমধ্যে ২৫ মিনিট লেট, এখনও গ্যারেজ থেকে বাস আসেনি। পৌনে আটটায় ট্রেন—তিনঘন্টার জার্নির পর জংশন স্টেশন থেকে ধরতে হবে। তারপর কলকাতা এবং রাজধানী। বাজেট অধিবেশন। দায়িত্ববোধ আছে কর্তৃপক্ষের? কিন্তু এম. পির মধ্যেও হুটোপাটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। হয়ত এ যাত্রীদের না নিয়ে ট্রেন যাবে না; যতই বিলম্ব হোক। অথবা এটাই গৌড়ভূমির ধারাবাহিকতা।

ভুজেন্দ্রর দলের অন্যদের ভাবনা বা মাথাব্যথা নেই এম.পি.-কে নিয়ে। ও চোখে গগলস চড়িয়ে আছে, কিন্তু ভি.আই.পি.-র ব্যাপারে নিরাসক্ত নয়। এককালে রাজনীতির ছোঁয়ায় থাকলে যা হয়। খুব ছোটবেলায় অম্বুজাক্ষর দলের সমর্থক ছিল। তাই চিঠির পরের অংশে উল্লেখ করেছিল।

...বাস ছুটিতেছিল ৭০-৮০ কিলোমিটার বেগে। হঠাৎ ইচ্ছা হইল, কোন সিটে, কী ভাবে আপনি বসিয়া আছেন। এক্সপ্রেস বাসের গদিতে ডুবিয়া থাকার লুকাচুরিতে আপনাকে পাইলাম না। অবশ্য আমি চেষ্টায় পরিপূর্ণ ছিলাম না, কারণ বেলাশেষের দীর্ঘ গতিপথে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুই পাশের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে নিবিড় হইয়াছিল। গৌড়ভূমিতে কেবলমাত্র, আমার অদেখা,

এই জিলাটি। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায় সব কিছুই মুখোমুখি আকর্ষণীয়। ছোটখাট নদী—দেশদশান্তরে বহমান, কংক্রিটের নতুন সেতু, ছবির মতো লেপা-পোঁছা আদিবাসীকুটির, মাঠের মাঝে টিউবওয়েলের 'হাইপারবোলিক' জলের ধারা, মাঝে-মাঝে জনপদ, হাট বা পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় পাকা-দালান, জাতীয়পথের দুইপাশে সামাজিক বনসৃজনের বাবলা, ইউক্যালিপটাস—সর্বোপরি দিগন্তখোলা পথে ছুটিবার গম্ভীরতায় মনে হয় কিছুই থামিয়া নাই; বদলাইতেছে।

হঠাৎ দেখিলাম সামনের একটি জোড়া-আসনে আপনি আরামে মাথা সঁপিয়া ঝিমাইতেছেন। আপনার পার্টনারটি নেহাৎই কিশোর—ব্যাগ, ব্রিফকেস পাহারা ও টানিবার জন্য আছে। বুঝিলাম অ্যাটেনড্যান্ট। জনা দুই যাত্রী—গ্রামের উঠতি পয়সাওয়ালা বোধ করিলাম—মাঝপথ হইতে উঠিয়া ঠিক আপনার ঘাড়ের কাছে ঢুশাইতেছে। যত্রতত্র থামিবার আইন নাই বাসটির। তবু যেন প্রথা হইয়াছে। ড্রাইভার কন্ডাকটরদের 'টু-পাইস' হয়। কিছু বলিলে উল্টো শুনায়. পরিবহণের দুর্মূল্যে গ্রামের মানুষদের জন্য অত আইন মানিলে হয় না। আইনের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য আইন?

আপনি ক্লান্তির ভারে তন্দ্রায় ডুবিয়া বদ্ধপরিকর অথচ বাহিরের পৃথিবীর মানুষ মুক্ত বেলাশেষে শস্যের দানার মতো রহস্যময়—হাটে, রাস্তায়, পল্লীতে, দোকানে বা মাঠঘাটের আলপথ ধরিয়া কোথাও পাড়ি দিতেছে। কখনও বা বিস্ময়ে আমাদের বাসটি দেখিতেছে; জানে না আপনি—নির্বাচিত এম.পি.-টি—এই গাড়িতেই আছেন, সঙ্গে ব্রিফকেস— ভিতরে প্রশ্নবান ও কাগজপত্রের বারুদ। ভোটাভুটিতে সরকারের পতন ঘটিতে পারে। আপনাকে ঝিমন্ত দেখিতে মন চাহিল না। তাই দেখিলাম আমার পাশেই বসিয়া। এতক্ষণে খুঁটিয়া দেখিবার সুযোগ হইল। আপনার দেহের সুন্দর গন্ধ আছে—যা মাখিলেই 'ইম্‌পরট্যান্ট'-'ইম্‌পরট্যান্ট' মনে করাইয়া দেয়। আবার ঘাম ও ধুলার ঘ্রাণও পূর্ণ লোপ পায় নাই। বুকময় কাঁচা-পাকা চুল, ফুলো-ফুলো তর্জনীর নিকোটিন হলুদ নখ; মেট্রোপলিসের ক্লোরিণ-আর্দ্র জল পান করিলে চামড়ায় যেমন, জৌলুস ফোটে, আপনার শ্যামল স্কিনও তেমন নিভাঁজ, টানটান, স্বাস্থ্যময়। চুল অতীতের বস্তু; করোটিবেষ্টিত কিছু শিরা-উপশিরা সর্বদা তেজোময় হওয়ায়, বুঝি হাইপ্রেসারের রুগী আপনি। নিশ্চয়ই সর্বিট্রেট সঙ্গে রাখেন। আপনার চক্ষুর দানা দুইটিতে গ্রাম্য ধূর্ততার প্রলেপ থাকিলেও, পাতাযুগল মেদে ফুলিয়া মানুষের প্রতি ক্ষমার্হ দৃষ্টি প্রতীয়মান হয়। বাস আপনার লোকসভার এলাকা দিয়া ছুটিতেছে। আমার কৌতূহলে জবাব দিলেন—এই নদীটা? ধরলা।

—আগেরটা?

—পুনর্ভবা। ব্রিজ ৮৮তে তৈরি...মুখ্যমন্ত্রী, আমি উদ্বোধনে ছিলাম।...তখন... বাসের গতিতে, বডি-কম্পনে পরস্পর আলাপের শেষ শব্দটি হারাইয়া যায়। অদ্ভুত!

—বাঁ দিকটা?

শুনিয়া বলিলেন—বর্ডার...কোথাও-কোথাও ৪/৫ কিলোমিটার...অনুপ্রবেশ আছে...ধ্যুৎ সম্ভব না'কি...!

—বিরোধীরা যে...

—ভোট!...ওরাও জানে...

বলিলাম—দারুণ আঁখ ফলেছে...চিনিকল...?

—পার্লামেন্টে আমি প্রস্তাব...হবে...বাধা...!

—এ পঞ্চায়েতটা?...কার দখলে...?

—গতবার লুজ্ করেছি...খারাপ এলাকা...খুন খারাপি...

—কেন?

—ধানকাটা, স্মাগলিং, গরু...যা হয়! হ্যাঁ হ্যাঁ, পয়সা আছে কিছু মানুষের...তারাই তো!

আগামীকাল দোলপূর্ণিমা। মাঝেমধ্যে দুইচারটি 'বুড়ির ঘরে'র প্রজ্জ্বলিত আগুন। গোধূলিতেই পশ্চিমের লালিমায় চোখ রাখিয়া নির্ভেজাল চাঁদ চলিল বাসের সঙ্গে।

—এই, এই গ্রামটি...দেখুন...।

তাকাইলাম।

—এমন ডোগরাশিল্পের কাজ সারা ভারতে...আমি ঘরে ঘরে ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা...পাই পয়সা শোধ হয়ে...

—ব্যাঙ্কের গচ্ছা যায় না?

—যায়!...তবে শিল্পপতিরা...তুলনায়...খুবই, খুবই...এই জেলা ফুরোচ্ছে, আমার এক্তিয়ারও...হ্যাঁ, মানুষ ঝুট-ঝামেলা চায় না...পিস্‌ফুল...ক্ষমতায় ঘাঁটি তো আমরা ভাঙতে পেরেছি...নিশ্চয় পাল্টেছে...দেখুন হাটের দোকানে...লিপস্টিক থেকে ক্যাসেট...সব...

আমি চপলতায় কানেকানে জিজ্ঞাসা করিলাম—কনডোম?

আপনি হাসিয়া ইংরেজিতে জবাব দিলেন—আপনি কি মনে করেন ও ব্যবহারের বিশেষ অধিকার উচ্চবিত্তরাই ভোগ করবে?

বলিলাম—স্যার, উচ্চবিত্তরাও অধিকারকে ভোগের বাধা বলে মনে করে।

ঘনিষ্ঠ মুখভঙ্গিতে বুঝিলাম উত্তরটি মনে ধরিয়াছে। তখনই অনুরোধটি জানাইলাম— ওপার থেকে একটা বিদেশি মাল...

—ধলঘাটের বাজারে খোঁজেন নি?

—অচেনা বলে সাহস পেলাম না।

—কি ধরণের?

—ইউমেটিক লেন্স! বহুদিনের শখ।

—কি করবেন?

—ডক্যুমেন্টরি বা অডিও-ভিস্যুয়াল কাজকম্ম...

আমার পরিচয় জানিয়া বলিলেন—কবি মানুষ তো! ভাবজগৎ নিয়ে কারবার! আমার সুপারিশ চাচ্ছেন কনে?

—ভুল হলো?

—আমি মন্ত্রী-ফন্ত্রী নই মশাই। সামান্য এম. পি.।

—কিন্তু সব এম. পি. তো মন্ত্রী নয়।...এখন ফ্যাশান হয়েছে রাজনীতিকদের পারলেই একটু চিমটি কাটা...দেখুন, আপনিও সামান্য বিদেশি মালের জন্য তেল দিচ্ছেন...সামলাতে পারলেন না... লোভ কেবল আমাদের জন্যই অন্যায়?

দেখিতে পাইলাম আপনি তন্দ্রাচ্ছন্নই এবং রডধরা যাত্রীটি ক্রমাগত আপনাকে চাপিতেছে। মনে হইল প্রথম অভিজ্ঞতায় এই দেশ, মানুষ এবং বৈচিত্র্য আমাকে নাড়া দিতেছে। আপনি কয়েকশত বার এই পথে ছুটিয়াছেন, জিপ বা হাঁটিয়া নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়াছেন, সামাজিক বিন্যাস মুখস্থ করিয়াছেন, মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াইতে পাশে দাঁড়াইয়াছেন, লাইসেন্স-প্রশাসন সেতু কালভার্ট হাসপাতাল-খেলার মাঠ, পুষ্করিণী উদ্বোধনে উপস্থিত হইয়াছেন.....

আজ তাই ঘুম বা জাগরণের বিশেষ হেরফের নাই। কন্ডাক্টরটিকে বলিলাম—দেখুন, কন্ডাকক্টার জিজ্ঞাস করিল—কোথায় নামবেন, এই যে ভাই?

—পীরতলা! লোকটি জবাব দিল।

—ফাঁকায় দাঁড়ান...আরাম পাবেন।

লোকটি কী বুঝিল, মালসহ দরজার কাছে বাসভাড়ার সুবাদে হেলায় বাহির করিল একগাদা একশত টাকার নোট।...

জংশন স্টেশনে পৌনে আট। হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। একরাতের জার্নি; কিছু খেয়ে না উঠলে পথে সুযোগ কম। দীপালি বলে—টানা-ফানা যাবে না।...বসে খেয়ে নি কোথাও!

দলের বাকি তিনজন নিরুদ্বেগে তিনমুখো হয়ে সিগারেট টানছে। প্রস্তাবে কেউ সাড়া না দেয়ায় শাসনের ভঙ্গিতে বলল—যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা দু'জন—হ্যাঁ আপনারা—ভুজেন্দ্র, মানবেশ—নরম্যাল না হতে পারেন, আমি আর বিশ্বজিৎ কুইট্ করব...অসম্ভব!

বিশ্বজিৎ বলে—ওদের ক্রাইসিসে আমরা ক্যুইট করব কেন?

—সারা বাস উনি জানলার বাইরে...ইনি স্রেফ ঘুম...কথা নেই, মজা নেই...এ জন্য কলকাতা ছেড়ে এসেছিলাম?

—তা কেন? কবিতা পড়তে।

—রাখো। ক-বি-তা!

—ওয়াইফ্ বলে কথা! .....আপনি জানেন না কী তুচ্ছ করিলেন! বিশ্বজিৎ হেসে লঘু হতে চায়। দীপালি বলে—এই যে এত মানুষ স্টেশনে, কে চেনে, কে নাম শুনেছে তোমাদের? ...কার ক্রাইসিসের জন্য তোমাদের কবিতা? ভেবে দেখছ? .... স্রেফ ঘুঁটের মতো ইগোর চাপড়ায় নিজেদের ঢেকে রেখেছ!

—সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ যে! ...ঘুঁটে? বাড়াবাড়ি! বিশ্বজিৎ বলে।

—কেন ? ইগো ছাড়া কী ? কাল রাতের ব্যাপারটা স্রেফ নেশা ?

হঠাৎ মানবেশ বাণীর মতো উচ্চারণ করে—সামনেই সমুদ্র!

ভুজেন্দ্র জবাব দেয়—আইস, আমরা সমুদ্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া পবিত্রভূমি ইজ্রায়েলে চলিয়া যাই!...ডিমের কারি আর রুটির ভালো দোকান...আমি চিনি...১৫ মিনিটে খেয়েই ট্রেন, ব্যাস। দীপালি যেভাবে প্রেস্টিজে পেস্টিসাইডস্ ছড়াচ্ছিল। বাব্বাঃ।

গতরাতে দু'জন রক্তারক্তি ঘটিয়েছিল। সকালে সেমিনার, বিকেলে কবিতা পাঠ এবং রাতে ছোট্ট শহরটা ঘুরে বড্ড শ্রান্ত ছিল এরা। দলটা ছিল সার্কিট হাউজে। দু'টো কামরা। মানবেশ এবং ভুজেন্দ্র। দীপালি ও বিশ্বজিৎ—স্বামী-স্ত্রী। কবিতা পাঠে মানবেশ ছিল শ্রোতাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ। হাততালি, অনুরোধ এবং কিছু যুবক-যুবতীর অটোগ্রাফ সংগ্রহ। খুশিতে এ ঘরে তাই মানবেশ একটি রেড-লেবেল ভদ্‌কার বোতল নিয়ে বসে। একটু পর, টুং টাং শব্দে, চুপিচুপি বিশ্বজিৎ। রাত একটায় সব উজার হয়ে গেলে, খালি গ্লাস তুলে মানবেশ বলে এই মুহূর্তে তাকে কিছু আনিয়ে দিতে হবে। ক্রমশ গোঁয়ার হতে থাকে।

—এনে দেবে শালা। আমাকে! হ্যাঁ, আমাকে!

—অনেক রাত হয়েছে! মা-ন-ব। ভুজেন্দ্র সাবধান করে।

—ড্যাম্ ইওর রাত! আমি মাল চাই!

—চ্যাঁচাস না! সার্কিট হাউজ জেগে যাবে!

মানবেশের চোখজোড়া ঘোলা এবং ভায়োলেন্ট। সামান্য শর্টস্ পরা। গেঞ্জি। মোটা বুকের লোম। গেলাসটা টেবিলে ঠুকে বলে—আমাকে...এনে দাও!

—মানব ! .....আমি বলছি...তুমি চ্যাঁচাবে না। ... গেট্ আউট করে দেব।

—বাইরে ? ভয় দেখাচ্ছিস, শালা।

—মোটমাট চ্যাঁচাবে না। আমি রেগে যাচ্ছি।

—ফো—ট্! এক্ষুণি মাল চাই...বিশ্বজিৎ, এই বিশ্বজিৎ!

স্বামী-স্ত্রী অনুশোচনায় চুপ।

—গ্লাসটা দাও বলছি! আমিও কম গিলিনি! হাতের স্ক্রু-প্যাঁচটি কষে ঘুরোতেই মানবেশ শেষ চেষ্টায় একখাবলা কামড় বসিয়ে দিল এবং রক্ত। পার্সোনেল রক্তের লালে, ভুজেন্দ্র দ্রুত দরজা ধাক্কায়—বিশ্বজিৎ।

স্বামী-স্ত্রী ছুটে আসতেই, 'ধর তো' গ্লাসটা ছিনিয়ে 'রক্ত বার করেছিস ? তালে দ্যাখ বাঞ্চোৎ!' বলেই পেশাদারি মারকুটের মতো কান, ত্রিনয়ন এবং ভাইটাল স্পট্ খুঁজে ব্লো কষাতেই, মাথা নুয়ে মানবেশ পড়ে যায় এবং অসহায় পশুর দৃষ্টিতে চোখের জল নিয়ে ভুজেন্দ্রকে অনুরোধ জানায়—মেরে ফেলো! ...মানুষের জীবনে কিছুই নেই, জিন্ এবং নার্ভ ছাড়া। ..... অতীত আর বর্তমান। .....আমার দু'টোই পচে গেছে। ...তোমরা কেউ খুন করো আমাকে।

সমস্ত শরীর দিয়ে মানবেশ কাঁদতে, ভুজেন্দ্রর গোঁ থামে। 'জল!' বলতেই, বিশ্বজিৎ, বাথরুম এবং ভরা একটি বালতি।

—এখানে নয়। দরজা খুলে লাশের মতো টেনে এনে গ্রিল ঘেরা বারান্দায় ভুজেন্দ্র বলে—ঢাল!

—সারা রাত থাকবে এখানে?

—তালা আছে।

ফিরে দরজা দিতেই বারান্দায় বমি, গোঙানি, প্রিয়জনদের স্মরণে মানবেশের কান্নার শব্দ ক্রমশ মফস্বলের রাতপোকার ঝঙ্কার একট একটু খেয়ে ফেলতেই গভীর শুনশান। সামান্য তুলো-ডেটলে ভুজেন্দ্র আশ্রয় নিয়েছে বিছানায়। এবং আরও ঘন্টাখানেক বিশ্বজিৎ বাড়াবাড়ির জন্য ধিক্কার দিতে হঠাৎ গভীর চমকের মতো দীপালির মুখে শুনতে পেল—শুধুই নেশার জন্য মারল? নাকি শ্রোতার হাততালি...

বিশ্বজিৎ নেশায় গ্লানির ঝলকানিতে বলে—মাথা নোয়াবার সুখ আমরা হারাতে বসেছি দীপু।

ট্রেনপর্বের শুরুতেই মানবেশ আর ভুজেন্দ্র নতুন বন্ধুতায় ফের পান করল। দীপালির নিষেধে পান-বঞ্চিত বিশ্বজিৎ জানালার ধারে। এবং দীপালি মৃদু কণ্ঠে ধরল গান। ইতিমধ্যে বিশাল নদী, দীর্ঘ বালিগর্ভ এবং সেতুর তলায় জলের ঝমঝম ওরা পেছনে ফেলে এসেছে। বাইরে চাঁদের আলো নিঃঝুম। ভরা পূর্ণিমা। ধূ-ধূ মাঠে একা কিংবা দলবাঁধা গাছগুলোকে মনে হয় পায়ের কাছে ছায়ার ফাঁদ পেতে কোনো রহস্য ধরবার মুহূর্ত গুণছে।

ভুজেন্দ্র বার দুই টয়লেটের পথে লক্ষ্য করল পাশের ক্যুপেতে এম. পি. অম্বুজাক্ষ প্রধান। পাজামা ও গেঞ্জিতে, শ্লিপারটি প্রায় জুড়েই টানটান। অতি সস্তা একটি ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ছেন। একেবারে উপরতলায় সঙ্গের ছেলেটি। ঢুকে সামান্য কুশল বিনিময়ের ইচ্ছে হলো ভুজেন্দ্রর; সংকোচ পারা গেল না। উনি কবিতা পড়েন? কে জানে!

—পাশের ক্যুপেতে !.....সেই এম. পি.। ভুজেন্দ্র হাসল।

মানবেশ বলে—চাপবি? সেই বাসস্ট্যান্ড থেকে... থেকে... ট্রেনে বাসে একসাথে কবি, চোর, সাধু, এম.পি., ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, যাদুকর থাকতেই পারে...কে কার খোঁজ রাখছে?...বাইরেটা দেখ, রোমান্টিক!...ঘুম চলবে না কারও!

দীপালি হাসে—কান ভোঁ ভোঁ গেছে? সকাল থেকে বলছিলে যে?

—কাল রাতে সত্যি বল তো, পড়ে গেছলাম? ...নাকি অন্য কিছু..?

চারজন হাসির বোমায় যাত্রীদের চমকে দিল।

হঠাৎ গাড়িটা থামল। মাঝে মাঝেই হ্যাঁচকা। আটকে পড়ছিল। এবার প্রায় আধঘন্টা পেরিয়ে গেল। নড়ার নামগন্ধ নেই।

—একঘেয়ে! মানবেশ বলে—চলো জোৎস্নায় মাঠে বসি।...ছাড়লে উঠে পড়ব।

—তা মন্দ নয়। অভিজ্ঞতা! চলো, সতরঞ্চ ও বোতল গ্লাস নিয়ে...এম.পি.-কেও ডাকি।

দীপালি বলে—ওনার ক্যুপ লক।...টয়লেট যেতে গিয়ে দেখলাম।

বিশ্বজিৎ হেসে বলে—ধরো, আমরা মাঠে গল্প করতে করতে...গাড়ি আওয়াজ করল...ছুটলাম ধরতে পারলাম না!

—আমি একবার গাঁয়ের মাঠে ঝড়ের গুঁতোয় কপ্টার নামতে দেখেছিলাম। ..... তেমনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানবেশ বলে। ভুজেন্দ্র দেখল সত্যিই পাশের ক্যুপটিতে লক। ভেতরে এম. পি., তারও ভেতর ব্রিফকেস, তারও ভেতর কাগজপত্র...সরকার পতনের ভোট ও টাইমবম...ইত্যাদি।

দীর্ঘ চিঠির পরের অংশে ভুজেন্দ্র তাই লিখেছিল...

একঘন্টা পর খবর আসিল সম্মুখে কোথাও মালগাড়ি উল্টাইয়াছে। সারা রাত আমাদের এই স্থানে কাটাইতে হইবে। এই বিড়ম্বনা এড়াইতে ঠিক হইল নামিয়া মাঠে বসিব। জ্যোৎস্নায় সুরাপান মন্দ নয়। আপনাকে অনুরোধ করিতে গম্ভীর হইলেন—উদোম খোলা মাঠে? ...রাতে? সিকিউরিটির কথা মাথায় আছে?

—গ্রাম নেই, গাঁ নেই... কেবল মাঠ আর বাগান...কে মশাই খবর পাবে গাড়ির বিভ্রাটে আপনি মাঠে বসে হাওয়া খাচ্ছেন?

—এটা আমার এলাকাও নয় যে কাউকে বোঝান যাবে কিছু...।

—এখানে ট্রেনপ্যাসেঞ্জার ছাড়া কেউ নেই। ...আপনি যখন গাড়িতে, কর্তৃপক্ষ আর্ম-গার্ডও নিশ্চয় বাড়িয়েছে।

—শরীরটা কেমন ঘুমঘুম লাগচে।...আজ থাক...।

তখন আপনার পাঁজরে কাতুকুতু শুরু করিলাম।

—এটা যা! কি হচ্ছে! মাইরি! বলিয়াই আপনি ক্রমাগত গুটলি পাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে সমস্ত প্রতিরোধ বিসর্জন দিয়া পাঞ্জাবি চাপাইয়া বলিলেন—বাসের পরিচয় যে এত ঘনিষ্ঠ হবে বুঝিনি। ..... সঙ্গে কিছু নিয়েছেন?

—না।

—এটাও আমার ওপর? বেশ, এক্সপোর্ট বস্তু খাওয়াব।...শর্ত, হাকুশ গিলবেন না... রয়ে সয়ে সিপ্ দেবেন। কবিরা এ ব্যাপারে হাংরি...কিন্তু যথেষ্ট সাপ্লায়ের সুযোগ নেই এই মুহূর্তে।

সতরঞ্চে আপনি কুহকি জ্যোৎস্নায় প্লুত হইলেন। আকাশ সামান্য নীলাভ। একটা কলি গুণ করিয়া উঠিলেন—এ রাত, এ চাঁদ...ফির কাঁহা!

—গাইব না? ...বিয়ের পর হানিমুনে প্রথম এই বইটা দেখেছিলাম...খুব মনে আছে!

দীপালি বলিল—সাধু! সাধু! বিয়ের আগে কিছু?

—আমাদের যুগে সুযোগ কম ছিল।

—তবু ছিল। কিন্তু আপনি নেন নি, কেমন?

—ঠিক ! ...কিছু গন্ধ পাচ্ছেন বাতাসে?

বলিলাম—মকুলের।...আমের সিজ্‌ন তো।

সত্যিই দূরাগত বাতাস উগ্র মাদকতায় ভরিয়া আছে।

আপনি প্রতিবাদ জানাইলেন—অসম্ভব। এ গোলাপের গন্ধ।

—গোলাপ! না, না। আমের মুকুল। মানবেশ বলিল।

—গোলাপ সম্পর্কে আপনার কতটুকু অভিজ্ঞতা? বলিয়াই আপনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, হিলস্টেশনে, এমন কি হরটিকালচারাল সংস্থার গোলাপ-বিজ্ঞান সম্পর্কে ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। আমি বলিলাম—দুর ছাই! জেলাটা আমের জন্য বিখ্যাত....দেখেছেন না দূরে দূরে আমবাগান...এবার ফলন খুব ভালো...এখানের আমবাগানেই তো...এই জ্যোৎস্না আমাদের স্বাধীনতাকে বিট্রে করেছিল সেদিন।...নইলে ক্লাইভ গুন্ডাটা থাকত কোথায়?

আপনি গোলাপের বক্তৃতা সংবরণ করিলেন। টের পাইতেছিলাম আপনার এক্সপোর্ট মালের বিস্ফোরক ক্ষমতা! দীপালি গানের পর গান গাহিতেছে, বিশ্বজিৎ-এর মুখের তবলা থামিতেছে না, মানবেশ চুপ থাকিবার মজা পাইতেছে, আমার মনে হইল দূরের বাগান, গাছপালাসহ আমি ডানা পরিয়া চাঁদের আলোয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

আপনি বলিলেন—যে হাল দেখছি, সারা রাতই জ্যোৎস্নায় থাকতে হবে। শুধু সুরা আর তর্কে কুলোবে?

—রাজনীতি কাজের বস্তু মশাই, গল্প নয়। সঙ্গে তাস আছে?

—কেন?

—খেলতাম। স্টেকে। ..... জেতা-হারার টান-বেটান থাকলে কখন যে সময় কাটে, টের পাওয়া যায় না।

—নার্ভে চাপ পড়ে না?

—ওটাই টনিক। মজা! .... কোনো ইস্যুতে ভোটাভুটির পর, পার্লামেন্টের বাইরে মুখ দেখাব কী করে? কিংবা ওরা?... পরে দেখলাম নার্ভের এই চাপটুকুর জন্যই পরে সম্পর্কটা ভালো থাকে।

—আপনারা ওখানে মোট সংখ্যায় কত?

—এখন ? এই মুহূর্তে ? বলা শক্ত।

—বিনে পয়সায় প্লেনে চড়তে পারেন?

—সারা ভারতবর্ষ আমি ঘুরতে পারি। ঘুরেছিও। যতই মন্দির-মসজিদের আগুন ছড়াক, দেখেছি দেশটা কেবল সমুদ্র বা পাহাড় ঘেরা নয়, ফুল ও ফলেও স্বর্গরাজ্য!..ক'জন বিদেশি এ জেলার আমের মাহাত্ম্য জানে?...এম.পি.-দের শুধু দুষলে হবে না, আসল ব্যাপারটা কী জানেন?

—বলুন।

—আপনার - আমার মধ্যে ফারাক সামান্যই। আপনারা সমুদ্রের ডুবুরি, ফাইটার প্লেনের

পাইলট, বুলফাইটার, প্যারাসুটবানানো ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত—নানা জীবিকার মানুষ দেখেন নি, চেনেন না; আমি সব দেখেছি।...বলতে পারেন পার্লামেন্টে আছি বলে বাড়তি সুযোগ পেয়ে ওগুলো...ঠিক বাড়তি নয়, আইনের জোরেই...

—শুধু তাই বা কেন! আপনি হাত লম্বা করতে পারেন, পা মোটা করতে পারেন, নাকটা পারেন ছুঁচলো করতে, ইচ্ছেমত ভাঁজ ফেলতে...দরকার হলে কাঁধে দু'টো মাথা নিয়েও চলতে-ফিরতে পারেন।

—সারা রাত তর্কই করবেন? এ জন্য ডেকে আনলেন? সংসার, চাকরি, পাড়া-পড়শি, বউ ছেলেমেয়ের ওপর কে না ক্ষমতা ভোগ করছে? খুঁজে দেখুন কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও ঘাড়ে ডবল মাথা নিয়ে ঘুরতে পারে।

আপনি হাসিলেন এরপর। জিজ্ঞাসা করিলাম—কবিতা পড়েন?

—ছেলেবেলায় অভ্যাস ছিল। .....এখন দারুণ খারাপ এফেক্ট হয়।

—কিডনি? স্টমাক, না হার্টে?

—তা নয়। ....একবার শোনাতে পারলেই দরবার শুরু হবে যোগাযোগ কিংবা লবি ধরবার জন্য। আমার আবার 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধে 'রাগ হয়। ....মনে হয় যেন শ্মশান যাত্রায় যাচ্ছি।

মানবেশ বলিল—জানেন কি, পবিত্র গঙ্গা প্রতিবছর কত মড়া বুকে ভাসিয়ে রাখে?

—রাখুন মশাই। মরে গেলে কে কোথায় ভাসল ইনটারেস্ট নেই। জন্মালে মরতে হবে—ব্যস।

—প্রশ্নটা ছুঁড়লেন কেন? বুঝতে পেরেছি! আপনি নদীশুদ্ধিকরণের স্কিমটার কথা বলছেন, তাই না?

—চমৎকার!

—দেখলেন, কেমন ধরলুম। ...আমি পশুপাখির ডাক শুনে মানুষের শুভ-অশুভ আন্দাজ করতে পারি। ....ঠিক বর্ষার রাতে যদি মেয়ে কোকিলের ডাক শোনেন উঠোন, বুঝবেন সে বছর আপনার চালে নতুন টিন উঠবে না।

—অম্বুজাক্ষবাবু! আমি ডাকিতেই, 'বলুন' মনখারাপের ভঙ্গিতে দূর মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। গাড়িটা আমাদের মৃত শুঁয়াপোকার মতো, দূরে সিগন্যালের লাল নিষেধ।

—পূর্ব ইওরোপে কেউ মেয়ে কোকিলের ডাক শুনেছে? জিজ্ঞাস করিলাম।

—আমি কোথাও যাইনি ভাই, মিথ্যে বলব না।...আবোল-তাবোল না বকে খুঁজুন না সারা গাড়িতে কেউ তাস এনেছে কিনা? একটু জুয়ো খেলি!

মানবেশ জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে কত টাকা জুয়োয় ফাঁকা হয়, জানেন? কাগজে বেরিয়েছে।

—আপনি দেখছি ভাই রগুড়ে মাস্টার! ...এতো জেনে কী লাভ? আমার দেশেই মৌমাছি

সারা বছর মোট কত মধু সৃষ্টি করে এবং মানুষ কত অংশ প্রয়োজনে কুড়িয়ে পায় বলতে পারেন। .....সংখ্যাতত্ত্ব একটি মস্ত বাধা।

মানবেশ আহত হইল। হঠাৎ গান থামাইয়া দীপালি দূর আলপথে আঙুল তুলিয়া বলিল—মানুষের দল মনে হচ্ছে? পাড়ি দিচ্ছে কোথাও?

—তাই তো! এভাবে বসে থাকা ঠিক নয়।...তখন বললাম, শুনলেন না কথা!...আমার এলাকাও নয় যে বললে তারা শুনবে। আমি জানি গ্রামের মানুষ মড়া পোড়াতে, ভূত খুঁজতে, সাপ ধরতে কি বর্ডার ক্রশ, স্মাগলিং বা লেবার খাটতে সারা রাত দলবেঁধে মাঠ ভাঙে। এ সব এলাকার নিয়ম।

আপনি উঠি-উঠি করিতেছিলেন। রাত তখন মধ্যপ্রহরে। ইতিমধ্যে অনেক পার্টিই ট্রেন হইতে নামিয়া জ্যোৎস্নায় হাওয়া খাইতেছে। যেন মহাকাশ যান হইতে অন্য গ্রহে পায়চারির অভিজ্ঞতা লইতেছে। বিশ্বজিৎ বলিল—না, না, মানুষের দল না। আলো ছায়ায় হ্যালোসিনেশন! 'ইউরেকার' মতো আপনি চিৎকার দিলেন—হতে পারে! আমার এ অভিজ্ঞতা আছে। খরা, বন্যা বা কোথাও পাহাড়-টাহাড় উল্টে গেলে আমরা সরকারি কমিশনের মেম্বার হয়ে যখন সার্কিট হাউজে উঠি...সাহায্যের বিলাপে রাতে বিরেতে যত হাজির হয়...থানা পুলিশ এবং চৌকিদার বলে তহশিলে অত জ্যান্ত লোকই নেই!...হ্যালোসিনেশন ভারি বেকায়দায় ফেলে মানুষের।

—কি খেলেন এক্ষুণি? বিশ্বজিৎ আপনার বড়ি মুখে পুরিবার ঘটনায় কৌতূহলী হাসিয়া উত্তর দিলেন —শুকনো নেশার অভ্যেস নেই মশাই। এ্যান্টাসিড্ খেলাম।

—অম্বলের দোষ আছে?

—দারুণ। ...রাতফাত্ জাগলে ভোরবেলা স্রেফ খুনোখুনি!

—অর্শেরও...

—প্রবলভাবে। আমার দ্বিতীয় ব্যাধি, পিঠে নার্ভের যন্ত্রণা। ....অজ্ঞান হয়ে যাই। ....সব সময় হয় না, মানসিক আঘাত পেলেই। ....নইলে সম্পূর্ণ সুস্থ।

হঠাৎ কথা বন্ধ, করতলটি মেলিয়া বলিলেন — দেখুন তো হাতটা। আপনি এ বিদ্যে জানেন না হচ্ছে।

—ধরেছেন ঠিক! এ আলোতে কিন্তু বলা যাবে না।

—তবু যা হোক!

—খুবই জরুরি?

—নিজের ভাগ্য জরুরি বটেই!

—ভাগ্য বিশ্বাস করেন? মানবেশ দংশনের সুযোগ পাইল।

—কে করে না মশাই? মানুষের প্রতিনিধি বলে অবাক হচ্ছেন?...জীবনটা সবারই নির্দিষ্ট। আমি এম.পি. হবই..আপনি কবি হবেন বাঁধা...কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ মোহন্ত...আপনি

না চাইলেও ঠেলে আপনাকে বানিয়ে দেবে... প্রতিনিধি বলে দশটা কাঁধ, দু'মণ ব্যস্ততা, দশ কিলো শোক, দৌড়-ঝাঁপ, ৬ ডজন হাত-পা, ৩০ ঘন্টায় একদিন, সব কিছু অবিশ্বাসের কালচার—কেনো দরকার নেই মশাই।

—কী জানতে চাচ্ছেন তবে? কবে মরবেন? বিপদ আসবে কি না? কে ল্যাং মারবেঙ্গ?

—আপনি বুঝবেন না ভুজেন ভাই, দেখে দিন মশাই!

রাত্রি শেষ হইতে চলিল। আপনি বলিলেন—যন্ত্র আমাদের মুর্খ বানায়...আমরা কেউ আকাশ পড়ে সময় দেখতে জানিনা...দরকার হয় না বলে।

নেশা ছুটিতে শুরু করিয়াছে। ট্রেন নড়ে না। কে বলে রাত্রি স্তব্ধ? কয়েক কোটি কীট-পতঙ্গের পুরুষ-রমণীরা সংগমে উতলা হইতেছে। গাছগুলি ফটাফট শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছে—রাত্রি পোহালেই বন্‌বন্‌ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

দীপালি ধাঁধাঁর মতো বলিল—ধরুন, গাড়িটা হঠাৎ ছাড়ল, আমরা গল্পে ব্যস্ত, ছুটলাম পড়ে, একটুর জন্য হ্যান্ডেল ফসকে গেল? কেউ উঠল, কেউ পারল না? আপনি হাসিলেন—চিন্তা করবেন না।...সব নতুন ঘটনাই মুখেমুখে জোড়া লেগে পুরণো নকশাটা বানিয়ে ফেলে। আমরাও যখন বিদেশ, প্ররিরক্ষা এবং গোয়েন্দাদের গোপন খবর পাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ল-অ্যান্ড-অর্ডার লুঠ-মার চলে...ভাবি, এই বুঝি গেল! ডুবল সব কিছু!...আদৌ হয় না সেটা। ...যেমন ছিল, তাই থাকে কিছুদিন পর... দেখবেন ঠিক পুরণো নকশাটাই ফিরে আসে। .....বীজমন্ত্রটি শিখে, যাচাই করে নেবেন। হ্যাঁ, প্রথম রাতের বাতাসে মুকুলেরই গন্ধ ছিল, ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।....এখন কিন্তু আমার অনুমানই সত্য...পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই কাছেপিঠে গোলাপের বাগান আছে!

জোয়ারে নৌকা খোলার মতো, জোৎস্নায় গুঞ্জন শুনিতে বুঝিলাম ট্রেন ছাড়িবে।...

গাড়িটা নগরীতেএল ভোর পৌনে পাঁচটায়। গুছিয়ে ব্যাগ কাঁধে চারজন টয়লেট পথে দাঁড়াতে, এম.পি. পোষাক বদলে ব্যস্ত গম্ভীর মুখে নেমে গেলেন। এ চারজন যে ধলঘাট থেকেই পাশে আছে, ছিঁটেফোটা স্বীকৃতিও ছিল না।

সবশেষে ভুজেন্দ্র নামল কামরা থেকে। হঠাৎ দলা পাকানো ক্ষোভ, কান্না ও বিলাপে চমকে উঠল। কয়েকটি বগি বাদ দিয়ে, সারা ট্রেনটাতেই ডাকাতি হয়েছে। ভোজালি, ন্যাপালা—আহত, অর্ধমৃত। চম্পট দিয়েছে সোনা-দানা, সম্পত্তি নিয়ে। শিশুর রক্ত, বৃদ্ধের জখম, মেয়েদের কোপ খাওয়া কাটা আঙুল, কনুই। একটি শিশুর পুরো কানটা ফালি দিয়ে সোনা নিয়ে গেছে। এখন মায়ের কোলে মরণ-বাঁচন শঙ্কায়। রক্তের ভূমিকম্পে হিক্কা উঠছে।

আহতরা চ্যাঁচায়—চলো স্টেশন মাস্টারের কাছে।

একজন পাশ থেকে বলে—এম.পি.-ও আছে গাড়িতে।

—সঙ্গে নিয়ে চলুন শুনবে কথা!

—কোথায়? কোথায় তিনি?

—বেড়িয়ে গেলেন। একজন জবাব দিল।

—কখন ?

—এই মাত্তর।

শব্দটা তলিয়ে গেল। সমস্ত স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, আনাচ-কানাচ গন্ধে ভরে উঠেছে। নিশ্চয়ই কাছে পিঠে গোলাপের বাগান আছে।

চতুরঙ্গ, ১৯৯৩

মহাগল্পের সমুদ্র

(অনুজ কথাশিল্পী কামাল হোসেন-কে)

দু'টো বনঝাউয়ের শিখড়মুড়ো পড়েছিল বালির ওপর । গর্জিত বাতাস ও ভূমিক্ষয়ের কবে যে জঙ্গলের গাছ কাৎ হয়ে জ্বালানির প্রয়োজনে চলে গেছে,, লবন, ফেনা ও ঢেউয়ের আঘাতে-আঘাতে, ঝড় ওরোদ্দুরের আঁচড় খেয়ে বাকি গোড়ার জটাজাল কত যে নির্জন ঋতুর শেষে চামড়া-বাকল খুইয়ে পোক্ত রূপান্তরের পর অতিকায় বিভঙ্গে পাখি হয়ে পড়ে আছে, তেমন চোখ না থাকলে ধরা যাবে না । সরাসরি সমুদ্র পাড়ি দিতে, উড়াল দেওয়ার মুহূর্তে মাটির চাপে গতি ঘনিয়ে তুলছে যেন । বেলাভূমির কিছুটা তফাতে দাঁড়লে --আলো-আঁধারির মধ্যে গম্ভীর সিলুয়েট দেখে মনে হয় কোনো মহাশক্তি পাতালমন্থনে গরুড়ের ছানাটিকে অনাথ ফেলে রেখে গেছে।

ওরা তিনজন মুড়োটায় হেলান দিয়ে তাকিয়েছিল সমুদ্রে ঢেউয়ের চরিত্রে মীনের ঝাঁক সন্ধান করা যায় কি না । বেশ কয়েকটা দিন বড্ড ব্যর্থ ও হতাশ ফিরে যেতে হচ্ছে । বাগ্দা চিংড়ির মীন। তখনও খবর পায়নি, জালপাতা খুঁটিগুলোর পাশেই, গত বিকেলে ট্যুরিস্ট লজের দুই ইঞ্জিনীয়ারিং -এর ছাত্র ডুবে গেছে। সমুদ্র এখনও ফিরিয়ে দেয়নি তাদের ।

দুপুর । ঘোলাটে আলিসান সমুদ্র, ঢেউয়ের আছাড় ; কল্লোল, আঁশটে বাতাস এবং নির্জন বেলাভূমি ছাড়িয়েই উঠে গেছে ম্যানগ্রোভ ও বনঝাউয়ের অরণ্য। অবিরাম জল-ফেনার পরাজিত ফিরে যাওয়া এবং ক্ষয়ের নিপুণতায় কখন যে গাছেরা শিকড়ের শক্ত পাহারা খুইয়ে উল্টোয়, কাটা পড়ে, বালির কবলে চলে যায়, নোনামাটি এবং প্রভূত নির্জনতার চাপে কালো দিক্ চিহ্নগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন যে জীবন্ত হয় বলা বড্ড কঠিন । পাখি, কুমীরের মুখ, জলঘোড়ার ছানা, অদ্ভুত সরীসৃপের দেহ । বালি ঠেলে শুধু মুণ্ডুটি নিয়ে মাতৃহারা তাকিয়ে আছে সমুদ্রের মধ্যে । পাতাল গড়িয়ে কেউ যেন ভাসিয়ে এনেছিল, ভাঁটায় ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেছে ।

এখন ওই তিনজন বাগ্দার মীনের শিকারী । ব্যর্থ শিকারী বলা যেতে পারে । তিনজনেরই তিনটি জাল ভাসছে জলে । নাইলনের নেট । বাতাসের ভয়ানক বিশৃঙ্খল দাপটে মাঝে মাঝেই জল ছেড়ে উছলে পড়ছিল নেটগুলো আকাশমুখো । হাত দশেক লম্বা বিশাল বেলুন ইট-পাথরের গিটবন্ধ মুখ নিশানের মতো উড়তে উড়তে থুবড়ে যাচ্ছিল ফের জলে। বিপরীত দিকটা খুঁটি শক্ত

ধরে রেখেছে। ঢেউবাহী কাঠি-কুটো, ফেনা-ঝিনুক, বালি ও কাদাখোলের আবর্জনা নিয়ে জল ঢোকে, মীনেরাও মিশে ধরা পড়ে যায়।

প্রত্যেকের হাতে বড় একটি বালতি। জালের বদ্ধমুখ যখন আবর্জনার ভরন্ত পেট হয়ে ওঠে, ঢেউয়ের বাধা কাটিয়ে বালতি ভরে আনতে হয়। খুবই কষ্টসাধ্য কৃৎকৌশল। ওরা তিনজন পাখিটার আড়ালে, ছায়ায় বসল মালাইচাকি ভাঁজ করে ক্লান্ত হতাশায়। বার চারেক গিট খোলা হয়ে গেছে, রাশিরাশি আবর্জনার মধ্যে মহামূল্যবান কিছু পায়নি। ভেজা পোশাক ও শরীর অন্তবর্তী বিশ্রামে শুকিয়ে ওঠে।

ওরা গল্প করছিল। গল্প ঠিক নয়, একটা কিছু সম্ভাবনার আলোচনা। যার নৈতিক সমাধান ভীষণ প্রয়োজন গিরিরাজ বৈতুলের কাছে। গিরিরাজের বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। ধোঁয়া লাগা ঘোলাটে চুল, বিশাল হাড়ের মুখ, চোখ দু'টো এতই ক্ষুদ্র খুঁজে বার কতে হয়। রহস্যময় আলোর দীপ্তি। আজীবন সমুদ্র মেপে যেন অতল অনন্ত বৈতুল এবং সুকুমার --বাকি দু'জনও পঞ্চাশের দিকে। রং একই --লবন হাওয়ায় ট্যান্ করা কালো চামড়া হলদেটে চোখ এবং ঠোঁটের কোণায় দুঁফোটা ঘা প্রলম্বিত আলোচনায় আজ আর তেমন রসরহস্য বা দেহজ আদিমতা ছিল না।

মাসখানেক আগে, এর সূচনায় পাখিটার ছায়াতেই বসেছিল তিনজন। ঝাউয়ের ডালে-ডালে একটানা, শ্বাসাঘাত, ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে অরণ্যময় স্তব্ধতা এবং পিঠ ফুলিয়ে বড় নদী ছিল আজকের মতোই রহস্যময়। ওরা সমুদ্রকে বলে বড় নদী। আজ ব্যতিক্রম বলতে, ঘোর দুপুরে একটি বালিমাখা কুকুর শুধু উঁচু বালিয়াড়ির বাজবরুণের ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখছে এদের।

সেদিন সূচনার আগে, গিরিরাজ বৈতুল একবালিতে জল-আবর্জনা নিয়ে যখন ফিরে এসেছিল, ঢেউ সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে। বোকা- বোকা হি হি হাসি। বালতিটা ঘিরে পাখির আড়ালে তিনজনই বসে পড়েছিল শ্যেন দৃষ্টি সাজিয়ে চ্যাটালো একটা থালা বার করে, কিছুটা জল-আবর্জনা ঢেলে নিতেই মীন খোঁজা চলে। তিন মাথা ঠোকাঠুকি অবস্থায় দৃষ্টির খুব কাছে তুলে আনতে হয়। আঁশের চেয়েও সূক্ষ, জলের রংয়ে মিশে থাকা ক্ষুদ্র প্রাণ। চলে বেড়ায়; পাতা দিয়ে তুলে রাখতে হয় বড় হাঁড়িতে। বাকি আবর্জনা বালিতে জমে, বালতি প্রস্তুত রাখতে হয় দ্বিতীয় 'ক্যাচের জন্য। এদের চারপাশে জলঝরা আবর্জনা থেকে আঁশটে সামুদ্রিক গন্ধ উঠছে, কিছু কিছু ঝিনুক ভেজা রেখা বানিয়ে আবর্জনা ছেনে হেঁটে চলেছে শ্লথগতিতে। গিরিরিজের আগে অনন্ত বৈতুল ও সুকুমার প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ মীন হাঁড়িতে ফেলেছে। পয়মন্ত একটি ঝাঁক গুরছে জালের চারপাশে। তিনজনে ফুসফুস বেশ ধকল সইছিল--প্রতিবারেরব্ ঢেউভাঙা জাল ঠিক রাখা এবং বাতাসের শাসন উপেক্ষা করতে। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে শরীরে ওম আনবার জন্য মোটা ঠোঁটে প্রচুর শক্তিতে টানছিল লম্বা, লোকাল বিড়ি। গতকাল উঠেছিল রাজার দেড়, আজও মন্দ ভাগ্য নয়।

অনন্ত প্রথম ক্যাচের বিশ্রামে বলল --কহ্য কর তোমার বৃত্তান্ত খান। শুনিয়া লই।

--অসতী বৃত্তান্ত! কী বল বিহাই? সুকুমার গিরিরাজকে ডাকে বিহাই। এটা আদরের ডাক, ঘনিষ্ঠ সম্বোধন।

প্রতি ক্যাচে মীনের নিশ্চিন্ত শিকারে, গিরিরাজ কেমন অভিজ্ঞতার হাসি দেয়, মোহাবিষ্ট হয়

এবং সমর্থন খোঁজে নৈতিকতার ।

--না বিহাই । প্রতিবাদ করে সুকুমারকে --ন্যায্য কথাখান কহ্যা হয় নাই । বৃত্তান্ত জটিল । বুঝি দেখ তোমরা ।

--অসতী নয় দুধি ? তুমি শরীরখান লও নাই তার ?

--দিছে আমারে ।

--ব্যাভিচার কর নাই ?

--না ।

--মিলন হয় নাই তোমাদের ? মীনের হাড়ি ছয়া বল ?

গিরিরাজ বলে --তা হক্ কথা । আমি পুরুষ, দুধি নারী ! গাং মতলবেই আসা করে বড় নদীর কাছে ।

ভিজে বালিতে সুকুমারের চওড়া চাপড়--গভভ্ বানাও নাই ?

---না ! বৈতুল বুক চিতিয়ে উঠল ।

দুধি ছিরু নায়েকের মেয়ে । বয়স বেশি নয় ---৩০কি ৩২ এখন । প্রৌঢ় গিরিরাজের সঙ্গে যখন এমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল --২২/২৩ এর বেশি ছিল না । বিয়ের পর পরই সতীনের ঘরে লাথ খেয়ে ফিরে এসেছিল বাপের ঝুপড়িতে । ওর স্বামী একমাত্র যে প্রয়োজনে পণ দিয়ে ঘরে তুলেছিল তার সম্ভাবনা নেই জেনে ---১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত, টানা কর্ষণ, অলৌকিক মুদ্রা, প্রচলিত-অপ্রচলিত নানা মাঙ্গলিক রতিক্রিয়ার পর -ভাগাড়ের বুড়ো গোরুর মতো ধাক্কা দিয়ে ফেলে গেছল চিরুর কাছে । নৌকোমিস্ত্রী ছিরু । সরল । যে সামান্য জমি --টেনে হিঁচড়ে নিলে স্বজনরা ।

দুধি নাম কেন ? না, ছোটবেলা থেকে দেহের বর্ণ দুধের মতো । কেন অমন বর্ণ ? এই সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় কুচকুচে ফাটাফাটলের চামড়ার মধ্যে ? না, মগ-হূণ দল পাঠান মোগল/এক দেহে ..... । দক্ষিণের এই দ্বীপগুলোতে এমন দেখা যায় ; এমনকি চোখের তারা এবং চুলবিপর্যয় পর্যন্ত। তো, দুধি তখন বনঝাউয়ের কাঠ কুড়োত, সমুদ্রের কাছে দুঃখের গাওনা গাইত, বৈতুলের পাড়ার মানুষ মীনের জাল পাতলেই ঝিমদুপুরে নিঃসঙ্গ পাশে বসে থাকত ; দু'চারটে কথা, এটা-ওটা, পান্তা ভাতটা .....ইত্যাদি !

গিরিরাজের কাছেও দুধি গর্ভধারণ করেনি । বৈতুলের সম্মান, আপন সংসার, একঘর ছেলেপুলে, বড় নদীর সাকরেদরা ও ফেরিগঞ্জের পুরুতমশাই কী বলবেন ? দারুণ শ্রদ্ধা আছে গিরিরাজের । তাছাড়া, গিরিরাজ বৈতুল নাভিকুণ্ডলের গুহ্য সাধন-চর্চা শিখেছিল যে কাঁথির শ্মশানে এক তান্ত্রিকের কাছে ! মধ্য যৌবনে ।

--গভ্ভ বানাই নাই, বিহাই । চালা গড়ায়ে পানির ধারা ফের উর্ধ্বে তোলা যায় জান ? দেহের মণিটুকু ?..... বড় শক্ত যোগ হে ! নারী দেহ বড্ড প্যাচাল দিয়া গড়া ! বড় নদীর মতো !

দুধি ও বৈতুলের কাহিনী, সেদিনের মীন ধরার চাইতে এক দশক পূর্বের কাহিনী । দ্বীপের এই

শেষ বিন্দুতে ট্যুরিস্টলজ গড়ে ওঠেনি তখন । সমুদ্রনিবাস ফেরিগঞ্জে —উত্তরে মাইলখানেক দূর । বেলাভূমি সেখানে প্রসস্ত নিরাপত্তামময় । ঘন বনঝাউ এবং চোখজুড়োনো সমতল বালিয়াড়ি । এখানে প্রায় বিরল-জনবসতি । কাঁচাজঙ্গল সমুদ্রের পাড় ধরে অনেক খাড়ি-নদী টপকে, বাঁক খেয়ে আরও ভয়ালতা মেখে চলে গেছে বাংলাদেশে এখানে সমুদ্রের ধার অপ্রশস্ত এবং খাড়া জঙ্গলে গেছে মিশে । এবড়ো-খেবড়ো, বালিয়াড়ি প্রধান এবং ভাঁটায় প্রচুর উল্টেকাদা জাগে । বাতাস ও লবণের থাবায়, বালির আগাতে বনঝাউ বা ম্যানগ্রোভ দুর্বল হয়ে উল্টে গেলেই, বালিয়াড়ি এগোয়, ভাঙ্গত ভাঙ্গতে সমুদ্র । এবং গাছগুলো লোপাট হয়ে গেলেও, শিকড়মুড়োর পশুপ্রাণীর নির্জনতার মধ্যে রাত্রিদিন তটরেখাকে মৃত উদ্ভিদের কবরভূমির আভাস এনে দেয় ।

এই বালির পথেই বৈতুল পাড়া যাতায়াত করে । রাত্রে হঠাৎ কেউ মরলে বা বিশেষ প্রয়োজনে, জঙ্গলে মশালের আলোয় পথ করতে হয় । দূর থেকে ঐ মানব-মানবীর পথহাঁটা দৃশ্য ভারি ছমছমে। তা, ট্যুরিস্ট লজটি এই পয়েন্টে বছর দুই হল গড়ে উঠেছে । মাইলখানেক উত্তরের ফেরিগঞ্জ সমুদ্রনিবাস ভাঙন, ক্ষার ও বালিয়াড়ির আগ্রাসী উপদ্রবে অস্তিত্ব হারাচ্ছে বলেই এই নতুন স্পট খোঁজা । ম্যানগ্রোভ ও ঝাউয়ের জঙ্গল কিছুটা অধিকার করে, সমস্ত আধুনিকতার মধ্যে। স্বাভাবিক বৃদ্ধিতেই গোটা চারেক মাটির চালার প্রাইভেট হোটেল, ভাজাভুজি ও চায়ের ঠেক এবং বাস টার্মিনাস ও পানবিড়ির দোকান । তবু ট্যুরিস্টদের পক্ষে হামলে পড়ার স্পট হয়নি । মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপটি যে নদীর জন্য বিচ্ছিন্ন --হাতানিয়া -দোয়ানিয়া - আড়াআড়ি পাকাপুল নেই বলে বাস ও প্রাইভেট সরাসরি যাত্রীদের এই বেলাভূমির পাশে নামিয়ে দিতে পারে না । বৈতুল পাড়ার মানুষ এত কিছুর খবরাখবরে উদাসীন । কিছু কিছু শাড়ি পাৎলুন, চুড়িদার বা ,শর্টস যখন জঙ্গল বা সৈকতে দাঁড়ায় নিজেদের খুবই অধঃপতিত মনে হয় ।

তো, গত বিকেলেই দু'টি সদ্যাআগত যুবক সমুদ্রের সবকিছু নিয়মকে কলা দেখিয়ে জলে নেমে পড়ছিল । এখানে ৬ ঘন্টা ব্যবধানে জোয়ার ভাটা আসে । তখন জোয়ার ছিল । বীচও ছিল নির্জন । সারাটি রাত, সকাল এবং মধ্যদুপুর -ওদের চিহ্ন নেই । ফিরে আসেনি মৃতদেহ । থানা ৩৫ মাইল এখান থেকে ।

গিরিরাজ বৈতুল ও দুখির পুরাতন জৈব-যোগাযোগ প্রসঙ্গে প্রেত-যোনি, পুরুষ-প্রকৃতি, অবৈধ প্রভৃতি টুকরো-টুকরো প্রসঙ্গ বাগদার মীন পর্যাপ্ত আসবার সময় অতিকায় পাখিটা শুনতে পেত । অজস্র গর্জনের মধ্যে এদের রহস্যরসিকতার হাসি থাকত মিশে । আজকের মতো, সেদিনও পাখিটার বিভঙ্গে সমুদ্র পাড়ির উড়াল । ধারণ করবার পাত্র এবং পুরুষের মণিবিন্দুর বিপরীত ধারাপাতের গূঢ় সাধনমার্গের আগের প্রাচুর্য নেই ।

বাতাস এবং আলিসান সমুদ্রের ভাঁজে ভাঁজে রোদ্দুরে চকিত ফলকের দিকে তাকিয়ে দুখির বিষয়টায় সামান্য চিন্তিত । যেন জল থেকে বিপুল একটি প্রশ্নের শরীর ওর সামনে দাঁড়িয়েছে । শুধু পিতা গিরিরাজ বৈতুলের সমস্যা নয় নিছক ; এই অক্ষয় সমুদ্র, আজন্ম জঙ্গল, পরিবার ও মানব-মানবীর সমৃদ্ধি বেঁচে থাকতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ পুণ্যের প্রশ্ন ? বৈতুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুখিকে ঘরে তুলবে । স্ত্রীর মর্যাদায় । পটার উদোম শরীর পেশিতে, ঘামে ভারি সুন্দর । সে কাঠের

ভ্যান টানে । লম্বালম্বি দ্বীপটার ২৫ কিলোমিটার পথ ধরে হাতানিয়া দোয়ানিয়া পর্যন্ত ।

শাঁসে, রসে বুকের আলিঙ্গনে দশবছর আগে যে নারীকে গিরিরাজ পুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্যে আদিম বানিয়ে, তুলেছিল, আজ বৈতুলের সন্তানের বীর্যে সে শিহরিত হবে ? একটা কিছু মূল্যবোধ বৃদ্ধের নাভি মূলে কম্প তোলে । এই দশবছরে সে পরিবার ও সন্তানের দেখভালের জন্য অপরিমিত লবণ মেখেছে সমুদ্রে, মৃত্যুর আরও প্রত্যক্ষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে, দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে জীর্ণতার ছোঁয়া গভীরতর ছাপ রাখছে এবং মানুষ যেহেতু একক বৃক্ষ বা থলথলে জেলিফিশ নয়, বৈতুলের গভীর বিশ্বাস আত্মজের এই সিদ্ধান্তটি পিতার কাছে সম্পূর্ণ ব্যভিচার বলে গণ্য ।

দুধি এখন থাকে ফেরিগঞ্জের পুরনো ট্যুরিস্ট স্পটের কাছে । এই জঙ্গলের নির্জনতা ও গিরিরাজের সম্পর্ক ছিন্ন করে, ওখানে চলে গেছল । সেই সব দিনে, কাঁচা পয়সা বা পণ্য বাজারের সঙ্গে ফেরিগঞ্জই ছিল এ অঞ্চলের একমাত্র খোলা জানলা । কত মানুষ যে আসে দু'দিনের বিশ্রাম নিতে শহর থেকে ! স্নান করে, নির্জনতার পুরু পুরু আবরণে ঢেকে রাখে শহরের গতিময় ধ্বস্ত মনটাকে । অথবা ব্যভিচারের হঠাৎ মুক্ত ফণায় নাচার সুযোগে, কেউ কেউ ছিঁড়ে ফেলতে থাকে জীবনের কিছু বিধিনিয়ম । গলা টিপে হত্যা, ফুসলে আনা বা পলাতক আশ্রয়ের সন্ধানে বালিয়াড়িতে পুলিশের বুটের ছাপ লক্ষ্য করা যায় ।

তবে জঙ্গলে, নতুন ট্যুরিস্ট স্পটের সৈকতে এই প্রথম মৃত্যু । দুর্ঘটনা, নাকি খুন বা আত্মহত্যা ? কিছুই সিদ্ধান্তে আসা যাবে না ? মৃতদেহ সমুদ্র এখনও ফিরিয়ে দেয়নি । বে-সনাক্ত ।

আজ দুপুরে ব্যর্থ শ্রমের ভার টেনে, বার বার সমুদ্রে নামছিল 'ক্যাচ' সংগ্রহে । মীনের ঝাঁক সম্ভবত এই তটরেখার ধার পরিত্যাগ করেছে । এরা দুঃসময় টের পায় ? নাকি মনুষ্য পরিবারে পাপ-পুণ্যের বিচার করে ? আসলে,ঐ আঁশের মতো মূল্যবান প্রাণগুলো কিছুই দেখে না, সব বিচার করে, সমুদ্র, বড় নদী । জীবকুল ধারণ করে আছেন যে পাথর, মকরঅধিষ্ঠাত্রী দেবী গঙ্গার রূপে পূজিতা নিরলস আছড়ে পড়ছে বৈতুল পাড়ার জঙ্গলের পাশে ।

পাখিটার ছায়ায় ওরা তিনজন ভেঙে বসে আছে ।

জোয়ার ফিরে যাচ্ছে একটু-একটু, পরিপূর্ণ ভাটা উঠে আসবে এরপর । বাগ্‌দা ধরার প্রশ্নই থাকবে না ? শুকনো । হয়তো সমুদ্র সাবধান করে দিয়েছে সন্তানদের । ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে বিপদের জাল ; হাওয়ায় উড়ে জলে আছাড়ি-বিছাড়ি খাচ্ছে বেলুনের মতো যে নীল নাইলনের নেটগুলো !

সুকুমার আনমনে ভেজা বালিতে কাঠির অপটু হাতে কিছু রেখা টেনে, প্রেত -যোনির ধারাটি বইয়ে পাখির কোলের ছায়া পর্যন্ত টেনে আনল ।

--আমরা মনুষ্য বিহাই । ..... দেখতি পাছ ? ...... এই গং এর বুকে ভাসন করা চাই আমাদের।

--জীবের ধম্মও বটে। অনন্ত সায় দেয়, পটা বারণ না শুনলে তোমার কর্তব্য কিছু নাই । ডাগর বয়স এখন তার ।

--কেন কর্তব্য নাই ? চোখ-জোড়া শানিয়ে তোলে গিরিরাজ ।

—দুধির ভরণ-পোষণ সে দিবে ।......... তোমার বলা করার কী আছে ? ...... পটা কামাচ্ছে আপন হাতে, তোমার হালে মীন ধরে না সে । অন্যায্য ক্রোধ তোমার ইটা ।

—তাছাড়া, সুকুমার যুক্তিটা লুফে নিয়ে বোঝায়, পটা আমাদের বৈতুল পাড়ায় বসবাস করেনা। ফেরিগঞ্জেই উঠ-বস ।...... পুত্রের মতো বাপেরে মান্য-গণ্য করে ?

—না । শুধু মাথা নাড়ানর ভাষায় বৈতুলের জবাব ।

—তালে ? করুক সে । সংসার ধম্মে মাতুক । তোমার বংশেই নাতি-পুতি ফলবে, কী বলো ? সুকুমার মৃদু হাসে । গিরিরাজ বুকের মধ্যে ভীষণ হোঁচট খায় । বুঝতে পারে, হারামজাদাটা তাল পেয়ে পাছায় ঘুরিয়ে আড়কাঠি দিচ্ছে ।

জল সরে গেছে অনেকটা । বিরামহীন কল্লোল । বালিমাখা কুকুরটা নির্জন পার ধরে-ধরে বহু দূর চলে গেছল একা একা । কাঁকড়ার লোভে ।

ফিরে ক্যাক্টাসের ছায়ায় শুয়ে রইল । বেশ কিছু তফাতে এতক্ষণ, জলঘোড়ার শিকড়মুড়োটার পাশে যে দু'জন মীন ধরছিল, জাল খুলে নিয়ে চলে গেছে, খুটিগুলোর অস্তিত্ব শুধু কাদায় পোঁতা । এরাও গুটিয়ে নেব-নেব করছে । অভাবের কোনো দুশ্চিন্তা নেই । পরিবারের খাবার থালায় আজকের সন্ধ্যা-রাত কী তুলে দেবে কোন পরোয়া নেই । যাপিত জীবনের আষ্টে-পৃষ্ঠে এত ব্যর্থতা ঘনিষ্ঠ জড়িয়ে, আলাদা চেতনার জন্ম হয় না । হঠাৎ গিরিরাজ দুই থাবায় বালি চাপড়ে উঠল ।

—মানলাম না তোমার হকের কথাগুলান, বেহাই ! বেশ ঝাঁঝ ও তিক্তরস ফুঁটে উঠল জবাবে।

—তোমার বিচারই বা কে মানে ? সুকুমারের ঢং তাচ্ছিল্যপূর্ণ । বৈতুলের অপমান বোধ হয়। যেন ছেলের চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে অমোঘ ।

—বিচার মানাতে পারি, বিহাই ।....... তুমি আমার কইলজের খবর রাখ না । বালিতে পুঁতি রাখলে, কেউ বাঁচাতে পারবে না ।

—কারে পুতিবা ?

—দুধি-পটা ! আপন কামাই খাছে বলে, ব্যভিচারের আইন নাই মনুষ্য জীবনে ।......

—তোমার সময়টা মাননাই তা ? স্মরণ করো বিহাই ।..... আর পটা ঘর-সংসার করিবে । ন্যায্য কাম ! অনন্ত সুকুমারের সমর্থনে এল ।

—ন্যায্য কথা বড় কুটুম ! অনন্ত দাস আবার গিরিরাজ বৈতুলের দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী বড় কুটুম। মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবল বন্যায় সমস্ত সম্পত্তি খুইয়ে, এই জঙ্গলে বসত গেড়েছিল বিশবছর আগে । পাতানো সম্পর্কও বলা যেতে পারে ।

বৈতুল পাড়াটাই দ্বীপের শেষ বসতিচিহ্ন --জঙ্গলের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো কিছু জেলেঘর । মীন মারা যাদের জীবিকা । অনেকটা দম নিয়ে, সমুদ্রের মতো- গিরিরাজ নিজেকে ফাটিয়ে ফুটিয়ে দিল --ঐ প্রেত যোনিতে গোবর্ধন বৈতুলের --আমার পিতার মণিবিন্দু প্রবেশ ছিল না ...আ-র ?

আর, পটা আমার সন্তান ...এটা পাপ, অন্যায়, বড়কুটুম ! তুমি বাপ হইলে সইতে পারতে ? সম্বন্ধী ?

বাতাসের মধ্যে আলিসান সমুদ্র যেন কেঁদে উঠল । বেলাভূমির ছিদ্র পথে লাল চোরা কাঁকড়া, ঝিনুক ও শঙ্খের আঁশটে গন্ধ, ঢেউয়ে ভেসে আসা মৃত পশুর চোয়াল খণ্ড —পরিচিত, এই সব প্রতিদিনের বস্তু সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়ে, বড় মূল্যবান কিছু গর্ভে রেখে দিয়েছে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ভয়-ভয় অরণ্যময়তার পাশে একমাত্র অস্তিত্ব যেন সমুদ্রেরই । মানব-মানবীর ভাষায় কথা না বললেও তাদের পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়, অনাচার নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি স্বীকারোক্তি আদায় এবং বংশানুক্রমিক শাসিত করে তুলতে সবকিছু ভাঙ্গচুরের মধ্যেও কেমন দুর্দম ও স্থায়ী ।

ওরা ক্লান্ত পায়ে জাল খুলে পাখিটার আড়ালে বসল । সূর্য ঢলছে পশ্চিমে, জঙ্গলের ছায়া বেশি বেশি ঘিরে ধরেছে দূরের বেলাভূমি ? সুকুমার ও অনন্ত বৈতুল গিরিরাজের কথাগুলোর গর্জিত ভেঙে পড়ার প্রভাবে কেমন থমথমে । ধারাপাত ঊর্ধ্বমুখী টেনে তোলার জটিল ও গূঢ় জৈব কৌশলের মতো, মানুষের জীবন, সংসার পরিবার, পাপ-পুণ্য, মূল্যবোধ অনেক, বৃদ্ধ বৈতুলকে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী হিসেবে বোধ হচ্ছে —গঞ্জের পুরুত ঠাকুর গঙ্গাদেবীর পুজোয় বসলে যেমন মনে হয় ।

অনন্তর কথা বলার খাতটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল ।

--পুরনো বৃত্তান্ত পটা কিছু জানে ? ওরও কর্তব্য আছে কিছু ।

গিরিরাজের দৃষ্টি সমুদ্রে । অনন্তকে শুনল না । বাতাস প্রশ্নগুলো উড়িয়ে দিয়েছে । সুকুমার লঘু স্বরেই বলে --বাজারে মাসী তা জানায় কখনও ? বলো বিহাই ?

--জানা কর্তব্য । অনন্ত যেন বিচার শুরু করে । আর গিরিরাজ সামান্য সমর্থন পেয়ে, আরও প্রগলভ হয়ে ওঠে ।

--কর্তব্য না জানলে সে কি মনুষ্য ? ...... ঐ বালিমাখা শ্মশানে কুকুরটা দেখছ, তাই ! পটা সব জানে । আমি পাপ লুকাব কেন ? বড় নদী সব নেয়, আবার ফিরায়ে দেয় যেমন, পাপ লুকায়ে রাখি না আমি । ...... হাঁড়ি উল্টে দেই । ..... মনুষ্যজীবন বিনামূল্যের না ...কিছু ধারণ করতে হয় এজন্য । ..... এই মিলন মহাপাপ ... বারণ আমি দিবই ....দরকার একটারে বালিতে পুতি দিব ....আমার হালে পটা মীন না ধরুক, রক্তের ধার জীবনে শুধতে পারবে ? ...... ভারি লাটের গরম দেখাচ্ছে !

এতক্ষণে খুঁটিগুলো ভাঁটার বালিকাদায় শ্মশানকাঠের মতো লাগছে । দু'টো রোগা পুলিশ, ট্যুরিস্ট লজের বড়বাবু, দারোয়ান, খড়ের হোটেলের লোকটি, দু'টো ভিখিরি, ভবঘুরে, নৌকোমিস্ত্রি , পান-বিড়ি দোকানের মালিকটি এবং ছোট্ট জনপদের গোটা তিন মহিলা পেছন পেছন । জঙ্গলের পেছনেই কাঠের লজ্জা। বন-ঝাউয়ের বীথি-পথ ধরে ক্রমাগত কথাবার্তা স্পষ্টতর হতেই, ওরা তিনজন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দলটা বালিয়াড়ির মাথা । কবর খোঁজার দৃষ্টি নিয়ে সমুদ্র দেখছে । মিনিট দুই ছবি হয়ে রইল দলটা । ভাঁটার তেজ হারানো বিকেলের আলোয় বিস্তীর্ণ জঙ্গলের পাশে কল্লোলিত ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত আসা যাওয়া মানুষের ছোট্ট দলটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উদাসীন ।

বালিমাখা কুকুরটা ভিড়ল গিয়ে ওদের দলে ; শুঁকলো কিছু ধূলিধুসর ঠ্যাং এবং কৃতজ্ঞতায় শুরু করল লেজ নাড়তে। এ তিনজন পূর্বের আলোচনা ও মেজাজ সম্পূর্ণ হারিয়ে কিছুটা শঙ্কিত । পুলিস কেনারে বাবা ? চুরি, ছিনতাই ঘটে না বটে, মাঝে মধ্যেই খুন-বচসা এবং শহরের ফেরার ডাকাত খুঁজতে, গঞ্জের থানা থেকে জিপ হানা দেয় । নিরীহ বেচাবাদের ভয়ানক হয়রানি ।

হঠাৎ একটা পুলিশ, ধীর পায়ে বালি হেঁটে চলে এল শিকড়মুড়োর পাখিটার কাছে ।

—মীন ধরা করছিস ?

—বটে ! আপনারা ?

—জলডুব হইছে । ..... দুই ছোকড়া ... কোলকাতার ।

এই প্রথম ওরা জানতে পারল । প্রায় ২৪ ঘন্টা পর । এবার পেছনের মানুষ ধীরে ধীরে নেমে আসে । কুকুরটা শব্দ ছাড়ল না । নানা অনুমান, আন্দাজ ও আশঙ্কায় হিসেব চলতে থাকল । কীভাবে, কোথায়, কতটুকু মাপ-জোপের মধ্যে ছেলে দু'টি নেমে আসতে নিয়তিতাড়িত হয়েছিল ? অথবা, সমুদ্রেই যে নেমেছিল, এটা কি নিশ্চিত ? ম্যানেজার মোটামুটি সেই প্রেক্ষিতেই কিছু উপস্থাপন করল । ঘরের তালাচাবি খুলেই, জামা-প্যান্ট রেখে শর্টস ও স্যাণ্ডো, কাঁধে রঙিন তোয়ালে চাপিয়ে পেছনে জঙ্গলের পথেই আসতে দেখা গেছল দু'জনকে । এখনও ছাড়াপোশাক অমন ভাবেই পড়ে আছে বিছানায় । কেউ হাত দেয়নি। লজের কেয়ারটেকাররা বিপদের গন্ধ পায় । তবু আইন বলে সনাক্তকরণের কথা । ডুবে গেছে বললেই সব খালাস হয়ে যায় না । খুন বা অপহরণও হতে পারে।

প্রথম পুলিশটা এবার আদেশের কিছুটা নিচে গলা রেখে তিনজনকে অনুরোধ করল লাশ জলে খুঁজে দেখতে । সমুদ্রতীর এমন হয় কখনও ঢেউ ফিরিয়ে দিলেও বেলাভূমিতে অনায়াস ফিরে আসতে পারে না সব কিছু । ঐ যে কাদা খন্দ, বালি এবং ভাঙনের খাড়ি ও রেখার প্যাঁচঘোচ, জলের ঘোলে আটকে পড়ে।

গিরিরাজ বৈতুল ধাক্কা খায়, তাকায় ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে । কোনো পথ খুঁজে পায় না । আজন্ম বড় নদীর পাশে থেকে এমন বাহ্যজ্ঞান লোপ পায় নি । অভিজ্ঞতা নেই । কী বলবে পুলিশদের ? অঞ্চলের মানুষও যেন চাইছে ওরা নামুক, খুঁজে আনুক দুই অনাত্মীয় যুবক। সূর্য ঢলে পশ্চিম সমুদ্রের কোণায় আড়াল হতেই দূর জলদিগন্ত থেকে অন্ধকার ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকল । আর ভাটার বেলাভূমিতে ছড়ানো জলঘোড়া, পাখি সরীসৃপদের সিলুয়েট গুলো ফুটে উঠল স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে । একরকম স্তব্ধ শাসনের চাপে তিনজন বাধ্য হয় এগোতে । ভাঁটার কাদা । পা টেনে টেনে যতই ঢেউয়ের কাছে এগোচ্ছে, মুক্ত বিপুলতা অন্ধকারে ছমছম করে ; আয়ত্তের মধ্যে হঠাৎ যেন জল ফুঁড়ে ওঠা লোমশ কোনো বাহু ওদেরও টেনে সুদূর জলগর্ভে নিয়ে যাবে ।

মৃতদেহ মীনধরার পাশেই, খাড়িমতো ঘোরপ্যাঁচে অতিরিক্ত বালিকাদা ও কিছুটা গর্তে আটকে ছিল । মাথা নুইয়ে ঠেস দিয়ে রেখেছে যেন । কাদা ও বালিস্তরে চাপা । অনুমানে পেছনে দাঁড়িয়ে টের পেতেই পুলিশটা ভয়ার্ত গলায় —পাছু ? তারপর ফের অনুরোধ, বকশিসের লোভ । কাদা-

বালি, সামুদ্রিক আঁশটে গন্ধে সিক্ত শব দু'টিকে ছুঁতে কী ভয় ! বৈতুলের বুকে ভয় আছাড় খেতে থাকে । প্রতিদিন দুপুরে যেখানে নিপুণ প্রত্যাশায় মীনের বালতি পাতে, দু'টি তারতাজা মৃত্যুর শব্দে তিনজনের বেঁচে থাকা শরীরে কিছু বোধ ঘন হয়ে যায় । কোল-পাঁজায় টেনে তোলে । আঁশটে কাদায় পিছল ভারি কিছু বুক-পাঁজর ঘিনঘিনে ভয়ের চেতনায় ভরে তোলে । মুহূর্ত খানেকও দাঁড়ানো চলে না । উঠে আসবাব জন্য পা রাখতেই সুকুমার ও অনন্ত বৈতুলের ধরাধরি শবটি বদস্ শব্দে পড়ে গেল । পিঠ সমুদ্রের দিকে, চোখ সামনের সিরসৃপ বা আদিম জলপ্রাণীর স্পষ্ট লিউডগুলোর প্রতি । ক্ষণিক ভয়ে দু'জন সামনে কিছুটা ছুট দিল । গিরিরাজ মাটি ও আঁশটে গন্ধে কী বিশাল ভারি জলঢোপ কিছু যেন বুঁকে আকড়ে আছে । মানুষ মরলে কি ওজন লাভ করে ? আহাঃ ! খুলির ভিজে চুলগুলো কী শান্ত ! বৈতুল হাঁটতে থাকে । দু'জন তখন স্টার্ট ভাঙা প্রতিযোগীর মতো ফিরে যায় লাশের দিকে । আপন ভয় ঠেকায় আপন প্রতিরোধই । দলটার মুখে কথা নেই । হাঁটতে থাকে, বেলাভূমি খাড়া বালিয়াড়ি, ম্যানগ্রোভের জঙ্গল এবং ঝিঁঝির ডাক পেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড ।

পটা বৈতুলের ভ্যান দাঁড়াল । স্তূপীকৃত শুইয়ে রাখা হল । জল ঝরতে থাকল । পানগুমটির মালিক দেখল প্রথমে, একজনের নাকটি কামটে খুবলে নিয়েছে। এতক্ষণ ওটি গিরিরাজের বুক পেঁচিয়ে ছিল । লেখালেখি, ছাড়া মালপত্র, কাগজ, সই, সাক্ষী এবং অনাত্মীয় দু'টি মৃতদেহ ঘিরে মেয়ে পুরুষের শোকমুহূর্ত। ওরা আর অনাত্মীয় নয় এ মুহূর্তে । ঘনিষ্ঠজন যেন হারিয়েছে । বেঁধে, ঢেকেঢুকে, ঈশ্বরের কাছে মৌন প্রার্থনায় দু-একজন গোপনে কাঁদল । এক কুঁজী বুড়ি, এক আঁচল জবাফুলের কলি ছিঁড়ে এনে বাধা-ছাঁদার ওপর ঢেলে, নমস্কার করল । অনেকে সরিয়ে নিল শিশুদের ।

বহু বছর বাদে, দ্বীপের নির্জন অংশে ধূসর জীবনে শোক এমন বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে । তারপর, পুলিশের জীপের সঙ্গে পটা বৈতুলের কাঠের ভ্যান ক্লান্ত প্যাডেলে চলতে শুরু করলে, শরীর ঝরা জলের জায়গা একটি বউ গোবর জলে লেপে নিয়ে গেল । কেউ কেউ টের পেল এতক্ষণে ভয়ানক আঁশটে গন্ধ ঘিরে ছিল চারপাশ । খড়ের হোটেলের মালিকবউটি শুধু, শব দু'টো চলে যাওয়ার পর ময়লা আঁচলে চোখ মুছে অবিবাহিত ননদকে বলে, মোটা ছেলেটা ঠিক তার বাপের বাড়ির গ্রামের হেডমাষ্টারের ছেলের মতো ।

এ তিনজন কিছুই মুখে তুলতে পারল না । পুলিশের নির্দেশ ছিল চায়ের দোকানটায় বিনেপয়সায় বনরুটি ও চা দিতে । শ্রমের প্রাপ্য । ওরা খেতে চাইল না, থেকে-থেকে শরীরে সমুদ্রের জল-কাদা আঁশটে গন্ধ শুকিয়ে উঠল এবং বৃদ্ধ বৈতুলের মনে হল শব এখনও বুক থেকে নামেনি, ভারি হয়ে পাকাপাকি গেঁথে গেছে । হাঁটা চলা, শ্বাস নেওয়া, কাদা সাফ করে ফেলা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না । এমনকি ওরা তিনজন যখন ফের বনঝাউ এবং সমুদ্রের পথে হেঁটেছিল বৈতুল পাড়ায় পৌঁছবার জন্য, গিরিরাজ রীতিমত কাঁপছে ভেতরে ভেতরে । আজন্ম চলা এই পথ এমনভাবে ঝিঁঝির ডাকে ভীত ও অস্থির করে তোলেনি । কিছুতেই সমুদ্রের পথে পা চালাতে পারে না । শেষে বড় নদী এড়াতে, জঙ্গলের সুরি পথে —ঝাউয়ের ডালকুড়ুনীদের অভ্যস্ত রাস্তায় তিনজন ফিরল। একবার শুধু পটার মুখটা ভেসেছিল বৈতুলের চোখে । পুলিশটার সঙ্গে শলাপরামর্শে ২৫ মাইল ভ্যান চালাবার রেট ঠিক করতে যেভাবে চোখের নাচ ও হাসি ফুটেছিল, ঘনিষ্ঠতা নজর এড়ায়নি

বাপের। ব্যভিচারের সব আঁটঘাটেই ছেলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তা'লে!

শবদেহটি গিরিরাজের বুক থেকে একমাসের মধ্যে নামলই না। বিশেষত সাঁঝ, ঊষা ও নির্জন নিশিরাতে। ভয়ের কম্পন তোলে, আকাশ-পাতাল ভাবায় এবং বুকের বাঁ-দিকে প্রসারিত হয় চিনচিনে ব্যথা। মীনের জাল বাঁধতে তেমন উৎসাহ ও বল পায় না। পাপবোধের ধারাবাহিক আশংকা ভেতরে ক্ষয় চালাতে থাকে। একই অন্ধকার গর্ভে পিত্রা পুত্রের মণিবিন্দু। মনষ্যজীবনের ধ্বংস ও ক্ষয় পুত্র পটা বৈতুল তোয়াক্কাই করল না। জীবন শুধু ভোগের। সেখানে ধারণ করে মেনে চলার কিছু নেই। তাইতা দুধিকে ঘরে তুলতে ধনুকাভাঙা পণ।

একদিন ঝুকঝুকে ভোরে, বড় নদীর কোলে প্রাতঃকৃত্যাদির মধ্যে সেই শবটার বুকে ঝুলে থাকা, যন্ত্রণা চিন্ চিন্ এবং বিশ্বচরাচর দু'চোখে রহিত। কতক্ষণ পড়েছিল কে জানে। তারপর সমুদ্র তাকে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ ফিরে এল না গিরিরাজ বৈতুলের। বে-সনাক্ত রয়ে গেল। খুন না স্বাভাবিক মৃত্যু? অনন্ত এবং সুকুমার জানে দুধি কিংবা পটাকে গিরিরাজ বালিতে লোপাট করতে চেয়েছিল।

একই খুঁটি-চিহ্নের পাশে, সামান্য কয়েকটা দিনের ব্যবধানে তিনটি মৃত্যু কাহিনী আস্তে-আস্তে ঐ জঙ্গল, সমুদ্রের স্পট এবং বেলাভূমির অংশ নিয়ে জনজীবনে গড়ে উঠল এক মহাগল্প।

দেড় দুই দশক পর। ক্ষয় ও লবণের আক্রমণে, বনঝাউয়ের সারি উড়ন্ত বালিয়াড়ির গর্ভে ঢুকতে-ঢুকতে ফেরিগঞ্জের সৈকতভূমি পরিত্যক্ত হলে দ্বীপের এই স্পটটির দরজা পরিপূর্ণ খুলে দেওয়া হল। ম্যানগ্রোভের জঙ্গল কেটে- কুটে কত লজ যে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মুখে, ইতিমধ্যে ঐ মহাগল্প আরও কাহিনীর ডানা পরতে থাকে। গভীর জ্যোৎস্না রাতে, ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট চোখে, কেউ বা কাদের চোখে যেন পড়ে, বাতাস ও রোদ্দুরে পোড়া কুচকুচে চামড়ার একটি বৃদ্ধ দু'টি তরতাজা যুবকের হাত ধরে বেলাভূমি পেরিয়ে জঙ্গলের পথে লজেগুলোর দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়, ফের নেমে যায় সমুদ্রে।

মহাগল্পের অভিকর্ষীয় টানে ট্যুরিস্টরা বিশেষ বিচলিত হয় না। শুধু বেলাভূমির স্পটে দাঁড়িয়ে একটি মোটা বনঝাউয়ের শরীরে লটকানো 'এখানো স্নান নিষেধ' সাইনবোর্ডটি মানে। কিন্তু শহরের যাপিত সংযমের সমস্ত নিষেধ ভেঙে মদ্যপানের গণআসর। তারপর ছমছমে অন্ধকার নামতে, নারী-পুরুষ ব্যভিচারের প্রস্তুতিতে যখন লগ্ন হতে চায়, কত অদ্ভুত জলজীবের মুণ্ডগুলো বালি ঠেলে আরও খানিক গলা তুলে জীবন্ত চাউনিতে তাকায়। নিষেধ করে। তাই মেনে, জীবনে কিছু ধারণ করে ফিরতে হয় বলে, সবকিছু বদলাবার দাবি সোচ্চার। নইলে হোটেল, লজ বা নির্জন আবাসন কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত নির্জনতায় আরও ডুবে যাবে।

এবং প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ এই পরিবর্তনে, অবশেষে ব্যক্তি -প্রতিষ্ঠানের ডাক আসলে একদিন উপযুক্ত ভোগপ্রবাহের নিরাপদ বেলাভূমির জন্য পুলিশ চৌকি বসে, জঙ্গলে আলো দিয়ে আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়। বুলডোজারে উৎপাটিত উপড়ে ফেলা হয় পাহারদার জলপ্রাণী ও সরীসৃপদের অলৌকিক মুণ্ডগুলি। গরুড়ের ছানা, উড়াল-পাখিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এইভাবে। এবং মহাগল্পের সবকিছু।

থেকে যায় তবুও দুর্দম সমুদ্রটির নিষেধ!

পৃষ্ঠা, শারদ ১৯৯৪

অদিতির জন্য ৬টি মিডিবাস

অদিতি মন্ডল পশুপতির ছোট মেয়ে। নীল পাড় সাদা খোল শাড়ি, মুজো এবং কেটস জুতো পরে প্রতিদিন স্কুলে যায়। চওড়া খয়েরি রংয়ের ব্যাক্‌ক্লিপ বাঁধে চুলে। ওর রংটি বেজায় কালো। গাঁয়ের পরিবেশে দশচোখের টিপ্পুনি বাঁচিয়ে যতখানি টিপটপ সম্ভব—চেষ্টা করে। তবে কর্মমাধবপুরের জলবাতাস এমনই প্রতিকূল, চামড়ায় চকচকে ঘষা-জৌলুস ফোটেনা। শ্যাওলা-বাঁশবন এঁটেল মাটি, সারা বছরের হিম-বর্ষা কাঠফাটা রোদের গোপণ লবণে হাত-পা-মুখে বিশ্রি কুড়োকুড়ো দাগ। বিস্তি ছোপ। গ্রামে গেরস্থবাড়িতে মোট পাঁচটি টিউবওয়েল। একটি ওদের। জলে লোহার দাপট বেশি, কোষ্ঠ অপরিষ্কার, অম্বল এবং নানা উপসর্গে বড্ড রোগা দেহ। তবু শাড়ির কুচি, কপালের চুল সামান্য কাটিয়ে দেয়া কিংবা বুকের ওপর দিয়ে আঁচল টেনে টানটান সেপ্‌টিপিন গুঁজলে অদিতিকে পাড়ার দশটি মেয়ের তুলনায় স্মার্ট লাগে। ও নিজেই শাড়ি ইস্ত্রি করে। গাঁয়ে দশআনা বাড়িতে 'ইলেকট্রি' আছে; কিন্তু হুক্ মেরে নেয়া। পশুপতি বছরখানেক হলো মিটার করিয়ে নিয়েছে। কাদা-ইটের পৈতৃক ভিটার পাশে, টালির ছাউনিতে পাকা একখানা যে কোঠা তুলেছে—ওয়্যারিং করানো। ওখানে প্লাগ লাগিয়ে অদিতি সুন্দর ইস্তিরি করতে পারে; কিন্তু টুক শব্দে সুইচ্‌টি টিপলেই মিটারে ঘুন ঘুন ঝংকার এবং মা তক্ষুণি আশপাশে থাকলেই ঝমঝম করে ওঠে— ফের ঐ মরণকলে হাত দেয়া করলি?

—হবে নি কিছু।

—এত আদিখ্যেতা কেন-রে কালী। ভয়-ডর নাই? মা এসে ফটাস করে স্যুইচটি বন্ধ করে দেয়। সস্তা ও ভাঙাচোরা ইস্তিরিটি ময়নার বুদ্ধিতে মরণকল। ওটি এ বাড়িতে ঢোকার পর এমন শক্ খেয়েছিল—বরাত খুব ভালো, টিকে গেছে সে যাত্রা। ময়না ওটি ধরে না আর; অদিতি আয়োজন করলেই ত্রাসে হাইহাই লাফিয়ে পড়ে। ১৬ বছরের মেয়ে মায়ের এককাঠি উপর দিয়ে যায়। মা যখন কাছেপিঠে নেই, উঠোনে কাঠের উনুন জ্বালাতে ব্যস্ত, একগাড্ডি সিদ্ধ কাচা নিয়ে পুকুরঘাটে কিংবা গোবর ঠোকে দাদুর আমলের পুরণো বাড়ির দেয়ালে, সন্তর্পণে ইস্তিরি সেরে নেয়। গ্রামের পথে গাছগাছালির ছায়ায় সাদা কেটস, গাঢ় খয়েরি মুজো, চুলের ব্যাক্‌ক্লিপ এবং নিজের হাতে সদ্য ইস্তিরির পাটবাঁধানো তৃপ্তিবোধে চাউনি ও গ্রীবায় অতিরিক্ত কিছু চাপা অহংকার।

শর্টকাটের জন্য নিজেদের বাগানের আলোছায়ায় বা কোণাকুনি কিছুটা মাঠ পেরিয়ে বাঁশবাগানের ছায়ায় লুকানো ছোট্ট মাজারটির পাশ দিয়ে পঞ্চায়েতের সদ্য-বাঁধানো রাবিশের পথটায় নির্মলের চায়ের দোকানের খদ্দেরের সামনে এলেই অদিতির অহংকার গাম্ভীর্য লাভ করে, এবং দু'টি মোড় পেরোলেই ভুবনমোহন-চঞ্চলকুমারী জুনিয়র হাইস্কুল। বছর দুই হলো জুনিয়রত্ব ঘুচে হাই হয়েছে। কয়েক মাস আগেও অদিতি গ্রামের স্কুলের ছাত্রী ছিল। এখন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ওর গম্ভীর অহংকার অদ্ভুত স্বপ্নের দু'টি পক্ষ লাভ করে। অদিতির গ্রীবা ও চোখ ফুটে স্বপ্নটি উড়ভার ভঙ্গিতে খুব দ্রুত মিডিবাসের টার্মিনাসে গিয়ে বসে একটি ডবল সিটের জানালার ধারে। এই ডানাযুক্ত কল্পনার খেলনাটি উপহার দিয়েছেন একজন পূর্ণমন্ত্রী—ওদের এলাকার এম.এল.এ। আর নিয়মিতভাবেই, চঞ্চলকুমারী পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই, 'এই কালী!' বন্ধুদের দূরাগত ডাকে অদিতি টের পায় নিজের শরীরের মধ্য থেকেই কে যেন বাঁ হাতের ছোট্ট ডাকে অদিতি টের পায় নিজের শরীরের মধ্য থেকেই কে যেন বাঁ হাতের ছোট্ট কব্জিটি চোখের সামনে তুলে সময়ের শাসন করেছে। ঘন্টা-মিনিটের কোনো কাঁটা নেই, দানার মতো ফুটকিগুলো শুধু ক'টা বাজল, আলপনার জলছাপ হয়ে ক্রমাগত অদিতিকে গুতোচ্ছে—চ, চ। ১০টা ৪৫-এর বাসটা পালালে, আরও দেড় মাইল ঠেঙিয়ে অটো ধত্তে হবে।....এদের ডাকে আর কথা কইতে হবে না।

৩৫ টাকার ঘড়িটি কিনে দিয়েছিল পশুপতি মন্ডল। রহড়া বাজারে মাছ বেচে। গ্রামের ধার ঘেঁষে যে মস্ত বিল— খেপলির বিল হিসেবে সরকারি রেকর্ডে উল্লেখ—ঠিক বিপরীত প্রান্তে রহড়া। সোজাসুজি ফিতে ফেললে দুই থেকে আড়াই মাইল পথ। ঘুরে গোটা চার-পাঁচ গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে বলে পথটি দাঁড়িয়েছে ৫ থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল। বিশ-পঁচিশ বছর আগে, পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিল দিয়েই কর্ণমাধবপুর মানুষ উঠত রহড়া। এখন ক্রমাগত মাটি তুলে জনপদ ঠেলতে ঠেলতে বিলটি বাটির মতো। সারা বছর হাঁটু-জল। অসীম বিস্তৃতির মুগ্ধতা নেই। কেবল কার্তিকের জ্যোৎস্নায় পাশে দাঁড়ালে মস্ত উঁচু উঁচু ইলেক্‌ট্রিক টাওয়ার বুকে জড়িয়ে কিছু কুয়াশা কল্পনায় রহস্যময়। কাউকে জীবনে চেয়েছিলাম—এমন কিছু মুখের বুদবুদ আস্তে আস্তে ঐ কুয়াশার মিশে গেলে দাঁড়িয়ে থাকটা কেমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

তা পশুপতি মেয়েকে ঘড়িটি কিনে দিয়েছিল বাজারে খোকাদার দোকান থেকে। আদিতি আবদার জানিয়েছিল বলে। প্রথমটায় বাবা বিশ্বাস করেনি অত সস্তায় ইলেকট্রনিকস্‌-এর ঘড়ি পাওয়া যায়। শিল্পাঞ্চলে নামজাদা স্কুলে ভর্তির সুবাদে মেয়ে হালফ্যাশানের অনেক কিছু খবর আনে। পশুপতি খোকাদার কাছে মেয়ের জ্ঞানের দৌড় যাচাই করে গর্বে অবাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মাছের বাজারের মতো। ওজনে ঢেলে বিক্রি!...তা এক দেড় বছর হেসে-খেলে চলবে।

—তারপর?

—কিনবে কিনা বলো। তারপর সব বুদ্ধি বাতলে দেব। আমার দোকানেই ব্যাটারি মিলবে। মেয়ের আধুনিকতায় পশুপতি খুশি।

প্রথম-প্রথম অদিতির পাড়ার বন্ধুদের তাক লেগে গেছল। ঝাপানতলার রাস্তায় নিজেদের

দাওয়া থেকে দেখতে পেয়ে চন্দনা অবাক। ও চঞ্চলকুমারীতেই রয়ে গেছে। সাধ পূর্ণ হয়নি ওর। বাপ গোপাল দাস রহড়ায় শাকসব্জি নিয়ে বসে। চন্দনাই বংশে প্রথম লেখাপড়ার মুখ দেখল। রোজ তিন টাকা খরচ করে স্কুলে পাঠানো সম্ভব নয়। তাছাড়া চঞ্চলকুমারী খারাপটা কিসের। প্রথম দিন চন্দনা বন্ধুর কব্জিটি তুলে শুকনো হাসিতে জিজ্ঞেস করেছিল—দিদিমণির বকাঝকা করে না? অদিতি এমন ভঙ্গিতে চোখ উল্টে দিল, যেন এসবের রেওয়াজ নেই বড় স্কুলে। চন্দনা গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। এখন অদিতির কাছে ঘড়ির চমক নেই। শহরের স্কুলে কেউ খুঁটিয়ে জানতে চায় না ৩৫ টাকায় ঘড়ি কোথায় পেল সে। গোল গোল ফর্সা হাতে ক্লাশের দু' একজনের কাঁটাওয়ালা ঘড়ি। শহরে কিছু জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল নাকি 'আদিখ্যেতা', 'গাঁইয়াভাব'। তবু স্কুল যাওয়ার পথে, চঞ্চলকুমারী এলেই অদিতির গূঢ় একটি কৌতুক কব্জিটিকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

লেখাপড়ার মাথাটি ওর খারাপ নয়। ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত সে ফার্স্ট। নিজের মধ্যেই কিছুটা আগ্রহ-উৎসাহ আছে। পশুপতি বড় মেয়ে দুর্গাকে, প্রাইমারি পাশের পর, কিছুদিন বসিয়ে রেখে ক্যানিংয়ে পাত্রস্থ করেছিল। তখন কর্মাধবপুরে জুনিয়র স্কুলও ছিল না। মেজ মেয়ে সবিতার মাথা বলতে কিছু নেই। ছয় ক্লাস পেরোতেই চার-চারবার ফেল। ২২-এর ওপর বয়স। নিপুণ গৃহকর্মে সংসার আগলাচ্ছে। নগদে ২০/২২ হাজারের নিচে ছেলে জুটেছে না বলে পশুপতির কাছে ব্যাপারটা শিরে-সংক্রান্তি। ছোট অদিতি। তারপর ময়নার চাহিদায় কেবলই 'ছেলে-ছেলে' ভাব জন্মালে চতুর্থটি পুত্র। বছর আষ্টেক বয়স। জিব নড়ে না—গুঙ্গা। কোমর থেকে সরু মরা ডালের মতো পা জোড়া নেমে থাকায়, মাটিতে গড়িয়েই পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ায়। ওর দায়িত্ব অদিতির। হাগানো-মোতানো, আবদার-সংকেত—সবই মেয়েটার তত্ত্বাবধানে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পাখনাওয়ালা স্বপ্নটি আদায় করা ছাড়াও মেয়ের ছোটখাট কল্পনা, বুদ্ধি ও শখের প্রতি পশুপতির নীরব সমর্থন আছে বরাবরই। নতুন নতুন ভাবনাগুলোকে কেটে-ছেঁটে সংসারের উপযুক্ত বানিয়ে বাড়ির হাল পাল্টাতে মেয়েটার দারুণ উৎসাহ। গাঁয়ের মাটিতে হেদিয়ে থাকতে চায় না। রেডিও, টিভির কত খবরের প্রতি ওর আকর্ষণ! উগ্রতা নেই, বরং নীরবে সংসারের দশটা কাজের মধ্য দিয়েই পশুপতি হঠাৎ টের পায়, কোথায় যেন রোজকার জীবনে সামান্য নতুনের সন্ধান দিল মেয়েটা। নইলে শহরের খবর—নিছক সাজপোশাক, ফ্যাশন, তেল-সাবান-শ্যাম্পু গাঁয়ের নতুন নতুন অনেক বাড়িতেই জানে, কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। বঙ্কুর মুদি দোকানটিতেই পাওয়া যায় প্রুডেন্ট টুথপেস্ট, ব্রাশ কিংবা কেয়োকার্পিন তেল। চিন্তা করা যেত বিশ-বাইশ বছর আগে? টি.ভি আছে ছ-সাত বাড়িতে। প্রতিদিন অধিকাংশ মানুষ যায় রহড়া বা সোদপুর। বলতে গেলে এটা তো শিল্পাঞ্চলের পড়শি গ্রাম। কোন কিছু চুঁইয়ে আসতে সময় লাগে না। রহড়া বাজারে প্রথম যখন পশুপতি লক্ষ্য করেছিল ছোকরাদের মধ্যে ঘাড়লতানো চুল ও জুলফি-চাঁছার ফ্যাশান, ঠিক হপ্তাখানেকের মধ্যেই ঝাপানতলার ক্লাবঘর থেকে বেরোতে দেখেছিল নোদোকে। কিম্ভূতকিমাকার! দেখাদেখি সুশীলের ভাইপো, মেহের আলীর নাতি বাক্কাসটা, ধীরেন পালের ছেলে রতন! ওরাই প্রথম ক্লাবে ভিডিও শো করেছিল। এখন বাক্কাস, নেদো জোগাল খাটে। আর রতন দু'বছর আগে ব্যাকে এইচ.এস. পাশ দিয়ে বেকার।

তো, পুরাণে বরলাভের মতো, অদিতির কাছে সরাসরি মন্ত্রীই এ বাড়ির উঠোনে এসেছিলেন স্বপ্নটি উপহার দিতে। ঠিক অদিতিকে উদ্দেশ্য করে নয়; তবু ওনার প্রতিশ্রুতিগুলো স্বপ্নের আকার পেল কেমন করে, নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি অদিতি। মন্ত্রীমশাই প্রাক্‌নির্বাচন এলাকায় প্রচারে এসে উঠেছিলেন এ বাড়ির দাওয়ায়। পূর্ব-আয়োজিত ব্যাপার। তোরঙ্গ খুলে ফুলকাটা কাচের গ্লাস, পেছনের গাছটা থেকে জ্যাঠার বড় ছেলে ভীমকে দিয়ে কয়েকটা ডাব পাড়ানো—সব দায়িত্ব অদিতির। ওর জ্যাঠা রঘুপতি গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান— মন্ত্রীও এক পার্টির মানুষ। সুতরাং কর্ণমাধবপুরে ভোট চাইতে এসে, ঘুরে ঘুরে মিনিট পাঁচেকের ফুরসতে তেষ্টা মেটানোর কর্মসূচীটি রঘুপতি কায়দায় নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছিল। বোঝে, এতে ওজন বাড়ে। অদিতি পারিবারিক অতিথির হাতে তুলে দিয়েছিল সবুজ গোল আয়তনের ফ্রেশ, স্নিগ টলটলে জল । মন্ত্রীর স্ট্র-খোঁজ করা অভ্যস্ত চোখ মুহূর্তে পরিস্থিতি সামলে ঠোঁটে তুলে ধরেছিল গ্লাসটি । বিস্ময়ে অদিতি খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছিল, অমন উঁচু মান্য অতিথিরও দাড়ির গোড়া সাফ করা নীলচে গলার ডিমটি পাঁচটা খুব হেঁজিপেঁজির মতোই উঠ-বস করেছে। ঠিক যেমন বাজার-ফেরতা বাড়ি ঢুকেই বাবা ঢকঢক জল খায়। তৃপ্ত ঠোঁটে, ভদ্রতায় মন্ত্রীমশাই-এর হাতের আলতো স্পর্শে, সরু কাঁধে অদিতির মনে হয়েছিল রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভরা শিহরণ। হাল্কা তুলো হয়ে দেহটি উড়ে যেতে চাইছে। লজ্জা মেশানো সুখ মুখে রক্তের আকারে 'জুম' হয়ে ফের শরীরে মিলিয়ে গেল যেন। কচি স্তনযুগলের নিচে কী তোলপাড়! মন্ত্রী নয়, এই মুহূর্তে অদিতির অনুভূতিতে উনি পুরুষ।

—কোন্ ক্লাশে পড়ো? সৌজন্যবোধে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন অদিতিকে। ভাগ্যিস বাবা পাশে ছিলেন জবাব দেয়ার জন্য। নইলে গুঙ্গা ছোট ভাইটার মতো জিব জড়িয়ে যেত উত্তেজনায়।

—আট ক্লাশে। বছর-বছর ফার্স্ট হয় ইস্কুলে।

মন্ত্রীমশাইয়ের উদরের খোলসে, অন্ত্রের তপ্ত নালি-নর্দমা প্রবাহিত ডাবের জলে শীতল হয়ে পড়তেই, ছোট্ট উদ্‌গার। নীরবে হাসছিলেন আরামবোধে। ভাইয়ের জবাব এবার রঘুপতি খানিকটা ব্যাখ্যা করে।

—মাথা ভালো থাকলেও গাঁয়ের মেয়েদের উপায় কোথায় বড় স্কুলে যায়?

...অথচ কাছেই শহর। হলে কি হবে, 'কমুকেশন' নাই ভালো।

মন্ত্রীর সামনে গাঁয়ের আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাদের মুখের ভাষা এবং কমুকেশন শব্দটির মধ্য দিয়ে রঘুপতির ইঙ্গিতটুকু ধরতে মন্ত্রীমশাই ঝানু বুদ্ধি বিফল হয় না। ঝাপানতলায় রাখা জিপটায় উঠে, আরও দু-দু'টি গাঁয়ের উদ্দেশ্য রওনা দেয়ায় আগে, কথা দিলেন, কর্ণমাধবপুরে বাস ঢুকবে। টেকনলজির যুগে সামান্য একটা বিলের বাধার জন্য মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে।

গাঁয়েও রাজনীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে; দু'চারজন বিরোধী সমর্থক, বেশ কিছু নৈরাশ্যবাদী এবং জীবনে বঞ্চনাটাই যাদের সত্যি, তাদের কাছে এইসব চমকে দেয়া কথাবার্তার গুরুত্বই ছিল না। কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে, মন্ত্রীসভা গঠনের মাস-দুই-তিন-এর মধ্যে শহরের সঙ্গে কর্ণমাধবপুর যুক্ত হয়ে গেল। টারমিনাসটি অবশ্য পশুপতির বাড়ি থেকে হেঁটে ১৫ মিনিট। পাশের ল[illegible]য়া গ্রামটায়।

পঞ্চায়েত যদি রাস্তা চওড়া ও বাঁধাই করে দেয়, তবে চলে আসবে চঞ্চলকুমারীর ধার পর্যন্ত। উদ্বোধন হয়েছিল দু'টো পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে। সামিয়ানা, শঙ্খ এবং ছোটখাট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, এবং ৬টি মিডিবাস সরু পথেও যারা হেলেদুলে ছুটতে পারে, লালবাড়ি—পেটের কাছে সবুজ—রোদে কেমন ঝিলমিল করছিল। কী উত্তেজনা এলাকায়! যেন স্পেস্ সেন্টার থেকে প্রথম রকেট্ উৎক্ষেপিত হতে চলেছে!

গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে ইঞ্জিন যখন গর্জে উঠেছিল, অদিতির জ্যাঠাবাবু, পঞ্চায়েতের আরও দুই সদস্য, চঞ্চলকুমারীর হেডমাস্টার ক্ষীরোদ গুছাইত, কোয়াক ডাক্তার বিশ্বনাথ দাস—মান্যগণ্য দলটার পেছু পেছু একদঙ্গল ছেলে- ছোকরা— সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে হৈ হল্লা, ব্যাগিস্ জামা ও কালো কাচের চশমা পরে চলল প্রথম ট্রিপে। সোদপুর স্টেশনে গিয়ে পরের বাসে প্রত্যাবর্তন। সমস্ত খরচ রঘুপতির। অদিতিও রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, কিন্তু ওর পিঠে ছোটভাই। দু'হাতে গলা আঁকড়ে, বাঁকা পাজোড়া দিয়ে এমন ভঙ্গিতে দিদির কোমরে ফাঁস দিয়েছে, যেন বিশাল ও মাংসল একটি মাকড়সা চেপে বসে গেছে অদিতির পিঠে।

বাসের শুভ উদ্বোধন নিয়ে সকাল থেকেই বাড়িতে হুট্টচট্ট। কানে খাটো দাদু কণ্ঠির মালা ও ধোপদুরস্ত পোশাকে বেরিয়ে গেল, মেজদির কপালে ধানসেদ্ধর ভার, বাবা মাছ নিয়ে বাজারে। জ্যাঠা ও কাকার ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে দৌড়েছে। অদিতির মহা ফাঁপরে। যেতেও মন টানছে ভয়ানক, অথচ ভাইটার কি অসহায় চাউনি! শেষে ময়নার অনুমতি নিয়ে ওকে কাঁধে-পিঠে চাপিয়ে...! সঙ্গে গোপালের মেয়ে চন্দনা।

চন্দনা কিন্তু অদিতিকে ফেলেই হুট্টচট্টর মধ্যে উঠে পড়েছিল বাসে। বন্ধুর এই স্বার্থপরতায় অদিতির কী ক্ষোভ! জানি না কেন ছুটেছে?...বদ মেয়ে!

—ভাইকেও বাস দেখিয়ে আনলি? ফেরার রাস্তায় জামাত আলী জিজ্ঞেস করল। ওর সারা দেহে শুকিয়ে ওঠা কাদা-জল। হাতে ঝোলানো আধ হাঁড়ি বিলের কাঁকড়া।

—চাচা, গেলে না দেখতে?

—সবুরে মেওয়া ফলতি দাও মেয়ে!...কখান গাড়ি দেলে মোট?

—ছয়।

—তা ল্যাজাখানা ঐ মৌজায় কেন? মোদের গাঁয়ে আনা গেল না টেইনে?

অর্থাৎ জামাতের বাসনা টারমিনাস কর্ণমাধবপুরেই থাকা উচিত ছিল। অদিতি ছোট্ট হাসিতে চলে যায়। ভারি মজা ও হাল্কা লাগছিল তার গোপনে। কেউ জানে না এ ৬টি বাসই তার জন্য। শুধু ওর কথা ভেবেই মন্ত্রীমশাই ব্যবস্থা করেছেন। সুখের দোলা লাগতেই, একি! পিঠে ভারি বোঝার টান কৈ?...অদ্ভুত ছন্দে ডানায় ভর দিয়ে, মাঠ-জঙ্গল পথের ওধার দিয়ে উড়ে সোজা বাড়ির উঠোনে। মন্ত্রী মানুষটি যে পুরুষ—সেই কবে কাঁধের স্পর্শে অনুভব করলেও—উড়বার পথে মিহি প্রেমের মায়াবী-মণ্ডলে জড়িয়ে পড়েছিল। দারুণ!

শুভ উদ্বোধনের রাতেই অদিতি বাবাকে মুখ ফুটে জানিয়েছিল, এ বছরই সে স্টেশনের ধারে

শহরের বেস্ট স্কুলটায় ভর্তি হবে। যাতায়াতে আর কোনো বাধা নেই। গাঁয়ের মাস্টার-দিদিমণির কাছে মাধ্যমিকে ভালো ফল সম্ভব না। একমুখ ভাত নিয়ে পশুপতি তাকিয়ে থাকে ময়নার উদ্দেশ্যে।

যেন নতুন সম্ভাবনার সামান্য দিগন্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তখন পশুপতির কল্পনায় অদিতি কেবল রোগা, কালো, যৌবনে পা দেয়া তৃতীয় কন্যা নয়। যেন তার মাছের দোকানে সম্মানীয় কোন মহিলা খদ্দের।

ময়না প্রতিবাদ জানায়।

—ক্ষীরোদ মাস্টার ন্যাকাপড়া জানে না, ছবি দিদিমণি ভালো পাশ দেয়াতে পারবে না—কি সব কতা কইছে সুমুখে? মেয়ের আদিখ্যেতায় বাঁচি নে আর!

—গেলেই ভর্তি করে নেবে? হ্যারে কালী। পশুপতি আমতা - আমতা করে।

—জ্যাঠাকে বলা-যাওয়া কর।

করুণ চোখের কথা ক'টি ভারি উষ্ণ হয়ে বেজে ওঠায়, পশুপতি ভাবে দাদার সঙ্গে পরামর্শ অবশ্য কর্তব্য। সে চঞ্চলকুমারীর ম্যানেজিং কমিটির একজন 'মেম্বর'। পরিবারের ফার্স্ট হওয়া মেয়েটিকে সরিয়ে নিলে গাঁয়ে কথা উঠবে। সব্বার চেষ্টায় মাত্র দু'বছর হলো স্কুলটাকে জুনিয়র থেকে হাই-তে রূপান্তরিত করা গেছে। কিন্তু পরিবর্তন ও উন্নত জীবনের পিপাসার জন্য পশুপতির ভয়ানক দুর্বলতা। নিজে সে ভালো করে সাক্ষর নয়। সাক্ষরতার অভিযানপর্বে লজ্জায় নতুন করে ভর্তি না হলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং উন্নতির জন্য ভীষণ আগ্রহ।

মস্ত উঠোনের তিন দিকে তিন ভাই-এর ভিটে। অন্যদিকে খুড়োদের পরিবার। পৃথক অন্ন হলেও, শ্রম উৎপাদন বা অন্যান্য ভোগস্বত্ব যৌথই বলা যায়। এখন এ পরিবারটি ক্রম-উন্নতির মুখে। এক সময়ে ছিল নিতান্তই গরিব-গুরবো। জাতে এরা কৈবর্ত। মাছের কারবারই ছিল প্রধান জীবিকা। বাবা নিশাপতির অক্লান্ত শ্রম ও বুদ্ধিতে কিছু জমি এবং আমবাগানের সূত্রপাত। এখন মাঠ থেকে বছরের খোরাক চলে। রঘুপতি পঞ্চায়েত করলেও হাওড়ার হাট থেকে ছিট-জামা এনে পাশের গ্রামের একটি ঠেকে সাপ্লাই দেয়। ভালো পয়সা আসে। ছোট ভাই যদুপতি দেখে জমিজমা—ধান ও সব্জির চাষ প্রধান। আর গ্রীষ্মে আমবাগান ধরলে বৃদ্ধ নিশাপতি থেকে পরিবারের মেয়েরাও যায় জড়িয়ে। অদিতি তখন ভৌতবিজ্ঞান রেখে দিয়ে কাঠের দাড়িতে কার্বাইডমশলা মেপে দেয়।

তবু সমস্ত বাধা টপকে, রঘুপতির বিশেষ চেষ্টায় চঞ্চলকুমারী ফার্স্ট গার্ল অদিতির স্থান মিলেছিল স্টেশনের ধারে শহরের বেস্ট স্কুলে। নুনের পুতুলের সাগরে ডুব দেয়ার অবস্থা।

এইভাবে কাটে কয়েক মাস। যাওয়ার বাস ১০টা ৪৫ এবং ছুটির পর ৪টা ২০তে ফেরার। মাঝে মাঝে ছুটির বাসটির জন্য অদিতিকে, স্টেশনের ফ্লাইওভারের ওপর তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হয়। শহর দেখে, শিল্পাঞ্চলের আকাশরেখায় বিস্ময় জাগে, রেললাইন দেখে, হোর্ডিং-এ চোখ বোলায় আর যে দিন বিকেলে অদিতির বাসটি আসে না— কোথাও ব্রেকডাউন, মনের মধ্যে অদ্ভুত ত্রাস। ছোট্ট প্লাস্টিকের টিফিন-কৌটায় চাউ বানিয়ে এনেছিল, দুপুরেই হজম

হয়ে গেছে। এখন পেটে ক্ষুধা মরে, পিত্তির রস জমতে থাকে। শেষে নিরাশ হয়ে অটো রিকশায় গাদাগাদি—৪টে টাকা খরচা করে— গাঁ থেকে মাইলখানেক দূর পার্থপুরের টারমিনাস। তারপর হাঁটা। বিলের ধার, মসজিদ, বাগান, চষা ক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ। বেলা ডুবতে না ডুবতেই মাটির বুক থেকে পাতলা আলোহীনতা হামাগুড়ি দিয়ে গাছগাছালির মাথায় চেপে ঘন অন্ধকার হয়ে যায়। ছমছম লাগে অদিতির। গাঁয়ের মুখেই ধাওয়া পাড়া—নিম্নশ্রেণীর গরিব-গুরবো মুসলমান। মোটা বকুলগাছের গোড়ায় বনবিবির থান। ভাঙাচোরা কিছু পোড়ামাটির ঘোড়া। কেউ না কেউ নিত্যসন্ধ্যায় নির্জনে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে যায়। ওটি নিঃসঙ্গ জ্বলে কিছু সময়, এবং দূর থেকে ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেই অদিতির কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীরে। যেদিন অটো মেলে না—শহর থেকে পার্থপুরে হেঁটে আসতেই রাত; বকুলগাছটা যেন অন্ধকারে বেশি-বেশি নির্জনতা ছড়িয়ে অপেক্ষা করে অদিতির জন্য। পাশেই সাঁতরাদের বাঁশবাগান, ছায়ায় ঢাকা ছোট একটি পুকুর—শ্যাওলা ও পুরনো পাঁকের গন্ধ ভাসে বাতাসে। পাগল বাসেদ—ধাওয়াপাড়ার রব্বান মল্লিকের ছেলে—ওখানে ডুবে তিন দিন পচা ঢোপ হয়ে ভেসেছিল। সে কি ইদানিংকার কথা? ছোটবেলায় ঠাকুমার মুখে বাসেদের জিন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর কত যে গা-হিম করা কাহিনী মাঝে মাঝে স্কুলফেরতা অদিতির মনে ভেসে ওঠে। নানা কৌশলে ভুলে থাকলেও বকুলগাছটার তলায় এলেই পাগলা বাসেদ-এর কথা মনে পড়বে। পিছু পিছু হেঁটে আসছে যেন। আর ফ্লাইওভারে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ভাবে, হুশহাস কত বাস চলে যায় শহরে, ওর ৬টি মিডির মধ্যে ব্রেকডাউনটা কেন বেশি? রুটটা কি দুয়োরানি?

ভয়ের গল্প স্কুলে সবার সঙ্গে সে করে না। ওরা হাসে। তবে শেষ বেঞ্চের দু'টি মেয়েকে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে অদিতি শোনায়—জানিস কী ভয় যে করে! ....ভূত-টুত না থাক...ধরে মুখ চেপে যদি কেউ...? কী ফাঁকা!

চঞ্চলকুমারীর দিনগুলোতে গাঁয়ের একই নির্জনতায়, ঝোপঝাড়, বাঁশবাগানের পথে সন্ধ্যারাতে ঘুরে বেড়ালেও এ ভাবনা হয়নি অদিতির। তফাৎ কিছু মাসের।

অদিতির স্কুল যাওয়ার সুবাদে ও বাড়িতে কিছু নতুন অভ্যেস গড়ে উঠল। এক বন্ধুর কাছে চাউ খেয়ে, রান্নার প্রণালী শিখে, অদিতি প্রথম যেদিন দাদু, দিদিমা, ছোট দিদা, জেঠি থেকে শুরু করে গঙ্গা ভাইটাকেও চাউ-এর স্বাদ পরীক্ষা করাল পরিবারে, পক্ষে-বিপক্ষে কত সিদ্ধান্ত! নিশাপতি ওগুলো সাদা কেঁচোর দলা মন্তব্য করে, দু-চামচ খেয়েই, ছ্যা ছ্যা। কী যে স্বাদ পায় এ থেকে! কিন্তু বাড়ির ঠাকমা অদিতির ছোট দিদাকে নিজেদের অতীত সম্পর্কে অনুশোচনা করছিল—বুঝলি আলতা, উনুনে দিতে না দিতেই বানিয়ে ফেল্লে কালী!...কত বদলে গেছে দিন!...আমাদের ছেলেবেলা? আগুনে কাঠ গুঁজেই গেলুম!... দিন-রাত্তির কেমন করে হয়, দেখার ফুরসৎ ছিল না।

অদিতির জন্যই পশুপতির নীরব গর্ব। মেয়েটা বুদ্ধিমতীও বটে যথেষ্ট। প্রায়ই, মাছের টিন-ঝুড়ি ক্যারিয়ারে চাপিয়ে, রহড়ার পথে সাইকেল চালাতে চালাতে দু-একটি চাকুরে মেয়ে দেখলেই, ওদের মধ্যে অদিতিকে খুঁজে পায়— কাঁধে সাইডব্যাগ চাপিয়ে শহরের স্কুলে দিদিমনি হয়ে চলেছে!

বিকেল ৩ বা ৪টে ২০-বাস এখন নিয়মিত ব্রেকডাউন। অদিতির অপেক্ষা, ক্ষুধা, নির্জনে

ঝোপঝাড়ের অমূলক আশঙ্কা, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়া — সব কিছুর প্রতিক্রিয়ায় পরদিন ১০টা ৪৫-এর বাসে অদিতি তুমুল ঝগড়া করে। এখন ঐ একটি বাসই নির্দিষ্ট সময়ে চলছে। রুটের প্রায় সব ক'টি কন্ডাকটার এবং ড্রাইভারের সঙ্গে এলাকার নিয়মিত যাত্রীদের সহজ সম্পর্ক।

—ভারি অন্যায়!...আমাদের বাসগুলোই বুঝি খারাপ হয়ে পড়বে?

—হবে না? তোমাদের যে রাস্তাঘাট! বাস চলে না নৌকা, বোঝাই যায় না।

—বাজে বকবেন না। শহরের রাস্তা কেমন জানা আছে।... ওদেরগুলোতে ঠিক চলে, বর্ষা-বাদলেও!...কাল সারা রাস্তা হেঁটে এসেছি।

ছোকরা ড্রাইভার কেবিনের রেলিং-এ মুখটা চেপে হেসে বলে—তোমাদের রাস্তায় ভালো ত্যালপিয়ার চাষ হবে বর্ষায়!...কি বলিস-রে পার্টনার? অদিতি ঝগড়া, রসিকতা ছাড়িয়ে সত্যিকার তর্কে পৌঁছে গেলে, কণ্ডাক্টারটি ফতোয়া দেয়!—নালিশ জানাও! যাকে খুশি...হ্যাঁ, হ্যাঁ খোদ মন্ত্রীকেই বলো গিয়ে! ড্রাইভারটি খ্যাক্ - খ্যাক্ হাসে।

এগুলো বাতকে বাত — কথার কথা। ওরা জানেই না, অদিতির সঙ্গে মন্ত্রীর কি কোমল, স্বপ্নের সম্পর্ক! কেনই বা ৬টি মিডিবাস এই রুটে চালু হয়েছিল! ফের উনি যদি বাড়িতে আসেন, অদিতি নিজেই তুলবে এইসব বিতর্কের প্রসঙ্গ। কারণ তিনি তো সাধারণ ব্যক্তি নন; কোন্ সাহসে এরা নিজের খেয়ালখুশিতে গাড়ি চালাবে এ রাস্তায়? তাছাড়া, যখন ছিল না এক কথা, এখন যাত্রীরা ৬টি বাসের সুবিধে ১টিতে নেমে আসায় গাল পাড়ে শুধু মন্ত্রীকেই।

এই ক'মাসের টানাপোড়েনে অদিতির ওজন পাঁচ কেজি কমল এবং নাইন থেকে টেন-এ উত্তীর্ণ হলো বটে— অভিভাবককে মুচলেকা দিতে হয়েছিল।

চন্দনার জন্য মাত্র ২০ টাকায় একটি ঘড়ি কিনে এনেছে গোপাল। এই মস্ত সংবাদটির জন্য অদিতিকে খোঁজা হচ্ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। আজকাল স্কুলের পথে বিশেষ দেখা হয় না। তাই আচমকা পেয়ে গিয়ে ডাকল—কালী? কাছে আসতেই উচ্ছ্বাস ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কালীর [illegible] কত ফুরফুরে! ২ টাকা পাতার শ্যাম্পু দেয়। দামী ব্যাক্‌ক্লিপ। হাতে একটি ফ্ল্যাট ফাইল, পাত[illegible] [illegible]াতায় বয়নশিল্পে গাঁথা। স্কুলের ওয়ার্ক এডুকেশন। আর চন্দনাদের ছবি দিদিমনি খালি কাগজের ফুল কাটায়।

—তোদের করতে হয় এগুলো? ফাইলটি নাড়িয়ে, চাটাচাটি সেরে চন্দনার প্রশ্ন।

—হু। ডাকলি কেন?

—তোর ঘড়ির ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে?

—কেন - রে?

চন্দনার মুখ গর্বে উজ্জ্বল। কিনেছে শুনেও, গালে ছোট্ট টুস্কি মেরে 'তোদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে?' বলে স্কুল-আলোচনায় চলে যায়। চন্দনা বোঝে এগুলো কালীর ঠেস মারা চাল। অথচ গাঁয়ের সব্বাই গোপনে সংবাদ নিয়ে ফেলেছে, মেয়ের পাশের জন্য পশুপতিকে মুচলেকা দিতে হয়েছে। সঙ্গে রঘুপতিও ছিল। ইনিয়ে-বিনিয়ে পুকুরঘাটে ময়নাকে শুনিয়ে বৌ-ঝিরা বলে—বুঝলে

না, বনগার শ্যাল রাজা, কলকাতা গেলে হয় পাতি শিয়েল! রসিকতার পাশাপাশি হাসির অর্কেস্ট্রা। ময়নাও হাসিতে যোগ দেয়। খড়খড়ে গলায় বলে— বনগায় ইঁদুর বাদরও ছেল, তারা তো যেতে পাল্লানি কলকাতায়? কি বলো দিদি? ফের পাল্লা হাসি।

রাতে পশুপতির খাওয়ার পাতে ময়নাই জানাল কালীকে ফের পুরণো স্কুলে ফিরিয়ে আনা হোক। অম্বল, আমাশা এবং দেহের গোপনীয় জটিলতার—যা স্বামীর কাছেও আকারে-ইঙ্গিতে রাখতে হয়— মেয়েটার কি চেহারা! ৬টি বাস নিয়মিত থাকলে কথা ছিল না। যে প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনই—ঐটুকু মেয়ের পক্ষে তাল রাখাই দুঃসাধ্য। ময়নার এতগুলো ধানাই পানাই শুনে পশুপতি স্তূপাকার অনিচ্ছার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বলে—কালী মানবে না।...এত কষ্ট করল।

অদিতি শোনে। শিষ্ট মেয়ের মতো সব কানে তুলে নেয়। চঞ্চলকুমারীতে চলে আসা বা শহরেই থাকা—মা-বাবার কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছাই বুকের মধ্যে দারুণ প্রত্যয় নিয়ে ঝম্‌ঝম্ বেজে ওঠে না। শুধু জ্যাঠাবাবুর পরামর্শ চাইতে, রঘুপতি প্রবল আপত্তি জানাল ফিরিয়ে আনার পক্ষে। গাঁয়ে দু'চার কথা শুনতে হবে এ জন্য। তবে রঘুপতি জানাল, অদিতি নিজের হাতে বাসের সংখ্যা ব্রেকডাউন ইত্যাদি নিয়ে যদি মন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠায়—অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসীদের সই করিয়ে— বিষয়টি ওনার নজরে আসবে। আর যখন চন্দনা স্মারকলিপিতে সই করে, কী উত্তেজনা মেয়েটার! গোপাল নিমরাজি হয়েছে। এ-ও ঠিক হয়, ওয়ার্ক এডুকেশনের ফাইলটি, পুরণো বই কালী যেন যত্নে রেখে দেয় চন্দনার জন্য।

দলের মিটিং উপলক্ষে মন্ত্রী কাছের শহরে এলে, রঘুপতি ফাঁকে তুলে দিল স্মারকলিপিটি। অদিতির হস্তাক্ষর। নব সাক্ষর কিছু গ্রামবাসীর সই দেখে উনি খুশি হলেন, এবং কি অদ্ভুত, মাসখানেকের মধ্যেই টারমিনাস ঠেলে আসে চঞ্চলকুমারী পর্যন্ত। অদিতির সঙ্গে মন্ত্রী আর মুখোমুখি হয় নি। তবে টারমিনাস বাড়ির দোরগোড়ায় চলে আসতে, এত দ্রুত স্টেপ নেয়ায়, মাঝে মাঝেই একান্ত গোপনে শরীরের বিশেষ স্থানে শিহরণ হামাগুড়ি দিতে থাকে অদিতির। একদিন মন্ত্রীমশাইকে দেখতেও পেল। পর-পর দু'টো বাস ব্রেকডাউন; পার্থপুর থেকে সন্ধ্যায় বাগানের মাথায় শেষ আলো ও ঝুপসি ছায়ায় জটলার যে অস্পষ্টতা জন্মে, অদিতি নির্জনে হেঁটে আসছিল। দূর থেকে হঠাৎ পাতলা ছায়ার মতো দেখল বনবিবির থানে বকুলগাছটার আড়াল থেকে সুড়ুৎ করে মন্ত্রী—অত্যন্ত বেঁটে, মাত্র এক হাত লম্বা, ঐ ফুলপ্যান্ট, জামা, চশমা এবং টাক নিয়ে—চলে গেলেন বাঁশবাগানের পাঁক ও পানায় ঢাকা পুকুরটার দিকে, যেখানে পাগলা বাসেদের দেহ ভেসে জলঢোপ হয়েছিল তিন দিন। অসম্ভব বিহ্বলতায়, আত্মরক্ষার গুমরানো ভয় বুকে নিয়ে, অদিতির নির্মলের চায়ের দোকান পর্যন্ত কী মরিয়া ছুটে আসা! তারপর পেটে মুচড়ে-মুচড়ে ব্যথা! সেদিন সন্ধ্যার মেঘে বিল, বাগান ও গাঁয়ের আকাশ থমথমে।

আর যে দিন ঘোর ধারায় শহরের আকাশরেখা লোমভেজা শুকুন সেজেছে, সাড়ে তিনটে থেকে অদিতি ওদের একটি বাসের জন্য দাঁড়িয়েই আছে ফ্লাইওভারের নিচে দুর্বল একটি আশ্রয়। ওয়াইপারে জল মুছে ছুটে যাচ্ছে শহরের বাস পর-পর, গাড়ির কার্নিশ বেয়ে পড়ছে ধারা, বাতাসে উড়ছে ফুটের পলিথিনের কোণা পংপং, চারতলা আবাসনকেন্দ্রটা ভিজছে, দরজা-জানালা ঠাসা।

এমনকি আশ্রয়ের মানুষ আকাশ ফাটিয়ে আবাসনকেন্দ্রটা ভিজছে, দরজা-জানালা ঠাসা। এমনকি আশ্রয়ের মানুষ আকাশ ফাটিয়ে বাজ ঝাড়বার ত্রাসে (হয়ত) যার এ্যান্টেনার তার খুলে কণিকাকে বাতিল করে দিয়েছে 'বাজে করুণ সুরে'।

আর কি ভাগ্যি, সন্ধ্যার মুখেই—বাদল বিকেলে দিনের হারিয়ে যাওয়া স্পষ্টতর হয় না বলেই সন্ধ্যার মুখ ঠিক নয়, গুড়িসুড়ি লোমশ অস্পষ্টতায়—অদিতি একটি বাস পেয়ে গেল। সারাদিন ডিপো থেকে এইটেই প্রথম। মাথার ছাউনি বেয়ে অদিতির ওয়ার্ক এডুকেশনের ফাইলটা জলের ছাটে করুণ ও কাতর। আজ প্রি-টেস্ট পরীক্ষা ছিল।

শহর ছাড়িয়ে ওদের গাঁয়ের এলাকায় ঢুকে যেতেই বড় বড় জলের গর্তে হারাধনের একটি মিডি হয়ে গেল নৌকা। বাসে অসম্ভব গাদাগাদি। গেঁয়ো, বোঁটকা গন্ধে গা-গুলোনো বাতাস। বাস দোলে, ড্রাইভার-কন্ডাকটার হাসে, চলায় পরস্পর রসিকতা। অদিতি সম্পূর্ণ ভেজা। চঞ্চলকুমারীর আগে খালি হবে না। হঠাৎ বড় দুলুনি। বিপজ্জনক টাল খেয়ে থেমে গেল বাসটা। ইঞ্জিনটা কাঠগড়ায় মোষের মতো বার-দুই গাঁ গাঁ করে বাতিল। ব্রেকডাউন।

—পার্টনার! ছোকরা ড্রাইভার হেসে উঠল, মন্ত্রীকে ত্যালাপিয়া ছাড়তে বলেছ? সেদিনের তুলনায় কণ্ঠের খাদে কিংবা সাহসে কোনো পরিবর্তন নেই। অদিতি টের পায় মন্তব্যটি কার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিপর্যয়কর আবহাওয়ায়, আটকে পড়া যাত্রীদের ঘরের টানে আজ আর ফোড়নটি তেমন তপ্ত কড়ায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠল না মানুষের চোখমুখের হাসিতে।

গাড়ি এখানে থাকবে সারা রাত। কেন? রুটে এই গাড়িটাই শিবরাত্রের সলতে। পার্টনার ফিরে গিয়ে ডিপোতে খবর দিলে, কাল মিস্ত্রি আসবে। রাতে আর কে আসছে এখানে? লাল-সবুজ সুন্দর রং-এর গাড়িটা বিলের ধারে পরিত্যক্ত থাকবে, জল লাগবে, হা হা বাতাস খেলবে রড ও স্টিলের পাতে, তারপর শেষরাতের বনজ কিছু গন্ধ স্পর্শ দিয়ে যাবে।

অদিতির সঙ্গে বাড়ির তিনজন সঙ্গী। বনবিবির থানে, বকুলের আড়াল থেকে সুড়ুৎ করে এক ফুট মন্ত্রীকে ছুটে নির্জন পুকুরে যেতে দেখতে হবে না। ভূত, জিন বা আলো-ছায়ার ভ্রম নির্জনে থাকলেই মানুষ দেখতে পায়।

অদিতি বাসে বসে খোলাচোখেই কল্পনার বৃষ্টি দেখে। সাদা দানার মতো। বিল ভরছে। রাস্তা ডুবছে। চঞ্চলকুমারীর সিঁড়ি ছোঁয়-ছোঁয়। বাঁশবাগান, আমবাগান—সব কিছু ডুবিয়ে ঘোলা স্রোত ওঠে মিডিতে। ওঠে, আরও ওঠে। অদিতি ডুবে যাবে? ঝপাং লাফ দিতেই হাতের ফাইলটি কোথায় যে ভেসে গেল, খুঁজে পেল না।

তিন-তিনটে টর্চের পাহারায় সাপের আক্রমণ বাঁচিয়ে অদিতি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ঢুকল অনেক রাতে।

তীব্র কুঠার, ১৯৯৪

মেলার কর্তৃপক্ষ

কাঠের বাঁটাগুলো ক্ষয় পেয়ে গেছে। বহু হাত ঘুরে কেমন পুরণো, মসৃণ। তেলে, ঘামে, মাঠঘাটের জল- রোদ্দুরে প্রথম পালিশ কখনো বসন্তের দাগধরা ছিটছিটি, কখনো-বা এমন খিচকোনো পোক্ত রং পেয়ে গেছে —কাঠ খসে না পড়া পর্যন্ত অমোঘ হয়ে থাকবে। শরীরে ওই ফুটে ওঠা দুর্দশা দেখলে ভর্তুকি দেওয়া সরকারি সংস্থার কথা মনে পড়ে। তবু ও বন্দুক শব্দটি বলে কথা! জংধরা ছিটকিনির মতো ট্রিগার ও লম্বা লোহার নলের গোল ফুটোটার অদৃশ্য অন্ধকার সমীহ আদায় করে। খুন শব্দের আভাস ফুটে ওঠে যেন। লম্বা পাটাতনে শিকল বাঁধা হাত চালাচালি করলেও যে গৌড়িয়ে দেওয়া যায় —গোটা তিন-চার। শুধু নলটা চেপে ডাউন করিয়ে, মাথাভাঙা চিংড়ির মতো ছর্‌রার দানা ঢোকাবার সময় হালকা খেলনা হয়ে ওঠে। এক টাকায় চারটে দানা।

কেলো তার চকরাবকরা শার্টটি গায়ে চৌকো লকেটটি সজ্ঞানে বুকে বিজ্ঞেপিত করে সঙ্গের লেজুড়েটিকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত হাঁ। রীতিমতো থ বনে গেছে লোকটির কাণ্ড দেখে।

পেছনে ঝোলানো পরদায়, কচিস্তনের মাপে লাল, নীল গোলাপি বেলুনগুলোর মস্ত বৃত্তটি ঘন বুনোটে নেই এখন। জেগে আছে কিছু কিছু; বাদবাকি সারাদিনের সফল লক্ষ্যভেদের চিহ্ন। ফ্যান্টা! গুরু! হেভ্‌ভি! কেলোর মুগ্ধ এবং এই মুহূর্তে অপ্রগভ চোখজোড়া শব্দগুলো কণ্ঠনালীর উল্টোপথে নীরবে বুকের অপ্রমধ্যে জন্ম দিচ্ছিল।

লোকটার পেটানো স্বাস্থ্য, ছিমছাম পোশাক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। মাতাল। না, ঠিক ঠিক মাতাল বলা যাবে না। চোখের মণিতে জুলফির বিনি বিনি ঘামে বা বাটারফ্লাই গোঁফের কাঁচাপাকা কুচির নিচে হালকা হাসিও পাকস্থলির হাওয়ায় হাওয়ায় মৃদু ঘ্রাণের আমেজ থাকলেও চলাফেরায় 'মাতাল' শব্দটি যথার্থ নয়। মিহি জর্দার সুগন্ধ ছড়িয়ে, অনায়াসসিদ্ধ, ডান হাতটা কাঁধ বরাবর সামনে মেলে দিয়ে, এক হাতে অব্যর্থ নিশানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল। বেলুন-ফেলুনের মতো স্থূল বস্তু নয়; আরো সূক্ষ্ম নিশানা। সুতোয় ঝোলানো পেরেক লকেট বা ছোট ছোট পুতুলের মুণ্ডু। প্রতিটি সফলতায় বস্তুগুলো গুলির ঘা খেয়ে দোল খেতেই ত্যাড়ছা চোখে দেখে নিচ্ছিল জো-হুজুরদের। বাঁ হাতে বগলদাবা এক মহিলা। মেলার এত মানুষের সামনে ভ্রূক্ষেপ নেই। মহিলার হাসি-চাউনি কিংবা দাঁড়ানোর রং-ঢঙে মনে হচ্ছে এই সব পুরুষদের বাগে রাখতে বহু দিনের

দক্ষতা অর্জন করেছে। জো-হুজুরদের 'স্যার ওইটা', 'লকেটটা হবে নাকি !' দুলিয়ে দিলে পারবেন ?' অনুরোধগুলো স্যাটাস্যাট টার্গেট করে, সাফল্যের ক্লান্তিতে, এবার লক্ষ্যভেদের খেলায় ছেদ টানলেন এইভাবে :হুকুম দিয়ে ছেলেটার কাছ থেকে চারটে দানা অতিরিক্ত ভরিয়ে নিলেন ; সূক্ষ্ম সুতো ছিঁড়ে দিলেন প্রথম দুটো দিয়ে এবং কি মনে হতে, গোঁফের রহস্য হাসিতে, শেষ দু'টোয় ঝোলানো পরর্দার কোণে মাধুরা দীক্ষিতের ঠিক জোড়াবুকে গাঁথা বেলুন দুটো টকাস টকাস্। তাচ্ছিল্যে বন্দুকটা ছুঁড়ে দিয়ে, হাসির রেশ টেনেই, মহিলার থুথনিতে খুনসুটির অঙুল ছোয়াতেই, ঝটকায় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় । শেষ টারগেট দু'টোয় মহিলার থুত্নিতে খুনসুটির আঙুল ছোয়াতেই ঝটকায় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় । শেষ টারগেট দু'টোয় মহিলা ক্ষুব্ধ ।

কে এই মানুষটা ? এত নিখুঁত টিপ ? নিশ্চয়ই কোনো ভাড়াটে খুনে কিংবা অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি ম্যান ? অথবা এও হতে পারে, কেলো ভাবল, দেশের কোনো অঞ্চল থেকে গা-ঢাকা দেওয়া উগ্রপন্থী ? বহু ভাষাভাষি কলমিল বস্তির শহরতলি, জটিল ঘোলাপথে গোটা দেশটাকে লুকিয়ে রাখলেও চিনতে পারা মুশকিল । এলাকাটা কেলোর নয়, সে এসেছে দু'টো স্টেশনে পেছনে ফেলে ।

সঙ্গের যে ভিড়টা জমেছিল চমৎকৃত অব্যর্থ নিশানা দেখতে, জো-হুজুরদের দলটা সরে যেতেই, মানুষটার দক্ষতার ঘোর কাটিয়ে আলোচনায় মশগুল । দোকানদার ছোকরা রুক্ষ ব্যবহারে গুতিয়ে পাতলা করে দিল । সে তো পেটের সন্ধানে এসেছে এখানে । এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে হুকুম তামিল করছিল, বলতে পারছিল না' কিছু ? দোকানদারটা কেলোর চাইতে বয়সে কিছু বেশিই মনে হয় । মেলায় মেলায় ছরকুটো মেরে গেছে, বয়সের হদিশ পাওয়া ভার । এক টুকরো কাপড়ে ফের বন্দুকগুলো মুছে, ঠিকঠাক সাজিয়ে মাধুরী দীক্ষিতের জোড়াবুক ভরাট করবে --এ অবস্থায় কেলোর সঙ্গে চোখাচোখি । কেলো চোখ মটকে মানুষটার পরিচয় জানতে চাইলে দোকানদারটা পাত্তাই দিল না । ঠোঁটের কোণায় তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে, তিক্ত এবং অস্ফুট 'বা --ল!' বলতেই, কেলোর ভারি মজা । তখনো টের পেল না ঘণ্টাদু'য়ের মধ্যে এই মেলা ও সমস্ত গুঞ্জন --গোলমালের বাইরে, অস্ফুট দূরাগত একটি ধ্বনি তার সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে ডাকবে 'অঞ্জ --ন। অঞ্জ --ন!'

এই ঘিঞ্জি, কোলাহল-প্রবন, অটো রিক্সা এবং ফুটদখলের হাঙ্গামা বাঁচিয়ে কাঠা আষ্টেক কাঁকুরে জমি শহরতলির রেলস্টেশনের এত কাছে যে অব্যবহৃত পড়ে আছে, শুধু মেলার সময়টুকুতেই মানুষের খেয়াল হয় হঠাৎ চোখে পড়ে যখন ইলেকট্রিক ঘূর্ণির আলোকিত মাথার কিছু অংশ । কেলো সাগরেদটিকে নিয়ে সেই ঘূর্ণিটার পাশে এসে দাঁড়াল । মোটরের ফট ফট শব্দ এবং ঝুলিয়ে দেওয়া ঝুড়ি --আসনগুলো শূন্যে বিরাট ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘানির মতো পাক খাচ্ছে । সাগরেদটি কেলোর তুলনায় ছোট --কোনো স্কুল-টুলে সেভেনের শেষ-বেঞ্চে বছর দুই 'আলো' করে আছে হয়তো । আনাড়ির মতো 'ভয় লাগে না ?' হেসে অস্ফুট প্রশ্ন করতেই, পাছায় সস্নেহ ছোট্ট একটি লাথ --বার কর । মন্টা হাসে । কিছু আগে নিপুন কায়দায় যে জিভে গজাটি হাতসাফাইয়ের পর পকেটে চালান দিয়েছিল চোরের ওপর বাটপারি যে চলছে, কেলোর নজর এড়ায় নি । বড় ইলেকট্রিক ঘূর্ণির পাশে দু-চার জন সাবধানী মানুষের টুকটাক কথাবার্তা ভেসে আসছে ।

--পাগল ! স্ট্রোক হয়ে যাবে মশাই । হুইটটা কম হল ?

--বহু দিন আগে, বুঝলেন ... কি বুদ্ধি যে চেপেছিল ! ..... শেষে শরীর খারাপ, বুক ধড়ফড় ঈশ্বরকে ডাকছি কখন নামিয়ে দেবে !

--হার্টে ধাক্কা এ বয়সে খারাপ । ..... বিশেষ করে ঘূর্ণিটার টপ পয়েন্ট থেকে নামবার সময় ছিটকানো দোলটা খুবই মারাত্মক ।

--মজাও আছে, যাই বলুন ।

--আপনি সোদপুরের পিঞ্জরাপোলের মেলার কথা বলছেন ?

--এটা আবার মেলা নাকি ? .... ফাঁকফোকরে দু-চারটে দোকান বসালেই মেলা হয় ? ....

ওখানে বিশাল স্পেস । ..যখন ঘূর্ণির টপ পয়েন্টে, সমস্ত মেলার তেলের লম্ফগুলো যেন অন্ধকার মাঠে থোকাথোকা আগুনের কুঁড়ি ।

--ঈশ্বরকে তো ডাকছিলেন, ফিল্ করলেন কখন ?

কেলো মন্টাকে বলে —ভয় করবে থোরি !

—তালে চ' উঠি ।

--দেখেছিস ? কেলোর ইঙ্গিতে মন্টা দেখে একটা ঘুরন্ত সিটে জাপটা- জাপটি ঘনিষ্ঠ বসে আছে একটি জোড়া । এবং নিখুঁত হিসেবে মোটরটি থামিয়ে দেওয়ায় একেবারে টপে তারা স্থির । এই মেলার আলোর ছটার আড়ালে পাতলা আঁধারিতে উর্দ্ধমুখী মানুষের সন্দিগ্ধ চোখ বাঁচিয়ে ঘেরাটোপ পেয়ে যাচ্ছে । বৃত্ত আবার ঘোরে । খেলা ? উত্তেজক খেলার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া ? যে লোকটা শর্টপ্যান্ট এবং কালো স্যাণ্ডো গেঞ্জিটি চাপিয়ে টিকিট চেক কিংবা আসনগুলো টেনে কাছে আনছিল, ঘেমে চুপচুপে এবং ক্রমাগত চিৎকারে পার্টি ডাকছিল যখন, কেলো সামান্য কাছে এসে কোমরে দু'হাত ঠেকিয়ে বলে --থামাচ্ছিস কেন ? বিলা ? বিলা করাচ্ছিস ? হিন্দীভাষী ছেলেটি অষ্টবক্র বাংলায় আঙুলে পয়সার মুদ্রা দেখিয়ে বলে --এথি আছে ? ফোট ইধারসে ! ত্যারচা চোখে কেলোকে জরিপও করে নিল । সেই মুহূর্তেই টিকিট কেনা পার্টিরা না এসে পড়লে, কেলোর উটকো রং-ঢং বেরিয়ে যেত । প্রতিপক্ষের চোখ মুখ পেশী দেখেই অনুমান হচ্ছিল তা ।

এত ছোট্ট পরিসর--দু-দুটো চক্কর খেলেই মানুষের মুখস্ত হয়ে যায় যেখানে, মাইকের এত হাঁকডাক উগ্রদাপটে সবার কানে --অর্থাৎ মেলা বলতেই যাদের রক্তে একটু ছুঁই ছুঁই ভাব জাগে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে --কর্তৃপক্ষ ! ক্ষমতা ! নানান সাবধানতা ! ওগুলোর কর্তব্য ! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মেলাটি আকর্ষণীয় এবং প্রচারিত করতে যে যে ভাষার প্রয়োজন, ট্রেন ফেরতা অটোয়, রিক্সায় পথে পথে চলতে থাকা মনুষ্যজনের মধ্যে তা ছুঁড়ে দেওয়ায় ত্রুটি ছিল না । আর এই সব জনসমাগমে নৈতিকতার জন্য, শৃঙ্খলার প্রশ্নে, স্টল পাওয়ায় অগ্রাধিকার বিচারে, বেহিসেবী হুজ্জুত হাঙ্গামায় কর্তৃপক্ষ থাকতেই হয় । আর এই কর্তৃপক্ষও নানা মাপের । মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড, মেলা পরিচালকমণ্ডলী কত কি ! রাত বাড়লে দু-চারজন নিজের হিম্মতেই কর্তৃপক্ষ হয় । দোকানদাররা সেটুকু বুঝে-সুঝেই সুঝেই মেনে নেয় সাত কি দশটা দিন তো রাতবিরেতে, এখানে-ওখানে ভাত ফোটানো, হাগা-মোতা কিংবা ঘাপঘোপে কিছু বদামো সারতেই হয় সারাদিনের

চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি ও লাভক্ষতির টেনশনের পর। মাথার উপর এই সব, সব কিছু নিয়েই মেলার কর্তৃপক্ষ।

রিঙের স্টলটা ঠিক বেলুনের লাগোয়। এ নিয়ে ওদের মধ্যে চাপা খিচখিচ। কেলো সরে এসে জোড়াকনুই বাঁশে ঠেকিয়ে দাঁড়াল। বেতের ছোট ছোট রিং। টাকায় পাঁচ। অর্থাৎ একটি টাকার বিনিময়ে পাঁচ-পাঁচবার চেষ্টা চালানো যেতে পারে, সাবানগুলোর কোনো একটিতে নিখুঁত গলিয়ে দেওয়া যায় কিনা। সেটি তখন তার। সাবানগুলো ভারি লোভনীয় চকচকে মোড়ানো-মলাট কিন্তু কোম্পানীর ছাপগুলো কস্মিনকালেও বিজ্ঞাপন দেখেনি, শোনেনি কেউ। কি ছাপায়, কি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়!

রিংগুলো ভারি খচ্চর। কাঠের পাটাতনে সাবানগুলো ফাঁক ফাঁক সাজানো। কত সহজ মনে হয়। অথচ রিংগুলো পড়েই ঠিকরে যায়। হাত, শরীর বাঁশে সর্বাধিক ঝুঁকিয়ে যতই দূরত্ব কমাক না কেন, রিং মোলায়ম হয় না। কখনো-বা গলে গেলেও সাবানের কানায় বেঁধে থাকে। যাঃ, হল না! এভাবেই লোকটা সাতাশ টাকা খেলেছে; বাঁ হাতের জিম্মায় মাত্র তিনটে সাবান। দোকানের মালিক, না মালকানী, প্রতিবার খচ্চর রিংগুলো, নিঃশব্দে কুড়িয়ে হাতে তুলে দিচ্ছে। ওর চোখে-মুখে খদ্দেরের পারা-না পারার কিছুই প্রতিক্রিয়া নেই। শূন্য! এমন নিষ্প্রাণ মুখোশে মানুষ স্থির থাকে কি ভাবে? যৌবনে ভাঁটার টান, দাঁত এবং গালে মেচেদার ছাপ, চুলের বাঁধনে কামুকতা আছে, ছিপছিপে, রুঠোশ্যামল। মানুষের কোনো মন্তব্যে সামান্যতম টলবার লক্ষণ নেই; মুখের চামড়াতেও সামান্য কুঞ্চন ফোটে না। কেবল বহু ঘাটের জলখাওয়া গভীর কালো চোখজোড়া তড়িৎ ফোকাস মেরে, নিজের দায়িত্বে প্রখর। ও এতেই টের পায়। পায় বলেই, খদ্দেরের অভিনয়ে যারা 'মাল' হিশেবে ওর বিশেষ স্পটগুলো নিয়ে মেলামঞ্চের বাইরের আনাচেকানাচে একটা কল্পবাস্তব প্রার্থনা করে, ওর সঙ্গে দু-চারবার চোখের ঠারাঠারি হয়ে যায়। সরে পড়ে, যেন কিছুই হয়নি।

—কত হল?

—-২৭

—৩০ হলে বলবে। অর্থাৎ তিন টাকায় আরো পনেরোটি রিং। ঠিক ঠিক গুণে রাখার মতো হুঁশ নেই লোকটার। নাকের ডগা, গোফের গোড়াগুলো ভিজে উঠেছে ঘামে, চোখজোড়ায় পাতা পড়ছে না। লক্ষ্যভেদের টেনশনে সাদা অংশ ঘোলা লাল। প্রতিটি ব্যর্থতায় মৃত্যু হাসি, গভীর শ্বাস এবং ফের রিংটা আসে। বাঁশের গায়ে বেঁকেচুরে লেপটে আছে। পাশের মোটা লোকটা সাবধানী, লাভ-লোকসান-সচেতন। কেলোর সমর্থনের আশায় বিস্ময়ে বলে —তিরিশ?

ক'টা পেয়েছে?

—তিনখানা দেখছি হাতে।

—কত হবে! ১২ টাকা? ....পুরো লস্!

কেলো জবাব দিল না। এই মোটুই কিছু ঘূর্ণিতে হার্টের ধুকপুকানির কথা বলছিল। শালা, ফাঁকে নিশ্চয়ই কিছু কিনেছে, কেলো ভাবল, হিপ পকেটে তখন মানিব্যাগটার মুখ উকি দিচ্ছিল।

কেলো খানিকটা আড়ালেও সরে এসেছিল তখন। প্রবল একটি আচ্ছন্নতা জন্মাচ্ছিল ওটি সাফাই করবার। কেলো পকেটমার নয়, জীবনের হাতেখড়িও দেয়নি কোথাও। তবু সব শুরুরই তো পূর্বের কিছু শুরু থাকে, হয়তো তাই। এখন কেলো দেখল সযত্নে পকেটের টিকির সঙ্গে বোতামটি ফাঁসবদ্ধ। কেলো এবার টের পেল মালকানী এই লোকসান-হিসেবিকে খেলোয়াড়ি দৃষ্টিতে দেখছে। তখন কেলো স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং মন্টাও, কারণ ওরা ভিড়ের চাপে চাপে বেলুনের সীমানায় অসুবিধে করছিল এবং দোকানদার টুঁ দিয়ে সাফ করে দিল।

বেলুনের পাশেই রিং চলে না। দু'টোই লক্ষ্যভেদের ব্যাপার। একটু সীমানা লঙ্ঘন হতেই পারে। ছোটপরিসরে কি ঠিকঠাক বড় মাপের স্থিরতা আসে? তাই তো ছোকরার প্রতিবাদ ছিল। বারবার কর্তৃপক্ষকাছে আর্জি পেশ করেও ফল পায় নি কিছু। দু'টোই পাশাপাশি থাকবে—কর্তৃপক্ষ মনে করেছে। বরঞ্চ ছেলেটাকে উলটে ' ?নিয়ে দিয়েছিল, ওর বাপের ভাগ্যি রোজ অতিরিক্ত দশ টাকা দিয়েছে বলে দ্বিতীয় বেলুন ঢুকতে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ কম লোকসান করেছে এতে ? একটা অনুরোধ রেখেছে বলে, ফের আবদার ? তাছাড়া রিং তো নির্দিষ্টভাবে ওর পাশেই চেয়েছিল—সব কিছুর পরও রোজ কুড়ি টাকা দেবে এজন্য। এতেও রিঙের লাভ, কারণ দু'টোই লক্ষ্যের ব্যাপার যখন, একটা থাকলে পাশেরটার ভোগ্যতা বাড়বে। এমন খোলা প্রতিযোগিতার সুযোগ কেউ ছাড়ে কুড়ি টাকার বিনিময়ে ? মেয়েটা তাই নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আর বেলুন-ছেলেটার শুধুই নালিশ, খিচ মেজাজ! বলতে পারে না, আবার মেলা ছেড়ে যেতেও চায় না। রিং থাকলেও, কর্তৃপক্ষ আর তো কোনো বেলুনকে বসতে দেয়নি—সব ফেলে ছেড়েও রোজ চল্লিশ- পঞ্চাশ থেকে যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেউ কেউ যদি খুশিমতো নিশানার ক্যাদ্দারি দেখাতে ফোকটে কিছুক্ষণ আগের কাণ্ড ঘটায়, মেজাজ ঠিক থাকে ? তাইতো কেলোর চোখের কৌতূহলকে চাপা উষ্মায় বলেছিল—বা -ল!

এই সব ব্যাপার কেলোর মাথায় নেই। এমনকি মন্টাকে নিয়ে সে সাধারণ পাবলিকের চাইতে আলাদা কিছু ধান্দায় আছে, ইতিমধ্যেই দু-চারজনের নীরব ও সন্দিহান দৃষ্টির জালের মধ্যে কিছু টের পাচ্ছে না। অথচ কেলো একজন সাধারণ পাবলিক-মন্টা জানে। মন্টাও একজন সাধারণ পাবলিক। দু'জন সাধারণ বটে, পাবলিক কি হয়ে উঠেছে ? আঠারো হয়নি কারো, তাই লাইনে দাঁড়িয়ে বাঁ-তর্জনীতে কাজল টিপ পরেনি যখন, পাবলিক হয় কী করে? ওদের বাড়ি জানে, ওদের স্কুল জানে, ওরা ছাত্র। শুধু ওরা এবং ওদের পরিমণ্ডলের খবর, কেলো এবং মন্টা স্বেচ্ছায় ছাত্রজীবন বর্জন করেছে। সে কথা পরে।

কেলোর চুলের কায়দা, চকরাবকরা জামা এবং পেতলের বুটিতোলা চামড়ার বেল্টটার জন্যই, যে স্পেসেই দাঁড়াক নজর কাড়বে। ইলেকট্রিক ঘূর্ণির ছেলেটা খদ্দের হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে এক ঝলক দেখে নিল ; ওরা দু'জন তখন কাঠের নাগরদোলাটার পাশে। কেলোর এটাও জ্ঞাত নয় সামান্য ছুতোনাতা পেলেই ওই ছেলেটা তিন ঠুসোয় কেলোর থোবড় ফাটিয়ে দেবে। তক্কে-তক্কে আছে ? ক্যাচাল বাঁধানো ? কিসের বিলা -রে বাঞ্চোৎ ? ভেবেছিস, চমকে হুজ্জুতে বাঁধিয়ে নোট খাবি ? কর্তৃপক্ষ সাজবি ?

এই কর্তৃপক্ষের পুরো খবর কেলো জানে না কিন্তু ছেলেটি ওয়াকিবহাল। এখানে তারা আছে। দৈনিক চার্জ হিশেবে এক কাঁড়ি টাকা দিতে হয় তাদের। এরপর আছে এনার্জি-খরচা হেন-

তেন, এতগুলো পেট যদি সব ট্রিপেই সিটগুলো না ভরে যায় চলবে ? এখন মেলার মধ্যপর্ব, অথচ কি করুণ অবস্থা ! ছোট ছেলেপুলেদের পর্যন্ত হামলে পড়া নেই । মালিক জানে না, ইদানীং বালক-বালিকাদের হার্টও খুব সূরু এবং দুর্বল । সুরক্ষাচক্রের মধ্যে রক্তে ভাসমান ক্রোকোস্টল অত উঁচুতে ঘুরপাক খেলে, রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেবে । ওরা ব্যাপারটা নিয়ে আর্জি পেশ করতে 'আমরা কি করব ?' কর্তৃপক্ষ বলেছিল 'তোমাদের স্বার্থে/ঘূর্ণির তো একটাই পারমিশন এখানে ।'

--লোকজন নেই একদম !

--কি করব তাতে ?

---ছ'টার আগে রোদই পড়ে না । ..... সন্ধেটুকু যা । ...... তা-ও টিভি আছে বলে .....।

--রোদের ঝাঁঝ বাঁচাতে শেড করতে হবে ?

--না স্যার । ..... লাইসেন দেন .....

--কি ? কিসের লাইসেন্স ?

--ফূর্তি- টুর্তি না পেলে কি এ সব চড়ে আরাম আছে ?

--মানে ? ...... ওঃ পটে তুলে চান্স করে দেবে ? মালিকের চোখ মটকানিতে, কর্তৃপক্ষের একজন --পেটানো স্বাস্থ্য, অব্যর্থ নিশানাবাজ -পাল্টা চোখ ছোট করে বলে --এটা শালা ভদ্দরপাড়া বে !

অর্থাৎ মরালিটির প্রশ্ন । মালিক ফের অনুরোধ জানায় ! মৃদু অনুযোগে বলে এটি তাদের নবম মেলায় যোগদান । গত আটটির কর্তৃপক্ষ নাকি মাথাই ঘামায়নি এ সব ব্যাপার নিয়ে । মেলা বা পাবলিক মানেই ফূর্তি, নীতি বা অনীতির প্রশ্ন উঠছে কেন ? তালে, হাতজোড় করে বলল, কাল থেকেই পাততাড়ি গুটোতে হবে । হ্যাঁ এ সব নীতিহীনতার জন্য অতিরিক্ত কিছু দাবি জানাতে পারে কর্তৃপক্ষ--মিটিয়ে দিতে আপত্তি নেই । কর্তাব্যক্তিদের দ্বিতীয় একজনকে সামান্য আড়ালে কথাগুলো বলেছিল । বৈঠক, আলোচনা এবং বোঝাবুঝির মধ্যে অনুমতি পেতেই না ছেলেটা কেলোকে ঠুসবার জন্য চান্স খুঁজছে ! চেহারা দেখেই ধরেছে কেলোরা হাঙ্গামা বাধিয়ে খিঁচতে চায় । সত্যিই কি মন্টাকে নিয়ে এমন কিছু মতলব ভেজে সে এসেছিল ?

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, তাপের দগ্ধক্ষমতা কমেনি, মেলার উজ্জ্বলতার ফাঁকে ফাঁকে পাতলা আঁধারির যে স্পটগুলো --কেলো সেখানেই ঘুরঘুর করছে কেন ? সে-ও ফাঁক খুঁজছে ঘূর্ণির ছেলেটাকে ঝাড় দেবে । কুত্তার মতো দাঁত খিঁচিয়ে মাস্তানি --সহ্য করবে না । খুবই 'ইনসাল্ট' অনুভব করেছিল কেলো । এখন নাগরদোলার পাশে দাঁড়িয়ে ।

আসলে, সে বন্দুকের টিপ করতে এসেছিল। কিন্তু ওই ষণ্ডামার্কা দক্ষতায় স্রেফ মিইয়ে গেছিলো । নাগরদোলার বনবন শরীরে ঠেকছে । কাঠের ঘোড়া, বাঘ, হাতি, সিংহ । মনে হয় বৃহৎ ভয়ংকর প্রাণীগুলোর পিঠে চড়া কি অনায়াস নিয়ন্ত্রণে ! শিশুদের মধ্যে এই মজাটুকু ছিল । কিন্তু পিঠের গাঁথা রডে শক্ত হাত আছে বলে, মস্ত বৃত্তের পরিধি ধরে বনবন করায়, শিশুরা দেখতে পায় না--ওই সব বৃহৎ ও ভয়ংকর মুণ্ডগুলো আসল নয়, বিকৃত, ঘাড় ভাঙা কারো কারো। মেলার

জলবর্ষায় কিছু ক্ষয়ে, খসে রংচটা হয়ে গেছে। তবে বাইরে দাঁড়িয়ে শিশুর অভিভাবকের এ সব দেখার সুযোগ আছে। তাঁরা নিরুৎসাহ। শক্ত, আরো শক্ত করে ধরো —এটুকু নির্দেশ দিয়েই যার ফিগারগুলো কিম্ভূতকিমাকার হয়েই যায় ?

কেলো মন্টাকে নিয়ে এবার দাঁড়াল মেলার ঠিক পুব অংশে —যেখানে পালিশ-পালিশ আকাঙ্ক্ষা বা উত্তেজনা ও দুরু দুরু রহস্যময়তা চলছে কতকগুলো সংখ্যা ঘিরে। আর সংখ্যাগুলো ঘিরে যে আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা পাক খাচ্ছে —তা লেবেল হিসেবে আঁটা আছে খোপে খোপে সাজানো টিভি, টেবিল পাখা, ফল ভেঙে রস বার করবার মেশিন, আরো আরো। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে একটি সংখ্যায়। মেলার অন্যান্য অংশের তুলনায় মানুষের চোখগুলো এখানে, নরম, আদরের এবং ফলভারে নত একটি আকাঙ্খার গাছ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই বন্দুক, ঘূর্ণি, কিংবা দা -বঁটি পুঁতির আকর্ষণের তুলনায়, কামনা এখানে বহু গভীরে বুদবুদ তোলে। পাশাপাশি তিনটে দোকান পরপর সজ্জিত, মেলার বিচ্ছুরিত একটি স্বপ্নের কুহক। অন্ততঃ পাবলিকের চোখ অনুমান করা যায়। প্রত্যেক দোকানের দু'কোণায় দু'জন পাহারাদার।

এত উদ্বেগহীন তাদের মুখভঙ্গি , মাত্র দু'টি টাকায় দান খেলে যে কেউ ওর একটা দামি ভোগ্যবস্তু খালি করে নিয়ে যেতে পারে, বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই। ভাগ্য। ভাগ্যের কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই। নাঙ্গা, ভুখা, শতকরা চল্লিশ-পার্সেন্টের যে কেউ এই ভাগ্যের জোরে যে কোনোটিকেই অবাধে ছুঁতে পারবে। দোকানিগুলোর মুখে চোখে এমনই নির্বাণায়তার ভাবচিহ্ন।

আশ্চর্য, অঞ্চলটায় লোকজন কম। তাই দোকানদারদের অ্যাপ্যায়ন খুবই আন্তরিক। রিং কিংবা বেলুনের মতো খরখরে নয়। কেলোর কি এসবের স্বপ্ন আছে কিছু ? প্রায় ঘন্টাখানেক হল, ওরা এখানে ঘুরপাক খাচ্ছে অথচ কিসের যেন অস্বস্তি বোধ। এই সব দশ পাবলিকের পরিবেশে একটা হুজ্জুত ঘটানোর নায়ক হতে না পারলে যেন মজা আসে না। আর মেলা মানেই তো কিছু আদিমতা। জনসমাগমে ঢুকে সামান্য খোলশ না ছাড়লে চলে ? গতমাসে কেলো, মন্টা এবং ঝুনু মাইল পাঁচেক ভেতরে নন্দদুলালের পর পর তিনবোতল 'কোক' পান করে —নকলি মালের দায়ে হাঙ্গামার ছুতোয় পয়সা না দেওয়াটা আইনসিদ্ধ করেছিল। আজ প্রথম থেকেই কেলোর এই মেলাটাকে পলিপ্যাকে মোড়া মনে হচ্ছে। এত ছোট জায়গায় মেলা হয় না। কিন্তু এখন এই সব 'স্বপ্নের' মুখোমুখি নম্বগুলো ভারি আকর্ষণীয়।

দু'টাকায় পাঁচটি চাকতি। লাল, নীল হলুদ —যে কোনো ব্র্যাণ্ড নেওয়া যেতে পারে! বেছে বেছে, আঙুলগুলোকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তুলে নাও ৫টি 'দেখি' বলে নিরুদ্বেগ দোকানদার ঘুঁটিগুলো নিজের আয়ত্তে এনে, পেছনের নম্বরগুলো মুখে মুখে যোগ দিয়ে যে সংখ্যায় পৌছে যাবে, সেগুলোই পেছনের সারিতে- সারিতে লেবেল আঁটা আছে। জুৎসই নম্বরটি বাঁধাতে পারলেই কেল্লাফতে। স্বপ্নের অলিকত্ব আর থাকবে না।

স্বপ্নই-বা কেন বলা হচ্ছে এগুলোকে ? এই যেমন অঞ্জন তার পোশাকি নাম, ফাইভ-সিক্স; এইট এ দু'বার, নাইনেও সমস্ত উদ্যম শুকিয়ে কেবল গাড্ডুই জুটল যখন, তখন এই বাইরের পৃথিবীতে একরকম পেরোয়া স্বাধীনতায় সে কেবলই কেলো। অঞ্জন এখনো রেজিস্ট্রি খাতায় পড়ে আছে। তাই বলে, স্বপ্নের অঞ্জন আর কেলো কি আলাদা মানুষ ? একটু গোঁফ উঠেছে —এই যা।

আর কিছু ব্রণ, কিছু শব্দ জিভের ডগায় রপ্ত, বাপের ভয় পাওলা --ছেলেকে শাসন করতে —এ টুকুই যা পরিবর্তন। আর পাল্টেছে শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইদানীং তাদেরও নবোদগম ভাষা আছে এবং সেইসব ভাষার অবদারে সে আড়াল -আবডালে পয়সা দিয়ে বিশেষ ভিডিও ছবি দেখতে যায়। মরালিটিও আছে, কারণ মন্টাকে সঙ্গে অ্যলাও করে না। তবে মন্টাকে আভাস দেয় যে, কেলো বৃহৎ জীবনের একজন যেখানে শরীরেও মজার খোরাক কিছু আছে। মন্টা কেমন নির্জনতা খুঁজতে চায় তখন।

সে যখন কেলো হয়ে একটা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে, লাইনের ধারের জলা জমিটার বিশাল পাড়ায় নিজের ছাউনিতে ঢোকে, ডোবার জলে গামছায় গা ঘষে, পাইপের ঘোলা জল পান করে কিংবা মচমচ শব্দে প্লাইউড ঘেরা চৌখুপ্পিতে পায়খানায় যায়, অঞ্জন স্বপ্ন দেখে ডাইনোসরাস। গতবছর, ওরই নেতৃত্ববে শিবরাত্রিতে সারা রাত ধরে পাড়ায় ভিডিও। নারী পুরুষে ঠাসা দর্শককমণ্ডলীর পারস্পরিক একাগ্রতায়, উৎসাহে জলাজমির পাড়াটা, টালির চালঠাসা বিস্তীর্ণ ঠিকানাগুলো কোনো সমুদ্র সৈকতের সুরম্য বহুতল বাড়িতে পরিণত হয়ে যায়। তন্দ্রায় মেঘে ভাসতে থাকে সব। জেগে থাকে শুধু লাগোয়া শরীরগুলোর টকটক ঘেমোগন্ধ, রাত্রিজাগা লম্বা হাই, মুখ ব্যাদান এবং গলায় জ্বালা ধরানো তীক্ষ্ন অম্বলের তাড়না। ফাঁকামাঠে, চৌখুপ্পির উজ্জ্বল বাল্বটা থেকে আলো বিধুরিত অঞ্চলটার খোলা আকাশ থেকে শেষরাতের ভেজাবাতাস নিঃশব্দে টনসিল দুর্বল করতে থাকে।

প্রায় বিশ মিনিট কেলো দাঁড়িয়ে দেখল, রুমাল কিংবা আঁচলের গিঁট, প্যান্টের পকেট অথবা মানিব্যাগ খুলে যারা যতবার দু'টাকা বার করেছিল নম্বরের হিসেবে মিলেছে চুলের ক্লিপ, জিভছোলা, টিপের পাতা, মামুলি ডট পেন ইত্যাদি। ধ্বংসাত্মক তাড়নায় যতই ঘুঁটি রং বদলে ছিল, নম্বরের যোগফলে প্রাপ্তির কোনো হেরফের ঘটেনি। কিল হজম করা চোখ-মুখ নিয়ে হাসতে-হাসতে ' স্রেফ জুয়া' বলে ছোট্ট একটু ঝাল ঝেড়ে গেছল এমন, কেউ যেন শুনতে না পায়।

আচমকা হঠাৎই, কেলো সন্তপর্নে আঙুলগুলো খেলিয়ে ঘুঁটি তুলল। দোকানদার গুনে ; সামান্য হেসে, বলে ১৭। এক প্যাকেটে সেভেন ও, ক্লক ব্লেড। (কেলোর দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয়। সেভেন ক্লক। মাথায় কমার চিহ্ন আছে কিন্তু 'ও' শব্দটি কৌশল বাদ।) মন্টা ভ্যাবাচ্যাকা খায় · কেলো পয়সা দেবে তো ? যা একখানা চিজ !

আবার ঘুঁটি তুলতেই মিলিত নম্বর এবং পাওয়া গেল সেফটি-পিনের পাতা। এবার ছিল সবুজ ঘুঁটি। তারপর কেলো সংস্কারের ভরসা থেকে নানা রঙের ঘুঁটি বদলাতে থাকল। ন্যাপথালিনের গুলি, সূচ এবং প্লাস্টিকের পাতলা পাউডার কৌটো। কেলো খুবই বিস্ময় বোধ করেছিল এগুলোও তালে নম্বরের আওতায় ; শুধু ওও সাজানো, পাউডার মাখা টিভি সেট, ফ্যান বা ফলের রস খাওয়ার জন্য যন্ত্রগুলিই নয়। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশে শুইয়ে রেখেছে বলে বোঝা যায় না কেলো নিশি-পাওয়া মানুষের মতো ফের ঘুঁটি খোঁজে। মনে পড়ে রিং ছোড়া মানুষটির নিষ্কম্প চোখ এবং অসাধারণ একাগ্রতা। কেলোও তাই অনুসরণ করল। ঘুঁটির রং ক্রমাগত পাল্টাল; বাঁ হাতে বেছে তুলল, ' লোনাথের' শরণাপন্ন হল কত বার ! বিয়াল্লিশ টাকা এবং শেষের পর্যায়ে পর পর জিভছোলা পেয়ে হ্যাট্রিক। কেলোর ঘাম ফুটে ওঠা নাকের নিচের চামড়া কুঞ্চিত হতেই, সে একটি ঘুঁটি উলটে বলে —কত ?

--ছয় । চটপট হাতে নিয়ে দোকানি বলে । কেলোর মনে হল খোপে খোপে সাজানো বস্তুগুলো বড্ড নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে । হঠাৎ কেলো দোকানির হাত থেকে ছিনিয়ে, উল্টে-পাল্টে চোখের কাছে তুলে ধরে । ছয় চার, তিন, এবং এক । অতি ক্ষুদ্র, লেন্সের সাহায্যে বোঝা যাবে এমন সংখ্যার টাইপগুলো । সুবিধে মতো, নিজের অনুকূলে নম্বর ঠিক করে দিচ্ছে । নিখুঁত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ।

--৪২ টাকা । বার করো আগে ।

--বা -লের টাকা !

ওইসব আলোকিত স্বপ্নের খোপগুলো না ছুঁতে পাওয়ার আক্রোশে, এক ঝটকায় সে বিভিন্ন রঙের ঘুঁটির সেটগুলো এলোমেলো মিশিয়ে দিল । টেবিলের দিল ধাক্কা । ঠিক তখনই, এক পাহারাদার কঠোর থাবায় কলার চেপে ধরতেই, কেলো দু'হাত পাঞ্জা মারে এবং লোকটা ছিটকে পড়ে না বটে, মাথাটা হেলে যায় পেছনে । সামলে, কেলোর গর্দনে চালায় জবরদস্ত ঘুঁষি । কলারটা ছাড়িয়ে, একটু ঝটকা-ঝটকি হয় পাল্টা আক্রমণের । তখনই পাবলিক দু-চারজন জড়ো হয়, বন্দুকবাজ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসতেই লোকটা বলে --স্যার, খালি মুখ খিস্তি ।

--খিস্তি ? কেন ?

--খেলে পয়সা দেবে না । ৪২ টাকা পাই ।

'আইন নিজের হাতে নেবেন না' এমন সুচারু ভঙ্গিতে কর্তৃপক্ষের জিম্মায় তুলে দিয়ে, খুবই স্বাভাবিক ঢেঁকুর তুলে সে পুনরায় উজ্জ্বল সাজানো অংশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । দু-চারজন খদ্দের জমছে । কে যেন পরামর্শ দিল --এখানে নয় .... ব্রজদা, বাইরে .....বাইরে ।

অগত্যা পাবলিকের কৌতুহল এড়িয়ে সীমানায় বাইরে একটা গলতাইতে ব্রজ ওকে ছাগলের দড়িটানের মতো হেঁচড়ে আনল । তবুও দু-চারজন পেছু পেছু ফেউ হয়ে আসে এবং মন্টা এই ফাঁকে ভয়ে লেজগুটিয়ে সোজা স্টেশনের উদ্দেশে ।

গলাতাইটুকুতে এই মেলাপার্টিরই কেউ হাফলুঙ্গি পরে রাতের তরকারি কুটছিল । উঠে এসে ব্রজকে ভক্তিসহকারে বলে --কি ব্যাপার স্যার ?

--কিচ্ছু না । ছিঁচকে !

--আপনি যান ।

ব্রজ'র হাত থেকে সরিয়ে এনে একটু দূরে, ওই ষণ্ডদেহী কেলোকে বানিয়ে দিল । কিরে ভাই! এক-একখানা ব্লো মানে, কেলো তাজ্জব ! বুকের অংশে জামাটা ঝরঝর রক্তে ভিজে গেছে । মাড়ি ফাঁক করতে পারছে না, বাঁ চোখটা নীলাভ আলু হয়ে কাতরানো সরু দৃষ্টিতে আলো-অন্ধকারের রাতটি দেখছে । রাত আর কোথায় ; শহরতলিতে মাত্র সাড়ে আট ।

প্রায় ঘন্টাদুই, চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের কোণে, সর্বদাই অন্ধকার যেখানে, ঘাসের ওপর মাথাগুঁজে বসে আছে কেলো । অদ্ভুত ঝিমঝিম ভাব । নাক দিয়ে তরল শ্লেষ্মা এখনো ঈষৎ রক্তমাখা । যেন হাজার ভিমরুল হুল ফুটিয়েছিল । তখনই ব্যথা, পরাজয় ও অব্যক্ত গভীর লাঞ্ছনায় কেলোর

দেড়খানা চোখে নিঃশব্দে ফুটে উঠল নোনা জল এবং দূরাগত ঘাসপোকাদের টানা ঝিনঝিন ডাকের কোরাসে অস্পষ্ট শুনতে পেল অঞ্জ —ন। অঞ্জ —ন।

অতিকষ্টে কাত হয়ে পকেটে হাত ; চিরুনিটি আছে। অন্ধকার চুল আঁচড়াল। চারপাশে শাক-সবজিতে ঠাসা, ঝুড়ি হাটুরে চেহারার জনা তিন পাহারায়। আজও লেট ট্রেনের অপেক্ষায় আছে সব। চুল আঁচড়াবার কিছু পরেই কেলোর মনে হয়, ঘাসপোকার ঝিনঝিন ডাক নয়, ওগুলো মানুষের কথা। বাকযন্ত্র বেয়ে উঠে আসছে। ওরা গল্প করছে। সামান্য রিলিফ পেতে কেলো যখন কান মেলে দেয়, ওই হাটুরে তিনজন গল্প করছে। হঠাৎ আকাশের কোণে চাঁদ ফুটে ওঠায় আলোচনায় বিষয় হয়, দেশের খরা এবার দীর্ঘস্থায়ী হবে। কেন ? না, চাঁদ প্রসঙ্গে গত পূর্ণিমায় নাকি ওদের একজনের গাঁয়ে অদ্ভুত লক্ষণ দেখা গেছে।

--কেমন ? দ্বিতীয় জন বলে। তিনজন ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা। এই প্রশ্নে প্রথম ব্যক্তি বললে, সে দিন মাঝ রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মাঠের মাঝের স্যালো পাহারাদার নাকি খটখটে শুকনো বিলের মধ্যে দেখেছে একটা ঘোড়া লেজ নাড়িয়ে জ্যোৎস্নায় নীরবে ঘাস খাচ্ছে ...অথচ তাদের আশপাশের দশগাঁয়েও কোনো ঘোড়া নেই।

--হয়তো নতুন কেউ কিনে থাকবে !

— না, না পরদিন তা-ও খবর নিয়েছিল। ..... প্রতিবাদ করল প্রথম ব্যক্তি।

--কিংবা ভ্রম ! খরায় মাঠঘাট ঝুনো ....ফাটলে তাপের দেহ বেরোচ্ছে .... ছায়া-টায় মিলে ...তুমি নিজে চড়াওনি তো আজ ?

গল্পকার তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তখন তৃতীয় ব্যক্তি একটু স্বপ্নিল কণ্ঠ নিয়ে বলে --হতেও পারে ! বর্তির বিল কিনা। মোসলমানরা মাটি দিতে আসে। .... মানুষের আকাঙ্ক্ষা তো মরে না ... ঘোড়া হয়ে বিলে চরতেই পারে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মেনে নেয় না। আকাঙ্খা তো রক্তমাংসের দেহে বাস করে, মাটিতে মিশে যাবার পরই রহস্যময় ঘোড়া কেন হবে, বোঝা মুশকিল। তবে, এইসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যেও, ওরা দৈববাণীর মতোই উচ্চারণ করল ওই সব মায়াময়তা দীর্ঘ খরাকেই সূচিত করে। তখনই কেলো সত্যি সত্যি তার দেড়চোখের মণিতে একটা ঘোড়া দেখতে পেল। দেখতে পেল। হঠাৎ একটা ঝরঝরে পুরনো কাঠের ট্রেন আসতেই কেলো ওঠে। ওরাও হয়তো ওঠে।

নিজের স্টেশনে নেমে কেলো সামান্য ঝুঁকে মানুষজন এড়াতে চায়। প্রশ্ন থেকে বাঁচবার জন্য সে মরিয়া। পরিচিত সাঁকোটার এপারে দাঁড়াতেই, কেমন মনে হয়, সব কিছুই অনতিক্রম্য। কিন্তু দাঁড়িয়েই-বা থাকে কি করে ? সিদ্ধান্ত নিল জামাটা খুলে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে প্রথমে। ডোবায় নেমে, জামাটা ধুয়ে, নাকে-মুখে জল ছিটোতেই কাঁচা গন্ধ।

--শুয়োরের বাচ্চা ! কেলো বিড়বিড় করল। কে যেন এই মাত্র লুকিয়ে শৌচ করে গেছে।

সবার সামনে বিকৃত নাক মুখের লাগসই একটি গল্প ভাঁজতে ভাঁজতে, কেলোর মনে খটকা জাগল, ওই ব্রজ কি সত্যিই কর্তৃপক্ষ ? নাকি স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে মেলার সব্বাইকে চমকে বেড়াচ্ছে ?

বান ২০০ ফুট

তারপর, সত্যিই লরির ডালা খুলে দিতেই বেয়ে নামতে থাকল । হিলহিলিয়ে, জড়াজড়ি ও ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে ফুল-পাঞ্জাব লরির চাকা, তেলের টেঙ্কি কিংবা অ্যাক্সেলে দোল খেয়ে থুপুস ঘাসে পড়েই হিলহিলিয়ে ছুটল হিন্দু জনপদের দিকে । একলরি সাপ । কেউটে, শাঁখমুঠি, চিতি কালাজ ---বেছে বেছে সর্পকুলের বিষধর যত আছে । এইসব বহিরাগত ভুজঙ্গদের পুঁতির চকচকে ক্ষুদে চোখ প্রতিহিংসায় জ্বলছে এবং তীব্র হলাহল নিয়ে যাকে পারে .....। কলাগাছের মতো তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়বে ।

---এত সাপ পায় কোথায় ?

--দেশটা তো জল-জঙ্গলের । দু-পা ফেললেই সাপ ! মনা দাস ঠোঁটের কোণে শীতল, ছাই জমে থাকা খণ্ড-বিড়িটি আপাতত নামিয়ে প্রচুর চা ছাঁকতে ছাঁকতে মাথা গোনে এবং প্রত্যয় নিয়ে বর্ণন্যা দিয়ে চলে । এভাবেই নাকি ইদানীং গভীর রাতে লরি ঢুকছে গুপ্ত পথে ।

--সাপগুলো ট্রেনিং দেয়া ? বেছে বেছে হিন্দুদেরই কামড়াবে ?

মনা দাস বক্তার দিকে একঝলক চাউনি ছুঁড়ে 'লিকার' ? বলেই ছোকরাটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল । রঞ্জিত চুক চুক নাক কুঁচকে ঠোটে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বিস্কুটের লেই জিভ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলে ----ক-লরি ঢোকে রোজ ?

মানা এবারও কিছু বলল না । একজনের দামের ভাঙানিটি ফেরত দিতে-দিতে ঠোটের ডগা সামান্য কাঁপাল ।

দোকানের একজন নিয়মিত খদ্দের মিটিমিটি মজায় তাকিয়েছিল মনা দাসের চোখের দিকে। মুখমণ্ডলের নানা মুদ্রা, কথার তালে নাচতে থাকা বিড়িটি --সব মিলিয়ে সুরেনের মনে হচ্ছিল মনা দাস মিথ্যে কিছু বলছে না ।

ওরা তো কতবার আমাদের পেছনে লাগার চেষ্টা করল । .... জানে, যুদ্ধ হলে পারবে না..... যদি চোরাগোপ্তায় কাবু করতে পারে ! যুদ্ধের খরচা নাই, শত্রুও বিষে মরল ।

সুরেন ভাবছিল, হতেও পারে ।আজকাল সব কিছু সম্ভব । দেশে দেশে কত ধরণের আতঙ্কবাদ

চলছে ! তামিল-টাইগাররা নাকি জলের ট্যাঙ্কে ফলিডল ছড়িয়ে রাখে !

যারা মনা দাসের দোকানটি এখনই আলো করে আছে--সবাই পরস্পর পরিচিত । ভোর পাঁচটায় ঝাঁপ খুললেই দলটি হাজির । বাসি মুখে কিংবা ডিউটির পথে অথবা প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরবার সময় । দোকানের একফোঁটা ছেলেটা রাতের বাসি ছাই সরিয়ে গুলকয়লার আঁচও স্বাভাবিকভাবে তুলবার ফুরসত পায় না । পাখা পিটিয়ে দ্রুত বন্দোবস্ত করতে হয় । বেঞ্চি জাঁকিয়ে তীর্থের কাক হয়ে আছে সব ।

ব্রাহ্মমুহুর্তে মাঠে পাক খাওয়া হাফ-বৃদ্ধটি শখের লাঠিটি পাশে শুইয়ে গভীর আগ্রহে শুনছিল মনা দাসের কথা । স্বাস্থ্য-দপ্তরের কর্মী হিসেবে অবসর নিয়েছে প্রায় ১৩ বছর হল ।

কীভাবে একটি শত্রু-দেশ ইদানীং লরি লরি সাপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে এ দেশের মাটিতে ! ধর্মযুদ্ধের জন্য !

এভাবে যদি হট্ট-হট্ট বাধিয়ে দেয়া যায় !

রঞ্জিত উঠে পয়সা দিতে গেলে, হঠাৎ কেটলির ফুটন্ত জলে আরও কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালতে-ঢালতে মনা দাস নাকের পেটি স্ফীত করে জিজ্ঞেস করল--কত লরি রোজ ঢোকে ?

রঞ্জিত মিটিমিটি হাসে, তুলতে কয়েন খুঁটে তোলে । সে পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মী । দল বেঁধে যে কুলিবৃন্দ বড় বড় ড্রেনের পাঁক সাফ করে, তাদরে অগ্রবাহিনীর একজন ।

লম্বা হেঁসো চালিয়ে আশপাশের জঙ্গল ছাঁটতে-ছাঁটতে যায় । একবার ঝোপে লুকিয়ে রাখা পটকা বোমার ঘায়ে পা খানিকটা পুড়ে গেছল রঞ্জিতের । সেই থেকে মিউনিসিপ্যালিটি এদের জন্য বরাবের গ্যামবুট স্যাংশন করেছে ।

---কতখানি ঢোকে টের পাও না রোজ ? একমুঠুম হাতের অশ্লীল মুদ্রায় মনা দাস উত্তেজিত ; শীতল খণ্ড-বিড়িটি হাতড়ে না পেয়ে নতুন ধরায় একটা । শালা ! আমাদের রোগটাই এই । রঙ্গ করো, না ? কিছুই বিশ্বাস করো না ! চোখ দেখলে বুঝতি । কাল রাত্তিরে এই, এখানে বসে পুলিশটা বলে গেল । বডারে ছিল । মিথ্যে বলবে ?

---চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে । যতক্ষণ না ঘাড়ে চেপে বসে ! স্বাস্থ্য-দপ্তরের লোকটি মনা দাসের জোরটুকু নিয়ে ভালো গ্লাসটিকে চেপে ধরে বলে ---আমি মশাই ঝড়ে মোষ উড়ে যেতে দেখছি । .... সমুদ্রের ধারে একটা গাঁয়ে ডাক্তারি করতাম । উড়িষ্যার । .... কী যে ঝড় ! বাপরে ! লোকাল গয়লাদের দু-ডজন মোষ শুকনের মতো উড়িয়ে নিয়ে কোথায় যে সমুদ্র ফেলে দিল । .....টেরই পেল না কেউ ।

--সমুদ্র নাকি কিছুই নেয় না ? ..... ফিরিয়ে দেয় ?

--হয়তো ভেসে-ভেসে এসেছিল পরে, মনে নেই । বুড়ো সামান্য থতমত খেয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করল এইভাবে --সারা জীবন কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি ঘটনাটা । সেবার গাইঘাটায় নারকেল গাছ মুচড়ে ছিঁড়ে তিন মাইল উড়ে গেল ...তখন ? দুনিয়ার সব কিছু সম্ভব । ..... সাপ কেন, ওরা সব পারে ।

স্টেশনে দুধ দিয়ে প্রতিদিন ফেরত পথে চা খায় বিন্দা ; বৃন্দাবন । সে এতক্ষণ নিজের মতো যুক্তি সাজিয়ে ঘটনাটা যাচাই করছিল নীরবে । হঠাৎ বলে -- সাপ কতটা দূর ছুটতে পারে ? ..... ওসব দিকে রাস্তার পাশেই তো খেত.... গ্রাম অনেকটা ভেতরে ।

---সাপ ? কতদুর ছুটবে ? কেউ বলতে পারবে না । অনে--ক দূর ।

---কত ?

--জানি না । ২০/৫০ ...হাজার মাইলও হতে পারে ।

বিন্দা ভ্যাবাচ্যাকা যায় । বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধন্দে দোলে । হাতের কাছে প্রমাণ নেই, আবার সোজা বাতিলও করতে পারে না । দিলু বোস পায়ের পা চাপিয়ে, চায়ের বিস্বাদে অতিরিক্ত চিনি চাইতে-চাইতে চেঁচিয়ে ওঠে ----সাপ উড়তেও পারে ।

--উড়ন্ত সাপ ? বাব্বা শ্মশানে চিতার ধোয়া দেইখ্যা ছাড়ে ! বলল যশোদা । যশোদাই দোকানের মজলিশে একমাত্র মহিলা খদ্দের । ঠিক পাশেই, ফুটে সে চাল নিয়ে চালনিয়ে বসে । খুব সকালে, সামান্য জলে ছিটে, ঝাঁট ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বস্তার মুখ খুলে সাজিয়ে বস্তার মুখ খুলে সাজিয়ে নেয় । বিধবা, পৃথুল শরীরে দিনরাত পুরুষের মতো খাটে । স্বামীই বসত এখানে ? সাত-আট বছর আগে ক্যান্সার মারা যাওয়ার পর, যশোদা ব্যাবসাটি ছাড়েনি । প্রতিবেশিরা ছাড়তে দেয়নি । বড়ছেলে বিদেশ-বিভুইয়ে সামান্য চাকরিতে সংসার চালায়, মেজটির টুকটাক ইলেকট্রিকের কাজ, সংসারে একগাদা পুষ্যি । যশোদা যাবে কোথায় ঃ সেই থেকে দোকানাদারদের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, ঝঞ্ঝাটে জড়িত । মনা দাসের দোকানে প্রথম এককাপ প্রভাতী চা না হলে মাথা ছাড়ে না । ঐভ্যাস!

বৃন্দাবন পয়সা মিটিয়ে সাইকেলে হাত দিতেই দিলু বোস অভিভাবক হয়ে বলল ------- ঘোষের, পো, দেশের কোথায় যে কী হচ্ছে দুধে জল ঢাললে টের পাওয়া যায় না ।

বিন্দা হেসে বলে --টের পেয়ে তো অনেক করছেন কর্তারা । ..... সে বাদ দেন । ..... অত সাপ ধরার মজুরি কে দেয় ?

মনা হেসে বলে --রোজ কত মেয়ে উধাও হয় জানো ? এলাকা তেকে ? ছাই খবর রাখো ! তালে আর মজুরির কথা তুলতে না ।

বিন্দা প্যাডেল চাপতে চাপতে বলে ----আমি তো আর বডারে থাকি না । ছাড়ুক সাপ ।

এর পরের পর্বেই কিছু নীরবতা । ধর্ম, জাতিবৈরিতা ও ঝড়ে মোষ উড়ে যাওয়া থেকে যাওয়া থেকে সাপের লরির ব্যাপারটা এই সব মানুষগুলো মধ্যে অনির্দিষ্ট একটি ভাবময়তা সৃষ্টি করে, যা-থেকে মনে হয় পরিচিত দমচাপা চারপাশটা পাকাপাকি কিছু নয় ; যে-কোনোদিন অদ্ভুত কোনো বোজবাজিতে বদলে যেতে পারে ।

এরপরই প্রতিদিনের খবরের কাগজটি আসে । যশোদা চলে যায় বস্তাগুলোর পাশে । মাথার ওপর পলিথিনের শিট টাঙানো । মনা দাসের দোকানে খদ্দেরের ভিড় পালটায় না -- মুখগুলো বদলে-বদলে যায় শুধু । ধ্বস্ত মন, অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও রিক্ত -শূন্যতার মধ্যে

এমনভাবে কাগজের খবর নিয়ে বিতর্কের দলে ভাগ হয়ে যায় যেন কিছু বধির পরস্পর ভয়ানক অসহিষ্ণুতায় যার-যার বক্তব্যকে জয়ী সাব্যস্ত করতে চাইছে ।

রাষ্ট্রপতির চেহারা এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে কেউ যদি বলে --ঠিক যেন পায়খানার বেগ পেয়েছে ।.... আর একজন উড়িয়ে দিয়ে বলবে --ধুস ! ওভাবে কেউ পায়খানার যায় না ।...মনে হচ্ছ ঘুম পেয়েছে খুব ।

---শুধু শুধু ঘুম পেতে পারে ? কোন দুঃখে ? জনগণের জন্য ভাবনায় ?

---মানুষের ঘুম পায় না ? আমরা ঘুমাই না ? কোন জনগণের জন্য ভাবচি ?

----সারাদিনেই তো দেখি উনি বসে আছেন ।.... মাঠে পায়চেরি করেন না ? ঘুমটা আসে কীভাবে ?

--সোনার খাট পেলে তুমিও ঘুমোতে এমনি এমনি । হাঁটার দরকার নেই । একজন চিমটি কাটতেই কোনা থেকে সখী-সখী হোরার কালোবরণ, দাঁতমাজনের হকারটি, বলে উঠল -- হাওলা-গাওলার সব সোনা ফাঁক । ... খাট কোথায় ?

---সি বি আই কী করে ? ধরে না কেন ?

----ডিম পাড়ে । দারোগারা খায় ।

--সব শালা চোর ।

---আদালত আছে ।

--সহ শালা চোর ।

--দরকার মিলিটারের । ধইর‍্যা ধইর‍্যা গুল্লি করবার লাগে ।

--সব শালা চোর ।

--থামেন তো । কালোবরণ দাপিয়ে উঠল --সব চোর ! সব চোর ...আমি আপনি সাধু ? একজন একাগ্র মনোযোগ একখণ্ড কাগজ পড়েই যাচ্ছে । যেন নিজের বাড়ির কাগজ । ধৈর্য হারিয়ে পাশের খদ্দেরটি মিন মিন করল --হল ? পাশের জন আধো চাউনিতে হুল ফুটিয়ে বলে --বানান করে পড়তে সময় লাগে ।

লোকটির বেকার-বেকার চেহারা । অবিশ্বাস ও অপষ্টিতে ভাঙাচোরা শরীর । পাশের লোকটির খোঁচা শোনেনি অথবা গ্রাহ্যই করল না । পাতাটি চোখের সামনে থেকে আস্তে সরিয়ে ঘোরের মধ্যে উঠল --অ্যাদ্দিন শুনছি গ্যাট গ্যাট ! .... এখন আবার চিটি বিটি ..... চিটি বিটি । ...... এ দেশের কিছু হবে না ।

--হলে তো এত ন্যাতা বেকার । দরকার নাই ।

দিলু বোস জিজ্ঞেস করে --চিঠি বিটিটা কি, মনাদা ?

মনা দাস ছেকনি হাতে, ঠোঁটের কোনায় বিড়ি নিয়ে বলে --কী সব বোমার ব্যাপার স্যাপার।

রঞ্জা শালার পায়ে ফুটুস বোমা না । ..... একটা ফাটলে পৃথিবী ধ্বংস কী বলেন ?

--আমাদের সে বোম নাই ! লোকটা হাসতে হাসতে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে দেশের অক্ষমতা প্রকাশ করে ।

মনা দাসের মনে কোথায় যেন বিশ্বাসে আঘাতে লাগল । ফের বিড়িটি রেখে বলে -- চোরগুলান দেশটারে শেষ করল ।...... সব আমাদের ছিল ...এখন সে-না বোমা ! .... সুদর্শন চক্রটা কী ? অ্যারোপ্লেন, রকেট ছিল না আমাদের ? নারদের ঢেঁকিটা কী ?

আবার আলোচনায় উঠে আসে মিথ বা জনশ্রুতি । মানুষগুলো ভাঙাচোর, নিঃস্ব চাউনির মধ্যে এতক্ষণ যে-নিরাশ্রায় ভাবুটকু ছিল,. একটা কিছু অবলম্বনে যেন ঘন হয়ে ওঠে । অবচেতনে জাগে প্রচ্ছন্ন একটি স্রোত --পরিচিত একঘেয়ে চারপাশটা পাকাপাকি কিছু নয় ; যে-কোনোদিন অদ্ভুত কোনো ভোজবাজিতে বদলে যেতে পারে যোগ্য

দুপুর ঘন্টখানেকের জন্য ঝাঁপ বন্ধ । বেকার, ক্লান্ত বসে বসে যারা উঠে যেতে বাধ্য, মনে হয় স্ব-স্ব বাড়িঘরের পরিচিত পথ এত দীর্ঘ, এত ক্ষয়-মনস্কতার জন্ম দিচ্ছে, অজ্ঞাত খোলস এমন করে রাখে, জীবনে সামনে এগুবার কিছু নেই । ওই জনশ্রুতিই আশ্রয় ।

কাগজে ছাপা খুদে অক্ষরগুলো অমোঘ সত্য, নইলে ছাপা হবে কেন । তাই তো, কোনো দেশে পুরুষের গর্ভধারনের সংবাদে ঝালাই মিস্ত্রী বেণীমাধব লে-অফের সুযোগে সারা সকাল মনা দাসের দোকানে অর্ধনারীশ্বরের মিথ শুনতে শুনতে অদ্ভুত বিশ্বাসে টইটম্বুর হয়ে পেছনের ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকিয়েছিল ।

--দু-পাতা পড়ে বেশি তড়পায় ভদ্দর লোকেরা । .... সব শালা চোর ... ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবে, ওসব খবর টেবিলে তৈরী করা ...শালা, বানানো হলে মানুষ চেপে ধরত না ? কেউ না কেউ প্রতিবাদ করত । .... তা তো দেখি না ? সবাই বোকা ?

আসলে প্রতিদিনের এমন হাজার জনশ্রুতি বা তৈরী-বিশ্বাস ঘিরে এরা ২৪টি ঘন্টা আলো-আঁধারিতে পাক খায় । আর নিজের মুখোমুখি নিজেই খুব জরুরি হয়ে ওঠে । তাই যশোদা যখন বাড়ি ফিরে মহল্লায় এক লরি সাপের কথা বলে, সবার চোখেমুকে ভবিষ্যৎ যেন নিদানযোগ্যতা হকারায়, মনের মধ্যে আকারহীন একটি ক্ষোভ, ঘৃণা দানা বাঁধে সেই শত্রু-দেশ ও মানুষ সম্পর্কে।

আজ তেমনই একটা মিথের পরীক্ষার দিন ; ওই মনা দাসের দোকানে প্রায় মাসখানেক ধরে যেটি তো দেয়ায় সরগরম ছিল । গঙ্গার বুক ধরে ২০০ ফুট বান আসছে । একটা বিপর্যয়ের স্বাদ চাক্ষুস দেখার জন্য এই মানুষগুলো প্রায় মাসখানেক ধরে কী যে বিতর্ক ও বিসম্বাদ চালিয়েছিল! দু-দিন ধরে কাগজের অক্ষরের ইঙ্গিতে দেখার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ।

আজ সেই দিনটি ।

গত দু-দিন ধরে মনা দাসের দোকানে কত জল্পনা-কল্পনা !

---২০০ ফুট কতখানি ? ওই লাইট পোস্টটা ?

---ধুস ! অমন ৫০খান পোস্ট তলিয়ে যাবে ।

একজন প্রাইমারি শিক্ষক বলে —ঠিক তা নয় । ধরুন, খুব উঁচু নারকেল গাছ যতটা ...।

----ঘরবাড়ি কিছুই থাকবে না ? আজগুবি । সব আজগুবি ।

শিক্ষকটি বলে ---কাগজ কি সবই মিথ্যা বলবে ? .... প্রকৃতির মর্জি যা খুশি হতে পারে । ইঠ-সুরকি সাপ্লায়ের ছোটখাটো এখজন দালাল বলে ---খুব ভালো ! একসঙ্গে শেষ হোক সব । পাপে ভরে গেছে ।

--যারা বেঁচে যাবে ?

---সুখে থাকবে । .... জিনিসপত্রের দাম কমবে ।

কেরোসিন ডিলার হিন্দুস্থানী লালাজি ময়লা পোশাকে গাঁজা টেনে ধুনকিতে প্রতিদিন রাতের দিকে দোকানের এককোণে বসে থাকে । জিনিসপত্রেঘর দাম কমবে শুনে খিস্‌খিস্‌ ইঁদুরের হাসি দেয় ।

----তোমার আর চিন্তা কেয়া ? সব ত্যাল বেলাকে জাড়েগা. মনা দাস বলে --জলে সব টিন ভেসে যাবে ।

--দু-চার টিনা তুম কাকাড় লো ! .... লালাজি বলে ।

মনা ধমকায় —পাকড়ালে তোমার তেল নেব কেন, ফ্রিজ মোটরগাড়ি দোষ কল্ল কী ?

---পরশু বানের কথা শুনছেন সুব্রতবাবু ? রোগা ধরণের খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে মাঝবয়সি একজন জিজ্ঞেস করল । সুব্রত তরফদার প্রতিদিন সকালে টুকটাক বাজার সেরে -মনা দাস্রে দোকানে এক কাপ চা খায় । তার পোশাক, চেহারা এবং কথাবার্তায় নিয়মিত খদ্দেররা সম্ভ্রমে বেঞ্চিতে একটু সরে বসে ।

--বান ? পরশু কেন ? রোজই তো আসে ।

চারাপোশের চাউনিতে সুব্রতবাবু ধরতে পারেন, প্রতিদিন জোয়ার আসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করছে না ।

---জোয়ারভাটা রোজই তো হয় নদীতে, কী ? বড় জোয়ারকেই বলে বান ।

ব্যাপারটায় রহস্য না থাকায়, সবকিছু অঙ্কের মতো ফর্মুলা হতে, এদের মধ্যে কেমন যেন অতৃপ্তি ।

---২০০ ফুট বান !

সুব্রতবাবু হেসে জবাব দিল —২০০ ফুট বান আনতে গেলে ... আমাদের এই নদীতে .... চাঁদ-পৃথিবীর দূরত্ব কত কমতে হবে,. জানেন আপনাারা ?

--কাগজে লিখেছে ।

----না লিখলে ওগুলোর বিক্রি বাড়বে কেন ?

মনা দাস অতৃপ্ত কণ্ঠে বলে ---তা ২০০ ফুট হতেও পারে স্যার । সবকিছু কি আগাম বলে দেয়া যায় ?

-----এ তো ভাই যুক্তি, বিজ্ঞান । হিসেব ছাড়া কি চলছে কিছু ?

--হিসেব করে বাল যায় কে কখন মরবে ? জন্মাবে ?

---আচ্ছা, আচ্ছা । পরশু কখন ? দুপুর একটায় ? ..... সন্ধ্যায় চো খেতে এলে দেখা হবে সেদিন । শুনব কিছু !

সুব্রতবাবু মৃদু হেসে চলে গেলে এরা কিন্তু মিহি সূক্ষ্ম মুখোশটুকু সরিয়ে বুঝতে পারল ঠাট্টা করে গেলেন । পিনচ্ । উনি চলে গেলে, এখানে পড়ে রইল চাপা ক্ষোভ ঈষৎ আশাভঙ্গ । একজনের মনের রহস্য অপরজনের বিস্ময়কে ছুঁতে পা পারলে ছন্দপতন ঘটে বইক । মনা দাস ক্ষোভমেশানো কিছু মন্তব্য করতে গিয়েও ফাঁকা শ্বাস ছাড়ল । সে দেখতে পেল, ২০০ফুট প্রবল জলোচ্ছ্বাসে টাকপড়া সুব্রত তরফদার ডুবুডুবু নারকেল গাছের মাথাটি আঁকড়ে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টায় পোঁদ উলটে ঢেউয়ের টানে ছিটকে ভেসে যাচ্ছে ।

পরদিনের ছাপা অক্ষরে আরও কিছু রোমহর্ষক সম্ভাবনার কথা প্রকাশিত হল । উত্তেজনা বাড়তে থাকে । ঠিক হয় আগামীকাল অর্থাৎ ২০০ ফুট বান অসবার দিন, মনা দাসের দোকান বন্ধ রাখা হবে । তারপর ? একটা দিনকে এভাবে উত্তেজনায় রূপ দিতে ছোটখাটো সাধ-সাধ্যের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল ।

--কী মাসি, কাল যাবে ? পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে ।

--৫০ ! বাপরে ! ..... কেন ?

--ফিস্ট । মনা দাসের প্রস্তাাবে যশোদা হাঁ করে থাকে ।

---খুব ভোরে ম্যাটাডোর ভাড়া করব । গঙ্গার পাড়ে বসব সবাই । দুপুরে খাওয়া দাওয়া ওইখানে । ..... তারপর বান দেখা ।

---কী খাওয়াবি ? যশোদা লোভাতুর হয় ।

---খিচুড়ি, লাবড়া, ইলিশমাছ ভাজা ...।

--দূর হ !

--ওহো, তোমার তো ..... বেশ, তোমার জন্য খিচুড়ি, বেগুনভাজা, বোঁদে । রাজি ? বড় বড় চাকা চাকা বেগুন ভাজার তেল গড়িয়ে পড়ছে, ঘি দিয়ে ভুনো খিচুড়ি এবং ফুলো ফুলো লাল হলুদ বোঁদের দানাগুলো । ধ্বস্ত জীবনে, ভাঙাচোরা খটবটে ডাঙা-পথে কে যেন এগুলোর স্বপ্ন পটপট মোমবাতির জ্বালিয়ে দিল । যশোদা রাজি হয়ে যায় । টানাটানির সংসার জেনেও সে ৫০ টাকা দেয় । ভো রে স্নিগ্ধ বাতাসে ম্যাটাডরের ছুটন্ত বাতাসে যশোদার সেই মুহূর্তে বেঁচে থাকা বিশেষ আয়নতন পেয়েযায় ।

নদীর ধার বরাবর কী ভিড়, আর কগী ভিড় ! সমস্ত জনপদ যেন অন্তিম বিপর্যয়ের সৌন্দর্য দেখতে পাগলের মতো বেরিয়ে পড়েছে । ২০০ ফুট বান দেখবে । দেখবে ধ্বংসরে মধ্যে চারপাশ কেমন পালটে যায় । প্রত্যেকরেই ভাবনা, বিপর্যয়ের অলৌকিক পরিস্থিতিতে তিনিই শুধু বেঁচে থাকবেন।

গুমোট গরম । বর্ষার ভরা নদী থমথম করছে । দেশময় বন্যার জল বয়ে এনে কী উদ্ধত ভঙ্গি ! মাঝে মাঝে সূর্য নির্দয় প্রহার চালাচ্ছে গাছপালা, মানুষের চামড়ায় ।

এ-দলটা যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে ছোটখাটো বাগা-জঙ্গলের ছায়ার কাপড়, পলিথিন টাঙিয়ে রান্নার আয়োজন লেগে পড়ল । কোথাও কোথাও কীর্তন শুরু হয়েছে ; খোল করতাল নিয়ে কিছু দল বান দেখতে এসেছে ।

রান্নার আয়োজনের পাশে কিছু মানুষের ভিড় ; টিটকিরি দিচ্ছে, কুকুর শুঁকতে তাড়াতে । আজ আর ওকে রান্নার হাত দিতে হল না । মুক্তি । পরিশ্রমের কাজ পুরুষরাই করবে ।

ঠিক হল খাওয়াদাওয়া আগেই সেরে নেওয়া হবে । তারপর বানের মুখোমুখি । এ নিয়ে অবশেষে মনা দাসের সঙ্গে দিলু বোসের খানিকটা বাদ-বিসম্বাদ ... । দিলুর ইচ্ছে ছিল বানটা দেখে মজায় মজায় খাবে ।

হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি । থই থই মানুষ ভিজছে, ছুটছে, আশ্রয় খুঁজছে । এমনিভাবে যখন দুপুর একটা আঠারো, বান এল । ভরন্ত নদীর বুকে ভীমগর্জনে সাদা ঢেউ পাকাতে পাকাতে শোঁ শোঁ ধেয়ে এল । ক-ফুট ? এরা কেউ আন্দাজ করতে পারে না । তবে নদী জল-সীমানা স্ফীত হয়ে চলে এল যেখানে খানিক আগে রান্না-খাওয়া হয়েছিল । ব্যাস্ ! পেছনের মাঠটা উঁচু ওখানে জল যেতে পারেনি । তবে, এই ভয়ংকরেরও কিছু রূপ আছে যা দেখতে ভালোই লাগে ।

আজকের ঘন্টা ছয়-সাত, যশোদার জীবনে স্বপ্নের কুশীলব হয়ে ওঠার মতো ; মনা দাসেরও, দিলুর এবং যারা ম্যাটাডরে এসেছিল । নিজেদের গণ্ডির মধ্যে প্রতিদিন যে-কর্তৃত্বে নিজেদের জাহির কার, এখানে তা সম্পূর্ণ বিপরীত । কোথায় সেই প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের বাঁধধরা অভ্যস্ত ব্যবহার ? নদী, আকাশ, আনন্দ এবং কৌতূহলের মধ্যে ক্রমশ যেন অকিঞ্চিৎকর কিছু বুদবুদ । মনা দাস একফাঁকে যশোদাকে বলে --চলো মাসি, আশপাশ কিছু দেইখ্যা আসি ।

কত পুরনো ভাঙা মন্দির, ঘাট, বড় বড় বৃক্ষ ! যশোদার মনে পড়ল, ছোটবেলা একবার খুড়িমার সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিল । কামাক্ষ্যা । কত দিন আগে ? এই মুহূর্তে পুরনো স্মৃতির ভারে কী রোমাঞ্চ । ভাঙাচোরা জীবনের গভীর থেকে নামতে থাকে । কিসের, ও টের পায় না।

মস্ত একটি বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে মনা দাস বলে --মাসি, গাছটা চেনো ?

--মনে হয় না ।

--নাগকেশর ! নাম শুনো নাই ?

কেন যশোদা নমস্কার জানাল বৃক্ষটিকে নিজেও জানে না ।

--শুনব না কেন । এর ফুলে শিব আছে ।

--জানো তো, এই ফুলের রেণু দিয়া ছাগলের দুধ খাইলে পোলাপোনের পঙ্গুত্ব সারে । পোলিয়ো । পোলোয়োর হাত থেকে নিরাময়ের জনশ্রুত উপায় । যশোদা আপশোস জানিয়ে বলে --ইস । বড়ছেলের শালাটা যদি জানত ।

-- কেন

---এরটা মাত্র মাইয়াটা পঙ্গু ।

প্রসঙ্গ ঘুরে যায় । এ-অবস্থায় কোনো আলোচনাই স্থায়ী হয় না । মাঠের পাশ দিয়ে নির্জন পুরনো অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, একটি পরিত্যক্ত মন্দির । উঁচু চাতাল । যশোদা দেখে শিবলিঙ্গ ! উঠে, আঁচলে গিট দেয়া আধুলিটা দিয়ে সাষ্টাঙে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ । তারপর, দুজনে হাঁটতে থাকে । বাঁচার এত আনন্দ ? মনে হল, প্রতিদিনের নিয়মিত খাঁচাটি ছড়িয়ে কয়েক ঘন্টার জন্য, এরা দু-জন পলাতক দুটি ভীরু মুরগি হয়ে গেছে।

বিপর্যস্ত দলটা ফিরে এল । সেই ম্যাটাডর ফিরিয়ে দিয়ে যায় । ডালায় জল ছিল আনাচে-কানাচে । বৃষ্টিভেজা পোশাক দেহেই শুকিয়েছে সবার । সবারই চোখেমুখে কল্পনা-ভঙ্গ । কে যেন খুবলে শূন্য করে দিয়েছে বুকটা । কী নিয়ে বেঁচে থাকা ? ফেরকার পথে, চারদিকের পারিপার্শ্বিক যেন যথাযথ কঠিন হয়ে আছে, কোনোদিন কিছুর বদল ঘটবে না ।

আজ সন্ধ্যায় চায়ের দোকানটির খদ্দের যেন সদ্য শবদাহ সেরে ফিরেছে । প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা দগদগ করছে মনে । প্রতিদিনের মতোই রাস্তাটা ধরে অটো, বাস, লরি যাচ্ছে— একই হর্নের চিৎকাব, ধুলো-ধোঁয়া, কার্বন-মনোক্সাইড । একই মানুষের ভিড় দোকানে দোকানে । যশোদা নন্দের পাহারায় চালগুলোর রেখে, এখানে চায়ের আশায় ক্লান্তিতে হাই তুলছে ।

একজন খদ্দেরকে চা পাঠিয়ে মনা দাস খোঁচা খাওয়া বদ্ধ পশুর মতো গরগর করে বলে -
-হ্ত ! হত ! কামান দেগে ভেঙে দিয়েছে । .... ঠিক ২০০ ফুট আসত নইলে !

---কারা ? কাদের কামান ?

মনা দাস শান্ত গলায়, সত্য যেন বলছে —নিয়ম আছে । ..... মোহনায় সরকার কথাগুলো তেমন জমাট বাঁধল না । আজকাল আর কোনো কিছু আশ্রয় করে নিজেদের ভুলে থাকতে পারছে না । তাহলে এগুলো সত্যিই গাঁজাখুরি । তাও-বা কেমন করে হয় ।

হঠাৎ সুব্রত তরফদার হাজির হন । নিজেই আয়োজন করে বসেন, সিগারেট ধরান এবং গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করেন ---- ভাবলাম সব ভেসে গেল দুপুরে । মনা দাস চুপ করে থাকে । সুব্রতবাবু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন না । খুবই সহানুভূতি নিয়ে বলেন ---২০০ ফুট বান তুলতে গেলে বিশাল উল্কা-পতন দরকার ।

অন্যান্য খদ্দেররা নিমবিরক্ত । উনি বলে যান একটু একটু করে --২০০ ফুল জলে ঠেলে উঠতে যে-মহাকর্ষ বলে দরকার..চাঁদকে নেমে আসতে হবে, অথবা । .... সমুদ্রের বুকে ৪০-৫০ ফুট জল ফাঁপলেই ত্রাহি ডাক । ...... সেটাই যখন এখানে আসবে, ক'ফুট হয় জানেন ? আমরা নদীপথে কত নটিক্যাল মাইল উত্তরে আছি ?

বিনা বাধায় সুব্রত তরফদার বিজয়ীর মতো যুক্তি, তর্কে, বিজ্ঞানের নিয়মে বোঝাতে থাকেন জনশ্রুতি কীভাবে আজগুবি হয়ে ওঠে । অক্ষরে ছাপা হয় । অহেতুক উত্তেজনা বাড়ে।

--তাছাড়া, ২০০ ফুট মানে, পৃথিবী জলের তলায় .... তা কি সম্ভব ?

এইবার পাশ থেকে ধবধবে পোশাকের, স্থূল-বপুর সামান্য অপরিচিত একজন ভদ্রলোক

হেসে মৃদু প্রতিবাদ রাখলেন ।

--মাফ করবেন, পৃথিবী জলের তলায় ছিল না কোনোদিন ?

--ছিল । তা পৃথিবী নয়, গ্রহ-পিণ্ড । মানুষের বাসস্থানকেই পৃথিবী ধরে নিচ্ছি ।

উনি হেসে বললেন ---কেন ? সপ্তম মনু বিবস্বনের আমলে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলমগ্ন ছিল না ? নোয়ার নৌকো চল্লিশ দিন জলের ওপর ঘুরে বেলায়নি ?

--ওগুলো তো নানা শাস্ত্রের গল্প ।

--বলছেন মিথ্যে ?

--প্রত্যেক ধর্মের পুরাণকথায় .... । সুব্রত তরফদারের যুক্তি ও বিশ্লেষণে ভদ্রলোক ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকলে, সমস্ত পরাজয়ের গ্লানিতে নীলকণ্ঠ মনা দাস হঠাৎ ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠল ---আপনি বা-ল জানেন ! .... শাস্ত্র মিথ্যা, কাগজ

তৃণভূমি

সেই একমাস আগে এসেছিলেন তিনি, ফের আজ। একইভাবে, পেটগরমের ফলে খুবই তুচ্ছ ঘুম এবং ঘুমের চটকার মধ্যে ভোর পৌনে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই নির্মলেন্দুবাবুর মনে হল বিছানা, ছোট্ট মশারি, চারধারে দেয়ালের ঘেরাটোপ শ্বাসরুদ্ধ খুপরি। জামাকাপড় গলিয়ে, দরজার হ্যাজবোল্ট ঠিকঠাক না টেনেই গলির পথটুকু ধরে সোজা পিচের বড় রাস্তা এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৃণভূমিতে।

সেদিন অবিশ্যি মাঠে আর ঢোকেননি তিনি। পাশে, উত্তর-দক্ষিণ ও পুব-পশ্চিমে চলে যাওয়া পাকা রাস্তার একটিতে দাঁড়িয়েই হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়ার মতো মনে হয়েছিল মানুষের হাঁটা পথটা ফিতে মেপে গড়ে ওঠে না। জ্যামিতির ছকে নয়! নির্মলেন্দু তো বাল্যজীবনে কত পেটানি খেয়েছিল ক্লাশে এইসব তথ্য শিখবার জন্য।

কিন্তু সেই, ভোরে, আলো ছড়িয়ে পড়বার প্রতীক্ষায় চারপাশ যখন কোন ম্যাজিশিয়ানের পথ চেয়ে, নির্মলেন্দু দেখতে পেয়েছিলেন ওপাড়ার মানুষজন --যারা মাঠ পেরিয়ে পিচ রাস্তায় ওঠে, চলার চিহ্নে যে পথ, যাকে বলা হয় ছিলে পড়ে যাওয়া-- কর্ণটিকে অক্ষ বানিয়ে কখনও ডানে, বাঁয়ে কখনও কাৎ হয়ে, কিছু যেন ছিটকে কান্নিক খেতে-খেতে, এই পর্যন্ত চলে আসে। মাঠের ঘাস খুব ভোরে সামান্য ভিজে, সবুজ কার্পেটের মতো, দাঁড়িয়ে তিনি বক্র ছিলেটিকে খুব স্পষ্টত লক্ষ্য করছিলেন। মস্ত মাঠটির বিপরীত কোণা থেকে, সাদা ধুলোর ধারাম মতো শান্ত পড়ে আছে। যেন ইতিহাসের রেকর্ড --- কত বছর ধরে কারা কীভাবে হেঁটে চলেছে। অনুসরণ। সেইসব ভাবনার মধ্যেই ও প্রান্ত থেকে হিঞ্চে ও ছেঁচিশাকের ঝুড়ি মাথায় একটি বুড়ি হেঁটে আসছিল স্টেশনের বাজারের জন্য। ভোরের হাওয়ায় ফাঁকা ময়দানে বুড়ির ময়লা জ্যালজ্যালে শাড়ি কাঁপছিল। নির্মলেন্দু ভারি বিস্মিত --শাকউলি ভূতগ্রস্ত, অন্ধবেগে ছিলেটুকুর শাসন মেনেই আসছে, অথচ ঘাসের বুক মাড়িয়ে বরাবর হেঁটে এলে পথ আরও সংক্ষেপ করা সম্ভব। ক্রমে, সেদিন তিনি নদী, ঘোড়সওয়ার কিংবা ছায়াপথ --- কি কি দেখতে পেয়েছিলেন ওই মাঠ-ঘাস-কর্ণ- ছিলেপথ উধাও হারিয়ে গেলে, গত ১মাস পর আজ আর স্মরণে নেই।

আজ তিনি পুব-পশ্চিমের পথটি ধরে যেন আতঙ্কেই ছিটকে মাঠের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ফেললেন। ভোরলাইনের দু-একটি অটোর ধোঁয়া নির্মলেন্দুর ফুসফুসে ঢুকে পড়ছিল বলে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে টান-টান শ্বাস নিয়ে বাঁয়ে লক্ষ্য করলেন গোটা পাঁচ সাত কুকুর। রাতদিন পথেই থাকে, দোকানে ঘুর ঘুর করে, তীক্ষ্ণ রুক্ষ দাঁতে কামড়া কামড়িতে ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে, চোখ ও চামড়ার রুক্ষ খসখসে উগ্র রং, যাদের খুল্লমখুল্লা ভাদ্রমাসের বিশেষণ তৈরী হয়ে গেছে, পথের মৃত্যুতে থেঁতো, দাঁতের পাটি বেরোনো রক্তাক্তকরুণ জলছবির মধ্যে দু-এক দিনে বাতাস পচনের গন্ধ তোলে যাদের-- তেমনই গোটা পাঁচ সাত বসেছিল ময়লা গাদার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নির্মলেন্দু যেখানে দাঁড়িয়ে এখন, এই বিশাল তৃণভূমিটায় কুকুরগুলো ছিল না। পাকা রাস্তার ওপাশে ঠিক এমনিই দ্বিতীয় একটি মস্ত মাঠ। কিন্তু ওখানে ভোরের মানুষ ফুসফুস তাজা করতে যায় না। ঘাস নেই তেমন, সমতল-মসৃণও নয়। উঁচু নিচু ঢিবি। ধুতরোর ঝাড়, কালকাসুন্দির হলদে ফুলের জঙ্গল, পৌরসভার ট্রলার-নিকাশি ময়লা স্তূপ --যার ওপর কুকুরগুলো বসে আছে এখন। আর কিছু কাদা-জলের চ্যাটালো উৎস। দুপুর বা প্রাতঃকালে, দু-চারজন মানুষ বিড়ি কানে আড়ালে হারিয়ে যায়, ফাঁকা ঝোপের পাশে পড়ে থাকে।

নির্মলেন্দুবাবু সতেজ ভোরে এতকিছু থাকতে কুকুরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন কেন ? এই প্রাণীটি তার জীবনে ভারি বিস্ময়ের। রাস্তাঘাটে কামড়ের ভয় পায়; তাছাড়া এদেরই কোন পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের মহাযাত্রার সর্বশেষ সাথী হয়েছিল ---যে যাত্রাপথ লোভ, অসূয়া, সমস্ত ক্ষুদ্রতার বাইরে।

এই মাঠটি যেমন ছড়ানো, বিশাল তেমনই মসৃণ। ভোরের বায়ুসেবন --ফুটবল ক্রিকেট খেলা --রাজনৈতিক সভা --বেশ কয়েক বছরে এই তৃণভূমি কংক্রিটের শহরে একটি টবের ফুল যেন।

নির্মলেন্দু হঠাৎ শুনতে পেলেন--- মানে আছে ? বাচ্চাটা মরে যাবে ! বক্তা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে, দৃষ্টি দূরে অনেকেই কাছে পিঠে বসে মজা দেখছে। নির্মলেন্দু তাকালেন সে দিকে। এক মহিলার পিছু পিছু সাত-আট বছরের একটি ফাঁপাফুলো মেয়ে --সুন্দর হলদে ফ্রক পর --বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছে। বলে যায়, বাধ্য হচ্ছে। ওদের কথাবার্তা শোনা যায় না এখানে বসে। উনি দেখতে পেলেন ক্রমে পিছিয়ে জন্য হঠাৎ মেয়েটির গালে মহিলার দু-দুটো থাপ্পড়। বৃত্ত অনুকরণ করার। মায়ের দৃপ্ত হাঁটা আর ওই পুঁচকে মেয়েটি ! যেন টলমল -- এক্ষুনি পড়ে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটি বেলুনের মতো ফেটে যাবে ------ সমস্ত রক্ত বুকে নিয়ে একটি -একটি স্টেপ ফেলছে। এই মাঠের কেউ কেউ যে লক্ষ্য করছে ওদের---সে খেয়াল মহিলার নেই, বা তিনি এসব তোয়াক্কা করেন না। সেই কখন নেমেছে তৃণভূমিতে।

------মরবে ? কি করে বুঝলেন ?

------পাশেই ঘুরছিলাম !

-------সত্যিই ওর মেয়ে ?

-----হ্যাঁ । হার্ট খারাপ ! জোর করে ঠেসে ভোরের হাওয়া খাওয়ালে সেরে উঠবে, এই ধারণা। .... মরুক, পড়ুক তাতে কি ! ওইটুকু মেয়ে !

এক বৃদ্ধা বাতের ভারে খানেক হেঁটেই বিশ্রাম নিচ্ছে, পাশে পোয়াতি পুত্রবধূ । বার কয়েক হেঁটে, হাওয়াই চটি খুলে, ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে ও থাকতেই ঘাম । অসুস্থতার, ক্লান্তির । ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ । শাশুড়ি শুনে বলে — আজকাল ফ্যাশন হইছে ঠাইসা -ঠুইসা পোলামাইযা মানুষ করা । ...... বাপের জন্মে শুনি নাই বাপু । ..... যার যতটুকু হওয়ার হইব । ....চুল ছিঁড়লে হয় । পোয়াতি বউটি, না শুনেই পাশে বসানো বড় মেয়েটির উদ্দেশে বলে —তোর এই দরকার নিপু । ...... সেই থেকে বসে ঝিমোচ্ছিস ! বললাম ছোটা,ছুটি কর ।

এই তৃণভূমির চারধারেই তো কথা, কথার টুকরো নির্মলেন্দু অলস চাউনিতে দেখলেন সেই মা -মেয়ে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, এবং হতে হতে হঠাৎ ছোট্ট মেয়েটি ধপাস করে পড়ে গেল এবং মরে গেল সম্ভবত । এতদুর থেকে বোঝা গেল না । বডি নট নড়নচড়ন । বাতাসে কেবল ফ্রকের কোণা উড়ল । আশ্চর্য। মহিলা পেছন ফিরলেন না । পাক খাচ্ছেন, জেদ নিয়ে হাঁটছেন, ছোট্ট মেয়েটির ব্যর্থতা যেন ক্ষমার অযোগ্য ।

নির্মলেন্দু এবার চোখের কোণ পাল্টালেন । ক্রিকেট চলেছে দূরে । ১৪/১৫ বছরের কিছু ছেলে খেলার পুরো নিয়ম না মেনেই —ঠিক -ঠিক ১১ জন, প্যাড গার্ড তৃতীয় আম্পায়ার, গ্লাভস, ড্রিংকস, সঠিক বাউণ্ডারির সীমানা --চিৎকার চেঁচামেচি করছে । তে —কাঠির স্টাম্প আছে, আর ব্যাট এবং প্লাস্টিকের শক্ত বল । হলুদ রংয়ের । আর বলটি যখন ব্যাটের গায়ে বিশাল শূন্যের আনাচে-কানাচে উঠে পড়ে, ---ক্যাচ ! ক্যাচ পল্টু ! একাগ্র চিৎকার । মুহূর্তের লক্ষ্যে কিছু ছেলে সব ভুলে যায় । তারপর 'ই-স' ! এই ক্যাচটা পারিস না ? কিছু ছেলের মাথায় চাপড় । 'খেলতে এসছে ?' 'ক্যালানে !' --নানা আপসোস এবং ফের বল করা নতুন উদ্যমে, অথবা 'তালুবন্দি' বলটি নিয়ে পল্টুর উল্লাস, দু-চারজনের ছুটে আসা, কব্জিতে- কব্জিতে উল্লাসে থাবড়ানো, এবং ধমনীয় মধ্যে সফলতার স্বপ্নে পল্টু ঝন্টি রোডস্ । তার মতো কোমর বাঁকিয়ে শূন্যে একটি ক্যাচের স্বপ্ন দেখে ।

মাঠের তিন মহিলা পরস্পর কথা বলে না, যখন বাতাসের অক্সিজেন নেয় । অথচ প্রতিদিন একসঙ্গে ঢুকবে । ওরা পাশাপাশি হাঁটে এমন ভঙ্গিতে ----এই তৃণভূমিতে সব্বাই এক একটি দ্বীপ । তারপর ক্রমে ক্লান্ত হলে ওরা, মাঠের কোণে একটি পুকুর আছে --চুপটি করে জল দেখে । আরও কিছু নীরবতার পর ওরা কথা বলে । সবই দৈনিক সংসারের ।

---মেজ ছেলে ফিরবে কবে ?

---ছেলেই জানে । একবার বাইরে গেলে পোড়া দেশে ফিরতে চায় কেউ ?

-----এসে কী করবে ? কী আছে এ দেশে ?

'----' !

---মানলাম না দিদি ! দীর্ঘসময় চুপ থেকে তৃতীয় জন বলে --সব মিএগকেই দেখি ...দ্যাশ দ্যাশই ।

—তা, আভাদি ঠিকই বলেছেন .... আমার তো এই মাঠটা দু'দিন দেখব না ভাবলে বুক কাঁপে। নির্মলেন্দু জীবনে দু'বার ইওরোপ গিয়েছিলেন। কর্মস্থল থেকে পাঠানো হয়েছিল। ১ বার ১৫ দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার ২৫ দিন। সে-সব স্মৃতি এ বয়সে কিছুটা ম্লান।

তিনি বাতাসে এখন বহুদূর থেকে ভেসে আসা কাঁচা পাতার গন্ধ পেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, ডান হাতের কঠিন-মুঠোতে চেন ধরা অ্যালসেশিয়ানটিকে নিয়ে ভদ্রলোক খাটো লাঠি হাতে নিঃশব্দে লম্বা শ্বাস টেনে হাঁটছেন। ঘামছেন বেশ। এই তৃণভূমি, মানুষজন —আলাপ-আলোচনার যোগ্য কেউ নয়, এমন মনোভাব। অথচ প্রতিদিন প্রত্যূষে এখানের বাতাস তার অবশ্য জরুরি। আজ কেন জানি, ওনার খুব পেচ্ছাব পেয়ে গেছল বলে, মাঠ পেরিয়ে রাস্তার ওপাশে হাল্কা হয়ে ফিরতি পথে ভদ্রলোকের মুখোমুখি। সামান্য হাসিতে নির্মলেন্দু জিগ্যেস করলেন —পি. এম রিজাইন করল ?

—সে তো গত রাতেই। ..... শোনেননি কিছু ?

—নো ইন্টাররেস্ট !

কুকুরটির জিভ তখন মাটিতে ঝুলছে, লালার মোটা প্রলেপ, খর চোখ, কান খাড়া এবং ফুসফুসে প্রতিহিংসার সাঁইসাঁই। যদি এই মুহূর্তে কথার অসধানে চেনটা ফসকে যায় ? ক্যানাইন দু'টো ঝকমক করছে।

—রিজাইনের খবর জানতে চাইলেন তো !

—তার কারণ, আর কিছু নয়, পরের বামন অবতারটি কে হবেন ......একটা স্পেকুলেশন ! .... আমার কাছে ওই স্পেকুলেশন ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং!

লোকটি সৌজন্যের হাসি ছড়িয়ে চলে গেলেন।

—কেমন আছিসরে নন্দু ?

—ওই কাটছে রক্ত পড়ছে না।

—দেখতে পাই না কেন ?

—রোজ সকালে এই পুকুরে চান করে যাই। .....সবাই দেখতে পায়।

—তাই ? হবে বা। এবার উৎসব কবে থেকে ?

—দিন এবার যেন ফসকে না যায়।

নন্দুদের 'বাবা' -র উৎসবের প্যাণ্ডেলের চুক্তি এ পায়। গতবার হয়নি। নন্দু মিটিমিটি হাসে।

—সব বার পেতে গেলে শুধু মুখে হয় না, ব্রজদা !

ব্রজ হাসে ; যে নাকি খানিক আগে খবর নিয়ে এসেছিল মাঠের মধ্যে মরে পড়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটার হার্ট নাকি খারাপ।

—ধর্মের লাইনে গিয়েও খাই মিটল না ? 'শুধু মুখে' বলছিল কেন ?

মধ্য বয়সে নন্দু বুড়োটে বনে গেলেও সব্বাই পেছনে ডাকে নুলো নন্দু। যৌবনের ডাকাতি

করতে গিয়ে বোমে ডান হাতের পাঞ্জাটি উড়ে গেছে । গরিব বাপের ঘরে রাতারাতি বড় লোক হবার দুঃসাহসিক স্বপ্ন । এখন সে এমন নিপুণ ভঙ্গিতে গামছা পরে —আঙুলের দরকার পড়ে না। তবে এত বছরের শেষে একটা কিছু হারার বেদনা যায়নি । প্রতিদিন পুকুরে ডুব দিয়ে তৃণভূমির ঘাসের পথে মাথা নিচু করে, এমনভাবে হেঁটে আসে যেন পাঞ্জাটা এই মাঠেরই কোথাও হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে, হঠাৎ খুঁজে পেলে পরে নেবে । নন্দু জাতে ক্যাওড়া । মাঠটা পেরিয়ে, দ্বিতীয় তৃণভূমির ঝোপজঙ্গলের শুঁড়ি পথে পাড়ায় চলে যায় ।

রে রে —হই -হই চিৎকারে নির্মলেন্দু এবার ঘোরানো ঘাড় সিধে করতেই দেখেন ময়লস্তূপের একটি কুকুর মুখে একপাটি হাওয়াই চটি কামড়ে ছুটছে । কী তার ঋজু ভঙ্গি । চোখজোড়ায় হিংস্র ভাব । চারপায়ে মরিয়া গতি । কামড়টি স্থির লক্ষ্যে রেখে, এধার ওধার দেখতে দেখতে ছুটছে । মাঠ পেরিয়ে, ড্রেন লাফিয়ে রাস্তায় এবং সোজা সেই ময়লা গাদায় পৌঁছে এমন রাজত্ব বানিয়ে বসল, যেন —আয় দেখি, কে নিবি । চ্যালেঞ্জ ।

--কার চটি ?

মোটা বেতো শাশুড়ি হায় হায় ভঙ্গিতে জানায়—— নতুন । এক্কেবারে নতুন । মাত্তর ২০দিন আগে অনেক দামে কিন্যা দিছি বউমারে ।

কিছু না পেয়ে, ছোট্ট একটি মাটির ঢ্যাড়া হাতে থপ থপ আপ্রাণ চেষ্টায় খানিক যায়, ভয়ে পেছোয়, ঢিল ছোড়ে — যা দু'গজেরও বেশি সামনে এগোয় না । কুকরটা কখন ছোঁ মেরে এই ছুটছে । প্রাণী হলেও প্রতিদিন হাজার হাজার পায়ে হাওয়াই দেখে নিশ্চয় অভিজ্ঞতা হয়েছে ওটো মাংস নয় যে দাঁতে ছিঁড়ে ক্ষুধা মেটাতে হবে । স্রেফ প্রতিহিংসা ।

অনেকেই মজা পেল ব্যাপারটায় এবং খুঁজে পেতে চোখ ঘুরিয়ে দেখল বাকি পাটিটি মনমরা অবস্থায় ঘাসের ওপর নিশ্চুপ । জুড়ি হারিয়ে ওটি যেন ফ্যাকাসে মূল্যহীন ।

--তুই আর মুখে নেয়ার পেলি না কিছু । অন্তঃসত্ত্বা বউটি নিরুদ্বেগে রসিকতা করে । সব জ্বালা শাশুড়ির । মাঝারি বয়সের এক ভদ্রলোকের দয়া জন্মাতে ,দু'টো বড় বড় ঢেলা কুড়িয়ে বলে --চলুন। আপনাকে সাহায্য করি ।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ক্রস করে ওরা ২ নম্বর তৃণভূমির কাছে এল । কিন্তু কুকুরগুলো ঠিক একই ভঙ্গিতে —বরং কিছু সপ্রতিভই —-বসে আাছে । সাথীগুলো যেন বেশি সচেতন । লোকটি কী হিসেব -টিসেব করে মঠে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়েই বহু দূরত্বে হাতের ঢিলগুলো ছুঁড়ল এবং নির্দিষ্ট কুকুরটি আরও নিশ্চিন্ত হতে চটি মুখে ঢুকে গলে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে । যারা ব্যাপারটার পরিণতির জন্য ভারি কৌতূহল, দেখতে পেল মোটা বেতো মহিলার সারা মুখে ঘাম, চোখের চাউনিতে উটকো লোকসানের জন্য হাহাকার এবং ফিরে এসে পুত্রবধূকে নীরব দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা —-আস্ত অলক্ষ্মী । যেখানে যায় কিছু না কিছু ছিদ্দাত বাঁধাবে । .... বলেই বা কি হয় ! ....ছেলে আমার ভেড়ুয়া ।

-----ক্যাচ ইট পল্টু ।

শুনেই নির্মলেন্দু এবার খেলার দিকে তাকালেন । দেখতে পেলেন বল্লেবাজ ১৫ ছেলেটি এমন হাঁকড়ে মেরেছে, বল শূন্যে উঠছে --উঠেই যাচ্ছে এবং পল্টু একটি মোক্ষম ক্যাচের জন্য মুঠো তৈরী করে ঘাড় উচিয়ে হাঁ । বল আর পৃথিবীর টানে নিচে নেমে আসছে না । দিনের প্রথম রোদ জগতের সমস্ত রংগুলোকে যখন যথাযথ ফুটিয়ে তুলল, নীল আকাশে হলুদ বলটা কোথায় যে লুকিয়ে গেল, টের পেল না কেউ । শুধু পল্টু অধীর আগ্রহে ওৎ পেতে আছে স্বপ্নের ক্যাচের জন্য।

নির্মলেন্দুর পাশ কাটিয়ে তখন ছেলে ও মেয়েটি ঘর্মাক্ত, শরীরে রক্ত চলাচল পরিপূর্ণ সতেজ বানিয়ে তৃণভূমি ছেড়ে বাড়ির পথে । মেয়েটির ঝলমলে দাঁত, ঠোঁটে অস্ফুট হাসি — ধ্যাৎ। শুনে ফেলবে । তরুন গোঁফ ও নবীন জুলফি নিয়ে যুবকটি বলে --ভয় কিসের ? ..... কেউ কিচ্ছু শোনে না আজকাল ..... আন্দাজ করে শুধু । তা করুক আমাদের নিয়ে, কী এল গেল ?

তবু মেয়েটির লজ্জার রং যায় না । ওরা রাস্তার দিকে চলে যায় ।

'অনেকেই তৃণভূমি ছেড়ে বেরিয়ে যায়' রোদ উঠলে । ঘাসের মধ্যে রোদটুকু —— তা ভোরের হলেও —শরীরে কুট কুট ভাব জাগায় । দূরের পুকুরের ভাঙা প্রাচীন ঘাটলায় বসে যে-বৃদ্ধের দলটা এতক্ষণ বিচ্ছিন্ন, নিজেদের মধ্যেই মগ্ন ছিল, আস্তে আস্তে উঠে আসে । ওদের মধ্যমণি যিনি —থানায় সেকেণ্ড অফিসার হিসেবে অবসর জুটেছে যার — প্রায় ৮০ ছুঁই -ছুঁই । খুব গপ্পিয়ে মানুষ । এই বুড়োদের দলে সঙ্গী-সাথীদের অদলবদল ঘটেই —মৃত্যু আসে, নতুনরা বুড়ো হয়ে পূরণ করে স্থান, ওনার গল্প বলার ভঙ্গি বদলায় না, মাঝেমধ্যেই চাক্ষুস দেখা একটি খুনের বৃত্তান্ত শোনান, বহু বছরের পুরনো, ঝাপসা অতীতের । এক ভাই সহোদরকে কীভাবে সীমানার ওপর একটি বকফুল গাছের জন্য হত্যা করেছিল । অস্ত্র ছাড়া কোন প্রাণসংহার কী যে দীর্ঘায়ত হয় ---- হিংস্রতা, বাঁচার আকুলতা, উল্টো খুন হওয়ার চান্স, দেহের প্রতিরোধ, শ্বাস, শেষ গোঙানি -- বৃদ্ধটি আজও মাঝে-মাঝে নানা প্রসঙ্গে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে দেন।

ওই দলটা তখন নির্মলেন্দুকে পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছে এবং ওদের দলেরই নিয়মিত এক সাগরেদকে এখন মাঠে ঢুকতে দেখে দুহাত ফাঁক করে এমন নমস্কারের নকল করে, আঙুলের নৈপুণ্যে বিশেষ একটি চিহ্ন তৈরী হয় । সাকরেদটির বুঝতে অসুবিধে হয় না, হেসে বলে ---

রাধে-কৃষ্ণ ! ঠিকই দেখিয়েছেন ।

--হাঃ । হাঃ । হাঃ ।

--হাসি নয় । .... আমাদের সব সৃষ্টির মূল তো ওটাই । ..... ঠিকই দেখিয়েছেন । ...... তবে .....

—তবে কি ?

——ওর কি ?

—ওর মধ্যে বিশ্ব দর্শন আছে, তা কি জানেন ? বাইরের রূপটাই দেখি সবাই, মর্ম বুঝি ক'জন ?

—আজ দেরি করলেন বুঝি শেষ রাতে মর্ম বুঝে ?

নির্মলেন্দু ওই দলটি বেরিয়ে পড়ার অনেক শেষে আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে আসেন । তখন হাওয়া একটু তেজালো । তৃণভূমি একক একটি শিমূল গাছে পাতারা ভারি দ্রুত ছন্দে দুলছিল । আর কান ছেঁচড়ে পুরনো খবরের কাগজের টুকরো —ভোরের শিশিরে কে বা কারা চেপে বসেছিল —এটি মালিকহীন এখন —এবং ওর বুকে যে অক্ষরগুলো ফুটে ছিল তা কত যে তাৎক্ষণিক ও স্বল্পায়ুর, কয়েকবার সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যেই কত ব্যর্থ, কত অকিঞ্চিৎকর, আবর্জনাময় —কেউ এখন তা যাচাইয়ের দরকারও মনে করল না । টুকরোটা উড়তে উড়তে ড্রেনের জলে ডুব খেয়ে ক্রমে ধ্বংস হয়ে গেল

নির্মলেন্দু দেখলেন রাস্তায় উঠবার মুখে, তৃণভূমির প্রান্তে ভোরের বায়ুভুখ শেষ তিনটি মানুষ। উঠি উঠি করছে । দু'জন রোগজীর্ণ, অনতিবৃদ্ধ, তৃতীয় ব্যক্তির বয়স অল্প চোখমুখে অসুস্থতার ছাপ । তবু জোর করে হাসি টেনে সাক্ষি মানল —আপনারা জানবেন, কাঁঠালে খুব বদ হজম হয় ?

——খু-ব ! অবশ্য হজম না করতে পারলে ।

——দিনে ২১ গল্লা খেলাম । ....রাতে আর ঘুম নেই ।

একজন বীজমন্ত্রের মতো ফিসফিস করে বলে —যদি আস্ত একটি বীচি গিলতে পারতে .... কষ্ট পেতে না ।

—তাই ? জানলে খেতেই পারতাম ! ... রাতে দু-দু'বার পাইখানা মশাই !

——উঃ ! রাতে না ঘুমনো কী কষ্টের !

লোকটি হেসে বলে —সে অসুবিধে নেই । ...... নাইট ডিউটিতেও রেস্টআছে ।

—সুতো কলটা খুলছে ?

—খোলেনি ....ওভ্যেস ! লোকটা করুণ মুখে হাসে ।

রুগ্ণ লোকদু'টি চলে যেতে, কাঁঠালখাদক হাতদু'টো ছড়িয়ে 'কোথায় যাব আমি ! ফেকলুর মতো পুরো দিনরাতটাই ঠেলতে হবে' বলেই উদরের হজমবৃদ্ধির জন্য হঠাৎই মাঠের চারপাশ ধরে কয়েক পাক দৌড় শুরু করে দিল ।

নির্মলেন্দু তখন বেরিয়ে এলেন ।

সারাদিন বৃষ্টি হল, দুপুর কিছু গুমোট ভাব ; ফের তিনটে থেকে ঝির ঝির জলকণা । বিকেল পাঁচটায় সব কিছু শান্ত হয়ে উজ্জ্বল হলুদ আলো ফুটল পশ্চিম আকাশের মেঘ চুঁইয়ে । ঠাণ্ডা বাতাস । গাছের পাতায় ঝুলন্ত জলের ফোঁটা গভীর খুশি নিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করছে । এরপরই গোধূলির সময়-কাল ।

এ সময়ে তৃণভূমিতে বিশেষ কেউ থাকে না ? কিন্তু নির্মলেন্দু উপস্থিত হলেন আজ । মাঝে মাঝে হুটহাট তিনি আনমনা ঘুরে বেড়ান । আজও মাঠে ঢুকে খানিক দাঁড়ালেন । তারপর কী মনে হতে গুটিগুটি পায়চারি করলেন চারপাশে । হঠাৎ চমক পল্টু নেই । ক্ষীণ হাসি পেল তার ।

দাঁড়ালেন না। চলার মধ্যেই এককোণে নজর গেল, সতেজ একটি পাঞ্জা —-কত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ! নন্দু কোথায় ? কী মনে হতে, আশ্চর্য ভাবটুকু নিয়েই এ প্রান্ত দেখলেন একজোড়া অক্ষত হাওয়াই চটি । ঘাসের ওপর চুপচাপ সাজানো , মালিকহীন । জুতোজোড়ার চারপাশ ঘিরে সকালের না -পাওয়া ব্যথার কিছু ধুলো জমা । নির্মলেন্দু এবার আরও খানিকটা শোকসঙ্গীদের মধ্যে হেঁটে চমকে উঠলেন, খুঁতো হৃৎপিণ্ডের শিশুটি হঠাৎ ঘাস থেকে উঠে শ্লথ পায়ে ভয়ে-ভয়ে কাল্পনিক সীমারেখায় পাক খাওয়ার চেষ্টা করছে অথচ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে গুমরে গুমরে কান্না । বহুদূরে সেই ঘুনগুনে কান্নার আওয়াজ ডানা মেলে চলে গেল।

নির্মলেন্দু তখন চলে গেলেও টুপটাপ ছড়িয়ে থাকা কাঠচাঁপার মতো সৃষ্টির কিছু চিহ্ন । ওদের আলোচনার বিষয়গুলোর কি প্রাণ পেয়ে গেছে ? নির্মলেন্দু যখন চিহ্নগুলো দেখতে দেখতে আত্মগত ভাবনায় নিজেকে ভ্রূণে রূপান্তরিত করলেন, আকাশের কোণে একটি তারা দেখা গেল । পৃথিবীর সঙ্গে বিশাল ব্যবধানের নির্মলেন্দুর নিজেকে ফের একজন পরিণত বৃদ্ধে ফিরিয়ে দিতে, কেমন ভয়-ভয় লাগল । এখানে আর সময় ব্যয় নয় । সন্ধ্যা গাঢ় হলেই ইদানীং এইসব মাঠগুলো অসামাজিক কার্যকলাপের ডেরা ।

একেবারে সোজা, কর্ণ বরাবর, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তিনি মাঠ পেরিয়ে এপাশে রাস্তার আলোর আভাসে চলে এলেন । কী মনে হতে, পেছনে তাকিয়ে অবাক হলেন । সোজা নয়, তিনিও আঁকাবাঁকা ছিলার চিহ্ন ধরেই এসেছেন, অজান্তে, বহু মানুষের চলা অভ্যাস ধরে এবং তৃণভূমির অন্ধকারে নজরে পড়ল পেছন পেছন চটিকামড়ানো ময়লা কুকুরটা নিঃশব্দে সঙ্গী হয়ে এতটা পথ হেঁটে এখন থমকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে । নির্মলেন্দুর কাছে যুধিষ্ঠিরের ত্যাগ আশা করছে।

ওই মাঠ -কর্ণ ছিলেপথ-উধাও হারিয়ে নদী, ঘোড়-সওয়ার কিংবা ছায়াপথ --নির্মলেন্দু কাছে বিন্দু বিন্দু সময় পাশাপাশি স্থির হয়ে রইল ।

এলাটিং বেলাটিং সই-লো

বৃষ্টি ধরে গেছে ব-হু আগে, মা তবু বিকেল-বিকেল কাজের বাড়ির উদ্দেশে 'বেরোলে মুখ ভেঙে দেব, হ্যাঁ' শাসিয়ে সেই-যে হেঁটে নেমে নিচু চালায় মাথা বাঁচিয়ে তা-ও ঘন্টাখানেক হয়ে গেল প্রায় এবং বস্তির সামনে পচা গভীর জলনিকাশিটার তিনবাঁশের পারাপারের মাঝে থমকে ফের 'শাখ ছুঁবি না .... সন্ধ্যা আসন মীরাপিসিকে দিতে বলবি ' অভ্যাস-নির্দেশে মায়ের গলায় যুগযুগান্তের কিছু সংস্কারের ইঙ্গিত, মেয়েত্ব ফুটবার সংকেত —— চানুও যা বুঝতে শিখে গেছে, কারণ তিনমাস ধরে জীবনের প্রথম রহস্যময়তার ভিন্ন জগৎ উঁকি দেওয়ার কয়েকটা দিনে ঠাকুর দেবতা ছুঁতে নেই, পাপ হয় নাকি --চানুকে মা-ই বলেছিল ; তা হোক, আজ বেরোলে কেন 'মুখ ভাঙবে ঠিক মেনে নিতে চাইছিল না চানু, কিছুতেই না ; যখন বৃষ্টি ব্রেক্ দিয়েছে ক ---খন এবং বস্তি ছাড়িয়ে দূরে ঘেঁষ-কাঁকরের কিছু ফাঁকা, তারও পর পরিত্যক্ত কেমিক্যাল কারখানাটার ভাঙা মস্ত বাড়ি ও বিশাল পাঁচালি ঘেরের মধ্যে ঝোপজঙ্গল, নানা গাছপালার আড়াল থেকে বস্তির কিছু মেয়েদের খেলার উৎসাহ-প্রেরণার প্রায় মধ্য আকাশ বেয়ে অস্তের দিকে চলেছে ইতিমধ্যে ; আহা ! চানু কি আর পড়ন্ত রং অনুমান করতে পারে, জল বোঝে, ফুরোতে-থাকা বিকেলের হাওয়া-বাতাস ? তবু মনটা কেমন গোঁ ধরে, সারা দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই সময় সঙ্গীদের নিয়ে চু-কিত কিত, এলাটিং বেলাটিং বা ওই ধরণের কিছু নিয়মকানুন --যাতে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি , ববি দেওল, পুরুষ শরীরের ভোঁতা ধারণা, লেটেস্ট ফ্যাশন টিভিতে, চুড়িদার ম্যাচিং, শ্যাম্পু ইত্যাদির আলোচনা ; গোপনে এই জন্য --রেললাইন ও জলনিকাশিটার মাঝ বারবর চিলতে উপত্যকার চটঘামাচির মতো টালি-প্লাস্টিক - প্লাইউডের থৈ- থৈ ঘন ঢেউ-এ টিভি, দোকানপাট, ধোঁয়া, উনুন সেলাই মেশিনের দাঁত ঠোকানি, কুকুর, ছাগল, কলাগাছ বা কুমড়োমাচা, হুক চুরির আলোর নজরে লণ্ডভণ্ড প্রাইভেসির মধ্যে ---এমনকি লাইনের ঝোপে হাগার শব্দ, সংগম-ধর্ষণ, চুমু-পিরিত বা পিট্টি -পালটা পিট্টি সবই যখন এখানে খোলামেলা, ওই কেমিক্যাল কারখানার পাঁচালির ওপাশে বিকেলের পর সত্যিই চানুদের কাছে ভিন্ন রাজ্যই বটে, সাপের খোলস, বেজি, চামচিকে, মরা জন্তু, রাতে চুল্লুর ঠেক, পয়সা দিয়ে ফুসলিয়ে ঢুকে পড়া --আছে কত কী, যা চানুদের জানার কথা নয়, জানলেও মাথাব্যথার দুশ্চিন্তার নেই তেমন —;

তখনই চানু ঝাঁপটা টেনে, পা বাড়িয়ে 'পিসি-ই ! পিসি-ই ! মীরা পি-সি' ডেকে-ডেকে হঠাৎই পেছনের ঘর থেকে বদ্যি জ্যাঠার মরছে ! আট আনার বিড়ি আনতে বছর কাবার ।..... ডাকস কেন ?' শুনে অযথা উত্তরের ইচ্ছে বোধ করে না, ফের ঝাঁপটা সরিয়ে ঢুকে পড়তেই জমানো অন্ধকার, বিপুল মশার কুচকাওয়াজ, চানুর ভেতরটা মোচড়াল, আজকের খেলার দান বোধ হয় শেষ, এত মশা যখন, তাহলে তো দিনটুকু জলদি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আলো জ্বালিয়ে ম্যাচ-টি হাতড়ে দু'টো কাঠি জেদে ঠুকে সন্ধ্যাবাতি এবং সলতেটা সরিয়ে, পোড়া কাঠিটি দিয়ে, এবং শাঁখ ছুঁতে গিয়ে ভেতরের ভীষণ ঝাঁকুনিতে 'থাক' যদি কিছু পাপ ...' একটি দিন ঠাকুরের শাঁখ না শুনলেও চলবে, মাকে বোঝাবে পাশের ঘরের মীরাই —হ্যাঁ, খেলে-টেলে ফিরে এসে বলে-কয়ে রাখতে হবে পিসিকে, ফের ঝাঁপটা টেনে টিপতালা লাগিয়ে, কোথায় গচ্ছা রাখে চাবিটি এখন, এ-ব্যাপারে ষোলো আনা বিশ্বাস নেই কাউকে, গতকালই ঘরে কিলো পাঁচেক চাল, মাগ্গিগণ্ডার ২টি পেঁয়াজ, চিনি আড়াইশো, দেড় লিটার কেরোসিন মজুদ হয়েছে চালার নীচে, সুযোগ পেলে একমুঠ মুড়ি ঢেলে নিতেও ছাড়বে না, নেহাত বিবেক কাঁদলে নিদেন টিভিটা খুলে এমন বেহায়ার মতো বসে দেখবে, যেন মালিক নিজেই ; এতসব চতুর সংসারপনা চানুর দশ-এগারো বছরেই পাক ধরেছে, তবু তুলনায় মেয়েটা এখনও কিছু ট্যালা বইকি, ওর বন্ধু বিউটি তো ন'বছরেই তার জলেসাঁটা ফ্রকটার দিকে বাপের বয়সিরা তাকালেও বেপারোয়া 'ট্যাপলা দু'টো গেলে দিতে হয়। মা মেয়ে নেই ঘরে' বলেই থু থু ফেলে, চল্লিশ বছরের আহাম্মক মানুষটা ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে যায় — ;

কিন্তু মা ফিরে আসার আগে চাবি না এলে, বেরিয়েছিল প্রমাণ হাতেনাতে, বড় আল-ফাল চড়চাপড় লাগায় মা ইদানীং, হাত না-যেন লোহা, তবে সে তো রাত আটটার আগে ঢুকবে না, মেজদা শ্যাম গোপনে, দুপুরে এক বোতল 'বিলাইতি' সংগ্রহ করে বহু কষ্টে চানুর বই-খাতার আড়ালে রেখে গেছে, গোপনে ওকে বলে গেছে কাউকে না ফাঁস করতে, কার কাছে যেন হেভি দামে ঝাড়বে, চানুকে ঘুষ দেবে 'সোলজার' দেখার ম্যাটিনি টিকিট, তাই চাবিটা এখন রাখতেই হচ্ছে নিজের কাছে সন্ধ্যা পর্যন্ত, রাতেই বোতলটি খদ্দেরের কাছে চালে যাবে, তাই টিপতালাটার ভরসায় ফের ঝাঁপটির গলা বেঁধে চানু তিনবাঁশের পারাপারের মাঝামাঝি দুলল, কষ্টি-কালো জল, তলায় হিঞ্চের কিছু উপনিবেশ, তাকাল, ব্রয়লার বেচা চালাটা থেকে স্তূপীকৃত পালক-ছাঁটের জঞ্জাল, পচা গন্ধ ছাড়ছে, ট্রেন যখন ছুটে যায় পেছন দিয়ে, বাতাসের চাপ মোষের মতো কলার জঙ্গল কাঁপিয়ে ওই গন্ধ ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ; শোনা যাচ্ছে এবার সংস্কার ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের টাকায়, শোনা গেলেও চানু কিছু জানে না, এ অবধি খবরটি চুঁইয়ে নামেনি, পেরিয়ে এপাশে চলে যেতেই সে টের পায় বৃষ্টি হয়েছিল, ধরে গেছে ব-হু আগে —;

বৃষ্টি কী, না শিবের পেচ্ছাপ, খুব ছোট্টবেলায় মা বোঝাতো মনে আছে, তবে এখন চানু পেচ্ছাপের নির্গমনালি জেনে গিয়েছে, কয়প্রকার কী কী আকারের, হিজড়েগুলোর অবিশ্যি এখনও টের পায়নি ; অবোধ বয়সটা দ্রুত ম্যাজিকের মতো হারিয়ে যাচ্ছে, মায়েরও গিয়েছিল, তার মায়েরও নিশ্চয় : তবে শিবভক্তি হারায়নি, বংশপরম্পরায় কারো নয়, এমনকী 'মালা-ডি' বুঝতে শেখা চানুরও নয়, কর্ডলেস-এর পাশে শিব ও পাপ, পাপ ও শিবকে দেখতে পায় —

খেলার আসরে না পৌঁছতেই নীলা জানিয়ে দিল, মাঝরাস্তার দালানে খেলা চলছে না প্রতিদিনের মতো, কোথায় ? না পেছনের দিকে কিছুটা গিয়ে পুকুরের কোণার মস্ত নির্জনতায়, কারণ সকাল দশটায় কিছু ছেলে পরিত্যক্ত দালানটার তরতাজা বোমা খুঁজে পেলে, পুলিশকে জানানোয় আতঙ্ক, তাই এদের নিষেধ করায়, বলা যায় না আরও অমন গোপন দু-চারটে আছে কি না, ছোটাছুটি ও খেলার ঝোঁকে হাতে নিলে, পা পড়লে কী বিষম পরিণতি, তাই আরও প্রায় দশমিনিট হাঁটা কোণার মস্ত নির্জনতায়, প্রায় ৪০ বিঘার মতো জমি-বাড়ি -বাগান নিয়ে কেমিক্যাল কারখানাটা আর খোলার সম্ভাবনা নেই, তাই ৪০বিঘা সোনার খনি, কে বা কারা হাতাবে, এই সব জটিলতা বর্তমানকে ঘিরে চলছেই এবং আলোচনা —;

আরও দশ মিনিট বিলম্ব, একেই বলে কপালে বিছে, কারণ দিন শেষ হয়ে আসছে ইতিমধ্যে, সঙ্গে চানুর চাবি, মা ফিরে আসবে, মীরা 'ঢেমনিটাকে বোঝাতে হবে, সন্ধ্যা প্রদীপের গোঁজামিলটা, এই সব কত কী ; কিন্তু এখানে পৌঁছেও চানু আজ কল্কে পেল না, পাত্তাই দিল না কেউ যেন টাইট দিচ্ছে 'ভালো মেয়ে সেজে ঘর আগলাগে যা' বিশেষত শেলি, শেলি মণ্ডল, বাপ মদন ইস্টিসানে চাল নামায়, ঝপ-ঝপাং চলতি ট্রেন থেকে ঝুলা মেরে নামতে পারে, শেলি তো এই মুহূর্তে বলেই ফেলল চানুকে দেখে 'ক্যালাতে এল', সোজা বললেও হত ' এখন এলি, নেব না, চানুরও ঝাল ও গুমর কম নয়, কাল স্কুলে এর শোধ নেবে, ওরা সব্বাই যে-স্কুলটায় পড়ে তা একটি সেবা সংস্থার, আন্টিরা কেউ কুচকুচে কালো, ধপধপে সাদা, টকটকে লাল, ফিনপিনে নীল, দুপুরে এদের খেতে দেয়, মাঝে মাঝে ফল আসে, ফুল আসে, এদের স্বাস্থ্য দেখতে আসে, শেলি চোর, ও আন্টিদের একজনের ছোট্ট ব্যাগ-আয়নাটি চুরি করেছিল, ও নাকি পড়বে না , হয় জুহি চাওলা বা ফুলন দেবী বনবে বলেছিল, শুনে আন্টিদের হাসি, বোঝানো, ধমক, কত কী —;

চানুর কপালে খেলার সুযোগ থাকলে ঠেকায় কে, শেলি ডাঙ্কাবাজ, হয়েছে কি হঠাৎ দুই লাফে খেলার মধ্যে, আলো হারিয়ে যাওয়া গোধূলির মায়াবী রঙে 'এনথু' পেয়ে বছর পঁচিশের পুরণো বকুল কাণ্ড বেয়ে বাঁদরের মতো লাফিয়ে কাছের শাখাটি আশ্রয় করে চেতিয়ে বসতেই চোরটানে, একটু ব্যথায়, হাতটা দ্রুত ফ্রক ও প্যান্টির ফাঁক দিয়ে সোজা গলিয়ে কিছু পর তুলে আনতেই যেন আলতার দোয়াতে আঙুলগুলো চুবিয়েছে, থমকে যায় দমবার মেয়ে নয়, সোজা নেমে 'খেলব না, চলি' বলে হন হন স্থির সিদ্ধান্তে হাঁটতে, বাকিরা জেদ ধরেই চানুকে আমন্ত্রণ এবং যোগ্য প্রতিশোধের আনন্দে, 'খেলব' বলে নামতে গিয়েই সময় ভুলে, চাবি ও মাকে গুলিয়ে দান দিল এবং অন্যান্যরা ওর চোখে একটা রুমাল বেঁধে হাঁটিয়ে 'এলাটিং বেলাটিং সই-লো / কী খবর আইলো / রাজামশাই চানু নামে একটি বালিকা চাইলো / নিয়ে যাও, বালিকাকে বলেই ঠেলে অপেক্ষাকৃত নির্জনতায় একাকী ছেড়ে দিয়ে যে-যার অদৃশ্য, খুঁজে বার করাই যে খেলার নিয়ম, চানু জানে এবং নিজেই চোখের বাঁধাটি খুলে ফেলতেই দেখল চারপাশ শুনশান, এরা কেউ নেই, কেবল দূর থেকে একজন হাসতে হাসতে কাছে এসে বলল,

তুমিই চানু ?

কেন ?

রাজামশাই পাঠিয়েছেন, সঙ্গে চলো

চানু লোকটিকে কিন্তু আন্দাজ করতে পারে কিছুটা, পাতলা চুল, কালো, টিপ্‌টপ ড্রেস, আঙুলে দামি পাথরের দু'টি আংটি, লম্বা সিগারেট ধরায় পাঁচ-সাত মিনিট পর-পর, ভারি সুন্দর সেন্টের ঘ্রাণ বেরোচ্ছে, চানু একে প্রায়ই পথেঘাটে দেখতে পায়, তাদের বস্তিতেও —;

কখনো ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কী কথা বলছে, কখনো তিনবাঁশের পারাপারে এ পাশে চায়ের দোকানটায় আড্ডা মারে, কখনো দেখে স্কুল ছুটির সময় গেটের বাইরে, বাসস্টপে ঘেঁষ-কাঁকরের মাঠটায় দাঁড়িয়ে, কিছুটা উদাস অথচ ভীষণ সজাগ, লোকটি হঠাৎ মৃদু হেসে বলে উঠল চানুকে,

জানি কী ভাবছ তুমি ।

ঠিকই ধরেছ, খানিকটা চমকে চানু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে,

তুমি ভাবছ, আমি রাজামশাইয়ের লোক হতেই পারি না ।

তা'লে আপনি চেনা-চেনা কেন, রাস্তাঘাটে দেখতে পাই যে আপনাকে ? রাজার বাড়ির কাজ যখন থাকে না, রাস্তায় বেরোই আমি, দেখতে পাও ? তাই হবে

এই দেখো, বলেই লোকটা ডান পকেট থেকে দামি একটি সোনালি মোড়কের ফাইভ স্টার হাতে দিয়ে বলে,

এটাও রাজামশাই পাঠিয়েছেন, বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে—

আমাকে ...শুধু আমাকে কেন ?

তুমি যে রাজামশাইয়ের বালিকা, বলেন, যদি ক্যাডব্যারি না পায়, তাঁর কাছে কেন যাবে বালিকরা

চানু মোড়ক খুলে শাঁসে কামড় বসাতেই দাঁত শিরশির, ভীষণ তৃপ্তি বোধ, কী স্বাদ, কী মৃদু গন্ধ, কী অনুভূতি —;

লোকটা হাসতে হাসতে ফের মিষ্টি গলায় বলে,

ভাবছ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না, সত্যিই আমায় রাজামশাই পাঠিয়েছেন, এই মাত্র তোমার দান হল যে, ওই দেখো, দুই বেয়ারার পালকিও পাঠিয়ে দিয়েছেন

চানু দেখল সত্যিই কিছুটা দূরে একটা শিমুল গাছের গোড়ায় স্বাস্থ্যবান, যেন দু'টো সাঁওতাল, দাঁড়িয়ে, ছোট্ট একটা সাজানো পালকি, শিমুল গাছটিতে একটিও ফুল নেই এখন, শুধু পাতা ।

বাড়ি তো দূরে, এতটা হেঁটে যেতে কষ্ট, রাজামশাই নিজেই ব্যবস্থা করেছেন রাজারা তো মারুতি চড়ে,

সে তো রাজারা চড়েন, তুমি বালিকাদের জন্য পালকিই মজার।

তালে আমি লুকুস্তিটা দিয়ে আসি!

সময় চলে যাবে যে —

ওরা লুকিয়ে পড়েছে, খুঁজে বার করে আনি অন্তত একজনকে ....

না খুঁজলেই বা কী —

খেলার নিয়ম যে ওটা, তাছাড়া রাজামশাই'র যে অনেক মেয়ে দরকার, আমাকে শুধু নিলে ফুটিয়ে দেবে। লোকটি নতুন সিগারেটটি ধরিয়ে, ঈষৎ বিরক্তিতে 'তাড়াতাড়ি ফিরবে, কেমন' বলে দাঁড়িয়ে রইল, যেমন ভঙ্গিতে চানু তাকে দিনের নানা সময়ে নানা স্থানে দেখতে পায় —

পালকির লোক দু'টো দিনের আলো চটজলদি ফুরিয়ে আসছে দেখে, মৃদু প্রতিবাদ করতেই লোকটা মজাজে ধমকে উঠল, যেন এরা রাজার কর্মচারী না হলে সোজা লাথ চড় কষিয়ে দিত, লোক দু'টোও ঠ্যাটা, তক্ক করেই যায়,

ক'টায় পৌঁছব সেখানে জানেন, ওভারটাইম চাইতে পারব না ।

না-ই বা চাইলে, কী হয়েছে তাতে

আপনি তো বলেই খালাস?

পেমেন্ট কি দেইনি তোদের

রাজামশাই কিছু বললে আপনি বোঝাবেন, মনে থাকে যেন।

আ-বে যা খানকি'র ছেলে, আমি বুঝে নেব ।

ইতিমধ্যে লুকুস্তিতে চানু খুঁজে বার করেছে কমলাকে, টেনে লোকটির সামনে এনে হেসে বলে, একেও রাজামশাই চেয়েছে।

তাই, ভারি সুন্দর মেয়ে তো!

লোকটি কমলার থুতনিতে এবার হাত বুলিয়ে ছোট্ট চুমু খেল আঙুলগুলো ঠোঁটে ঠেকিয়ে, আর কমলা অসম্ভব পাকা মেয়ের ভঙ্গিতে 'ধ্যাৎ অসভ্য, বলে হাসতে হাসতে একটা চোখ ছোট করে দেয়।

চানু লোকটিকে বলে, আমরা দু-জনেই পালকিতে যাব—

একসঙ্গে নয়, পাগল, ওইটুকুন পালকিতে দু-জন বসতে পারে না —

রাজামশাই বালিকাদের নিয়ে যায় কেন, চানুর প্রশ্নের উত্তরে লোকটি হাসতে -হাসতে, যেন ভুলে গেছল, 'আমরা কী বলে ডাকবে জানো' বলতেই কমলা উত্তর দিল জলদি, 'আংকল', এবং লোকটি একেও দামি একটি ক্যাডবারি উপহার দিয়ে তুমি কাল যেয়ো, কেমন' বলে প্রায় জোর করেই কমলাকে সরিয়ে দিয়ে চানুকে ছাউনির মধ্যে ঢুকতে হুকুম করল এবং চানুর হঠাৎ খেয়াল পড়ল ঘরের চাবিটি ট্যাঁকেই আছে, মা ফিরে এসে হাতে না পেলে ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে, শ্যাম খদ্দের পেয়েও কিছু করতে পারবে না, আজ খেলতে আসাই নিষেধ ছিল, কী ফ্যাসাদ জুটলরে বাবা,

দাঁড়িয়ে কেন, ওঠো পালকিতে,

একবার ঘরে যেতে হবে আংকল,

কেন ?

ঘরের চাবি আমার কাছে, ভীষণ কেলো হবে, ছুটে যাব আর আসব, বিশ্বাস করো, মা তো ফেরেনি, মীরাপিসির জিম্মায় দিয়েই, লোকটি এবার হাসির এবার হাসির মুখোশে কঠিন মুখে বলে, ভীষণ চালাক হয়েছ তো, চটে গেলে ভীষণ খারাপ মানুষ আমি,

আজ আমি খেলতেই ছাড় পাইনি, ভাগ্যিস জোর করে এসেছিলাম, দেখাই হত না তালে

আমি বিশেষ জোর পছন্দ করি না

তালে ঘরে গিয়ে চাবিটা রেখে আসি, ভাবছেন আমি ফিরব কি না,

লোকটি হেসে বলে, তুমি তো ভালো মেয়ে চানু, রাজামশাই খারাপ মেয়েদের কখনোই চান না, ফিরবে না কেন, ছি ছি,

হেসে চানু দু-পা বাড়াতেই পেছন থেকে লোকটি 'দশমিনিট ঘড়ি দেখছি কিন্তু, বলেই চানুকে জরুরি তলবে কাছে ডেকে খু-ব ধীর গলায় 'ওয়াদা না রাখলে আমি শাস্তি দিই, তখন আংকেল থাকি না বলেই কঠিন মুখে শিমুল গাছে ছোট্ট একটি আঘাত দিয়েই 'এদের দেখলে বুঝবে' --- অমনি গাছ থেকে সদ্য-ফোটা টকটকে লাল দু'টো ফুল, শেষ হওয়া বিকেলের ম্লান নরম আলোয় টুপটুপ ঝরে পড়ল, চানু ভয়ে দেখে ফুল দু'টো ফুলের মতো ফুটলেও এখন তারা বুলু আর হেনা- -স্পষ্ট মাটিতে পড়ে আছে --যারা দু-মাস ধরে নিখোঁজ বেপাত্তা, বিশাল বস্তিটার দক্ষিণ অংশে ওদের চালা । এক-বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি, সেই থেকে বাকি মায়েরা কাজে বেরোলেই ধমকায়, মুখ ভাঙতে চায়, গু খেতে বলে, দিব্যি কাটায়, যখন-তখন চুনুদের পথে যেতে নিষেধ করে, তাই আজ শাস্তি পারাপারের তিনবাঁশে দাঁড়িয়ে অমন মুখঝামটা দিয়েছিল --;

ড্যারায় ফিরে চানু বুঝল ফেরেনি, মীরাকে ডাকল না, বুকের মধ্যে চাকা ঘসটানোর শব্দ চলেছে, ঘামছে নীরবে, আলো জ্বালিয়ে টিভি-টি খুলে ঠিক করল আর ও -মুখো যাচ্ছে না, ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি, চানু পেটে-পেটে কম বুদ্ধি ধরে না, ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চানুর মনে হল শেলি, কমলার চাইতে সে অনেক বেশি সুন্দরী, নইলে কেন পালকিটা শুধু তার জন্যই শিমুলের তলায় অপেক্ষা করছে, কিন্তু আজ খেলার ব্যাপারটা কাউকে জানাতে পারছে না, এত বড় বিস্ময়ের ঘটনা, মা তাহলে বুঝে যাবে বারণ সত্ত্বেও চানু বেরিয়েছিল বিকেলে, পেটে-পেটেই রাখতে হবে, আচ্ছা মীরাপিসিকে (ঢেমনি, বলার জন্য অনুশোচনা হয় এখন) বললেও হয় সন্ধ্যাবাতির বেনিয়ম এবং রাজামশাইয়ের পালকি ও পাঠানো মানুষটার ব্যাপারে, কিন্তু মীরাপিসি মাকে জানিয়ে দেবে, দু-জনের মধ্যে ভীষণ ভাব, কিসের যে গোপন টান, চানু ধরতে পারে না, মাঝেমধ্যে সবজির হাটে যেতে মীরাপিসি টাকা নেয় গোপনে, সুদে শোধ দেয় মা ও মীরাপিসির মধ্যেই ব্যাপারটা আছে ইত্যাদি --;

আজ আটটার পর ফিরে এসে শাস্তি দেখে চানু সুবোধ বালিকার মতো ঘরে টিভি চালিয়ে বসে আছে । চোখেমুখে চাপা অপরাধের ছাপ মায়ের চোখ এড়ায় না,

বেরিয়েছিলি

না

মীরাপিসিকে ....

হ্যাঁ

পাকামো করে নিজে শাঁখ...কী রে, কী যেন লুকোচ্ছিস !

লুকোনোর কী আছে ?

খেলতে তো যাও রোজ ....শুনছি বোমা ফেটেছে ।

হুঁ

এমন সময় টিভিতে হারিয়ে যাওয়ার ফর্দে হেনার নামটি ফুটে উঠতেই মা বলে, ওরা কি এ মুল্লুকে আছে, দ্যাখো শ্যাল কুকুরে খুটছে কোথাও !

না, না, আমি -----

তুই কী

চানু চেপে গিয়ে মনোযোগে টিভি দেখে,

বলছিস না যে তুই কী .... হেনা, বুলুকে

এমন সময় শ্যাম বাইরে খদ্দের দাঁড় করিয়ে লুকোনো বোতলটি খুঁজতে এসে মায়ের সঙ্গে সংসারের টাকাকড়ির ভাগাভাগি নিয়ে তুমুল বিতণ্ডায় মেতে ওঠায়, চানু ভয় ও ভাবনায় একটু একটু ভিজতে থাকে, আবার ফিরে যেতেও কৌতূহল ওই রাজাকে দেখতে, এবং লোকটি কেমন মনের ভাব বুঝে গিয়ে মিষ্টিমধুর ভঙ্গিতে কথা বলে, ববি দেওলের মতো ---;

পরদিন চানু ঘর ছাড়ে না, স্কুলে যায় না, সারাদিন কোথাও বেরোয় না পর্যন্ত, মা অবাক হয়ে চিন্তা করে এ-বয়সে মেয়েটা বিগড়ে যাচ্ছে না তো, শেলি নাকি ছোকরা এক পুলিশের সঙ্গে ঘোরে, যা চারপাশের অবস্থা এ মহল্লায়, সন্ধে নামলে কী না চলে লাইনের ধারে, এখানে-সেখানে শান্তি নিজেই তো বড়ি বেচা মানুষদের সাহায্য করে গোপনে, দু'টো অতিরিক্ত পয়সার জন্য, কিন্তু চানু বেলা যত্ত ভালো-মন্দ বিচার, চানুর একদিন শুনিয়েও দিয়েছিল মাকে, মার কী পেটানি সেদিন, কিন্তু ওদের স্কুলের সুন্দর সুন্দর আন্টিগুলো পড়ানো-খাওয়ানো, নানান কাজে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় চানুর জন্য, মায়ের জন্য স্বপ্ন ভরসা-ভবিষ্যৎ- কিছুটা জাল বোনা হয়, দরাকারে ওদের হাতে-পায়ে ধরে মেয়েটাকে পাকাপাকি দিয়ে দেবে ...ওরা নেয় এরকম শুনেছে, ছোটবেলা চানুকে চেয়েওছিল, খন মেয়ের মেয়েত্ব ফোটেনি, ভেবেছিল বড় হোক অন্তত একটি সন্তান ভদ্দর হবে, নাকি বিলেতেও নিয়ে যেতে চায়, চানুর মধ্যে শেখার আগ্রহ, এবার একদিন আন্টিদের বলবে শান্তি, বাড়ন্ত গড়ন, শ্যাল-কুকুরের রাজ্যে কদ্দিন পাহারা --;

পরদিন, তার পর, তারও পরদিন চানু স্কুলে গেল না, ঘর থেকে বেরোল না, বলতে গেলে লোকটিকে ঠকিয়েছে ভেবে ভয়ে লুকিয়ে রইল। লোকটা যতই বলুক, চানুদের ড্যারা খুঁজে বার করতে পারবে না, রাস্তায় বেরোলে যদি .....,

ঠিক হপ্তা খানেকের মাথায় ঘর থেকে প্লাইউডের ফুকো-জানালা দিয়ে চানু হঠাৎ রাজার মানুষটিকে দেখতে পেয়ে চমকে গেল, তিনবাঁশের পারাপারের ওপাশে ফুচকা বেচছে, যেন ছল

এটা, অথচ লাট্টুর কাউকে খুঁজছে, পরদিন আরও ঘাবড়ে যায় চানু যখন লোকটিকে দেখে বস্তির চায়ের ঠেকে জমিয়ে দিচ্ছে, আবার বিকেলের মরা আলোয় দেখতে পাওয়া গেল পেছনের লাইনের ঝোপের পাশে যেখানে চানুরা পাইখানায় বসে, হেঁটে যাচ্ছে এধার-ওধার তাকাতে, তাকাতে, ইত্যকার দৃশ্যে সময়-অসময়ে চানু আশঙ্কায় কিছুটা দমে গেলেও মাকে বলতে পারছে না, পাছে এই সূত্র ধরে নানা জেরার মুখোমুখি হতে হয়, বালিকা-বুদ্ধিতে ভাবল পুলিশকে বলবে, শেলির সেই ছেলেটাকে, কিন্তু শেলি পাকামি করবে তাই দাদার কাছে যখন ইনিয়েবিনিয়ে থানার বৃত্তান্ত জানতে চাইল, শ্যাম মুখ ঝামরে বলে, থানা দিয়ে কী করবি ? স্রেফ ক্যালাব বলে দিলাম, খইনি ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে যায়, কিন্তু দুপুরে বিকেলের যে-কোনো উদ্ভট মুহূর্তে লোকটি কিন্তু এলাকা ছাড়ে না, তক্কে তক্কে থাকে, মাথায় খাঁড়া নিয়ে কি এ-বয়সটা বেশি গুমরোতে পারে, মা তিষ্ঠোতে দেয় না স্কুলে না-যাওয়ার জন্য, কত দিন আর আন্টিকে ওই লোকটার সব কথা, রাজা ও পালকির ব্যাপার, নালিশের ভঙ্গিতে বলল, এমনকী হেনা ও বুলার ঝরে পড়াটাও —

আন্টি খোলা পিঠে তাঁর অজস্র লাল তিল নিয়ে আঙুল তুলে নির্মল হাসিতে বলেন,

ওই মানুষটি ...

আর তখনই চানু লক্ষ্য করলে স্কুলের কিছুটা দূরে লোকটা কার জন্য অপেক্ষা করছে যেন, সিগারেই খাচ্ছে, আন্টি হেসে বলেন,

কিছু নয়, ভয় পেয়ো না, ঈশ্বর মঙ্গল করবেন।

ওকে ভয় লাগে আমার ।

ভয় দূর করতে হয়।

বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ লোকটার মুখোমুখি, কিন্তু কোনো প্রতিশোধের দৃষ্টি বা ধমক নেই, হেসে বলে, আন্টি কী বলল আমার সম্পর্কে, চানু বিস্মিত , এরই ব্যাপারে যে আন্টির সাথে কথা হল, লোকটা জানল কী করে, আন্টির সঙ্গে মুলাকাত হল কখন, কিন্তু লোকটি সেদিনের মতোই হেসে হেসে বলে, রাজামশাই ফের তোমায় চকোলেট পাঠিয়েছেন, যাওনি বলে মন খারাপ হয়েছে তাঁর, আজ বিকেলে খেলতে যাবে তো, নিশ্চয় যাবে , যেতে হবেই তোমায়, ভালো মেয়ে তুমি, এবার ঠকালে ভীষণ রেগে যাব আমি —;

ড্যারায় ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করে, কিছু চেপে যাচ্ছিস ।

কেন ?

মুখ-চোখ বলছে তোর।

কী আর লুকোব ?

বড় হয়েছিস, কুটকুট্ করবি না একদম ।

বড় হয়েছে, তাহলে তো মা বলেছিল আন্টিদের জিম্মায় দিয়ে পাকাপাকি, আন্টিরা ঠারে ঠোরে চোখ নাচিয়ে বলতেও চায়, দু-দিন স্কুলে কামাই হলে ছুটে আসে, সেবা-ঈশ্বর-মানুষের কথা বলে, দেশে দেশে এমনই তো কালোকুষ্ঠি জলনিকাশি আর রেললাইন, চানুদের মতো ফুলেরা নাকি

ফুটে থাকে, ঈশ্বরের অংশ হয়, সেবা ও সুগন্ধে পৃথিবীর হাট ভরে যায় ইত্যাদি, সেইসবের প্যাঁচ কি মায়ের কথার আড়ালে, তাহলে সে তো নির্ভয়ে গড়গড়িয়ে বলে দিতে পারে হেনা ও বুলার সন্ধান, কিংবা রাজার লোকটির সঙ্গে চানু'র আলাপ পরিচয়ের কথা, এলাটিং বেলাটিং সই-লো খেলা, কোনো আশঙ্কা বা ভয়ের ব্যাপার থাকে না আর, আন্টিরাও লোকটিকে চেনেন, কোনো বিপদ মনে করেন না, সহাবস্থান করছেন নিরুদ্বেগে, মিলেমিশে, তাহলে যেখানেই চানু যাক মায়ের এত ফেউ লাগা কেন, এত জ্ঞানের কী আছে, নিজে তো রাম ঢেমনি —;

পরদিন সকাল থেকেই শান্তির জ্বর, মাথা ঘামানো, পাইখানা ইত্যাদি, মা ককিয়ে বলে, সামনের হাউজিংটার এম ৪-এ খবর দিয়ে আসতে, ও-ফ্ল্যাটে মা রানি, হাফ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শান্তি না এলে অসহায়, টাকার কোনো পেছুটান নেই, শান্তিই সব, সংসার-চাকার তেল ওখানে, শান্তি হল গিয়ে চলাফেরার অসুস্থ মানুষটির কাছে বেশি বেশি সুস্থ, তা খবর দিতে বিউটিকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তা এবং কর্ণের প্রোথিত রথের মতো বা তিল টুটু-রিকশার চাকা ডেবে-থাকা মাঠটা পেরিয়ে, এম ব্লকে ৪ নম্বর-এর কলিং-এ আঙুল, শব্দ, দরজা খোলা, খবর পেয়ে অসহায় চোখ, চানুর মেজাজ খাপ্পা তা দেখে ফ্ল্যাটের ভেতরটা এক ঝলক দেখে নেওয়া, মোটা মোটা বিছানা বেসিন-ডাইনিং টেবিল —অসম্ভব পেছল মোজাইক, বেসিনে তখন চকচকে কলের মুখটা দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, ভারি মজার আওয়াজ, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চানুর মধ্যে ভিনদেশি বিদ্বেষ-বিষ, বিউটির কিন্তু মন্দ লাগেনি, ঘরে ধূপের গন্ধটি ভীষণ মিষ্টি লাগছিল। ফের ওই মাঠ এবং রিকশার অংশগুলোর বেঁটে ছায়াগুলো সম্পূর্ণ ভুলেই বড় রাস্তার ফুট ধরে দোকান, ঝুপড়ি চায়ের ঠেকের পাশ দিয়ে হঠাৎ বিউটির 'টোপলা দু'টো গেলে দেব, পায়েজ্জুতো দেখেছিস শুনতেই চানু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেই লোকটা যেন, রাজার চাকরি চলে গিয়ে বেকার ইতিমধ্যে পোশাকে তেমন জেল্লা নেই, চানু ভয়ে চমকে উঠেছিল, সে তো কথা রাখেনি ফিরে যাবার, কিন্তু লোকটা চানুকে চার্জ করল না, অদ্ভুত উলটে বিউটির ঝালে সুরুত করে কেটে পড়ল, পাছে আশপাশ থেকে উটকো দু-চারজন এসে মেয়ে বাজির জন্য ড্রেস করে দেয় এবং বিউটি গর্ব ও বড়াই করে বলল, রাস্তায় বেরোলেই নাকি ওর পেছনে পুরুষেরা ছোঁক ছোঁক করে, কিন্তু এই মুহূর্তে চানু তাকে পেঁচি ছাড়া ভাবতেই পারে না কিছু যেহেতু, নিরালাপে খানিক হেঁটে, ফের ভাবনাটা মুছে যেতে, দু-জনার মধ্যে পেয়ার হয় এবং আজ তাদের ম্যাটিনিতে 'প্রদীপ' হলে বই দেখার সিদ্ধান্ত পাকা হয়, টাকা বিউটির নয়, পাত্তি খরচ করবে বিউটির ইয়ে, মাঝাবয়সি একটা পুলিশ, এবং যখন দু-জনে এই মতলবটি লুকানো বোমার মতো পেটে বয়ে অনেক বেলায়, ঠাস ঠাস কাক ডাকে যখন, আর গাড়িগুলো ভিন্ন তালে লাইন ধরে ছোটে, বস্তিতে ফিরে মাকে হাউজিং-এর রিপোর্ট দিয়ে, চানু ব্যস্ত হয় দুর্গন্ধময় লাইনের ঝোপে নিত্যকর্ম সারতে এবং চান —;

এই অবসরে স্কুল থেকে একজন আন্টি উৎকণ্ঠায় খোঁজ নিতে এসেছিল কেন যাচ্ছে না হপ্তা ধরে, উৎসাহ হারাচ্ছে কি না, পড়াশুনো কিংবা ঈশ্বরে মতি, পাপ-পুণ্য-সেবা ইত্যকার ব্যাপারে, অসুস্থও হয়ে পড়ার সম্ভাবনা চানুর, তাহলে আন্টিদের সেবার স্পর্শ থাকবে, ইত্যকার খোঁজ নিয়ে শান্তিকে কিছু শুশ্রূষা এবং উপদেশ দিয়ে মায়ের মনে চানুর জন্য ভবিষ্যৎ একটি স্বপ্নের জন্ম দিয়ে, রাজহাঁসের স্বপ্ন, যখন সবে ফিরে যাচ্ছিলেন, চানু ভার বালতি ও ভেজা গামছা বুকে জড়িয়ে

চালার ঢেউয়ের ছায়া দিয়ে-দিয়ে ঘরে এসে সব শুনে-টুনে উঁকি মেরে দেখতে পায় উনি তখন তিনবাঁশের মাঝপথে, নীচে কালোকুষ্ঠি স্থির পাচ জল ধারে ধারে হিঞ্চের উপনিবেশ, ভারি জাদুকরি রোদটুকু টানটান শাড়ি নাচানোর ঢঙে দুলছিল বলে চানু দেখতে পায় ওনার খোলা কাঁধে লাল মেচেতার অজস্র ছিট, তিল, চুল ধপধপে পোশাক, বিনম্র ভঙ্গিতে সরল পদক্ষেপে ওপারে চলে গেলেন এবং মরকুটো শিমুল গাছটার পাশ দিয়ে স্কুলের দিকে চলে যেতেই অবাক, একটাও ফুল ছিল না যেখানে, কয়েকটি কুসুম জেগে উঠল, যদিও হঠাৎই চানুর ভয়ে হল, কৌতূহলও জন্মাল, এক্ষুণি গিয়ে গোড়ায় সামান্য আঘাত দিলে ওই কুসুমের কেমন অবস্থা হয়, কিন্তু আজ বিকেলে এলাটিং বেলাটিং সই-লো খেলতে যাবে না যেহেতু, কারণ ও এবং বিউটি পূর্বেই ম্যাটিনি মারার মতলব গোপন বোমার মতো পেটের গভীরে বয়ে বেড়াচ্ছে —;

...অথচ ফুলগুলো উঁচুতে ফুটে রইল ফুলেরই মতন, শুভ্র ভদ্রতা নিয়ে, এবং ফের চানু স্নানের পরেও নীরবে ঘামতে থাকল, কারণ, ওনার স্পর্শেও শিমুলের ডাল থেকে যে-দু'টো ফুল ঝরে পড়ল, চানুর ভীষণ পরিচিত ।

বিভুর পৃথিবী

বিভুর বিপদ। খুবই। যে-কোনো অবস্থায়, বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। এমনকী জগদ্দলের বাসে ওঠার মুখেও কে যেন টুক করে শাসিয়ে গেল বিভুকে —যাচ্ছিস তা'লে ? নে, শেষবারের মতো ঘুরে নে!

আগামী কিছুদিনের মধ্যে সে যে খুন হতে চলেছে, নিঃসন্দেহ। খুনি আজ সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে গেল। নেমে পড়বে ? চলন্ত বাসটি নিরাপদ নয়। কিন্তু তাতেও বা ছাড় কোথায় ? টের পেয়ে গেছে, বুঝতে পেরে এই মুহূর্তে পেছন থেকে সাঁটিয়ে দেয় যদি।

বাসটায় খুব গাদাগাদি ছিল না। কল-মিল এলাকার মধ্য দিয়ে এ রুটটায় ছারপোকার মতো পকেটমার জেনেও, বিভুর কেবলই মনে হচ্ছে ব্রহ্মতালুর ঠিক নীচে, করপাস্ ক্যালোসাস রগটি ভীষণ দপ দপ করছে, কাঁপছে সারা শরীর খাওয়ার কোনো রুচি জন্মাচ্ছে না। বমি হতে পারে। ভাবল, বাসের মধ্যে এই মুহূর্তে খুনির দু-চারটে চামচে কি নেই, যারা বিভুকে ফলো করছে না ?

ঘামতে থাকলে বিভুর মুখমণ্ডল ভীষণ করুণ হয়। নাকের অসুস্থ ডগাটি স্যাঁতসেঁতে, বুকের আজন্ম স্প্যাজম ব্যাধিটি চাড়া দেয়, কুতকুতে সহ্যশীল দৃষ্টির মধ্যে চোখদু'টি যেন বরফ-চাপায় বিভু'র সবকিছু হজম করে। তখন বাইরের মানুষ চট্ করে টের পায় না ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা ঘুমের জন্য ওর যন্ত্রণা হয়। হয়তো আজন্ম ব্যাধিটিই তাকে সহ্যশীল গড়ে তুলেছে।

আসলে, আজ বিভুর খারাপ কিছু ঘটে গেলে, দায়ী হবেন অধ্যাপক মনকুমারই। নইলে বিভুর ব্যক্তিগত কোনো হিংস্র অতীত কার্যকলাপ নেই, যাতে বদলায় খুন হয়ে যেতে পারে। সম্পত্তি? যদিও সে ছেলেবেলায় পারিবারিক গুপ্তধনে মুঠোয় মোহর-গিনি নিয়ে উপুড়-ঢালা খেলত, আজ সবকিছুই পারিবারিক কাইজ্যায় ফুস্তা হয়ে গেছে। বউ, ছেলে, মেয়ে নিয়ে জোড়াতালিতেই আছে। পূর্বপুরুষের ধ্বংসগ্রস্ত একটি অংশ আঁকড়ে মাথা গুঁজে আছে বটে, বিশাল ক্ষয়িত দরদালানটির খোপে খোপে বংশলতাদের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা বিষ বাতাস। তুচ্ছ, ছুতো-নাতা নিয়েও।

দু'টো স্টপেজ যেতেনা-যেতেই বিভু নেমে পড়ল। টেনশন সইতে পারছিল না। ভীষণ অস্বস্তি। ভয় হচ্ছে খুব। টেলিফোন বুথ নেই কোথাও ? ওই তো! মনকুমারদাকে এক্ষুণি ব্যাপারটা

জানিয়ে রাখা দরকার । নিরাপত্তা নেই । বিভুকে প্রোটেকশন দিতে হবে তাঁর । তাঁর প্রয়োজনেই বিভু বাইরে বেরিয়েছে । দরকার পড়লে পুলিশ সুপার এস ডি পি ও বা ডি এম থেকে প্রশাসনিক সাহায্য নিতে হবে । নইলে এইসব খতরনার্ক খুনিদের ঠেকানো যাবে না । দু-দিন আগেই তো পাড়ার ছোট্টু বিভুকে হাসি হাসি ঝকঝকে দাঁতে জিজ্ঞেস করেছিল ---মনকুমারের পেছনে ঘুরিস কেন ? কী ? কেসটা কী ?

--তোমার গায়ে লাগছে কেন ? আমার উব্‌গার করেছিল, আমি তাই করছি ।

---চামচেগিরি করবি তার জন্য ?

----লোকাল ইতিহাস খুঁজছে, আমি হেল্প করছি । এর মধ্যে এমন কী দেখলে তুমি ?

-----লোকাল ইতিহাসে তোর কী হবে ? কেন মেলাই জড়াচ্ছিস ? একা পারে ও করুক ।

অথচ ছোট্টুকে বিভু ছোটবেলা থেকে চেনে । এক পাড়ায় পাশাপাশি বহুকাল ধরে আছে । ছোট্টু খুবই ঠাণ্ডা রক্তের । এলাকার অনেক কিছু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এমনকী শিক্ষা সংস্কৃতির নানা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার চাক বেঁধে আছে । সুন্দর দাঁতে, বিনয়ে কথাবার্তা বলে । ছোট্টু এই বিভুকেই হাজার আশি চোট দিয়েছিল একবার, মিলিঝুলি ব্যবসা করতে নেমে । তখনও সে দেশসেবার ত্যাগে মাতেনি । বিভু হজম করেছিল । ভেতরে ভেঙে পড়েছিল । মানসিক অবসাদ এসেছিল । বিশ্বাস ও ভরসার নানা জটিল জিজ্ঞাসা জেগেছিল । সেসব বিশ বছর আগের কথা । কুড়ি বছরে পৃথিবী যতটুকু না বদলেছে, পরিশীলিত হয়েছে তুলনায় অনেক বেশি। বিভু ছোট্টু সম্পর্কে গোপনে আজও পোষণ করে । আতঙ্কের একটি কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়, যখন সে হেসে ঝকঝকে দাঁতে বন্ধুর মতো কারো সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। ঠাণ্ডা রক্তে কিছু ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করে । মনকুমার সাক্ষী দিয়েছিল ছোট্টুর বিরুদ্ধে, কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতিতে ।

এখনও ফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে বিভু । সামনে মাত্র অচেনা দু-জন, কাচের আড়ালে একজন রিসিভার নিয়ে ঝুঁকে খবর আদান-প্রদান করেই চলেছে। বিভুর মনে হচ্ছে দীর্ঘ সময় । হতে পারে, বিভুর হঠাৎ নেমে পড়ার সংবাদ চারদিকে পাচার করে দিচ্ছে ।

---ফোন করবেন তো ? ..... এখুনি হয়ে যাচ্ছে । মালিক বিভুর ঘাড় কাতের মুদ্রায় স্বস্তি পেল । কপালে খাড়া সিঁদুর এবং চানভেজা চুলে সেলো-তে কথা বলছিল কার সঙ্গে যেন । চোখজোড়া কেমন শক্তিধর ।

সময়ের হিসেবে বিভুর পৃথিবী পৌনে একটায় ঠেকেছে। অলস ও আচ্ছন্ন মাছিকুল চা-কচুরির দোকানগুলোর টেবিল-বেঞ্চে মূর্ছিত। বাস-লরির দাপটে বিশাল দু'টো বাদামগাছের চওড়া পাতা সকল ধুলো মলিন । একধারে চটকলের দীর্ঘ পাঁচালি । গা—ঘেঁষে মস্ত নর্দমা দিয়ে বহু বছরের জল চলেছে গঙ্গায়। পাশেই ছোট্ট শিবমন্দিরের মাথায় ধ্বজাটা ন্যাতানো । ঢালু কাঁকরের পথটা চলেছে খেয়াঘাটের উদ্দেশে । অজান্তে পিঠে একটা কাকের ভার নিয়ে মেটে রঙের মোষটা আপাতত নদীর চরার ঘাসে যাবে । একজোড়া ঢ্যালা-চোখে পুরাতন নির্বোধ চাউনি ।

বিভুর করপাস ক্যালোসাস দপ দপ করেই চলেছে । এটা ওর নিত্য উপসর্গ । অভ্যাসের তালিকায় চলে গেছে । যখন তীব্র হয়, আর সইতে পারে না, ট্যাবলেট গেলে । একটি রাংতা-

বাহারের পাতা সর্বদা পকেটে থাকে । হায় আজ ভুলে তা ফেলে এসেছে । বিপদ হলে চারদিক আয়োজন করেই আসে । এমন আতঙ্কময় দুপুরে বিভু যে আজ ফাঁসবে বুঝে উঠতে পারেনি । এমন বেঘোরে, বিভুঁইতে খুন হলে বউ-ছেলে-মেয়ের দরজায় খবরটুকু পৌঁছবে কি ? অন্তত মনকুমার ফোনে আভাসটুকু পাক । সে কাচের দিকে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল । লোকটির যেন খবর পাচারের দান আর ফুরোতে চায় না ।

অধ্যাপক মনকুমারের বাড়ির ফোনটি খানিক বাদেই ঝনঝন বেজে উঠবে । এখন তিনি টেবিল কাজ করতে করতে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েই বউকে জিজ্ঞেস করলেন ---- বিভু ফোন করেছিল কোনো ?

----কবে ?

---দু' একদিনের মধ্যে ?

---না তো ।

----- কী আশ্চর্য ! ...... মানুষ এত ক্যালাস !

----কেন ?

---সাতদিন আগে বললাম, জগদ্দল থেকে অধ্যাপক মুন্সীর লেখাটা স্রেফ শুধু নিয়ে আসতে ..... আজও পাত্তা নেই । .... আগবাড়িয়ে রাজি হলি কেন ? আমিই না হয় যেতাম ।

বউ বলে ---তোমার ন্যাওটাগুলো সবই তো এরকম। .... দিনরাত এদের নিয়েই আছ ! --বিভুটা এমন ছিল না .... উৎসাহ পায় বলেই পাঠালাম । মুন্সিকে বলে রেখেছি, ও গিয়ে স্রেফ নিয়ে আসবে ....আগামীকালের মধ্যে হাতে না এলে, বইটাই বেরোবে না দেখছি ।

...এদিকে হল বুক করে বসে আছি ।

---কী লেখা ? চিত্রা জানতে চায় ।

---জরুরি লেখা । ..... বর্তমানকালের ওপরই । ...... দায়িত্ব নিলি কেন বাপু ?

ফের মনকুমার জোর দিয়ে জানাল,খুবই গুরুত্বপুর্ণ লেখা । নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর ইতিহাস কোথায় প্রবেশ করতে পারে, তার সম্ভাবনা-বিশ্লেষণ--টেকনোলজি--আতঙ্কবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ।

মনকুমারের সঙ্গে বিভুর ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি দিনের নয় । বছর দেড়েক হবে । উপলক্ষ ছিল স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ । আঞ্চলিক ইতিহাসের সন্ধানে মনকুমার বুঁদ থাকবার পর্বে আচমকাই বিভুর সঙ্গে আলাপ । সে খুবই পুরণো পরিবারের এবং অঞ্চলের অনেক কিছুরই খোঁজ রাখে । আর ইতিহাস যখন বিচিত্র জটিল ও বিপুল ঘটনাসামগ্রী, মনকুমারের সঙ্গে বহু মানুষেরই পরিচয় ঘটেছিল । কিন্তু বন্ধুরা টিকে রইল বিভুর সাথেই । বছর দশেকের ছোট যদিও তা হোক, মানুষটিকে ভালো লেগেছিল অধ্যাপকের । ও প্রায়ই বলত ---এখানে পুরণোরা বিশেষ কিছু জানে না ...... কিন্তু বুলি ঝাড়বে বড় বড় । ফালতু কেন ওদের দরজায় যাবেন ?

বিভুর উর্ধ্বতন পুরুষেরা এলাকায় যে অভিজাত ছিল, একদিন সন্ধ্যায় ওই বিশাল ভগ্নস্তুপের

জমিদার বাড়ি-র মধ্যে ঢুকবার সুযোগে টের পেয়েছিলেন মনকুমার । গঙ্গা'র ধার, প্রাচীন বসতি । নদীই বাকি সব সভ্যতার জননী । বিভুদের ঘরে ঢুকে অধ্যাপক খুব পুরণো রুচির একটি চেয়ার দেখতে পেয়েছিলেন । তাজ্জব ব্যাপার ! বার্মা সেগুণের প্রাচীন নকশার কী অসাধারণ সূক্ষ্ম কাজ ! ওটিতে বসে না কেউ । টুকরো চিহ্ন হিসেবে যেন, সাজিয়ে রাখা হয়েছে । কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা টাল দেওয়া আছে, আর কিছু চিহ্ন হিসেবে যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে । কয়েকটা বাক্স-প্যাঁটরা টাল দেওয়া আছে, আর কিছু তেমন নেই বিভুর । বোঝা যায়, নামে তালপুকুর কিন্তু এখন ঘটি ডুবছে না । শুধু জল শুকিয়ে যাওয়া নয়, পাঁক উঠছে । ওই সন্ধ্যায় অচেনা একজনকে হুট করে ভেতরে টেনে, আনায়, স্ত্রী'র ঈষৎ বিরক্তি ও অস্বস্তি মনকুমারের চোখ এড়ায়নি । সিঁড়ির অন্ধকার, পায়রা ও চামচিকে, পরিত্যক্ত নাটমন্দিরের অসংখ্য বট-পিপুলের চারার মধ্যে সাপের খোলস পর্যন্ত মনকুমার দেখতে পেয়েছিলেন । ওই একদিনই । নিয়মিত আড্ডা জমাতে বিভু-ই অধ্যাপকের বাড়িতে আসে । এ বাড়ি খুবই খোলামেলা । বিভুর মাথায় অনেক পরিকল্পনা । একমাত্র মনকুমারের কাছেই উজাড় করে দেয় । কেন জানি, অধ্যাপক মানুষটিকে বিভুরও ভালো লেগেছিল । নইলে সে স্বভাবে ভীষণ খুঁতখুঁতে ; কারো কাছে সহজ হয় না ।

মনকুমার যদি আড্ডায় জিজ্ঞেস করেন ----- তোমাদের পাড়ার ঘোষ পরিবার নাকি দু'শো বছরের ? কর্ণওয়ালিসের আমলের পরচা আছে বাড়িতে ? বিভু নাক ফুলিয়ে বলে — ভুবন ঘোষ বলল আপনাকে ? তালেই হয়েছে ? ও ব্যাটা স্রেফ বাখওয়াজ । দেখবেন আপনাকে কেবলই ঘোরাবে , পরচাটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ।

টেলিফোন বেজে উঠল । বউ ডেকে দিতেই জানতে পারলেন, বিভু । গরম-গরম হাতে পেয়ে, অপ্রত্যাশিত, মনকুমারের শান্ত রুচিময় মেজাজ খরখরিয়ে দর্পে ওঠে ।

---- কে ? বিভু ? কী ব্যাপার বলো তো ? আমার লেখা কোথায় ?

---হয়ে যাবে !

---ধ্যুৎ । আর কবে হবে ?

---ধরে নিন হাতে পেয়ে গেছি .. ষোলো আনা ....কিন্তু এখন আমার প্রটেকশন কে দেবে ?

---কিসের ? মাথামুণ্ডুহীন, অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মনকুমার ভেতর-ভেতর খেপতে থাকেন ।

----আমি মার্ডার হলে ?

---মার্ডার ? কেন ? কে করবে ?

---আপনি বুঝছেন না । ...... আমি তো বলেছি আপনাকে ...পাড়ার ছোট্টু-ফট্টু ভীষণ জিনিস ? পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে দেবে.... জেনে গেছে আপনার হয়ে লেখা আনতে এসেছি ।

মনকুমার বিরক্তি চেপে বলে --ঠিক আছে, আমিই প্রটেকশন দেব ।

---ঠাট্টা করছেন মন দা ? কথাগুলো যেন এলোমেলো ভাসিয়ে দিল বিভু, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ---আপনি ডি এম কে বলুন ...এস পি-কে জানান লেখা আপনি পেয়ে যাচ্ছেনই .....আপনি আমার বিপদটা ধরতে পারছেন না... ভীষণ খারাপ... সব এখানে খুলে বলা যাচ্ছে না।

শেষ কথাগুলো খুবই জরুরি ভঙ্গিতে বলা হল ।

---বললাম তো, আমি সামলাব সব ...লেখাটা আজই চাই আমার !

---একটু আগে, বাসে উঠবার মুখে শাসিয়ে গেল ।

---কীভাবে ?

----শেষবারের মতো ঘুরে আয় । ..... আমি ছোট্টুকে চিনি ছোটবেলা থেকে...... আপনি থানা-পুলিশ খবর দিয়ে রাখুন ।

---কাঁদছ কেন ? হঠাৎ ও-প্রান্তে সপ সপ আওয়াজে মনকুমার স্তম্ভিত । তড়িঘড়ি সামলে বললেন ----ঠিক আছে, ঠিক আছে, থানায় যাচ্ছি । লেখাটা নিয়ে এসো । ..... বিকেলের মধ্যে চাই-ই কিন্তু ।

রিসিভার রাখতেই মনকুমারের বিস্ময় ক্রমে আতঙ্ক-ভাবনার রূপ নিতে থাকে । বিভুর সঙ্গে বেশিদিনের আলাপ নয় । অতীত জানা নেই । ছোট্টুকেও ভালো চেনে না । ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সামান্য ভদ্রতা বিনিময় হয়েছিল বটে, এলাকায় মাতব্বর সে, কিন্তু খুন করতে বা করাতে পারে, টের পায়নি । তাহলে কি মনকুমার কারো টার্গেট ? অজানা শিহরণে মনকুমার নিজেকে ছাইতে থাকেন ।ইদানীং কত নিরপরাধ পরিশীলিত মানুষও খুন হচ্ছেন । পুলিশ মোটিফ খুঁজে পাচ্ছে না । পৃথিবী জুড়েই তো চলছে সব । নাকি বিভু অসুস্থ সিজোফ্রেনিক? ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কি কারো স্বার্থে ঘা পড়ছে ? ভাড়াটে খুনি দিয়ে যে কোনো মানুষকে সরিয়ে দেওয়া যায় । পয়সা দিলেই কিলার ভাড়া পাওয়া যায় !

মনকুমার বউকে কিছু ভাঙালেন না । নিরীহ, গেরস্ত মেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে । যখন বিভুকে অসুস্থ ভেবে খানিকটা নিরাপদ হতে যাচ্ছেন মনকুমার, ভাবলেন, সব কিছুই সরল চোখে দেখা ঠিক নয় । খুন এতই বা অপ্রত্যাশিত কিসের ? কেউ সন্ন্যাসীর সরলতায় বুকে-পেটে সরাসরি চালিয়ে দিলেই হল । হোক না পরে প্রমাণ, ওটা মিস ফায়ার । ভয় নেই, কিন্তু ভরসাও বা কোথায় ? কী আছে আমার ? পাক্কা নিরাপত্তায় প্রতিদিন ক-ত রক্ত বড়ি ছেড়ে ছোপ ছোপ ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে । কত সহজলভ্য হয়ে গেছে অস্ত্র । ডিম, লবণ, আদা কেনার মতোই চাইলেই নোটের বদলি চলে আসবে । এই তো, সেদিন কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল, বুকে পেঁচিয়ে স্রেফ কয়েকশো মানুষের মাংস, খুলি হাড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় । অনেকে টেরই পাবে না, কেন রকেটটা ফাটল। কিন্তু বিভু আচমকা টেলিফোন কেঁদে ফেলল কেন ? ওর শান্ত পৃথিবীতে কি নিধন-ক্রীড়ার ছায়া পড়েছে ? কোত্থেকে ফোন করল ? ইস জিজ্ঞেস কারর দরকার ছিল । কোত্থেকে ? পৃথিবীর কোন দেশ-কালের অংশ থেকে ?

মনকুমার বাইরে এসে দাঁড়ালেন । তাঁর ছিমছাম দোতালা বাড়িটির চারপাশে ঘিঞ্জি বসতির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস । এখন দুপুর একটার নানা কথাবার্তার টুকরো শব্দ উঠে আসছে । কারো কলগোড়ায় বালতি রাখার ঠকাস কারো ফ্ল্যাট-ফোকর থেকে ময়লা ফিকবার ঝপাস, কোথাও জোরে জোরে কড়াইতে ছ্যাঁক ছোঁক, ভটভটির মেজাজি শব্দ, কারো নতুন প্লাস্টারের জন্য মিস্ত্রি কলস্বর, হঠাৎ কোথাও উলুধ্বনি জেগে ওঠে, টিভির বাজনা, বালি সিমেন্টে মাখন্ত

কোদালের খর খর, কাউকে নাম ধরে ডাকার আওয়াজ, কাঠ-ভ্যানের প্যাঁক প্যাঁক, কাগজকুড়োনির পাছায় পাছায় কুকুরের তারস্বর, কখনো ঝগড়ার টুকরো অংশ । এইসব ঘিরেই বাতাস বইছে এখন । কখনো এক আধটা কাক গলা ফাটিয়ে ডাকে, সেফ্‌টি ট্যাঙ্কের দুর্গন্ধ ছোটে, কারো প্রেশার কুকার থেকে মাংসের গন্ধ ছিটকে আসছে । সবকিছু নিয়েই সবার বে-খেয়ালে সূর্য একটু একটু টাল খায় । আসলে হেলছে যে স্বয়ং পৃথিবীটাই, কে বোঝে চট করে ! নইলে তো ইতিহাস গড়াবে সূর্যকে নিয়েই ।

ফোন-বুথ থেকে বেরিয়ে বিভু আর বাস ধরল না । হেঁটে এক কিলোমিটার দুরে রেল স্টেশনে । তারপর মুন্সীদের স্টেশনে নেমে তাঁর বাড়ি । মনকুমার তো ফোনে জানিয়েই রেখেছিলেন, তার ওপর বিভু তো ভালো-ভালো কথা কইতে জানে । নানা প্রসঙ্গে । মুন্সী কেন প্রভাবিত হবেন না ?

মনকুমারের বিস্ময় বিভু সেদিন লেখাটা নিয়ে এল না । চার-চারটে দিন এভাবেই চলে গেল । ক্ষোভ, হতাশায় গোল্লায় যাওয়া সমস্ত 'ক্যালাস' প্রজন্মে । ওপর ক্ষেপে মনকুমার ঠিকই করলেন, ওই লেখাটি ছাড়াই নির্দিষ্ট তারিখে বই বার করে দেবেন । ভাড়া করা হলের কর্তৃপক্ষ তো কোনো ওজর শুনবে না । এই চারদিনের মধ্যে অধ্যাপক নিজে বিভুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারতেন, কিন্তু যাবেন না তিনি । অহং-এ বাধছে, চুক্তি ভাঙার জন্য উপেক্ষার চিহ্ন হিসেবেই যাবেন না । যদি বলত, পারব না মুন্সীর বাড়ি যেতে-ল্যাটা চুকে যেত । নিজে গেলে একবেলা আড্ডা ও আহারাদির বিনিময়ে সময়টা মন্দ কাটত না । এত দৌড়ঝাঁপ করছেন প্রতিদিন এটুকু সময় বার করে নিতে অসুবিধে ছিল ? ভেবেছিলেন, কৃতজ্ঞতা হিসেবে বইতে বিভুর নামটুকু ভূমিকায় ঢুকিয়ে দেবেন । ছেলেটিকে খুশি করা যাবে । অপ্রত্যাশিত খুশি করলে নিজের মধ্যেও শ্লাঘা বোধ হয় । তৃপ্তি পাওয়া যায় । কিন্তু বিভুর নতুন দায়িত্বজ্ঞান জানতে পেরে ভাবলেন, কেন স্বীকৃতি ? কেউ কাউকে স্বীকার করবে না, উত্তাপ দেবে না, যার হুঁকো তারই টান —একটি নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্যবাদ যেন । পৃথিবী যত পুরণো হচ্ছে, এমন মানুষই উৎপাদিত হয়ে চলেছে গাদায় গাদায় । মনকুমার স্থির থাকতে পারেন না । সত্যিই বিভুর কিছু অমঙ্গল ঘটলে ওর বউ ছেলেপুলেরা এসে যদি কৈফিয়ত চায় ? ওরা তো জানে, বিভু খানিকটা শান্তি পায় মনকুমারের কাছেই । এ বাড়ি খানিকটা মানসিক আশ্রয়স্থল তার । আমি নিমিত্ত হয়ে গেলাম ? কোথায় পাঠিয়েছিলাম ? কেন পাঠিয়েছিলোম ? খুনির সঙ্গে আমার কোনো যোগসূত্র আছে কি না —অনেক সন্দেহই তো জেগে উঠবে । আজ পৃথিবীতে কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নন । তখন যদি বৃহৎ কোনো লুকানো কেলেঙ্কারির গাড্ডায় পড়তে হয় ?

এরপর, আরও তিনটে বিকেল পেরিয়ে পরদিন দুপুরে মনকুমার যখন এলাকার কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছিলেন, বেয়ারা ঢুকে খবর দিয়ে গেল, বাড়ি থেকে স্ত্রী'র জরুরি ফোন ছিল, পিরিয়ড সেরে উনি যেন রিং-ব্যাক করেন । তা, শুনেই মনকুমার বাকি সময়টুকু ভীষণ অস্বস্তিতে কাটালেন ।

ফিরেই, টেলিফোনের বোতামগুলো দ্রুত টিপে যেতেই, ধরল চিত্রা ।

—কী ব্যাপার ? ফোন করেছিলে ?

--বিভু ঘরে উঠে বসে আছে । চিত্রার গলা গম্ভীর, চিন্তিত ।

---কখন ?

-----তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর-পরই ।

---কেন বসে আছে ? কী ? বলেছে কিছু ?

----কিছু বলছে না ।

-----ফোনটা ওকে দাও ।

মনকুমারে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, একটু ঝামটে দেওয়া দরকার । ভালোমানুষিতে পেয়ে বসে নইলে ।

এরপর আসা-যাওয়া ছেড়ে দেবে বিভু, দিক । ক্ষতি নেই । ক্যালাস গোরুর চাইতে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো । এ কী ছেলেমানুষি ?

বিভু ফোনে বলে —হ্যালো, মনকুমার দা ।

যেন পুরণো দিঘির গভীর জলশয্যায় শুয়ে কেউ কথার বুড়বুড়ি কাটছে ।

----কী ব্যাপার ? লেখাটা ? এনেছ ?

--আমার বাড়িতে আছে ।

----তোমার বাড়িতে ? কেন ?

---কাউকে পাঠিয়ে দিন, পেয়ে যাবেন ।

---তুমি যাবে না ? কী বলছ যা-তা ।

--বেরোলেই পেছন থেকে মার্ডার ।..... পারব না দাদা...... কিছুতেই না ।

---সত্যিই কি লেখাটা এনেছ ? খোলসা করে বলো তো ?

মনকুমার ঝাঁঝিয়ে উঠতেই বিভু শান্ত জবাব দেয় ---এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন কাউকে আমার বউয়ের কাছে আমার বিছানার তলায়, সাদা খামে—না, না আমি বেরোলেই খুন হয়ে যাব । লেখাটা যে বয়ে এনেছি, ওরা টের পেয়ে গেছে ।

---কাকে এখন পাঠাব ?

মনকুমার রিসিভার রেখেছিলেন, বুঝে নিয়েছেন বিভু সঠিক কিছুই জানাচ্ছে না ।

এক ঘন্টা পর । টেলিফোনে মনকুমার, চিত্রাকে ।

---হ্যালো, বিভু গেছে ?

----না ।

---করছে কী ?

---তোমার পড়ার ঘরের মেঝেতে বসে ঝিমুচ্ছে ।

---মেঝেতে কেন ?

---ওতেই নাকি স্বস্তি পাচ্ছে ।

----চলে যেতে বলো এখন । শুনিয়ে দাও, ফিরতে আমার রাত হবে ।

---আ-মি পারব না । ..... উটকো উৎপাত । চিত্রার ক্ষোভ চাপা থাকে না, তুমিই তো মাথায় তুলেছ ?

আরও এক ঘন্টা পর ।

---হ্যালো, গেছে ? মনকুমার বিনীত কণ্ঠে জানতে চান ।

----না । তোমার সঙ্গে দেখা না করে উঠবে না বলছে ।

চিত্রার নতুন কোনো অনুযোগের ভয়ে মনকুমার দ্রুত রিসিভার নামিয়ে দিলেন ।

এবার বেলা তিনটায় ।

-----গেছে ? কী-গো ?

----না ।

---চান-খাওয়া করবে না ও ?

-----তুমি খবর নাও ।

------কী করছে, ঠিক বলো তো ?

-----ভয়ে শুধু ভেতরে কাঁপছে । চোখমুখ আতঙ্কগ্রস্ত ।

---বলেছ খাওয়ার কথা ? বলোই না । দেখতে খারাপ লাগছে । I feel for him !

------বলেছিলাম । বসতে রাজি নয় ।

---জোর করে দু'টো খাইয়ে দাও, ছুটি হলেই আমি যাচ্ছি ।

ছুটির অনেক পর, সন্ধ্যাটি বেশ উতরে দিয়েই মনকুমার বাড়ি ঢুকলেন । ভয়ে-ভয়ে কুণ্ঠিত ভাবে । সারাদিনের উটকো উৎপাতে চিত্রা নিশ্চয়ই বারুদ হয়ে আছে । হয়তো, গ্যাস জ্বালিয়ে গড়ানো দুপুরে নতুন করে ভাত ফোটানো হয়েছিল ! ঠিকমতো খোলামেলা গড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারেনি । তাই খানিকটা বউয়ের ভয়েই লেট করে ঢুকলেন ।

----গ্যা-ছে ?

উত্তরে চিত্রা মনকুমারের মুখটা নীরবে জরিপ করতে থাকে । তারপর অপ্রত্যাশিত শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় --পৌনে চারটায় । তা-ও যেতে চায় ? মিছে ক'রে বললাম, ছোটমেয়ের স্কুলে যাব ...... বড়দি ডেকে পাঠিয়েছেন ..... ।

----তারপর ?

-------আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল ..জোর করে এড়ালাম ।

-----শেষে গেল কোথায় ?

---জানি না । বললে , স্টেশনে গিয়ে বেঞ্চে বসে থাকবে ...রাতে তোমায় ফোন করবে ।

---আবার ? কখন ?

---দশটা -এগারোটা, কি বারোটায় ।

সুতরাং ঘড়ির যাত্রাধ্বনিতে মনকুমার সুস্থির থাকতে পারলেন না । প্রতিমুহূর্তে রিং রিং ধাতব শব্দের আশঙ্কা গুণছেন । কিংবা দরজা ঠেলে বিভুর ওই মুখটি । কিন্তু পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে মনকুমার ছাড়া পাবেন না । পুলিশ এক-আধবার ঢুঁ দেবেই । খুন কিংবা সুইসাইড -----যা-ই ঘটুক না কেন, রাষ্ট্র প্রথমেই এখানে খোঁজ নিতে আসবে । তা ছাড়া, বিভুর বউ ও দুই ছেলে আছে । বড়টি তো মনকুমারের কলেজের ছাত্র । স্যারের সঙ্গে বাপের সম্পর্কটা জানে।

হঠাৎ মনকুমার দেখতে পেলেন, তাঁর লেখার টেবিলের তলায় একটি ব্যাগ ঠেকনো দেওয়া । নিরীহ অথচ সন্দেহজনক ভঙ্গি ।ইদানীং দেশে-দেশে বিপুল হিংস্রতা এভাবেই অন্তরালে ওৎ পেতে থাকে । পথে ঘাটে, ট্রেনে, ব্যবসা কেন্দ্রে, এমনকী, পবিত্র মন্দির-মসজিদেও ।

মনকুমার অস্থির হতে থাকেন । বিশ্বাসের সকল সম্পর্ক জট পাকিয়ে যায় । ভীষণ সন্দেহ জাগে । বললেন ---ব্যাগটা কার ?

চিত্রা ততোধিক নিশ্চিন্তে --বিভুর । রেখে গেছে ।

---কেন ? কী আছে ওতে ?

----জানি না ।

-------জানি না মানে ? বাড়িতে বসে ছেঁড়ো ?

— ইতরের ভাষা বলছ কেন?

---এতক্ষণ ধরে একটা বাইরের ব্যাগ ঘরের মধ্যে, খুলে দেখোনি ? অ্যা-ত ক্যালাস ?

অধ্যাপক আর্তনাদ করে উঠলেন । দ্রুত ওটার চেন খুলতে টানাটানি শুরু করলেন । ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য বিভুর কোনো কৌশল না তো ? স্নেহ ভালোবাসাই তো আজকাল নিরাপদ ব্ল্যাকমেইলিং।

যদিও তিনি ব্যাগটা খুলে দু-দু'টো কলম, একটা পুরণো বছরের ডায়েরি, বারো আনা পয়সা, অ্যানাসিনের একটা পাতা, এলোমেলো লেখার টুকরো কাগজ তুলে আনলেন, মনকুমার স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাকে ফাঁসাবার জন্য ব্যাগের নানা কুঠুরিতে গোপন হয়ে আছে ড্রাগের প্যাকেট, বন্দুক, সাইকেলে বসা সেই কঠিন মুখের মানুষটার বুকে চেপে ধরা রকেটের এক-আধটা, ঘড়ি লাগানো টাইমবম্ । একটি লোলিত পৃথিবীর ছবি, এবং একটু বাদেই বিভু পুলিশ নিয়ে ঢুকবে।

দশটা ---এগারোটা ---বারোটা ---একটা । বিভুর কোনো টেলিফোন না পেয়ে ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়লেন মনকুমার । সারা রাত মানুষটার কী হল ? ভোরে ছেলে-মেয়েরা বাড়ি না ফেরা বাপের জন্য হাজির হয় যদি ? অভিযুক্ত করে যদি—কেন পাঠানো হয়েছিল ? কিন্তু মুন্সীর সেই লেখাটি কোথায় ? যেখানে নতুন শতাব্দীর ইঙ্গিতগুলো আছে ? সত্যিই বিভু কি সংগ্রহ করেছিল ? এদিকে যে হলঘর বুক করা হয়ে গেছে ।

পরদিন বেলা দশটায় অকস্মাৎ বিভুর ছেলে অর্থাৎ ছাত্রটির ফোন ।

তাদের বাবাকে পাওয়া গেছে ।

—কোত্থেকে ?

—স্যার, কলকাতার রাস্তা থেকে ।

—কলকাতা গেল কী করে ?

ছেলেটি বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দেয় —স্যার, ঔষধগুলো মাস কয়েক বন্ধ ছিল তো !

—কোনো লেখা এনেছিল ? বিছানার নীচে ? মাকে জিজ্ঞেস করো তো ?

—বোধ হয় ।

—সাদা খামে .....

সামান্য খোঁজ নিয়ে ছেলে জবাব দিল —হ্যাঁ, স্যার ।

—এক্ষুণি ওটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে ?

ছেলেটি ইতস্তত করতে, মনকুমার বললেন —রিকশায় যাতায়াতের খরচ দেব । লেখাটি জরুরি ।

চল্লিশ মিনিট পর ছেলেটি লেখা পৌঁছে দিয়ে গেল । খুলেই অধ্যাপকের মুখে এক প্রকার টানাপোড়েনের মুক্ত স্বস্তি ফুটতে থাকে । রিকশায় মোট ষোলো টাকা হয়েছিল, মিটিয়ে দিলেন । ছেলেটি শুধু বলল, বাবাকে নাকি অবিচ্ছিন্ন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ।

ও চলে যেতেই মনকুমারের খেয়াল হল ব্যাগটার কথা ভুলে গেছে । যথাস্থানে আছে ওটি। বিপজ্জনক সন্দেহটি ফের মাথা চাড়া দিল । বুকে চেপে রকেট গণ্ডাখানেক, ড্রাগ, আতঙ্ক, রাইফেল, সুইসাইড স্কোয়াড, ওলখেতের মতো মাইনের চাষ —বিকল্প পৃথিবীর সম্ভার নিয়ে ব্যাগটা কী ভীষণ নিরীহ নিশ্চিন্ত । কিন্তু মনকুমার এখন লেখাটি পড়ায় ব্যস্ত । স্বামী-স্ত্রী বাল-বাচ্চা, আশা-নিরাশা, রংবাহারি মানুষের বিপুল প্রবাহ নিয়ে যে নতুন সহস্রাব্দ, তারই কথা আভাস-ভবিষ্যৎ মুন্সীবাবু পনেরো পাতার শত শত অক্ষরে বেঁধে দিয়েছেন । প্রেসে ছুটতে হবে এক্ষুণি ।

হঠাৎ লেখাটি বাতাসে আঙুলে ফসকে উড়তে উড়তে ভাসতে ভাসতে ওই নিরীহ লোলিত ব্যাগটির মধ্যে স্যাট করে ঢুকে গেল । মনকুমার ঘরের চারদিকে কাউকে দেখতে পেলেন না । বিশ্লেষিত পৃথিবীর অক্ষরগুলো ব্যাগ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষজনকে যে চেঁচিয়ে জানাবেন, হল বুক করা, এক্ষুণি প্রেসে যাওয়া দরকার —হয়ে উঠল না । রাশি রাশি তৎপরতার ঠাসাঠাসি কণ্ঠ রুদ্ধ হতে থাকে ।

মনকুমার তখন বাতাসে হাত-পা ছুঁড়তে থাকেন, কেউ কি এই মুহূর্তে এ-ঘরে হাজির হবে না! এই আশায় ।

নীললোহিত : গল্পসংখ্যা ১৯৯৯

তাই তো খুকু রাগ করেছে

মা,

মিছে রাগ করছ আমার ওপর । চাইলেই কি হুট-হাট যেতে পারি আগের মতোন ? তোমার মান্তা কি আর সেই মান্তা আছে ? তারও বয়স্ ৪৬ বছর হল । সতেরো মাস ধরে কীভাবে আমরা সংসার চলছে, কোনো ঢাক গুড় গুড় নেই — দেশ দুনিয়ার সকলের জানা । তোমাকে বার বার গাওনা শুনিয়ে কী লাভ ? দুঃখই পাবে কেবল ।

তোমার কোমরের ব্যথা এখন কেমন ? কীভাবে পিছলে পড়ে গেলে বাথরুমে থেকে ? ধারেকাছে ছিল না বাড়ির কেউ ? থাকবেইে বো কী করে ! বউদির ইস্কুল, বড়দার অফিস । নাতি-নাতনিদের ডাকতে পারলে না ? বুলু, শেখর কী করে ? মাথায় তো কম হল না, দিদাকে দেখভালের বুদ্ধি কবে হবে ?

থাক, আমার ইতিহাস নাই বা শুনলে । আগে তবু ফোনটা ছিল ----খবর নিতে পারতাম । সে অপদবালাই গেছে ! সংসারের আরও কিছু তুলে দিতে হয়েছে — শুনলে হা হুতাশ করবে ---থাক ।

তোমার জামাইয়ের শীরর ভালো নেই । চেহারা খুবই খারাপ হয়েছে । গায়ের সেই রং নেই । পুঁজি ভেঙে আর কদ্দিন চলে ? মাস দুই ধরে শান্তিপুর, ফুলিয়ায় তাঁতির বাড়ি থেকে সরাসরি শাড়ি আনে, বিক্রিবাটা হলে থাকে কিছু ।

কেন যাব বলে তো তোমাদের কাছে ? বড়দো বউদি ক' দিন উঁকি দিতে আসে ? সবাই ব্যস্ত আর মান্তার সংসারটাতেই অঢেল সময় । যাক পাকে পড়েছি, সব্বাইকে ভগবান উপদেশ দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে । ভালো । যদি পথে নেমে ছেলে-মেয়ে সহ আমাদের ভিক্ষে করতে দেখলে সবার জ্বালা মেটে, তাই করব ।

ফোন কেটেছি, দুধ তুলে দিয়েছি, সংসারে কাজের লোক নেই, সোনাদানা, টেবিল-চেয়ার, ফ্রিজ বেচেছি । ভাগ্যে থাকলে ফের সব হবে । টিভিটায় হাত দিইনি । গাধার খাটুনি আর দুশ্চিন্তার পর মনটা তবু হালকা হয় । তাতেও শেষরক্ষা না হলে, বেচে দেব । তবে কোয়ার্টার ছাড়তে হয়নি এখনও । লাইন-কোয়ার্টার জল-ইলেকট্রিসিটি কাটাতে গিয়ে মালিকেরা ঝামেলিতে পড়েছিল, আমাদেরটায় মতো ঝাঁটা -লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়তে পারব না ।

শোনো মা, এ বয়সে চোট খুব খারাপ । বাতে ধরলে সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে । কে হাগাবে-মাতাবে ? বলছিলাম চিকিৎসা ঠিকঠাক হচ্ছে তো , নইলে মেজদি বা তুফানকে জানিয়ো । তুফানের দেওর নাকি নামকরা ডাক্তার ।

আমি পাল্লে, একদিন তোমায় দেখে আসব । আজকাল সেলাইয়ের অর্ডার মেটাতে কোমর ভেঙে যায় । আবার বেরুতেও হয় । পেটে টান পললে অনেকে অনেক খারাপ কাজই তো করে । অতি সামান্য গতর খাটুনি দিচ্ছি । লজ্জার কিছু নেই । কী বলো ? তবে তোমার জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা কেঁদে উঠে । এই কি কপালে ছিল ? যে মানুষটা টাই পরে ল্যাবরেটরিতে কেমিস্ট হয়ে বসত, সে কিনা ট্রেন বাস করে তাঁতিপাড়ায় টো-টো করছে, ব্যাগে কাঁধে ছুটছে আপিসে আপিসে !

তার উপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা । মাস দুই হল ওকে সুগারে ধরেছে । ২৪০ । তবে মনকে বুঝ দিই ভেবে, ওর দলের কেউ কেউ তো রোদ-জলে মিস্ত্রি খাটানোর কাজ করছে, দোকানে দোকানে মাল নিয়ে ঘুরছে, দেড় দুই হাজারে দিনে বারো ঘন্টা খাটছে প্রাইভেট কোনো কোম্পানীতে । না গেলেই মাইনে কাটা । দু-একজনের তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে । মরেছেও কেউ কেউ । একথা ভাবলে, তোমার জামাই তো ভালোই আছে ।

দীপু এবার টেনে, পিকলু এইটে উঠবে । ছেলে -মেয়ে বড় হয়েছে , সব বোঝেআজকাল । কষ্ট পাই যখন ওর মুখ বুজে থাকে আর ওদের পেছনের রসব খরচা কমাতে বলে ।

দীপুর প্র্ইিভেট মাষ্টারকে ধরেছিলাম । উনি নিমরাজিও ছিলেন । বিনে পয়সার ব্যাচে পড়ানো তার পক্ষে অসুবিধে বলে, শনি-রবিবার বাড়ি যেতে বলেছিল । দেখিয়ে-টেখিয়ে নাকি দেদেব যা বুঝবে না । কিন্তু দীপু যেতে চায় না । বলে, লজ্জা লাগে । নিজে নিজে পড়েই নাকি ভালো রেজাল্ট করবে । মেয়েটা ভীষণ জেদি হয়েছে । পিকুলও । কিন্তু মা, আমি তো বুঝি এ ভছর থেখেই অঙ্ক, ইংরেজী আর সায়েন্স গ্রুপে আলাদা-আলাদা মাস্টার দরকার ।

শোনে মা, পিকুল হওার পর সেলাইটা পচে যেতে সেই যে তলপেটে ব্যথা হত, ইদানীং বেশি হাঁটা-চলতি করলেই চিন চিন করে । রোদ থাকলে তো কথাই নেই । ভীষণ সাদাস্রাব হচ্ছে । সর্বক্ষণ মাথা ঘোরায় । ডাক্তারের কাছে গেলেই একগাদা টাকা । আচ্ছা, তুমি যেন কী একটা পাতার কথা বলতে বিয়ের পরে-পরে ? সাদাস্রবে উপকারী ? মা, এখন তোমার উপদেশ মনে পড়ছে সংসারে একজনকে ডাক্তার বানানো ক-ত দরকার । জানি না, দীপু আশা পূরণ করতে পারবে কি না ! মাথাটা তো খুবই সাফ ওর কিন্তু ভগবান সবার ভালো সইতে জানেন না । যা অবস্থা এখন, সামান্য কঠিন ব্যাধিতে বিনা চিকিৎসায় মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই । ভাবলে শরীরে কাঁটা দেয় ।

যাক যা হবার হবে ! যার জন্যে এ চিঠি লিখছি । কথাটা তুমি বড়দা বউদিকে বোলে । বউদির ইস্কুলটা তো বড়, শুনেছি গত বছর সে অ্যাসিসটেন্ট দিদিমণি হয়েছে । আর বড়দার সি এম ডি-এর অফিসে বহু লোক বড়দা আছেও বড় পোষ্টে । তোমাদের জামাই যদি তাঁতের শাড়ি নিয়ে যায়, একটু বলে-কয়ে দিতে পারবে ওরা ? তবে নগদে কিন্তু । আমার অত পুঁজি নেই । মাসে ১০০শাড়ি বেচতে পাল্লে বাকি সংসার আমি হারিয়ে-গড়িয়ে নিতে পারব ।

আত্মীয়-স্বজনের কাছে টাকাপয়সার জন্য সাহায্য কোনো দিন মুক ফুটে বলিনি। আজকালের দিনে সবার সংসারেই সমস্যা। তাই ওরা একটু বললেই বাধিত থাকব। ১৭ মাস হয়ে গেল। হয়তো এবার, কিছু হবে। না, থাক! দু-দুবার এভাবে বলে ঠকেছি। আর আগ বাড়িয়ে বলছি না। শুনেছি দিল্লিতে ওপরমহলেও কথাবার্তা চলচে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তুমি ভালো থেকো। কোমরের দিকে নজর দিয়ো।

ইতি —

মান্তা

মান্তা

.কল্যাণীয়াসু,

মাকে যে চিঠি লিখেছে, উত্তর পাঠাতে মা আমাকে পড়তে দিয়েছিল। ভালো করেই জানো, ছানি ও দৈহিক অসুস্থতার মার পক্ষে লিখালিখি এখন প্রায় অসম্ভব। তাই, তোমার চিঠি পড়লাম বলে অপরাধ নিয়ো না। বড় বউদির স্বভাবে এমন কুৎসিত কৌতূহল নেই। মান্তা, সংরা থাকলেই দু-মাথায় থাকলেই দু-মাথায় ঠোকাঠুকি হয়। বড় মেজো, তুমি এবং তুফান ---কোনো ননদের সঙ্গেই বড়দা -বউদির সম্পর্কে খারাপ নয়। আমি যথাসাধ্য কর্তব্য করেছি। মানবে কি নাজানি না। কিছু এসে যায় না তাতে। তোমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে কখন কী নিয়ে যে মান-অভিমান হয়, আমার মাথা গলিয়ে কী লাভ?

তোমার দুঃসময়ের জন্য কি আমাদের মন কাঁদে না? ডেকে না বললে বুঝি তা সত্য হয় না? তোমরা পতে ভিক্ষেয় নামলে কাদের জ্বালা জুড়োয়? কী ইঙ্গিত করছ? ছিঃ!

১৭ মাস তোমাদের কারখানা খুলছে না। পুঁজি ভেঙে-ভেঙে খেয়েছে, ঘরের আসবাবপত্র বেচছ একে একে, ভালো মাইনের অমন হাসিখুশির কিরন্ময় এখন রোদে জলে তাঁতের শাড়ি বেচতে দরজায়-দরজায় ঘুরছে ---এটা আমাদের আনন্দ দিচ্ছে? তুমি কোমর বাঁকিয়ে সেলাই করছ, দোকানে অর্ডারের জন্য হাঁটাহাঁটি করছ --এ যন্ত্রণা আমাদেরও।

নিছক শ্রমিক হলে রিকশা, তেলেভাজা, মুটেগিরি বা মিস্তিরির যোগালি খেটে পেটের ভাত জোটাতে পারতে। তোমাদের অবস্থাটা বুঝি, পেটেও সইছে না, পিঠেও বইছে না।

বাথরুমে মা পড়ে গেছল, চিঠিতে লিখেছ বুলু-শেখর কী করে?

হ্যাঁ, আমাদের ছেলে-মেয়েরা মাথায় বড় হয়েছে, বুদ্ধি কম থাকলেও দিদার যত্ন আত্তিতে ত্রুটি করে না। তাতে কি দুর্ঘটনা এড়ায়? মানুষ বিধিলিপি বদলাতে পারে না? ওই বুলু-শেখরই পুরোটা এখন সামলাচ্ছে। আমি তো ন'টায় বেরুই ফিরতে ফিরতে ছটা। তোমার বড়দা চিরকলের অফিস-পাগল। রান্না বা কাজের লোক যেটুকু নয় তাই সারে। মা বারো আনা সেরে উঠেছে কাদের জন্য? ওই বুলু আর শেখর। তোমার মেজদা ছোড়দার বাড়ি গেলে কি মায়ের ভোগান্তি কম হত? তুমি যে ইঙ্গিত দিলে? ওরা কি ছোড়দার বাড়ি গেলে কি মায়ের ভোগোন্তি কম হত? তুমি যে ইঙ্গিত দিলে? ওরা কি ভগাবান? যে-চিকিৎসা ওখানে হত, এখানেও তাই হয়েছে। মেজবউ

তো ফোনেও একবার জিজ্ঞেস করে না মা কেমন আছে ? পাছে ফোনের বিল বাড়ে। দেবা-দেবী মিলে ২২/২৩ হাজার টাকা মাসে কামায় তো —ভীষণ গরিব ! যাক তিক্ততা পরিহার করাই ভালো।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন হোক। সত্যি, আজকাল কোনো সংসার অন্য সংসারকে মাসের পর মাস টানতে পারে না। বাইরে যার যত আয়, ভেতরে খরচটাও তত বেশি। তবু তোমাকে বলছিলাম, যদ্দিন তোমাদের কারখানা না খুলছে, আমি দীপু বা পিকলু —একজনের লেখাপড়ার খরচ বাবদ পাঁচশো টাকা মাসে মাসে দেব। তুমি এসে নিয়ে যাবে। এতে কোনো অনুকম্পা ছিল না। তুমি নিজেই মার মারফত নাকচ করেছিলে। তখন সবে ৬ মাস, আজ ১৭ মাসে পৌঁছল। আমার প্রস্তাব আজও রাখছি। কিচ্ছু মনে করব না। ছেলে-মেয়েরা হোক—তুমি যেমন চাও —আমরাও কম কামনা করি না। তবে তোমরা বড়দা এবং আমি কদিন তোমার ওখানে উঁকি দেই —এ অভিমান করলে আমি করলে আমি অপারগ। হপ্তায় একদিন ছুটি, বাকি দিন ন-দশ ঘন্টা বাইরে কাটাই, রাস্তাঘাট ট্রেন-বাসের অবস্থা জানো, তা ছাড়া এ-অবস্থায় এককাপ চা খরচাও তোমার ঘাড়ে চাপানো অন্যায় মনে করি আমি।

শুনলাম মেজদার কাচে লিখেছ, গদরজেরে আলমারিটা বেচে দিচ্ছে জেনেও বড়দা নাকি চুপ করে ছিল। আমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানি না তোমার সংসারের কী কী বেচা শেষ, আর কী কী পড়ে আছে। এসব ছোটখাটো ব্যাপার। তবে তুমি নিশ্চয়ই ভোলনি, কারখানা বন্ধের ঠিক এক বছরের মাথায় কিরন্ময়ের মনের অসুখ ধরে মারাত্মক কিছু ঘটিয়ে ফেলার আশঙ্কায় তোমার বড়াদার ছোটাছুটি। দিনের পর দিন অফিস ছুটি নিয়ে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখায়নি ? কারও জন্য কিছু করে বলে বেড়ানো ঠিক নয় —প্রসঙ্গ উঠল বলে জানলাম।

তোমার পেটে ফের ব্যথা, সাদাস্রাব হচ্ছে —এজন্য টোটকায় আজকাল লাভ নেই। একদিন পারলে এ-বাড়িতে এসো—আমার কলিগের বর নামকরা গাইনি —বিনে পয়সার ভালো করে দেখিয়ে দেব। আর সুগারের জন্য কিরণকে নিয়মিত মেথির গুঁড়ো খেতে দিয়ো। এ-দিন থাকবে না তোমার, কিন্তু মুখের কথাগুলো থেকে যায়।

এবার অন্য প্রসঙ্গে জানাই। কিরণ আমার স্কুলে আসবে —ভালো কথা। কিন্তু বেকারি আর কারখানা বন্ধ তো হামেশাই ঘটছে। শাড়ি, আচার, চানুচুর, জ্যাম -জেলি —টিচার্স-রুমে আনগোনা লেগেই আছে। দিদিমণি তিতিবিরক্ত। গছিয়ে দিয়ে দশ-বারো কিস্তিতে টাকা পেলেও সই। সেখানে কিরণ আসবে —আর দশজনের মতো ব্যবহার পাবে —এটা ঠিক চাই না আমি। আর তোমাদের তো নগদা-নগদির কারবার।

বরঞ্চ সামনের পুজোর জন্য, খান তিনেক শাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো, আমি কিনে রাখব। আমার দরকার ছিল না তবু তোমাদের তো উপাকারে আসবে ! শুনছি তুফান এবার ছেলের পৈতে দেবে। নিশ্চয়ই তোমার কাছে যাবে। মা এখন অনেক ভালো। ভীষণ খিটকিটে, মেজাজ হয়েছে। যদি মনে কিছু না করো, , টেস্টের পরও যদি কারখানা না খোলে, মাস দুই দীপু আমার কাছে থাকতে পারে। সায়েন্স গ্রুপটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

মান্তা তুই মিছে অভিমান করছিস । তোর মঙ্গল সবসময় কামনা করি আমরা । কারও ওপর রাগ নেই আমাদের । জানি, বড়কেই সব সইতে হয় । ভালো থাকিস ।

ইতি —

বড় বউদি

কিরন্ময়,

শুনলাম সুগারে ধরেছে । ২৪০ । সোনায় সোহাগা । অসুখের আর দোষ কোথায় ? সাবধানে থেকো, এর বেশি কী আর বলতে পারি । মান্তা একটা পাগলি । মা কি শুধু ওদের? বড়দার কেউ নয় । বুড়ো বয়সে কোমরের চোট কি সহজে সারে ? যথাসাধ্য চেষ্টা তো করছি । নিখিল কিংবা অমিতের বাড়িতেই উঠলেই সেরে যাকেব ? তিন মাস ছিল তো কোমর চোটের আগে ? শেষে ছুটে পালিয়ে আমার কাছে এসেছে !

দ্যাখো কিরণ, তুমি শাড়ি নিয়ে এলে অপিসে বিশ-ত্রিশ পিস যে বেচে দিতে পারব না--তা নয় । সেটুকু এলেম শিবু মুকুজ্জে রাখে । পঁচিশ-তিরিশটা কনট্রাক্টর তো আছে যারা এই অধমের চারপাশে ঘুরঘুর করে । ব্যাপার কী জানো, পরে ওরা ফায়দা লুটবে মুখুজ্জে সাহেবের কাছ থেকে। বিশ্বপাজি, হারামজাদা, এক একটি মাল--এই কনট্রাক্টরগুলো । মলিক খারাপ --এ কথা অবিশ্যি প্রায়ই রটছে । রাজনীতি চলছে ভাই । দিতে-হবে করতে হবে বলে দেশটার বারোটা বাজিয়ে দিল। বোনাস, দাবিদাওয়া কথায় কথায় স্ট্রাইক — দেশটাকে খলখলে করে দিল । কোমো কারখানা থাকবে না এদেশে । ইউনিয়ন ভূতটাই খেল সব । মালিক গাঁটগচ্ছা দিয়ে মিল খুলবে কি ইউনিয়নের চোখরাহানি সইতে ?

তোমাদের ফ্যাক্টরির চাকরি একসময়ে রাজার হালের চাকরি ছিল । খোদ ইওরোপীয় আদব-কায়দা । একচেটিয়ে বাজার । কী করে ফেলেছে আজ ? কাজ করব না, ঝাণ্ডাবাজি করব ---দিনের পর দিন চলতে পারে না এটা । মালিককানার বদল ঘটবেই, বিদেশী মালিকরা ঢুকবেই ভাই, তারা তো ব্যবসা করতে এসেছে, সাধু-পুরুষ নয় ---- তবে ? এই যে ১৮ মাস বন্ধ হয়ে আছে, ইউনিয়ন কোনো শ্রমিক-দরদের পরিচয় দিচ্ছে ? মরলে মরল, বাঁচলে বাঁচল-- নেতাদের কী ! শালা ! কথায় কেবল খই ফোটায় ! গ্যাট, বিশ্বব্যাংক, রিপর্ম --বড় বড় বুলি কপচানো । মানুষ একশোবার ভোগ করবে, বাজারে কমপিটিসনে নামবে। এমনি এমনি উন্নতি হয় ? পাঁচটা দেশ এগিয়ে গেছে কি শুধু বুলি ঝেড়ে ?

এবার তোমাদের চোখ খুলল তো ? ফ্যাক্টরি খোলা মাত্তর তুমি ভি আর নিয়ে নিয়ো । কারও কথার ফাঁদে পা দেবে না । আমার কাছে খবর , প্রচুর অর্ডার আছে বিদেশে, সরকার খুলবার জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, আরও টাকা দেবে । মালিক কিছুদিন খুলে পাকাপাকি পাততাড়ি গুটোবে। তাদের যে-পথ সুবিধে, তাই তো দেকবে । কে লুটোপুটে খাচ্ছে না ? মালিকরা খেলেই গা জ্বালা? ওদের অনেক ক্ষমতা । তোমাদের ভিখিরি সাজাতে পারে । তাদের কিন্তু দশপুরুষ ঠ্যাং-এব ওপর ঠ্যাং চাপিয়ে খেয়ে যেতে পারবে । তুমি তো মজুরদের মতো ঠ্যালা-রিকশা টানতে পারবে না। এখন যে টাকা ভি আর-এ পাবে,সুদে খাটালেও সংসার চলে যাবে । তুমি একজন সিনিয়র কেমিস্ট-

-এখন না-পাছ ঘরে থাকতে, না পারছ ঘাটে বসতে । সুগার, প্রেসার, হাইটেনশান । ফোন ফিরিজ, আলমারি না হয় বেচলে, দুধও তুলে দিলে, মাস্টার রাখলে না, স্পেশালিস্ট দিয়ে চেকআপ করালে না, কিন্তু দু-বেলা দু-মুঠো ভাত আর পোশাকটি দরকার । যা দিনকাল, চারজন সংসারে কমপক্ষে ছ-সাত হাজার দরকার । নেতারা কিন্তু গাড়ি চড়েই বৈঠকে বসবে ।

যাক শোনো । বড় দাদা হিসবে হুকুম করছি এবার । তোমাদের মনে থাকার মতো মনের অবস্থা নয় এখন । আজ এমন তারিখে ২১ বছর আগে টোপর মাথায় তুমি এ বাড়িতে এসেছিল । মান্তা এখন সেই বড়দার বিরুদ্ধে খোঁচা মেরে চিঠি লেখে । শুনছি, ছেলে-মেয়ে দুটোকেও বানিয়েছে অসামাজিক । সরলতার নেই । কারও বাড়ি যেতে চায় না । ১৮মাসের জন্য কি মামাবাড়ি দায়ী, যাক, বড় বউদির হাত দিয়ে এই চিঠি এবং বিবাহ বার্ষিকীর জন্য নগদ দু-হাজার উপহার পাঠালাম । অন্যভাবে নেবে না । বিপদে আত্মীয়র কাছে আত্মীয় হাত পাতে । এতে কারও হেঁট হয় না । কারখানা বন্ধের তিনমাসের মাথাতেই মনে আছে নিশ্চয় বলেছিলাম তোমাকে আমার পরিচিত একজনের সঙ্গে শেয়ার বাজারে ঘুরতে । কিছু না হলেও রোজ ২০০টি টাকা আসত । তখন নাক উঁচিয়ে রইলে । প্রেস্টিজে বাধল, অথবা হেসেখেলে মাসে দশ-বারো হাজার কামাতে পারতে ।

আমি তো মান্তাকে হাড়ে হাড়ে চিনি । আকট মুর্খ আর মুর্খ আর গোঁয়ারে । রূপটাই ছিল । চিরকালের নাক উঁচু । ওর কপালেই যে এত লাঞ্ছনা —ভাবলে খুব খারাপ লাগে ।

আচ্ছা, আজকাল তো ছোটখাটো অনেক ল্যাবরেটরি গজাচ্ছে – সেখানে কেমিস্ট-এর চাহিদা আছে । তুমি নিয়মিত স্টেটস্‌ম্যান রেখো । ওখানে বিজ্ঞাপন দেয় । কাগজের খরচা আমি দিয়ে দেব ।

সুগার বড্ড পাজি । দুশ্চিন্তা করবে না । রোজ তেতো খাবে । হ্যাঁ, টেস্ট তো হয়ে গেল, দীপুকে কি পাঠাবে এখানে ? বড় বউদি জিজ্ঞেস করছিল । মান্তাকে জানিয়ো, বড়দা হিসেবে চিরকাল আশীর্বাদ জানাব ।

ইতি —

বড়দা

মেজদা,

তুফানের ছেলের পৈতেতে যেতে পারিনি বলে, সব্বাই কি আমাকে বয়কট করলি? গত ছ'মাস বাপের বাড়ির কারও খোঁজখবর নেই। হ্যাঁ, আমি তো সুখে শান্তিতে টইটম্বুর, আমার না-যাওয়াটা তাই অপরাধের। সত্যিই তো কেন ক্ষমা করবি? আমার তো মন-টন নেই যে পুড়বে। বড়দা বলেই দিয়েছে আমি মুখ্যূ গোঁয়ার, আমার ছেলে-মেয়েরা অসামাজিক। ১২ আর ১৫ বছরের দুধের ভাগ্নে-ভাগ্নি নাকি বড্ড খারাপ। তেমন দিন থাকলে, কেঁদে বুকটা হালকা করতাম। আজ বুঝি, সে সময়টুকুন বাড়তি সেলাই করলে দুটো পয়সার মুখ দেখব। তোদের মান্তা নেই, তোদের মান্তা মরে গেছে, কাকলি গাঙ্গুলি সুইসাইড করেছে— কাগজে দেখবি একদিন।

যাক্, বড়দাকে বলিস, রোদে টইটই করে শুকনো মুখে তোদের সম্বন্ধীর চিঠি পড়ে খুশি হয়েছে। ও বেশি কথা তো বলে না। কোনো দিনও বলত না। তবু আমাকে জানাতে বলেছে, দিতে হবে মানতে হবের মধ্যেও বন্ধের আগে-আগে মালিক শতকরা ৩৪ পার্সেন্ট নেট্ মুনাফা করেছিল, সরকার সাহায্য দিচ্ছে, পি.এফ., ই এস আই এর টাকার হিসেব নেই, তবু যে খুলছে না—এটা নিশ্চয়ই দেশভক্তির লক্ষণ।

আমি মেয়ে, অতশত বুঝি না। কিন্তু তোরা কেউ জানতে চাইলি না কেন তোদের জামাই একবার পুলিশ হাজতে কাটিয়ে এসছে ক' দিন আগে? খবরে বলেনি?

বড়দার উপদেশে ছোটখাট একটা ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিল। মাত্তর দু-হাজার টাকা—দশ ঘন্টা ডিউটি। তাই সই! গ্রহের ফের কে জানত! নামি কোম্পানির লেবেল ছাপিয়ে আড়ালে যে দু-নম্বরি বিজনেস্, বঝিবে কার বাপের সাধি! একদিন হঠাৎ পুলিশ-হানা! মালিক উধাও। পাঁচ-সাতজন কর্মচারীকে ধরে এক রাত হাজতে। পরে অবিশ্যি মালিকের উকিল জামিন আনে, থানার সঙ্গে রফা হয়।

কিন্তু মেজদা, বিয়ের পর-পর এই কোয়ার্টারে এসে বাপের বাড়ির সব্বাই বলেছিলি মান্তাই নাকি কপাল করে এসেছে। বর-ঘরের তুলনাই হয় না।

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে, হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে কে উঠেছে, কিরন্ময় গাঙ্গুলি নাকি কোনো পোড়া কাঠ, প্রথমটা চিনতেই পারিনি। এমনিতেই আমাদের স্টাফ্ কোয়ার্টারগুলো এখন ভূতের মতো। ঝুল জঙ্গল পাখির বাসায় ছন্নছাড়া চেহারা। জল আর ইলেকট্রিসিটি এখনও কাটতে পারেনি শুধু, বাকি সব গোল্লায় গেছে। ছাদ খসে পড়লেও কেউ সারিয়ে দেবে না। প্রথম প্রথম কান্না পেত, এখন সয়ে গেছে। দু-একজন অফিসারের পউ তো—কী বলব তোকে, শুনে মাথা হেঁট হয়ে যায়। দুয়ব কাবে বল?

যাক, মাকে শুধু গোপনে একটি কথা জানাবি। আমি কোনো আত্মীয়কে আগাম বলতে চাই না। সামনের মাসের দু-তারিখ ফ্যাক্টরি খুলছে। এবার মনে হচ্ছে পাকা। হালে অবিশ্যি কাগজেই জানতে পারবি।

আমার কোনো আনন্দ, দুঃখ, উচ্ছ্বাস, ব্যথা, বেদনা, লাফিয়ে ওঠা— কিচ্ছু নেই। খুবি ক্লান্ত হয়ে গেছি, মেজদা! বুঝেছি, মানুষের জীবনে এগুলো তেমন আর একান্ত গোপন নেই। খুব ছোট অর্থে থাকে বটে, বড় করে দেখলে ব্যক্তিগত বলে কিছু হয় না। হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। আজ ২১ মাস হতে চলল। কী যে ছ্যাঁকা গেল ভেতর-ভেতর!

মারি ছানি পাকলে, তোরা একটু খোঁজখবর নিস। কারও ভরসায় ফেলে রাখিস না। বুড়িটা আর ক' দিন বাঁচবে!

ইতি—

মান্তা

সামনের মাসের দু-তারিখ, খুব ভোরে কাকলি গঙ্গুলি বিছানা ছাড়ল যখন, পৌনে চারটের

মতো হবে। দু-চারটে কাকের ডাকাডাকি, লোক চলাচলের ইঙ্গিত, কাশির শব্দ। দোতালার নীচেই ঝোপড়-পাড়ার শুয়োরগুলো ভোরের নিরিবিলিতে ছায়ার মতো চরছে; পশ্চিম আকাশে ঠিক সিঁড়ির তলায় রাতের চাঁদ ধরা পড়ে আছে। বাতাসে মৃদু নাইলন পোড়া গন্ধ। ২১ মাস সব কিছু বন্ধ রাখা হলেও, অঞ্চলের বাতাস সারারাত ঘুমেয়েও মৃদু ঘ্রাণের এই অভ্যেসটুকু ত্যাগ করেনি।

বুক ঠেলে জ্বালা-জ্বালা ঢেকুর উঠতেই, কাকলি একপেট জল খেল। না হলে বাথরুম ঠিকঠাক হবে না, সারাটা দিন বিশ্রী একঘেয়েমি। চা-টুকু চাই-ই তার এখন। স্টোভটা ধরাতেই কিরন্ময় উঠে বসে। তেলের গন্ধটা সইতে পারে না। মাস্তা বলে—ঘুমোওনি বুঝি সারারাত? সবে তিনটে পঞ্চাশ।

—বা-রে! আবার জিজ্ঞেস করছ ঘুম হয়নি?

—একটা কাজ করো তবে। নীচে টিউবওয়েল থেকে দু-বালতি জল এনে বসবে? ফাঁকা আছে। এক্ষুনি লাইন পড়বে আজ। ....ছ'টার আগে পাইপের জল পাব না, চানটা সারতে হবে। ...চা ভেজাচ্ছি আমি।

কিরণ সবটুকু শোনার আগেই বাথরুমে তলপেট খালাস করল। ইদানিং একটুও সংযম রাখতে পারে না। ফিরে, দুটো হাই তুলে, দুবলা শরীরে বালতি দুটো নিয়ে নীচে। ঠিকই, আজ এলাকাটা সাজো-সাজো। সুতরাং চাপ শুরু হল বলে। সিঁড়ি বেয়ে দ-দু-বারে দু-বালতি জল টেনে কিরণ বুঝল ফুসফুস ভীষণ দরকারি যন্ত্র মানুষের।

ভাঙা মোড়ায়, চায়ের কাপ হাতে একটি ভিন্ন দিনের স্বাদে কিরণ বলে—তালে যাচ্ছই?

—যাব না কেন? সব ব্যাপারে মাথা গলিয়ো না।

—ফার্স্ট ট্রেন, খেয়া, ফের ট্রেন... পুজো দিয়ে ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়াবে এতেই।

—তালে সকালে এখানে থাকছ না? তুমি আর কে যাচ্ছ?

—দাশগুপ্ত গিন্নি।

—গেটের কাছে সকালে কারা থাকবে?

—কেন? একগাদা বউ-মেয়ে আছে। কাল তো মিটিংয়ে ঠিকই হয়ে গেল!

—শুনছিলাম তুমি আর মিত্তিরদার স্ত্রী যাচ্ছ?

—কথা ছিল তাই।

—তালে?

—মিলিদির অসুবিধে আছ। বলেই মাস্তা তাকাল কিরণের মুখে মৃদু রহস্যের চাউনিতে। ঠোঁটের ভাঁজে লুকনো কথা।

—কিছু আছে যেন?

—মিলিদি প্রেগন্যান্ট।

কিরন্ময় মিনিটখানেক রহস্যে, বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বউয়ের দিকে। চোখ দুটো ঘোলা, সবটুকু পিচুটি সাফ হয়নি।

—তুমি হাঁদার মতোই তাকাবে! মান্তা চপল ভঙ্গিতে বসে উঠল।

—২১ মসের মধ্যে? মানে হয়? আচ্ছা-মহিলা তো!

—বেশ করেছে। ওঠা বুঝি মেয়েরা একা একা পারে? শুনলে বিত্তি জ্বলে! কাপটা দাও ধুয়ে রাখি।

কিরন্ময় সাহস নিয়ে বলে—বে-শ! জানা রইল!

—তোমার জানাই রয়ে যাবে! শোনো, গোটা পঞ্চাশ টাকা হবে? এতটা পথ টায়টায় হিসেবে বেরুনো ঠিক নয়।

কিরণ বলে—দ্যাখো পকেটে! ষাট-পঁয়ষট্টিই আছে... পথের আর দোষ কী!

—খুলছে...অগ্রিম দবে না কিছু? তেমন যেন শুনছিলাম?

—না আঁচালে বলি কী করে!

মান্তা দেখল ঘড়িতে চারটে সতেরো। ট্রেন, খেয়া এবং ফের ট্রেন এবং তা খানিকটা দীর্ঘ সময় নিয়ে। বেরিয়ে কাকলি টের পেল, সব শহরেই মানুষের দেখা মেলে পথে। দাশগুপ্ত গিন্নি অনুপমা বেশ চালাকচতুর, কাকলির মতো পথেঘাটে খুব একটা মুখচোরা নয়। তারই ব্যবস্থাপনায়, চা-ফা খেয়ে বেশ জুতসই সিট নিয়ে জানালার ধারে বসা গেল। ২১ মাস দাশগুপ্তর সংসারটা যে সামলানো গেছে, প্রধান কারণ নাকি স্বামী তার অঙ্কে ভীষণ পাকা। 'কোচিন'এর জন্য নাগাড়ে ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসত। আজ থেকে যে কী হবে। এটাই অনুপমার ভাবনা। মাঝপথে ছেলে দিলে অতগুলো ছাত্রছাত্রীর কী হবে!

কাকলি শুধু শোনার ভান করে। সে দেখে দু-ধারে ফাঁকা মাঠ—বহুদূর ফাঁকা এবং ঠাসা নিবিড় ধানের প্রান্তর। এত দূ-র কাকলি অনেকক্ষণ চোখে দেখতে পায় না। ভীষণ অন্যরকম লাগে তার। গভীর শ্বাস উঠে পড়ে বুকের পথে। ভাবে, জীবনে উত্থান-পতন সবারই নিয়তি। দুঃসময় কেটে গেল। কত দেশ, কত মানুষ— কিছুই জানা চেনা হল না জীবনে। ট্রেন ছুটছে। ফের নতুন নতুন দূ-রগুলো মান্তাকে ভীষণ ভরিয়ে তুলছিল।

দাশগুপ্ত গিন্নি অনুপমা, এখন গেটের কাছে, কী কী চলছে—কল্পনার একটি ফর্দ তুলে ধরছে টীকা-টিপ্পনি যোগে। ফিতেকাটা, নারকোল ফাটানো, শঙ্খে ফুঁ, ফুলের মালা, কুচো ফুলের ছড়াছড়ি—এমনকী অনুপমা গোপন খবর পেয়েছিল মেইন্টেনেন্স ডিপার্টমেন্টের পউ-মেয়েরা নাকি আবির কিনবে—অকাল হোলির উচ্ছ্বাসে বৃন্দাবন মথুরা বানিয়ে তুলবে কিন্তু অনুপমা বলে এসেছিল, যেন মনে রাখা হয় রমা এবং পৃথা ২১ মাসে বিধবা বনে আছে। একজনের স্বামী বিষ, অন্যজন গলায় দড়ি। যতই হৈ হুল্লোড় বানাক, ওরা তো ফিরে আসবে না। কা-ক-লি! সে তাকিয়ে থাকে নতুন কোনো স্টেশনের নামের দিকে।

পুজোর ভির এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সেরে, প্রসাদ বিল্বপত্র, পবিত্র পরিধেয় নিয়ে ফিরতি ট্রেনে উঠবার আগে ওরা বেড়ার হোটেলে খেয়েছিল। ভাতের দুটো দামই অনুপমা দিয়েছে। কিছুতেই মান্তা রাজি হবে না, সে টাকা এনেছে সঙ্গে, কিন্তু দাশগুপ্ত গিন্নি নাছোড়বান্দা। ট্রেনে বসে কাকলি

ভাবে এত ভাত সে কী করে খেল। বাব্বা! পেট তো ছিল না তখন, একটা দহন-কুন্ডে কেবল গরাস-গরাস আহুতি। অতিরিক্ত ভাতে কোনো পয়সা লাগে না এখানে। চালের দেশ এটা। ডাল-তরকারি দেয়; শুধু মাছ এক টুকরো একবার। রান্নাটিও ছিল ভারি চমৎকার। গরম এবং ঘরে তৈরি যেন।

ফুটি এ অঞ্চলে খুব সস্তায় মেলে। হলুদ শরীর, ফাটা-ফাটা, ভেতর লালচে। এবার দামটা কাকলিই মেটাল জোর করে। দুজনের হাতেই ঝোলানো প্লাস্টিক। ম-ম গন্ধ বেরুচ্ছে প্লাস্টিক ছাড়িয়ে এবং ফিরতি ট্রেন, খেয়া ও আবার ট্রেন মিলে দুপুর গড়ানোর মুখেই ওরা ফিরে এল।

বোঝা গেল সকাল এলাকায়, ২১ মাস পর বিপুল হট্টমালা গেছে। কারখানা গেটে এখনও ছড়িয়ে আছে নানা চিহ্ন। ঘট, কালাগছি, ফাটা নারকোল, কাগজের রংচঙে শিকল, পতাকা। এমনকি এখান-ওখানে ধুলোতে মাস্তা আবিরের কণাও দেখতে পেল। দু-জনের হাতে প্রসাদের সরা, ফুটি এবং কপালে পবিত্র সিঁদুর।

হঠাৎ দুই ঝকমকে ছোকরা শোঁ করে কাছে এসে মস্ত দুটো নল ধরে জিজ্ঞেস করে—২১ মাস পর দিনটা কেমন লাগছে?

মাস্তা হকচকিয়ে যায়। একটা সপ্রতিভ সে নয়। একবার তাকায় অনুপমার দিকে। ছেলেদুটো রূপের জন্যই বোধহয় কাকলিকে পেয়ে বসেছে।

কাকলি হেসে হেসে বলে— বেশ ভালো লাগছে।

—তাই পুজো দিতে গেছলেন?

—হ্যাঁ। আমরা অনেক কষ্ট করেছি। ...আজকের দিনটা তাই আমাদের পক্ষে খুবই...ভালো লাগছে.... কারখানা খোলায় আমরা খুশি...

—কোনো দাবি নেই আপনাদের?

—কী বলব বলুন তো? দাবি আর কিসের!

—কেন খুশি?

—অনেক কষ্ট গেছে...তাই খুশি, না খেয়ে...অনেক অপমান, লাঞ্ছনা...দুধ...মাস্টারের মাইনে...ছেলে-মেয়েরা অপমানিত...জীবনে এই অবহেলা, কষ্ট, কত যে অপমান...

বলতে বলতে কাকলি সাংবাদিকের প্রশ্নে, খুশিতে, ঘাবড়ে গিয়ে, এলোমেলো সব কিছু জড়িয়ে, পুরনো কথা মনে করে, ঝরঝর কাঁদছে, হাসার চেষ্টা করছে, ভাঙা আবেগে স্বর আটকে যাচ্ছে...শুধু চোখের জলে হাপুস ধারা।

•

সন্ধ্যায় মাস্তা অবাক। চারদিকে থেকে বউ-মেয়েরা এসে জানিয়ে যাচ্ছে টিভিতে দেখা গেছে। আর আজই মাস্তা সন্ধ্যায় ওটা খেলেনি। ভীষণ ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছিল। টিভিতে নাকি তার কথা শোনা গেছে, তার হাসি, লজ্জা এবং চোখের জল দেশের সবাই দেখতে পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। কারণ, ২১ মাস পর, আজকের এই দিনটি ছিল গণমাধ্যমের কাছেও জরুরি একটি সংবাদ।

রাতে কারখানা থেকে ফিরল কিরন্ময়। মাস্তা দ্যাখে, বহুকালের পুরনো যে-পোশাকে মুড়িয়ে কিরণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক ঠিক ফিট্ হচ্ছে না। ভীষণ ঢোলা-ঢোলা, হাস্যকর ঠেকছে। চোয়াল, কণ্ঠা, কাঁধের হাড় আজকের পোশাকটি ফুটে উঁকি দিচ্ছে। অথচ ল্যাবেরেটরির পুরনো কেমিস্ট-এর পদমর্যদায় এ পোশাক পরতেই হবে।

কিরণ রহস্য করে বলে—সব কান্না ঢেলে দিলে? নিজের জন্য রাখলে না কিছু? মাস্তা উত্তর দেয় না। অপ্রতিভ হয়ে থাকে। ছোকরা দুটো যে এই কান্ড ঘটাবে—তখন তড়িঘড়ি টের পায়নি। তাহলে কি আর লাঠি দুটোর মুখোমুখি হত? মাস্তা চুপ করেই থাকে। প্রসাদ তুলে দেয়, বেলপাতা ঠেকায়, পবিত্র সুতো বেঁধে দেয় হাতের বাজুতে। কিরণ তবু প্রসঙ্গ টেনে, জমানো অপমানে প্রকাশ্যে দেখানোয়, বউকে কচলাতে থাকে— কিছুই রাখলে না?

বারে বারে বলতে তিতিবিরক্ত মাস্তা হবে—বেশ করেছি। ভেতরে চোখের জল থাকবে আর দেখালেই অশুদ্ধ?

কিরণ তবুও হাসি হাসি রসিকতা করে—তাই বলে, সব প্রাইভেট জিনিস খুলে দেখিয়ে দেবে? অ্যাঁ।

কাকলি খেপে গিয়ে বলে— প্রাইভেট বলে কিছু হয় না। স-ব টিকিতে বাঁধা। একটু ভেবে দেখো পরে।

এই প্রথম, কিরন্ময়ের মনে হল, খেলার ছলে মাস্তা তাকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে বিচিত্র একটি ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেখানে যন্ত্রপাতিগুলো কিম্ভুত। নটখটেও বটে।

দীবারাত্রির কাব্য ঃ গল্প সংখ্যা ২০০০

সীতা

ভিড়ের পেছনে বেঁটে মানুষটা দাঁড়িয়েছিল আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে । চাঁদোয়ার ঠিক নীচে আসরটি । ঝোলানো বাল্‌ব থেকে ছিটকে গিয়ে আলো ঠোকরাচ্ছিল তার মুখের কোনো কোনো অংশে । চোয়াল দু'টি গোপনে কিছু চিবিয়ে চলেছে । নতুন ফ্যাশনের সরু নিকেলের ফ্রেম-কাচের আড়ালে চোখ দু'টি মনে হচ্ছিল চকচকে কিছুতে আক্রান্ত । বন্ধুটির ঘাড়ে হাত রেখে, কী যেন বোঝাচ্ছিল আসর-সংক্রান্ত কিছু । হ্যাঁ, আংটি-ঠাসা আঙুলে আভিজাত্যের নিদর্শন একটি সিগারেট জ্বলছিল । তবে বন্ধুটি স্বাভাবিক সোজা মনে হচ্ছিল না । যেন দাদাগোছের, কোনো এলাকার । পেছনে ঠেকনো দেওয়া ওদের লাল মোটর-বাইকটা।

বেঁটে মানুষটার কাঁধে ছোট্ট একটি কিটস ব্যাগ । দামি কিছু নয় ; সস্তা ফোমের । কালো প্যান্ট, ভদ্রগোছের একটি সাদা গেঞ্জি-জামা পরা । বুকের কাছে ঝাঁপানো বাঘের ছোট্ট একটি জলছাপ । যেন বাড়ির পথে, অফিস-ফেরতা নেহাৎই মজার পেছনে উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়েছে । কত আগে ওরা গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল, ভিড়ের কেউ জানে না, কারও মাথাব্যথা ছিল না দু-জনকে নিয়ে । এরকম ফ্টিকো অনেকেই তো কিছুটা সময় ব্যয় করে যাচ্ছিল । আচমকা পেছন থেকে পাকা খেলুড়ে-ভঙ্গিতে 'দশ' ! হাঁকতেই সবার নজরের ঝাঁকুনিটা এদিকে ঘুরে আসে ।

চাঁদোয়ার মধ্যে বল-ভরসাহীন ভরত যেন প্রাণে জল পেয়ে যায়া ধূর্ত হাসিতে আদরের তোয়াজ গলায়, বলে ---নামটা ! নামটা বলুন দাদা ! লোকটা অবিচলিত কণ্ঠে চেঁচাল — স্বপন দে !

তখনই রাম বাড়তি জোস দেখিয়ে, মাথার ওপর আঙুল ঘুরোল --স্বপ্পন দে --শ । ...গণেশ ঢ্যাবঢ্যাব !

বেঁটে মানুষটা এতক্ষণের মরা আসরটিকে যেন হঠাৎ মালকোচা দিয়ে দাঁড় করিয়েছে ।

একটু আগেও রাম-ভরত শেষ আশাটুকু নিংড়ে ডাক তুলছিল ---সো-মা তিন ! সো-মা তি-ন ! সো-মা !

পাছে তিনের সীমানায় ডাকটি বাঁজা না- হয়ে বসে, নানা কৌশলে সময় খেয়ে-খেয়ে পাক

মারছিল—সোমা তিন ! তিন ! তিন ! ..... মিস্ সোমা সরকার তি-ন ! সো-মা দেবী তিন !

মাত্র আট বছরের রোগপটকা মেয়েটি ! ঠাকমা লক্ষ্মণের মাল ভক্তি-ভয়ে নাতনিকে দিয়ে ডাক করিয়েছিল । পোড়া আসরে তিন আটকে থাকে । হঠাৎ বাতাস পড়তে-পড়তে গণেশ লোধ —চা দোকানদার —ছাকনিতে ঢালবার ফাঁকে ছোট্ট করে উসকে দিল —পাঁচ !

—দাদা , নামটা ! লক্ষ্মণের খুশিদীপ্ত গলা ।

শুনেই রাম হাঁকল —গণেশ লোধ ! ....মাননীয় গণেশ লোধ মহাশয় পাঁচ ! .... সোমা ঢ্যাব্‌ঢ্যাব ! দিয়েছে ! দিয়েছে গণেশ সোমাকে শুঁড় দিয়ে চেপটে মাটিতে শুইয়ে .....

যখন পাঁচে দাঁড়িয়ে দশমিনিট ধরে ফের আসরটি খাবি খাচ্ছিল, ধর্মপ্রাণের অভাবে রাম যখন এলাকার নওজোয়ানদের কাছে ব্যর্থ, সীতা সামনে এসে খ্যামটা ঢঙে জনপ্রিয় হিন্দিগানের সুরে গেয়ে উঠল—-গণেশ পা-বে/মালা গলায় দে-বে/ ফেঁসে গেল সো-মা !

অনেকটা শুনো চম্পা/শুনো তারা'র সুর লাগানো । ফ্ল্যুট এবং ডুগডাগ তবলা চলল চমর-চর ভঙ্গিতে ।

তবু সোমা গ্যাস খায় না । খুকির চোখেই আসরে থাকে ঠাকমার পাশে । তাহলে পাঁচেই দাঁড়িয়ে আছে ডাক ! রাম হাঁকছে । কিন্তু এ কোন মড়া-হাবড়ার দেশ ! লোধ তখন চা ঘুটতে ঘুটতে হাত কামড়ায় —মেরেছে পোঁঙা । ...শালা, পাঁচের ওপর লোক নেই পানশিলা খালপাড়ে ? বাবা বাঁচা কেউ !

চারপাশে চাপা খুশি, সবাই চালাক সেজে মজা দেখছে । ছুটির সন্ধেটা কাটছে বেশ ! বেচারা ভরত ! কী করবে এর পর, ধরতে পারিছল না রাম ঘন ঘন চোখ ঘুরিয়ে ভিড়ের এধার-ওধার খুঁজছে জগা আর কানাইকে । ওরা এ-এলাকাটুকুর শের ! এদের ডাকে, বিনে বায়নায় চলে এসেছে । দলে ৯ সদস্য ; মাথা- পিছু বিশটা টাকা না হলে চলবে কী করে ? জগারা ইচ্ছে করলে নিলামের দর যে-করেই হোক ফাঁপিয়ে দিতে পারে । রামের চোখজোড়ায় একটা ফ্লপ-আসরের ছায়া ক্রমে মলিন হয়ে উঠছিল । তখনই 'দ-শ' ! আওয়াজ বুলেটটি ঝাঁকুনি গেড়ে বসে ।

ছোট্ট চাঁদোয়া । বাল্‌ব—এর সরাসরি মোহময় আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তিন-চার জনের মুখে । রামের পুরো বদনটি জুড়ে জিংক-অক্সাইড ও লিনসিড তেলের ঘন পেন্ট, ঠোঁটজোড়া কোনো কিছু দিয়ে সাজানো আরক্ত, সামান্য ময়লা একটি ধুতি পরণে, পৈতে, খোলা পেট-বুক-ছাতিতে অজস্র কালচে লোম । চুলের গোড়ায় বিন বিন করছে ঘাম । পোড়াখাওয়া চোখ দু'টি বলে দিচ্ছে, সে-ই দলে লিডার এবং আসর চরিয়ে পোক্ত । ভরতের গাল দু'টো বসা, চোয়াড়ে, থাক-থাক চুড়োর মতো ভাঁজ খাওয়া চুল, শরীরে ছাপা-ছাপা সস্তা রাংচিতের ঝলমলে পোশাক । ওর পেন্টটি আবার নীলচে আভায় ঘামের সঙ্গে মিশে গেছে। শরীরটা ছিবড়ে-মারা । লক্ষ্মণের ঘাড় অবধি কানঢাকা চুল, সরু গলা, হাসিহাসি চোখে পাতলা খাঁচায় চকচকে পেটটা দেখলে মনে হয়, লিভারটি গোপনে বিগড়ে চলেছে ।

চটে সাপটে বসে দু-জন ফ্ল্যুট এবং আড়-বাঁশির সুর তোলে, ওপাশে তিনটি মাথা ছোট ছোট ডুগি তবলাতে লাগসই আসর জমানোর কসরতে ব্যস্ত । কেবল সীতার কোনো পেন্ট নেই ।

খোঁপার পেছনে পেখম ধরা আধুনিক ক্লিপ, টাইট শাড়ি-ব্লাউজ ----কিছুটা উদ্ধত ভাঁজভঙ্গি। ভুরু প্লাক, বাদামি লাস্যময় চোখ; কিন্তু মুখের চামড়াটি ঈষৎ কর্কশ। গালজোড়া সামান্য ভাঙা। দেখলেই বোঝা যায়, হাট-মাঠের পুরুষ এই গর্ভে বীর্য নিষেক করেছে বহুবার।

---এগারো!

ভরতের হাতে ধসকানো সরু কামিনীর মালাখানা। আলোতে থুতুর কণা ছিটিয়ে চেঁচাল গণেশ লোধ — এগারো ...এ -গা-রো! স্বপন দে ঢ্যাব্‌ঢ্যাব! ..... ফাটা ফুটো।

যে-গণেশ খানিক আগে ফাটা বাঁশে আটকে গেছল, স্বপনের ডাকটি টের পেয়েই ঘোরেল খেলায় মেতে উঠল। নতুন বেঁটে মানুষটিকে লোধ মশাই চেনে?

এবার প্রমাদ গুনে বন্ধুটি যেন বাদ সাধতে যাচ্ছিল, স্বপন দে ছিটকে সরে এসে সিগারেটটি টেনে চলল ঘন ঘন। চোখদু'টো মুহূর্তের জন্য গুলি পাকিয়ে চেঁচাল --পনেরো

এইবার নেশা চড়ে। ভিড়টা ছুটির সন্ধে ভারি আমোদে চাটতে থাকে নীরবে।

--ফের! স্বপন দে পনেরো! হ্যাঁ, স্বপন দে! ...গণেশ এবার ঢ্যাবঢ্যাব!

টুকুস করে চায়ের দোকানে আওয়াজ --ষোলো!

---ষোলো! ষোলো! ...গণেশ! ..... আহা, গণেশ! দুর্গার ছেলে ...জিতবেই ...... ! স্বপন দে পানসে মেরে গেছে!

---পঁ-চিশ!

ফাটাফাটি কাণ্ড! একলাফে এই অঙ্কটিতে চড়ে বসতেই, আসরটি যেন ঘোরে মজতে চায়। লোকটা কে? চোখজোড়া চকচকে করছে কেন? ভরতের তর সইল না। গোলাকার ভিড়ের চারপাশে আঙুল ঘুরিয়ে --পঁচিশ -দুই! পঁচিশ-তিন --বলেই মাথাটা ঝুঁকিয়ে ডাকে ---কই, আসুন স্বপনবাবু!

লক্ষ্মণের মালা। জয়ের তিলক।

সরু শব্দে ব্যাগের চেন টেনে, নোট গুলো মুঠো পাকিয়ে, লোকটা ঘাড় নুইয়ে মালা পরে নিল। কিছু ক্যাপ-ক্যাপ হাততালি। নোট-শোওয়ানো থালাটা সীতার হাতে উঠতে সে পাশে মাটিতে রেখে, ঝোলানো মাইক্রোফোনটার ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে চটুল, বুক-কাঁধ হাতের ভঙ্গিতে গান শুরু করল। গলাটা ফাটা কর্কশ --বহু রাত গাইতে গাইতে যেন মরচে মেখে গেছে। অথচ, এই মুখ গলা কাঁপিয়েই অগ্নিপরীক্ষার বেদনায় কাঁদলে, হাপুস চোখে কত উলুধ্বনি!

জায়গাটা ঠিক আসর বসার উপযুক্ত নয়। ঘিঞ্জি শহরতলি। পিচরাস্তা দিয়ে লাগোয়া বাস লরি-ম্যাটাডর-মারুতি থেকে শ্লথ ভ্যান, রিকশা ও শত শত সাইকেল ধোঁয়া-গন্ধ-শব্দ ছুঁড়তে ছুঁড়তে দোকানপাট, তেলেভাজার গুমটি, শহিদ স্তম্ভ, চাকিপেষা কল, ঝুপড়ি হোটেল ফেলে চলে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপে খানিকটা যানজট এখানে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। খালের পাড়ে সি এম ডি-এর পাকা নতুন ড্রেন তৈরীর ফলে যেটুকু খোঁজ-জমি বেরিয়েছে অতিরিক্ত, দোকান গড়ছে অস্থায়ী ---তারই সামান্য গলতাইতে আসর। অপর ফুটে পুরণো বটগাছটা থাকায় --বাসের সহিস হাঁকে,

বটতলায় মোড় ।

এখানে হঠাৎ করে রামযাত্রা হবে, কেউই ধারণা করেনি । কানাইয়ের গ্রুপটা আড্ডা মারে, কোথাও বোমাবাজি করে আসে, কারও ক্যাওড়ামি হাতেনাতে ধরলে মাথা-কামাই করে দেয় এখানেই । সেলুর ক্ষুর তুলে এনে । মাঝে মাঝে একটু ভারি রাত্তিরে, সাদা পোশাকে আবগারি পুলিশ ঘোঁত-ঘাঁত খুঁজতে আসে। আর পাশের সুরু খালটা দিয়ে জল শুধু আসা-যাওয়া করে । নদীর সঙ্গে ওর যোগ ।

দু-দিন ধরে রামযাত্রা চলছে । একখানা ফটো টাঙিয়ে, ধূপধুনো প্রদীপ জ্বেলে, পোড়খাওয়া রাম গোধূলির আলোটুকু মরে বিজলি স্পষ্ট হলে, খানিক লক্ষ্মণের গাওনা, সীতার প্রতি বাষ্পাকুল নিবেদন, ভরতের প্রতি ভ্রাতৃসুধা বর্ষণ করেই —আড়চোখে ভিড়ের বুনোট যাচাই করে বলে — এখন নিলাম ! ... ডাক হবে মা বোনেরা /..... রাম-সীতা লক্ষ্মণের মালা নিলাম ! মা-মাসিরা অপরাধ নেবেন না । .... আমাদের সবার পেট আছে, জ্বালা আছে ! মালগুলো এতক্ষণে আসরে এদের প্রত্যেকের গলায় দোল-ঝাঁপ করছিল ।

মুখগুলো ভয়ানক সস্তা জিংক-অক্সাইডের ঘন লেপনে মজার খোরাক হয়ে দাঁড়ায় । মাত্র ন'জনের দল । মাটিতে ৫ জন যন্ত্রী, যার যার ভঙ্গিতে গোল হয়ে সাজিয়ে বসেছে । আর আলোর দীপ্তি মেখে দাঁড়ানো চারজন । মহাকাব্যিক চারটি চরিত্র ।

ধর্মের নামে বৃদ্ধা মহিলা দু-চারজন হাজির যে হয়নি, এমন নয় । তবে ছুটির দিনের বেকার, মাঝবয়সি, ছেলে-ছোকরা, চলাচলের সাইকেল, কৌতূহলী ভিড়ে উঁকিদারদের সংখ্যাই বেশি । আর আছে ফুটের দোকান ঘিরে থোকায়, থোকায়, অলস মানুষ, কিছু খদ্দের, আড্ডাবাজ । সন্ধেটা কাটিয়ে ক্লান্ত বাড়িতে ঢুকে পড়ার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না । নিলামটা তাদের উপরি পাওনা ।

রাম যখন আসর জমাতে মিনিট ১৫-র দক্ষ গলায় রস গেঁজিয়ে তুলছিল, কেবল দু-একজন ঘোর বৃদ্ধাই শুধু ত্রেতাযুগের ছায়ান্ধকার পথে চোখের জলে ভরতকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটছিল চোদ্দো বছরের বনবাসে । কোনো অজানা সংকুল পথ ধরে !

বাকি ভিড়ের মানুষজন পেন্ট, ঝলমলে পোশাক আর ভক্তির কম আয়োজনে সরযূ নদীতে চান না করে, খালের পাড়েই দেখছিল নিলামের মজাটি ।

আসর-অভিজ্ঞ রামের চতুর চোখ ইতোমধ্যে জগা-কানাইকে না-দেখতে পেয়ে বুঝে নিয়েছে ফালতু পাবলিক । চিপ্পলুস তেঁয়েটে ! গতকাল শুরুতে আসরটা এরকমই ম্যাড়মেড়ে ছিল কিন্তু নিলামপর্বে চাকাটা ঘুরিয়ে দেওয়া গেছল । এমন তুঙ্গ-অবস্থা, একটা ভ্যান টানিয়ে তার সারা দিনের কামাই একশো এক টাকা নিলামযুদ্ধে ময়দানে লক্ষ্মণের মালা জিতে নিয়ে গেছে । এ নিয়ে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল যদিও —জগারা প্রখর দৃষ্টিতে ছিল ।

আজ রাম নিজের গলার মালাটি নিলামে না তুলে সোজা আবেদন জানিয়ে বসল — রামের মালা ! ..... মাত্তর এগারো টাকা .... কিনে সাহায্য করুন !

আবেদনের কী করুণ হাল ! প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট আসরের চারপাশে বসা-দাঁড়ানা, সাইকেল ঠেস দিয়ে, লক করে নানা বয়সের পাবলিক কী ভীষণ নিরাসক্ত হয়ে ছিল ! বেশ মজা লাগছিল

লোকটার নানা ভঙ্গির আবেগ দেখানো পদ্ধতিতে । বারবার সে পেন্টমাখা মুখে পিটপিটে চোখে, ন-সদস্যের পরিবার, পেট, পিপাসার জল, ক্ষুধা, যন্ত্রনা, পিলে, লিভার নাড়িভুঁড়ির জন্য কৃপা মাগুছে ---শুধু টিকে থাকতে । লক্ষ্মণ আর ভরত নির্দেশ মতো চুপটি দাঁড়িয়ে নখ খোঁটে । সীতা হাসছে আলোর ছটায় । মৃদু চোখ নাচিয়ে ।

দু-চারটে ঠানদি বা যুবকদের যে প্রাণ ভেজেনি তা নয় ; এগারো টাকা অনেক । খুচরো এক-দুই হলে সবারই হাত উঠত। রং-পালিশ মুখটা রামের লাগছিল কিছু একটা বেহিসেবি কাজ করার মতো । জগাদের কাছে বোকা বনে গেছে বলে ! নাকি ভেবেছিল, হাট মাঠের চাইতে শহরে আজকাল অনেক পয়সা হয় ? কিন্তু একবার হেঁকে, মালার দর আর কমিয়ে আনা যায় না । রাম মরিয়া হয়ে পথ খুঁজছে অসহায় দৃষ্টিতে, তখনই রঙিন পাড়ের শাড়ি পার এক বিধবা --বেশ মাংসল চেহারার, ছোট নার্সিংহোমে যে পয় পরিষ্কারের কাজ করে --১১টি টাকা এগিয়ে দেয় । আর তখনই রাম প্রণামির থালাখানা ভরতের মারফত ভিড়ের মধ্যে সিকি আধুলি টাকাটার খুচরো সামর্থের অপেক্ষায় পাঠিয়ে দেয় । হাতে হাতে ফল । এগারো টাকায় যে-গিট বেঁধে গেছল, খুচরোয় মোটামুটি রুপোলি রেখা পাওয়া গেল । তারপরই লক্ষ্মণের মালার নিলামপর্ব এবং স্বপন দে ! বেঁটে মানুষটা !

এবার ভরত মালাটি রামের হাতে তুলে দিতেই, চতুর চোখ মেরে সে জনতাকে বলে --এ মালা যে কিনবে, সীতা পরিয়ে দেবে ! ..... হ্যাঁ সীতা দেবে পরিয়ে !

ফের রাম ছোট একটি চোখ মারল । দ্রুত ঘুরে, সামনে বসে থাকা বয়স্কাদের উদ্দেশে মাফি চাওয়ার ভঙ্গিতে --আসল রামায়ণ এখন বন্ধ .... ক্ষমা করবেন মায়েরা, দিদিমা-রা .... বাংলা হিন্দি গান একটু চলবে ...। পরে ফের ধম্ম ফিরিয়ে আনব ....আপনারা উঠে যাবেন না !

চাঁদোয়ার কাপড়টির ঠিক মাঝে, ছোলার দড়িতে বাঁধা মাইক্রোফোনের মুখটি ভীষণ সতেজ । ছোটখাটো ফচকেমিও বড় ক্যাচ হয়ে ওঠে । রাম ঘাড় ঘুরিয়ে হাতে মুখ আড়াল করে --বউদি ! সামনে ! সামনে !

সীতা হাসি হাসি ঠমক ছন্দে আলোর কেন্দ্রে দাঁড়ায়, হাত-পাছা নেড়ে চটুল সুরের একটা বাংলা সিনেমার গান সুর করে । বহু মানুষের চোখে সীতার রূপটি বেশ প্যাঁজ রসুনের ফোড়ন তুলছিল বাসনার কড়াইতে ।

রাম হাঁকে --ভরতের মালা ! ...দুই টাকা ! দুই টাকা ! মাত্র দুই টাকা !

---তি-ন ! আবার সোমা সরু গলায় ডাকে ।

---সো-মা তিন ! মিস্ সোমা !

---পাঁ-চ !

---কে ? ..... আচ্ছা, গণেশ লোধ ! ...... পাঁ-চ, পাঁ-চ ! সোমা ঢ্যাব ঢ্যাব !

এখনও ভিড়ের মতিগতিতে হাওয়া ওঠে না । দু-একজন কিছু ঘটবার আশায়, ট্যারিয়ে দেখছে মোটর -সাইকেলের বন্ধুটা বেঁটে মানুষটাকে পেছনে বসতে টানাটানি করছে । মানুষটা

নিজের মতলবে ভয়ানক অটল থাকতে পারে। ফের বন্ধুটি কাছে আসলে, 'দাঁড়িয়ে দ্যাখ'। বলে স্বপন দে —— দ শ! বলেই মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে সিগারেট টানে।

ডাকের লাফই আসরটিকে মাতাল করে দিচ্ছে। লোকটা কে? টাকা ব্যয় করতে কাতর হয় না? হয়তো -কাঠে কাঠে কেউ কাপ্তানি করছে। এই খালপাড় যে ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের স্পট, কে না জানে! লোকটা এবার দু-একজনকে সরিয়ে সোজা আসরের সামনে এসে, হাত বাড়িয়ে বলে -- দেখব খালপাড়ে কোন শালার কত মুরোদ!

থোকায় থোকায়, আলো অন্ধকারে, সাইকেল-পাছা অনেক ছেলেছোকরা! কে এমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে! খেয়ে এসছে বোধ হয়! কিন্তু বেশির ভাগই তেতে উঠল না, মৃদু মজায় জাঁকিয়ে উঠল মনে মনে। এই আলো, এই জমজমাট, বাস জমজমাট, বাস-রিকশা ম্যাটাডর কিংবা শত শত সাইকেলের গতিময়তার মধ্যে একটি পৃথিবী জেগে উঠল, যেখানে স্বপন দে-রা ভীষণ ক্ষমতাশালী এবং নানা রং বেরঙে মজার পোশাকে হাজির থাকে।

--এগারো! ছায়া-অংশ থেকে একটা ছোকরা যেন ঢিল মারে আর বিস্ময়ের ব্যাপার, রাম অঙ্কটি শুনিয়ে মাইক্রোফোনে মোষ বলির বাজনা বাজায় --- এগারো! এগারো! এগারো! স্বপন দে ঢ্যাব ঢ্যাব।

এই ১১টি কার ছিল রাম জানায় না। প্রয়োজন বোধ করে না। তার বহুদিনের অভিজ্ঞতার পেন্ট যেন বলে দেয়, নামে কী এসে যায়। একটা দোলা, একটা ঝাঁকুনিই আসল।

---কুড়ি!

---বাইশ! ফের একটি কোণের ডাক।

----বাইশ! বা-ইশ! দিল স্বপন দে-কে শুইয়ে চিত করে, বেশ মাখিয়ে দিয়ে ....

---তিরিশ! ডাকটি তুরুপের তাসের মতো ফেলে দিয়েই লোকটা হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে গুমটি দোকানটার সামনে গেল। দু-চারজন হাঁটল তার পিছু পিছু। সিগারেট কিনতে নয়। নতুন-উইলস-এর প্যাকটটায় বুকপকেট ফুলে আছে। লবঙ্গ ফুরিয়ে গেছল; দাঁতে পেষণের মন্ত্র। চোয়ালজোড়া নীরবে নাড়তে পারছিল না। তাই পানপরাগ বা গুটকা কিনতে গেছে। কোনো উত্তেজনা নেই। ধীর গতিতে আবার রাস্তাটা পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে চলে এল। বোঝা গেল, দোকানদারটা ওকে চেনে। মজা দেখতে সে-ও চলে এসেছে। কী যেন একেবার বোঝাতে যাচ্ছিল, স্বপন দে বরাভয়ের মুদ্রায় মুখফুটুনি বন্ধ রাখতে বলল। জ্ঞান-ট্যান সে কারো নেয় না। ভিড়ের একটি মাথা, স্বপন দে কাছে আসতেই বলে ----একত্রিশ ডেকেছে!

ডাকটা সে যাচাই করল না। তাচ্ছিল্যে ঘুরে এল ?

ভ্যান-টানিয়েটা টাল খেয়ে খেয়ে এভাবেই ক্রমশ একমুখিন হতে থাকলে, বাকি ডাকওয়ালা চুপটি মেরে গেছল। তারপর, ঘেমো মুখে, নেশাচ্ছন্ন ঠোঁটে দুলতে থাকা সিগারেটের ধোঁয়ার ময়লা খুঁটের ভাঁজ খুলে একশো টাকা দিলে যখন --বাতাস ঝপ করে পড়ে যেতেই বটের পাতা-রা ঝিম গুচ্ছ হয়েছিল। আর প্রণামির থালাটা তখন অনেক নোট ও মুদ্রায় ভরে যেতে, অনেকেই মনে

নিশপিশ অন্ধকার অংশে মুগ্ধ লাইসেন্সের ভাবনা জমতে থাকে। কিন্তু জগা- কানাইরা মাঝেমধ্যেই রাম-সীতার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে, প্রবল হাওয়া উঠল না। আজও কি তেমনই কোনো দল নেমে আসবে ? ....তবে চালা পানসি বেলঘরিয়া।

রাম গলাটি নামিয়ে টিকটিকির স্বরে বলে ---পঞ্চাশ-এক ! পঞ্চাশ-দুই ! পঞ্চাশ-তিন !

দোকানদার ছোকরাটা বেঁটে মানুষটার বন্ধুটিকে ফিসফিস করে বলে ---নানু, গুরুকে থামা ! ফতুর হয়ে যাবে !

নানু এবার খাড়া গলায় হুকুম দেয় --তুই উঠবি পেছনে ?

স্বপন দে ব্যাপারটা নজর করেছে। ছোকরাটাকে শুনিয়ে দেয় ---আমি ফতুর হলে এই ওভারহেডে কারেন্ট থাকবে না তোদের ....পানশিলা থেকে মোহনপুর অবধি।

তাহলে বেঁটে মানুষটি ইলেকট্রিক অফিসে রাজত্ব করে। এমন পঞ্চাশ একশো তাদের দৈনিক ময়লা। উপরি । তাই লক্ষ্মণের ঘামজড়ানো বেলফুলের মালাটার জন্য পঞ্চাশ গলিয়ে দিতে, তিলপ্রমাণ আপশোস হয়নি তার। উইলস, ইলিশ বা আয়েসের দখলের জন্য কোনো চড়া মূল্যই তাকে ঠেকিয়ে দিতে পারে না। জয় করার মুড উঠে আসে।

রাম কৌশলে এবার বাবাজি-নামের মালাটি নিলামে তোলে। বাবাজির ফটো ঝোলানো আছে। নানু তখন বগলদাবায় স্বপন দে-কে পেছন-সিটে বসিয়ে, ভিড় কাটিয়ে ধোঁয়া ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা তবু ঘুরে চোখ পাকিয়ে ঝাকতে ঝাকতে যায় —ব্যাগের হিম্মত স্বপন দে রাখে। মুরোদ দেখে নিলাম সবার !

সীতার প্রতি তার যে কোন বিকার জন্মেছিল, আদৌ বোঝা গেলো না।

লোকটা চলে গেল। উত্তেজনা ঢলল। তবু আসর, মানুষ বাস, তেলেভাজা বা চায়ের দোকান, খালের জল —নানা মিশ্র ঘ্রাণের মধ্যে কেবলই থেকে অদ্ভুত কুকুরের গন্ধ আসছিল। এঁটুলি পোকার ঘেয়ো কুকুরের চিমসানি।

রাম মালাটা ইষৎ গোল বানিয়ে বলে—ঠাকুর গোলকনাথের মালা!

----তি-ন !

-----চা-র !

-----পাঁচ !

-----ছয় !

------সা-ত !

মনোহারি দোকানের খ্যাপা কুণ্ডু ডাকল---এগারো।

তারপর ক্রমে ডাক গিয়ে ২৭-এ ঠেকে। ভরত বকের মতো খুশি খুশি ঠ্যাং ফেলে ভিড়ে সেঁধিয়ে ডাকিয়ের গলায় পরিয়ে দিল। খানিকটা গোঁয়ারতুমি-মরা আপশোসে, ডাকিয়ে তখন সাতাশ টাকা হারিয়ে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে, সীতা একটি

ঠোঙায় তিন তিনটে লাড্ডু --গোলাকার, হলদে বর্ণের ---থালায় ঢেলে ডাক তোলে ---- পাঁ-চ। খাঁটি ঘিয়ের ।

ভিড় থেকে চটুল হাসি ওঠে কিছু ।

---আট !

----নয় !

---দশ ! দশ এক, দুই ...... । ডাকিয়ে ছোকরাটি নিজেই ডাক বাজা বানিয়ে দিচ্ছিল । এটা যে নিলামে বেনিয়ম । ছোকরাটা জানে । তবুও রাম এবার মহাকাব্যের মুখোশ ছেড়ে, সাধারণ পারলিকের মতো হাতজোড় করে কাতর ভঙ্গিতে ---দাদা, আসরটা মাটি করবেন না ! ....প্লিজ ভাই ! .....আপনার পুঁজিপাটা বেলেঘাটা হয়ে গেলে অন্যদের সুযোগ দিন !

---লাড্ডু দ-শ ! দ-শ ! ছেলেটা তবু হাত তুলে খ্যামটা নাচতেই থাকল । অন্য কোণা থেকে আওয়াজ উঠল ---বা-রো !

লক্ষ্মণ এবার পিলেবাড়ন্ত পেটটি নিয়ে আসরের মতলবটি ধরার চেষ্টা করছিল । ডাক কি চড়বে, নাকি ঝামেলা পাকাবে কেউ ?

----পনেরো !

----আঠারো !

----কুড়ি !

কয়েকটি ছোকরা গুমসা মেরে ছিল । ভাবছে, আসরটাকে জুয়ায় ঠেলে মানুষের পকেট ফতুর করা হচ্ছে ! এরপর কায়দায় কী কী নিলামে চড়াবে ? ফুল ? বেলপাতা ? চাঁদোয়াখানা ? নাকি সীতার দেহের শাড়িখানা ? ফটোর নীচের ধুলোবালি ? ইট ? ঘাস জঙ্গল-মাটি ?

-----এ-কুশ ! হেঁকেই গাট্টাগোট্টা ছোকরাটা ছোঁ মেরে আসরে ঢুকে নিজেই সীতার হাত থেকে লাড্ডুর থালাটি নিল কেড়ে ।

বাতাস জাগল বটের পাতায়, খালের জল কচুরি-ঢোপ নিয়ে ছুটল । পেট্রলের ধোঁয়ায় কিছু মানুষ নাক আড়ালে রাখে ।

---লাড্ডুর নিলাম ? কেন, কিসের জন্য ? তারপর সে গলা ফাটায় ---মাজাকি মাচ্ছ ? শালা, কাল ভ্যানাটানার ১০১ গ্যাছে ! .... খালপাড় ফতুর কত্তে এসেছে ?

ঝম্ ঝামাড় ! ঝম্ ঝামাড় ! ঝম্ ঝামাড় !

বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ে, অটো কাটাবার পথ না পেয়ে ঘন-ঘন ডাকতে থাকে, সাইকেলগুলো জমে যায়। গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি ।

লাড্ডু হাইজ্যাকারকে জগার সাররেদ কঁৎ কঁৎ তলপেটে ঘুষোতে থাকলে, খালপাড় আপন পরিচয় নিয়ে নিল । ড্রি-ম ! দু'টো পড়তে বিপুল হুটোপুটি। কে ফেলল ও দু'টো ? কানাই সাইকেলে ইতিমধ্যে হাজির হয়ে গেছে । পানপরাগের দোকানদার দু'টো গরম আওয়াজ তুলে

লুকানো ভোজালিটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

সরযূ নদী বয়ে যায়। শব্দ নেই, বাতাস-হারা, আলো জাগে না। সরু অন্ধকারের মধ্যে পরিত্র জলের ধারা বইতেই থাকল। গোদাবরীর গভীর জঙ্গলে লক্ষ্মণ আর মাথা তুলে সীতাকে আড়চোখে দেখতে চায় না।

এখানে নিলাম চললে কোন শালার কী? আসলে ছোকরাটা কি নেশাগ্রস্ত? ধর্মস্থানে নেশা করা ঘোরতর অন্যায়। অন্ধকার আছে, সীতা আছে, তাকে অক্ষত রাখার শর্ত আছে—সবই যে গুলিয়ে ফেলা হল।

আসলে ছেলেটা খালের এ-পাড়ের। এ-পাড়ের বহু মাথা ওই ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা কুকুরের গন্ধ পায়, গতকালের একশো টাকা ভোজবাজির ঘ্রাণ শোঁকে আর ঝাঁপের বাঁশ হাতে হাতে ওঠে জগা-কানাইদের।

নিলাম তো ন্যায় ও আইনসম্মত! তবে?

বাতাস থেমে থাকে, জল বয়ে নেয় খালের বুজবুজি। আসলে সব জলেরই গোপন ঘ্রাণ আছে, কিন্তু বলে দেওয়া হয়—যাহা স্বাদহীন, বর্ণহীন ....ইত্যাদি।

কানাই সামলে সুমলে এবার রামকে ধমকে বলে ---মারাতে এসছ? শুরু কত্তে পারো না? রাম মুহূর্তের জন্য বিমূঢ়। মালা, লাড্ডু ---সবই তো নিলম বেরিয়ে গেছে! এখন? ফের ধর্ম আলোচনায় ফিরে যাবে? কিন্তু দাদা-বউদি - দিদিমা বা যুবকবৃন্দ কোথায়? সে তখন সীতাকে ঝাঁঝিয়ে দিল --- একটা গান ধর্তে পারো না? ডুগি-বাঁশি কি ইয়ে মারতে বসে আছে?

কথাগুলো মাইক্রোফোনে ক্যাচ হয়।

বেঁটে লোকটা নেই। কিন্তু খালের ওপার থেকে ফের কিছু বেঁটে জড়ো হয়ে যায়। এরা আইন-শৃঙ্খলার হাত-পা নেড়ে চলনযোগ্য বানাতে হাত লাগায়। অটো ছোটে, সাইকেল যায়, বাসগুলো হাঁটে ----তবে সংখ্যায় কম।

রামের পাশে দাঁড়িয়ে জগা-ই ডাক তোলে --হাতের কাছে যা পায়। ঘর-বাড়ি বটগাছটা রাস্তা-খাল নদী ক্রেন অকাতরে বুকের সমস্ত বল হাঁকিয়ে সে ডাক তুলেই যায়। দেশটাকেও ছাড়ে না।

চটুল বাজনায় মাইক্রোফোনে সীতার ফাটা গলা? ঘরবাড়ি থাকে না। রাস্তা লোপ পায়। জঙ্গল জাগে। গোদাবরীর অরণ্য। মারীচ ছোটে। ঈষৎ বাদামি, গালভাঙা, বহুবীর্যে নিষিক্তা সীতাকে জাপটে মাটিতে শুইয়ে দীর্ঘ লাইন যার যার দান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। আবার ধ্বস্ত সীতাকে নিয়ে নতুন লাইন শুরু হয়। জিংক-অক্সাইড ও লিনসিড তেলের মুখগুলো --- সীতার কুটুম্বরা ---কাঠিতে দাঁত খোঁটে অন্ধকারের ধুলো দৃষ্টিহীন ব্যূহ রচনা করে। বাতাস থেমে থাকে বটগাছে। জল বয়ে যায়। আসলে সব জলেরই গোপন ঘ্রাণ আছে, কিন্তু বলে দেওয়া হয় --- যাহা স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন .... ইত্যাদি।

গান্ধারী

পাঁচমানুষের দলটি যখন নিঃশব্দে ঢোকো, মন্দিরের আরতি শেষ । পুরোহিতির ঘন্টাধ্বনি পঞ্চপ্রদীপের তালে তালে সবে থেমে গিয়ে, রেশটুকু আশ্রমের বিশাল নীরবতায় মিশে গেছে । গিলে খাওয়া শুনশান ভাবটুকু বেশি বেশি জমাট বেঁধে উঠল তাই । বিগ্রহের দারু-কপাট বন্ধ ; তবে স্নিগ্ধ ধূপ গন্ধের সাথে বহু পুরণো জুঁইলতার সুবাস এখনও বাতাস মুছে ফেলতে পারেনি ।

কথাই ছিল, পাঁচমানুষের দলটি সাড়ে সাতটার পর হাজির হবে এবং তা খেলাপ হয়নি । আরতির পরও উঁচু মন্দিরে বরফি-কাটা শ্বেতপাথরে লক্ষ্মী ঘোষ চুপচাপ বসেছিল । পাশে তার ৬ বছরের খুকি । পট্টবস্ত্র, আলো, মদনমোহনের স্মিত হাসি, বাঁকানো হাতে বাঁশি ---প্রাচীন বিগ্রহের দিকে লক্ষ্মী এতক্ষণ যে-নিবেদনের মঙ্গলস্তরে ছিল, সবকিছু থেমে যাওয়ার পরও যেন ঘোর কাটতে চাইছে না ।

স্বামী অধর ঘোষ জনা দশেক ঘনিষ্ঠ সাগরেদ নিয়ে দূরে ভোগ রাঁধার কুঠুরিগুলোর সামনে কী যেন কথা -পরামর্শ চালাচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না । তবে পবিত্র স্তব্ধতরা পরিবেশে, ওই কোনায় কিছু আদেশ-নির্দেশ যে চলেছে,সহজেই অনুমান করা যায় । খুকির ডানপা-টি একেবারে পাতাজুড়েই ব্যাণ্ডেজ । পুড়ে যাওয়া ক্ষতটি আজ দু-মাসেও সম্পূর্ণ সারেনি । ভুলভুলে চোখদু'টো তুলে সে বিস্ময়ে আকাশের ঝকঝকে দীপগুলোর দিকে তন্ময় হয়ে ছিল ।

আষাঢ়ের ১৫ দিনেও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি নেই । দিগবিদিক মাতানো রোদ ; প্রতিদিন গোধূলি সম্পূর্ণ শরতের মতো সুকোমল রংবরেঙের মেঘমালার মধ্যে লুপ্ত মায়াবী অমাবস্যা তিথি । আকাশ সোনার বুটি মেকে এমনই স্পষ্টতর, হয়তো খুকির কচি চোখজোড়া আর কোথাও সরতে চাইছে না ।

দলটা ঢুকল মন্দিরে মূল দরজা পেরিয়ে । বহু অতীতের বিশাল পাল্লাজোড়া যেন কোনো দুর্গ পাহারায় রাখা ছিল । ঢুকেই কুঠুরিতে কিছু অনাথাশ্রম, সম্মুখে নাটমন্দির এবং ছড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে মূল মন্দিরে বাঁধানো চত্বর । অনেকটা দূর । তবু মানুষ ঢুকে পড়ার শব্দ এতদূর থেকে টের পাওয়া যায় । তাই পেছনের ভোগের ঘর ছেড়ে অধর তিন চারজন সঙ্গী নিয়ে দ্রুত চলে এল আপ্যায়নে ।

---জয়গুরু ।

----কৃপা ! কৃপা ! অধর বলে ---ঘুর প্যাচে পরেন নাই তো ?

অধরের সৌজন্যবশত জিজ্ঞাসা । পতাকি মণ্ডল --মোড়ল নামেই যিনি এলাকায় পরিচিত ---- বললেন --স-ব ভালাই ? স-ব ভালাই ঘুষের পো ! মোড়ল সব ভালাই শব্দদু'টি এমনই রস-ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করলেন, অধর টের পায় দলটি আসতে কোথাও কিছু আয়াসে পড়েছিল ।

আসলে ওরা মন্দিরের অপ্রচলিত পথটা দিয়ে ঢুকেছিল । ওখানে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ও অতীতের কিছু বৃক্ষাদি রহস্যময় জটলা বানিয়ে নদীতে নেমে গেছে। এ-অংশে, মন্দিরে প্রতিদিনের পুজোর -ফুলের বাগান, ঘন ঘাস, জলপথের চোর-ডাকাতের শুঁড়ি রাস্তা, সাপ, বনফুলের গন্ধ এবং ওরই মধ্যে বেশ চওড়া একটি নদীঘাট । মন্দিরের সম্পত্তি । দূর অতীত থেকে জলের ঘা-য়ে ঘা-য়ে তলার কয়েকটি সিঁড়ি দলা -পিণ্ডের মতো হুড়মুড়িয়ে আলিশান ।

জোয়ার-ভাটায় তলপেটে জলছলাৎ চারপাশকে আরও রহস্যময় বানিয়ে দেয় ।

অধর কিছুটা বিগলিত হাতজোড়ের ভঙ্গিতে বলে ---বসেন, বসেন আজ্ঞে জল-টল খান । ..... আরিত শেষ ; নইলে প্রসাদ দেওয়া করতাম !

---তাতে কী ! ঠাকুরের আশীর্বাদ ! কী বলো তুমরা !

সঙ্গী চারজন সায় দিতেই, কুকুরটা করুণ ডেকে উঠল । রাস্তায় রাত-বিরেতে নেড়িরা যেমন থেমে, সুর তুলে আর্তি জানায়, হঠাৎ পবিত্র নির্জনতায় ব্যাপারটা বেশ্রাব্য হতেই অধর সামান্য বিব্রত হয় । ভেতরটা মুচড়ে ওঠে ! হা ঈশ্বর !

দলের তিননম্বর মানুষটা হট্ হট্ ! যা থামাতে গিয়ে ব্যর্থ হল । ফের অপরিচিত পরিবেশে কু-ই-ই ডাক উঠতেই মোড়ল মোটা পায়ের পাতা ফেলে-ফেলে, বিনীত ভঙ্গিতে সারমেয়টির কাছে পেতেই কৃতজ্ঞতা লেজ নাড়তে থাকে ঘন ঘন । রাতের অন্ধকারের টের পাওয়া ভার, ওর দেহের রং সাদা এবং ছোপ ছোপ পাটকিলে । কানদুটো ঈষৎ বেশি ভাঙা বলে, মোড়ল দাবি করেন, এটি উঁচু জাতের ।

--যা, বস গিয়ে ওখানে । স-ব হবে !

কী অদ্ভুত, শিষ্ট সন্তানের মতো সারমেয়টি চত্বরের কোণে আধভাঙা, পরিত্যক্ত শিবমন্দিরটির তলায় শুয়ে পড়ল । পাঁচমানুষের দলে এটি ছয় নম্বর । সামনের পা-জোড়া ছড়িয়ে, থুতনি যখন ঠেকায় কানদুটো মেঝের পাথরে সামান্য ঘষা খাচ্ছে ।

এই ভাঙা মন্দিরের চত্বরটা কুকুর থেকে তিনহাত উঁচু । স্তূপাকৃত বহু প্রাচীন কিছু ইট শুরকি, ঘাস-বনতুলসীর ঝোপ এবং ঝিঝি । মূল মন্দিরের দক্ষিণে ছটি শিবলিঙ্গে নিত্য তুলসী-ফুল-বেলপাতা পড়ে ; এই উত্তরের ছটি বিপজ্জনক জরাজীর্ণ হয়ে আছে । দেড়শো বছরের মদনমোহনের মন্দির কি সর্বাঙ্গীণ অক্ষত থাকতে পারে ? তাও তা সমস্ত চত্বর অটুট বর্গাকার পাথরে যে মোড়া আছে, শ্বেতপাথরগুলো সে চটানো হয়নি ---- মানুষের দানের জন্য । ওইসব স্বর্গীয় পিতৃদেব মাতৃদেব বা অকালপ্রয়াত পুত্র-সন্তানদের করুণ স্মৃতিরক্ষার্থে আজও লেখাগুলো এধার ওধার

ছেয়ে আছে। তাই এখনও ক্ষীণ নিত্যপূজা, ভোগ এবং অনাথশ্রমে ছ-সাতটি বালকের মৃদু কলকণ্ঠ শোনা যায়।

অধর এবার মোড়লের দলটাকে জুতো ছাড়িয়ে নাটমন্দিরের মেঝেতে বসিয়ে দিল। বিশাল বিশাল থাম, কড়ি-বর্গার পুরনো ছাদ। মেঝেটি এতই পালিশ, তেলতেলে এবং শীতল---কিছু পেতে বসতে দেওয়ায় ভদ্রতা অপবিত্র মনে হয়।

দলের লোকগুলো বিস্ময়ে টালটুল তাকাচ্ছিল। মোড়ল এতক্ষণে আরামের বিড়িটা ধরিয়ে পা-জোড়া সামনে ছড়িয়ে দিল। মন্দিরে ধূমপান নিষেধ ---আজ এদের ছাড় পেয়ে গেছে।

---কী পঞ্চা ? বলেছিলাম না ?

পঞ্চা এতক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে কড়ি-বর্গের পেটানো ছাদের কৌশল লক্ষ করছিল। সে ভাবে তাদের অঞ্চল থেকে মাত্র আড়াই ক্রোশ দূরে এমন একটি স্থান যে আছে, আজন্ম বসবাস করেও টের পায়নি। তখনই মনে জাগে, সে একজন অন্ধ আহার-মৈথুনের জংলা গাছ-পাপী! দিনরাত ভূষি- চাল-লবণের গদিতে বসে বসে গুড়ের মাছি বনে গেলে কি ইহজন্মে ছিঁটেফোঁটা পুণ্য সঞ্চয় হয় ? নদী নির্জনঘাট ও মন্দিরে আসা হল না এতটা আয়ু পর্যন্ত ?

মোড়ল এবার অধরকে মুখের কাছে ডেকে, কাঁধে হাত রেখে বলেন --অধর ভাই! হাত-পা এট্টু চালাতে হয় যে! ...ফিরে যাব মোরা! .... দিনকাল তো বোঝে।

নিজেই মোটা কবজিতে ঘড়ি দেখেন। আজ এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি ওটি হাতে বেঁধে এসেছেন, নইলে জীবনে তার সময় মাপার দরকার-টরকার হয় না। চারজনের পরণে ধুতি ও সাদা নাইলনের পাঞ্জাবি ---গোল হাতার। আজই যে কেচে, শুকিয়ে নিয়ে এসছে বোঝা যায়। কেবল একজনের চোঙামতো রেডিমেড একটা প্যান্ট এবং পেটগোঁজা চকচকে বাহারে শার্ট। তবে পায়ে সবারই মিহি ধুলো ; মেঝের একধাপ নিজেই পাঁচজোড়া জুতো এখন খালাস অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পুরনো হাওয়াই দু-জোড়া, বাকি সব পলিতিনের বর্ষাচটি।

অধর মোড়নের তাড়ায় লম্বা দুটো ঠ্যাং ফেলতেই ফের মোড়ল ডেকে কানে কানে কী যেন মনে করিয়ে দিলেন ? চোখদুটি হাসি হাসি অথচ কুণ্ঠামাখানো!

অধর সমান্য অহংভরে বলে উঠল----মোড়ল এক-বাপের জন্ম আমার, জিভ দিয়ে দুই কথা পাবেন না।

মোড়ল পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন --আরো রাখেঘা! শুধু মনে রাখবার কথা কলাম।

অধর হাসল। তার তো গাছে কলমবাঁধার ব্যাবসা। আম, পেয়ারা, সবেদা থেকে নোনা-আতা --কী নেই! ফলবাগিচার মালিকেরা অধরকে র-ত খাতির করে! বলে, মাঠ বিশ্বকম্মা! তো, অধর কি আর মোড়লের পাঁচশো টাকার চুক্তি খেলাপ করবে ?

লক্ষ্মী ঘোষ কিন্তু পাঁচমানুষের দলটা ঢুকতেই, খুকিকে কোলে টেনে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছিল। বিগ্রহের বন্ধ দরজায় ঘোমটা ঢাকা মাথাটি নত করিয়ে, মন্দির-প্রদক্ষিণের পেছনপথের সিঁড়ি দিয়ে সোজা অতিথিশালায় মেয়ে কামরায়। অতিথিশালা এখন ইতিহাস ; ঘরগুলো জীর্ণ হচ্ছে

চামচিকে, ইঁদুর ও বর্ষার ব্যাঙদের বিচরণক্ষেত্রে । আজ, সেবাইত সুশীলা লোক দিয়ে দুপুরের পর সামান্য সাফসুতোর করিয়ে রেখেছিলেন, তাই চলনসই । শুচিবাইগ্রস্ত . মুখ রা আধ-বুড়িটি দুপুর থেকেই সবকিছুর পেছন-পেছন আছে ।

ঘরে মেঝের শতরঞ্চে জনা দশ-বারো মহিলা । এ-ঘরে পুরুষেরা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হুটহাট ঢুকে পড়ছে না । একটা হ্যাজাক জ্বলছে সামান্য শোঁ শোঁ শব্দ নিয়ে । এ ঘরটায় ঢুকতেই মায়ের ওপর ভীষণ খিচকে রইল খুকি। অমন বিষ্ময়কর ঝকঝকে আলোর ফুটকি, হু হু বাতাস- -সব হারিয়ে গেছে । ব্যাণ্ডেজ পায়ে সে তেড়িয়ে গলায় বলে --আমি দাবো (যাব) । গুড়গুড় করে, চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে লক্ষ্মী ধমকায় —

আ-য় ! বাইরে ভূত ! খুকি সামান্য চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বটে, ব্যাজার মুখটি দেখে বোধ হয়, নিষেধ অমান্য করতে ও পারে ?

মহিলারা অলস ভঙ্গিতে বসে থাকলেও, দুচারজনের ব্যস্ততা ছিল ফুল-চন্দন-দুর্বা বেলপাতা ইত্যাদি যথাযথ গুছিয়ে রাখতে । এছাড়াও, চাল-বাতাসা -হলদ টুকটাক নানা উপাচার আছে । এটা যে ভাড়া-বাড়ি নয় --মন্দির, কিছুতেই যেন মগজে ঢুকছে না এদের । এমন সময় পবিত্র কিছু কাদামাটির দরকার পড়ল। সুশীলাবলে ---কেমন গেরস্ত তোমরা, দিন থাকতে আনেনি ? যাও এখন পেছনের ঘাটে ..... দ্যাখো, জোয়ার না ভাটা ..সাবধানে বাপু !

পেছন দরজা ধরে, দু'জন আধাবৃদ্ধা চলল ভাঙা ঘাটে বালি-কাদা তুলতে । ওদের আলোর দরকার হয় না ।

সুশীলা বোঝে রাত এগাররোটার মধ্যে আশ্রয় ফাঁকা না করিয়ে দিলে, কোন উঠকো উৎপাত হাজির হয়, বলা যায় ! কিন্তু পুরুত মশাই কোথায় ?

অধর ছুটে এসে বিগলিত করজোড়ে সুশীলাকে জিজ্ঞেস করতেই, সে খেঁকিয়ে ওঠে --- ঘরে নেই ?

--নজরে তো নাকছে না !

সেবাইত সুশীলার চোখ চারপাশে ঘুরছে । এ-ঘরের তদারকি ফেলে বাতাসের মতো চলল পুরুষদের ঘরে । আশঙ্কাই ঠিক, নিশ্চয়ই বঙ্কা ওখানে নেই । অথচ, কাল পইপই তাকে বোঝানো হয়েছিল, সন্ধ্যাবাতির পর আজ যেন সে ঘরে থাকে । তড়িঘড়ি উঠকো পাট চুকিয়ে দিতে হবে । এতগুলো মানুষ, রাত আটটার পর মেইন গেট খোলা থাকছে, দায়িত্ব থাকা দরকার ! নাঃ বঙ্কাকে তাড়াবে সে । দেখি বাউনের কত বুকের পাটা জন্মেছে !

কতদিন বলেছে সুশীলা ---ঠাকুর, তুমি সন্ধ্যারতি শেষ করো সাড়ে সাতটায় ....বাইরে তোমার কোন রাজকায্য ? সদর গেট পেটালে আমি খুলতে পারব না ..সেবা তো বলতে এক বেলায় ডাঁরিয়েছে তাতেও রোজ ট্যাককস ট্যাকস কত্তে হবে ?

সেবা সত্যিই ভাঙা হাটে ঠেকেছে । ঠাকুরের স্নান ও দুপুরের বোগ খাওয়ানো বঙ্কার ছেলে পলাশ সেরে যায় য় পুরুতঠাকুর সোজা বলেছে ,তার পক্ষে সম্ভব নয় । রাজমিস্ত্রির কাজ করতে

হয়, সারদিন অত খাটুনির পর,সন্ধ্যারতিসারতে পারবে বটে. মন্দিরে ঠায় পড়ে থাকলে চলবে না তার ; একবার জিতুর ঠেকে যেতেই হবে ।

তাই-ই হল আজ । সুশীলা পুরুতকে নিয়ে ঢুকল যখন, বোঝা গেল, রাস্তাতেই কয়েকপশলা ঝাকাঝাকি হয়ে গেছে দু-জনের মধ্যে । ঢুকতে ঢুকতেই পুরুতের গলাটি বেশ রোখা শোনা গেল - --লাট্টুর রমা, চরিত্তির কার কেমন, আমিও কম জানি না । বয়সটা তো তিনকুড়িতে ঠেকল !

---ঢের হয়েছে । সে বিচার পরে হবেখন ..... এখন এদের বিদায় করুন তো !

----বিদায়ের মালিক আমি ? চুক্তি তো আপনার সাতে হয়েছে ?

সুশীলা দুম দুম করে ভোগের ঘরের উদ্দেশে চলে যায় ।

পুরুতটির দেহ বেশ লম্বা ; ছিটোফোঁটা মেদ নেই, লিকলিকে একটি বেতের মতো । রোদ ঝলসানো মুখ ; দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্র পরে যখন নাটমন্দিরে হাজিরা দিল কে বলবে সুশীলা এই মাত্ত জিতুর ধেনোর ঠেক থেকে হাত-পা ধরে ঠাকুরকে ডেকে এনেছে ?

নাটমন্দিরের হ্যাজাকের আলো ছিটকে পুরুতের দু-চোখে পড়তে, ভীষণ ঝকঝকে লাগল । মাত্র একগ্লাস সবে পেটে ঢেলে , নদীর বাতাসে গুপী ময়রা ও পাড়ার নলিনী দালালের সঙ্গে মৌতাত শুরু করছিল । প্রতিদিনই আরতি সেরে জিতুর ঠেকে চাঙ্গা হয়ে সে মন্দিরে ফিরে আসে । আজও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সুশীলা বারণ ছিল । থাক বারণ তাই বলে সেবাইত ! কিসের সেবাইত ? তিনপুরুষের পরিবারটা এখন বিশ হাঁড়ির । সুশীলা তো একটা হাঁড়ির প্রতিনিধি। পুরুত মশাই কি মন্দিরের আইন জানে না ? তেমন রমরমা থাকলে, কবেই বন্ধ করে দিত সুশীলার মাতব্বরি ! এখন জরাজীর্ণ অবস্থায়, ভাগের মা গঙ্গা না-পাওয়ার মতো । এ-অনাথশ্রমটার জন্য কিছু বাইরের অনুদান জোটে আর দু-চারজন ভক্তর কৃপাদৃষ্টি --- নিত্যদিন নিয়মিত । ভোগ আরতি চলছে । সুশীলাই আশ্রমই দেখে, অনুদানের কাগজপত্তর ঠিকঠাক রাখে । পুরুতের থাক-খাওয়া ফ্রি ; এবং আজকের মতো আলটপকা পরিবেশ জুটে গেল উপরিও হয় ।

---কই ? সব রে-ডি ?

বঙ্কা চোখ ঘুরিয়ে বরের দলটাকে দেখে নিল । অধর তড়িঘড়ি পা ধোয়ার জলের ঘটি ধরতে, বঙ্কা খড়ম ছেড়ে পাতাদুটো এগিয়ে দেয় । এই সুযোগে উপচার দেখে নিল । শাড়িখানা বেশ বরংবাহারে লাগছে । গামছাপ্যাঁচানো, পুটুলিতে আরও অনেক কিছু । হঠাৎ ঘোমটা টেনে দুই মহিলা কল কল তিন তিনবার উলুধ্বনি দিয়ে উঠল । কুকুরটা একটা কুঁ--ই ডাক দিয়েই চুপটি মেরে থাকে, তখনই মন্দিরের চূড়ায় খাঁজ তেকে একটা প্যাঁচা চুপ করে উড়ে নদীর বৃক্ষগুলোর দিকে চলে যায় ।

অনাথাশ্রমের অংশে গ্যাদাগুলো ঘুমিয়ে গেলেও, ওদের দেখভালের বুড়িটা ঘুমোতে পারছে না । আশি-পঁচাশি বছরের বুড়ি কেবলই কৌতূহল খুট খুট করছে । সেবাইত আবার কী বলে -- লুকিয়ে শুনছে সব, এ্গোচ্ছে না । জোকার উঠতেই আর সামলে রাখতে পারল না । কুঁজো দেহটি ঠেলে ঠেলে অন্ধকোর পেছন-পথে অতিথিশালায় মেয়েদের ঘরে হাজির । তখন কেবল লক্ষ্মী বসে আছে । বাকিরা নাটমন্দিরে ব্যস্ত । আর খুকিকে নিয়ে জনা তিন কমবয়সি বউ পাশের ঘরে

সাজাচ্ছে। মহা কান্না চলছে ওখানে, উলটে ধমকও কম হচ্ছে না।

বুড়ি লক্ষ্মীর চোখজোড়া বিস্ফারিত। বুড়ি অনেকক্ষণ চুপচাপ। শেষে নিজেই বলে ---আমায় তো দু-বছর বয়সে বিয়ে বলতে হল এখটা কলা গাছের সাথে তবে না গেরো কাটে। কিন্তু মা কপাল যাবে কোতা ? সোমত্ত বয়সে যখন আসল বিয়ে হল পেত্থম রাতেই বুঝলুম বর আস্ত পাগল ! উদ্দাম !

লক্ষ্মীর ভীষণ সহানুভূতি জন্মে। খুকির কপালেও বা কী আছে ?

-----বাড়ির মানুষ টের পায়নি আগে ?

---অ -ত মনে নাই ..... সে কি আজকের কতা ? .... সেই যেবার শুনেচি যুদ্ধু লাগল।....

---বরের ঘর কল্লে তো ?

--বড্ড ঘেরো ছিলাম আমি .... সেই যে যে বাপের বাড়ি উঠেছিলুম মেরেও কেউ শ্বশুরের ঘর করাতে পারেনি !....

লক্ষ্মী চুপ। বুড়ি ফের বলে --ভাগ্য রে বউ। ..... সবার কপালে বে থাকে না !

--তোমার বাপও কিছু করলে না শেষে ?

---মনে নাই ...। সেসব কি আজকের কতা ..... তো তোমার মেয়ের কপালে কী হল ? লক্ষ্মী ম্লান মুখে বলে --ভগবান জানেন। আটমাসে দাঁত ভাঙে, দু-বছরে হাতের হাড় দু'টুকরো, চার বছরে জলে ডুবতে ডুবতে বাঁচল, গত মাসে পা-খানা পুড়ল আগুনে আত্মীয়রা বলছে পেট থেকেই ওকে দুষ্টু গেরো ভর করেছে বিয়ে দিয়ে না কাটালে সারা জীবন দুঃখ সইবে !

বড়ি যেন কিছুই শুনছে না এসব। মস্ত জ্ঞানীর মতো বলে— মোদেরও বংশ ছোট ছেলে না গো!... নদীর ওপারে সিন্দুরগড়ের নাম শোনেনি? শিয়ালখালার পাশে?.... আমার বাপ বৈশ্যকে পাঁচ গাঁয়ের মানুষ চিনত... জমিজমা... ধানে-চালে-সর্ষে, কী হত না?

লক্ষ্মী বলে—তোমার শ্বশুর খোঁজ নিতে আসেনি পরে?

—এলেই কি পাগলের কাচে বাপ আমায় পাঠাত?...স্রেফ হাঁকিয়ে দিলে! বললে, ভীম বৈশ্যের অভাব নাই কোনো...চলে যান, মেয়ে গান্ধারী বৈশ্য পাগল বরের ঘর করবেনি।... আপনারা ঠকিয়েছেন আমায়।

কতদিন? কতদিন ধরে এ-কাহিনী জরাজীর্ণ দেহের মধ্যে লুকিয়েছিল। বুড়ির? এবার খাঁচাটি খালাসের হ্লাদে জল হয়ে গেল। আর লক্ষ্মীও বুড়ির নামটি শুনে ধক্ করে উঠল। গান্ধারী বৈশ্য!

বুড়ি বলে—খুব জাগ্রত দেবতা, বুঝলে।... মেয়ে তোমার সুখী হবে!... গেরো কাটিয়ে নিলে!

মদনমোহনের উদ্দেশে দু-হাত কপালে ঠেকায়। লক্ষ্মী কি কাঁদে? হঠাৎ নাটমন্দিরের চাতালে শঙ্খ বাজতে দু-জন কেমন তৎপর হয়ে উঠল।

পুরুতমশাই আধঘন্টার মধ্যে দ্রুত অং, বং, চং, ক্রিং, দ্রিং সঙ্গে নানা মুদ্রায় উপচারে কুশের জল ছিটিয়ে হাঁক দিল অধরকে।

—মেয়ের নাম?

—গান্ধারী ঘোষ...!

—গোত্র?

—সৌকলিন।

বেনারসি চেলিতে প্যাঁচানো ছ'বছরের শরীরে হ্যাজাকের শোঁ শোঁ তাপে ভীষণ চুলকোবার ইচ্ছে জাগতেই, পুরুত হুট করে, উঠে দাঁড়িয়ে বলে— এবংর শুভদৃষ্টি, মাল্যদান! কন্যা নিয়ে আসুন!

ফের উলু এবং শাঁখ। হ্যাজাক উঠে এল জনৈকের হাতে। মাঝবয়সি একজনের কোলে চেপে চেলি পরিহিতা খুকি ভাঙা শিবমন্দিরের অন্ধকার অংশে যখন হাজির; মোড়লের ভোলা থুতনি ঠেকিয়ে ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ লোকজন ও আলোর ঘা খেয়ে খাউ খাউ করতেই, 'যা! যা! ফ্যাচাং করিস না'— মোড়ল মাথায় হাত বুলোতেই ঠান্ডা। প্রভুর শরীর ঘেঁষে কেবলই লেজটি নাড়াচ্ছে। এ-সহজ সুযোগ সব লগ্নে জোটে না। সবাই প্রবল উৎসাহে খুকির হাত দিয়ে পরিণয়-মালা সারমেয়টির গলায় দিতেই, গান্ধারী ঘোষের গেরো কাটার বিয়ে হয় এবং ভবিষ্যৎ বিঘ্নের উপর একটি কাঁটা পড়ে।

এরপর নিশুতি স্তব্ধতার মধ্যে কন্যা ও বরযাত্রীর আহার করে। কুচ্‌কি-কণ্ঠা ভরিয়ে। ভাত, মুড়ো দিয়ে মুগডাল, পটলের তরকারি, মাছের ঝোল, অম্বল এবং পায়েস। এবং বরকর্তও হিসেবে মোড়ল গুনে নিলেন পাঁচশো টাকা। পুরুত উষ্মা চেপে প্রাপ্য বুঝে নিল এবং রাত এগারোটার মধ্যে ঝামেলা চুকিয়ে সুশীলা যখন নিশ্চিন্ত, মেয়ের গ্রহ কাটার খুশিতে অঘোর তাকে চুক্তির বাইরেই দুশো টাকা ধরে দেয়। কেউ হিসেব পায় না। কেবল পঁচাশি বছরের কুঁজি বুড়ি গান্ধারী বৈশ্য— বৈধব্যের জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনি বলে, এক বাটি পায়েস আশা করেছিল লক্ষ্মীর কাছে। ক-ত কথা হল ! আসলে তাড়াহুড়োয় ব্যাপারটা কারো হিসেবে আসেনি। বুড়ি যখন দরজা বন্ধর আওয়ার পায়, বিষ ঢেলে বলে—কেমন ভদ্দর নোক সব? চ্যামার! চামার!

তখন হ্যাজাক নিভে গেছে, বাতাসে ভর দিয়ে স্তব্ধ অমাবস্যা ফের জাঁকিয়ে উঠেছে। ডানার শব্দে প্যাঁচাটি ফের ফিরে এসে বসল চূড়ার খাঁজেই। ওখানে ডিম পেড়েছে ইদানিং। সন্ধ্যার নক্ষত্ররা তখন দিগন্ত থেকে মাথার ওপর সরে গেছে।

এর ঠিক এক দশক শেষে, গান্ধারী ঘোষের প্রকৃত বিয়ের পর, যখন ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা, মায়ের সঙ্গে মদনমোহন দেখতে এল। লক্ষ্মী বুড়িয়ে গেছে কিন্তু সিঁদুর-শাখা খোয়ায়নি। আলোছায়ার মতো স্মৃতি স্পষ্টতর হয়। সুশীলা ছাই হয়ে গেছে, বক্কা পুরুতও নেই। তার ছেলে এখন সন্ধ্যারতি সারে। তবে নদী তেমনই আছে, ঝোপ-বৃক্ষ আছে, মন্দিরের শুনশান প্রাচীনত্ব আছে আর চূড়ার খাঁজে প্যাঁচটার আশ্রয়।

ওরা মা-মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে, পৃথিবীর আসন্ন নবজাতকের জন্য শুভ প্রার্থনা জানাল। শেষে

পেছন-পথে বাগান হয়ে, ঘাটে হাজির। ক-ত দিন এই দুটি প্রাণী নদী দেখে না! ঘাট তেমনই আছে; হুড়মুড়োনো স্থবির পিণ্ডগুলোর শরীরে জলের ছলাৎধ্বনি আজও বর্তমান; শুধু ইটের শরীরে পেছল শ্যাওলা কিছু পুরুষ্ট হয়েছে নয়-দশ বছরে।

গান্ধারী এখন আর ঘোষ নয়, কংসবণিক। ঠিক নিচের ধাপেই ঝরু ঝরু বাতাসে দু'ই বৃদ্ধ গল্প করছিল। যেন দুটি ছায়া ঘন বসে আছে। এ-ঘাটে পাড়ার মানুষ এখনও চুপচাপ বসে সময় কাটিয়ে উঠে যায়। মা-মেয়েকে নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। নিজেদের মধ্যে দৈনন্দিন আলোচনা চালিয়েই যাচ্ছে।

একজন বিড়ির ঠোঁট নিয়ে বলে—দুর্যোধনের ভীষণ ক্রোধ, কেন তাকে পাঁঠার বাচ্চা ডাকে পেছন থেকে... সে তো কৌরবপতি! তাহলে কী রহস্য!

—হাঃ হাঃ! দ্বিতীয়জন মজা ও কৌতূহলে বলে— তারপর?

—গান্ধারী কৃষ্ণকে নালিশ জানাতে, তিনি হাসলে।

—কী জবাব দিলে অর্জুনসখা?

—বললেন, গান্ধারী এ-উত্তরে সুবলরাজের কাছে গিয়ে জেনো। আমি ত্রিকালদর্শী... সব জানি। যদি এই শ্রীমুখে শুনতে চাও তো বলি!

—যদুপতি, আপনি সর্বশক্তিমান, বলতে থাকুন।

—কিছু মনে কোরো না, তোমার জন্মের মধ্যে অশুভ গ্রহ ছিল।... তোমার বৈধব্য ছিল নির্ঘাৎ... তাই শিশুকালে তোমার পিতা তোমাকে একটি অজের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। গ্রহ কাটলে তবেই না স্বামী হিসেবে পেয়েছ ধৃতরাষ্ট্রকে।... তাই দুর্যোধনকে সব্বাই বেছন পাঁঠার বাচ্চা বলে!

দুই বৃদ্ধ নির্জনে ঐতিহাসিক তৃপ্তিতে হেসে উঠল। আর অধর ঘোষের মেয়ে গান্ধারী—গান্ধারী কংসবণিক— হঠাৎ শুনে, কেন জানি, দেহের মধ্যে চমকে উঠল। তলপেটের গভীরে কী যেন সন্ধ্যার আঁধারে নড়ে উঠল। তার প্রথম সন্তান। নদীর বাতাস যেন ফিসফিস বলে গেল, অশুভ-কুলক্ষণ কেবল নারী শরীরেই প্রবেশ করে, তাই এ-যাত্রা তার মেয়ে হবে। গোপন ইচ্ছে হল, নাম রাখবে গান্ধারী। হোক না, নিজেরও পরিচয়। গান্ধারী তো মেয়েদেরই নাম!

অনুষ্টুপ: শারদীয় ১৪০৭

রেডিয়াম ! রেডিয়াম

রাঙাকাকা যখন বাণীমাসির কয়েকটি গয়না সরিয়ে ফেলে, একমাত্র আদিত্যই ঘরে উপস্থিত ছিল। সাক্ষী। এই কাকা তার আপন নয়, বাবার দূর সম্পর্কের ভাই। কিন্তু বিপুল ও বিশাল মল্লিক পরিবারটি আজও ঠাকুর্দা দিব্যনাথের শাসনে ডালপালা নিয়ে যৌথ আছে বলেই রাঙাকাকা আদিত্যের রাঙাকাকাই। বাড়ির উঠোনে আজও পরি আছে, আছে, শ্বেতপাথরের শিল্প ও আভিজাত্যের নিদর্শন। তবে আজ আর দৈনন্দিন গুরুত্ব নেই এ-সবের। দু-তিন পুরুষের পারিবারিক রঙের ব্যবসা— এই পরিচয়েই বিশাল বাড়িটি চিহ্নিত এবং নব্বুই বছরেও অটুট স্বাস্থ্যের দিব্যনাথ শেয়ার, ডিবেঞ্চার থেকে সাম্প্রতিক বহুজাতিক পুঁজির গিলে খাওয়া হাঁ-টি হাড়ে হাড়ে সহ্য করছেন।

বাণীমাসি এসেছিল ছেলেমেয়ে নিয়ে এ-বাড়িতে কোনো বিয়ের উপলক্ষে। এসব দিব্যনাথেরই সৌজন্য, অনুশাসন। যে কোনো বৃহৎ উৎসবে সব পুরুষ সদস্যরাই যার যার শ্বশুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবে। তাই আদিত্যের বাবা প্রিয়নাথ নিজে গিয়ে বাণীমাসিকে নিচারকের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। বউ মরার পর এই শ্যালিকা প্রিয়নাথের খুবই আপন। বাজি, রোশনচৌকি তত্ত্ব আসা—পুরণো যাঁড় দিনের সবটুকু গ্ল্যামার না মানা গেলেও, মল্লিকবাড়ির বিয়ে-অনুষ্ঠান আজও ক্যাটারিং এর যুগে একটি স্থাপত্যকর্ম বটে।

আর এ বাড়িতে ধুমধাম শুরু হলেই আদিত্যর অবস্থা ফাঁদে পড়া ভীরু খরগোসের মতো। না পারে মন খুলে হৈ-হুল্লোড়ে যোগ দিতে, না হয় সবকিছু এড়িয়ে নির্জনে আপন চিন্তায় বিভোর হওয়া। সব ঘরবাড়িই তখন অধিকৃত হয়ে যায়। যেমন বাণীমাসি স্যুটকেস, গয়না, প্রসাধনের টুকিটাকি সহ উঠেছে খোদ আদিত্যর প্রান্তের ঘরখানিতে। বেশ নিরিবিলি। চৌদ্দ বাই দশ ঘরটিতে সে নিজেই থাকে, তার নানা কল্পরাজ্যের একটি রাজধানী যেন। সাতাশ বছরের আদিত্য এ বংশে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পারিবারিক ব্যাবসাতে সে নিজেকে নিয়োগ করেনি, দিব্যনাথকে মুখ ফুটে বলেই দিয়েছিল। মৃদুভাষী, সৎ ও সদাচারের জীবন্ত ভাবমূর্তিটি নিয়ে আদিত্যের পেছনে যে যাই হাসি-তামাশা করুক না কেন, চিরতরুণ দিব্যনাথ আজও নাতিকে একান্তে বসিয়ে এ-বাড়িতে কারো বিরুদ্ধে বিচার-সাক্ষীর রায়টি চূড়ান্ত মেনে নেবে। এই ভাবমূর্তিটুকু আদিত্যর স্বীকৃত হয়ে গেছে পরিবারে। হয়তো, কোনো কাজের মানুষ এসে আস্তে বলল, 'দাদাবাবু ডাকছেন', আদিত্য বোঝে

কাউকে নিয়ে গেরো বেধেছে। 'কী হল রে বাবা!' মনে মনে আদিত্য হাসে, বেশ খানিকটা হেঁটে দাদুর ঘরে উঁকি দেয়, দেখে দুজন কর্মচারী কম্প্যুটারে হিসেব রাখছে। ঘরটিকে দাদুর ব্যক্তিগত চেম্বার বা মল্লিক পরিবারের ব্যবসায়িক মস্তিষ্কের কেন্দ্র বলা যেতে পারে। 'সঞ্জয়রূপ' যন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মতো তিনি ব্যাবসা-কুরুক্ষেত্রের সব কিছু খবর রাখেন। দরজায় ছায়া দেখে আদর ও স্নেহের দৃষ্টিতে 'এসো'! বলে, কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানি খালি করিয়ে দেন। কর্মচারীরাও জানে, নাতির সঙ্গে মালিকের এখন একান্তে পারিবারিক কথাবার্তা হবে।

ঘর খালি হলে, বুড়ো প্রথমেই বলেন—তুমি তো আর এসবে মাথা দিলে না!

—ওসব পারব না দাদু! ক্ষমা-ঘেন্না করে দেবেন!

—দিয়েছি বাপু! এখন ডাকলাম অন্য কারণে। এবার দাদু সংসারটা অন্তত করো, মেঘে-মেঘে কম বেলা হল না!

টকটকে ফর্সা আদিত্যর ধ্যানমগ্ন চোখজোড়া নিয়ে গালদু'টো আরক্ত হয়ে উঠল। মৃদু হেসে, আস্তে বলে—এই তাহলে ডাকবার কারণ?

দিব্যনাথ রসিকের মতো চোখ নাচান—না, না! অন্য কারণ আছে।... কথার পিঠে বলছিলাম তোমার সংসার করার কথা... যদি সিদ্ধান্ত করেই থাকো, অন্যভাবে জীবনটা কাটাবে, তারও ঘোষণা দরকার!

আদিত্য চুপ। দু-গ্লাস শরবত রেখে গেল কাজের মহিলা। দাদুর এ-ঘরে একান্তে বসলে এ-আপ্যায়ন জুটবেই আদিত্যের। মল্লিক পরিবারের ঐতিহ্যময় ঘরোয়া শরবত পান করলে দেহমন অদ্ভুত স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

—বলছিলাম, তোমার একটি মতামত। দাদু কাজের কথায় এলেন।

—কিসের?

চোখজোড়া উজ্জ্বল করে দিব্যনাথ বলে—নজরে পড়েছে কখনো ইন্দ্রনাথ ছেলেকে দিয়ে কিছু সাইড-বিজনেস করায়?... তুমি জানো ইন্দ্রনাথ পরিবারিক ব্যাবসার লভ্যাংশ পায়, ছেলে তার পে-রোলে আছে সেখানে...এটা সত্যি হলে তারা শাস্তি পাবে।

ইন্দ্রনাথ দিব্যনাথের দ্বিতীয় পুত্র। ৪৫-এর ওপর বয়স হয়েছে বলেই কারবারের লভ্যাংশ পায় এবং ছেলে পতঞ্জলি পে-রোলে ব্যবসায়ে কর্মচারী। এটাই নিয়ম মল্লিক বংশে।

আদিত্য স্থির নিঃশ্বাস ফেলে, সরল দৃষ্টিতে চোখজোড়া তুলে তাকাল।

—এ খবর আপনাকে পৌঁছে দিল কে?

—কেন ?... আলোকনাথের বড় ছেলে!

—ফণীন্দ্র আপনাকে ঠিক তথ্য দেয়নি!

—মানে?

আদিত্য হেসে বলে—ইন্দ্র জ্যাঠাকে ফণীন্দ্র সহ্য করতে পারে না।... তাই আপনার কান ভারি

করেছে।

দিব্যনাথ আত্মগত বিশ্লেষণ করতে থাকেন। আদিত্যই চূড়ান্ত। আর কোনো যাচাই চলে না। আদিত্য আরও বলে— ব্যবসা-ট্যবসা নয়, পতঞ্জলি ক্লাব থেকে রাত করে ফেরে।... ওর তাসের নেশা আছে!

শুধু দাদু নন, সংসার-বাতাবরণে আদিত্যর এই ভাবমূর্তি বহুদিন ধরেই একটু-একটু বিস্তারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। চেহারা, রং, ধুতি-পাঞ্জাবি, বিনয়, অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি—মল্লিক বংশে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, আদিত্যের একটি স্থান পাকা আছে—বিবেক ও বিশ্বাসের। তাই বাণীমাসির গয়না চুরির ঘটনা আদিত্যের বাবার কানে পৌঁছলে, ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান সম্মানের জন্য। মেসোমশাই চম্পক, বাণীর স্বামী, ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাটিতে নিমরাজি ছিলেন।

—ছেড়ে দিন প্রিয়দা।... যা গেছে, গেছে।

—বাবা শুনবেন কেন?

এক ফাঁকে, মাথা চুলকে পিতা দিব্যনাথের কাছে ব্যক্ত করতেই, নব্বুই বছরের বৃদ্ধ দৃষ্টি কঠিন করে বলেন— ভালো করে খুঁজেছে?

—হ্যাঁ। তাই তো জানি!

—কোথায় রেখেছিলে?

—তালা দেওয়া ছিল?

—কাজের বাড়িতে কি তা ভালো দেখায়? নাকি মল্লিক বংশে দরকার হয় তা?

দিব্যনাথ বুঝলেন প্রশ্নটা গোবর হয়ে গেছে। চম্পক গুপ্তও পয়সাওয়ালা, খোদ লালবাজারের উচ্চ কর্মী, এক-আধখানা সোনার গয়নার জন্য হা-হুতোশে আভিজাত্য খোয়াবে না। কিন্তু এ-বাড়ির সম্মান তাতে অটুট থাকবে? দিব্যনাথ জরুরি গলায় জিজ্ঞেস করলেন— কে ছিল ওঘরে, তখন?

—কখন?

—যখন খোয়া গেল?

—আদিত্য।

—দিব্যনাথ দৃষ্টি ক্ষুদ্র করে বলেন—ঠিক জানো তুমি?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে! তাহলে চিন্তা নেই। অপরাধী ধরা যাবে!

এসব ঘটনা আড়াই কি বছর তিনেক আগের। আজ হঠাৎ মনে ভেসে উঠল কেন আদিত্যর? এই মুহূর্তে? কিছু আগে, আদিত্যর বড়দার মেয়ে চারু যখন বলে গেল 'কাকু তোমার বাণীমাসির ফোন'! রিসিভারের ঘরে যেতে যেতে অনেক কিছু সদাঅতীত মনে ভেসে ওঠে।

একমাত্র বাণীমাসির ফোন এলেই সে ভারি সুন্দর একটি সুখানুভূতিতে আক্রান্ত হতে থাকে। খাঁচার নরম কুটুরিতে শুরু হয় মৃদু ধুকপুকানি। প্রতিবারই মাসি কথা বলার মধ্যে বিশেষ কিছু হেঁয়ালি ব্যবহার করে। তাতে আকর্ষণীয় ভঙ্গি থাকে। যেন বা অদৃশ্য চুম্বকের টান।

—কিরে ভুতু, কেমন আছিস?

—ভালো। তোমরা?

—আমরা না আমি? এদিকে পা দিচ্ছিস না যে?

—যাব, যাব। সময় করতে পারছি না।

—পারিসও! উড়ে-পুড়ে মরল ঝি/এখন আমি করব কী!

আদিত্য হেসে— কে-উ মরবে না মাসি!

—শুনলাম তুই নাকি দেড়মাস আমার বাড়ি আসিস না?

—শোনার দোষ কী? কে বলল?

—ন্যা-কা!

বাণীমাসি দেখতে পাচ্ছে না, ফোনের এ-প্রান্তে আদিত্যর গালে রক্তিম আভা এবং চোখজোড়ায় মৃদু সংশয় ও অপরাধবোধ! অথচ, দু-দিন বাদেই হাজির বাণীমাসির বাড়ি। এটা কি প্রশয়?

আজ কিন্তু ভাইঝির পেছু পেছু ঘরে ঢুকে রিসিভার তুলতেই বাণীমাসি ও-প্রান্তে বলে— ভুতু?

—বলছি!...হ্যাঁ, মাসি বলো!

—এক্ষুণি আসতে হবে।...আমার বাড়ি।

—কেন?

—বলব, স-ব বলব! রিসিভার ফেলার শব্দ। এত সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনে মাসি কোনো দিন ফোন করে না। আদিত্য বুঝে নেয় এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া দরকার।

দুই

মা যখন মারা যায়, আদিত্য নেহাতই শিশু, তিন-চার বছরের হবে। বিয়োগ-ব্যথা যথাযথ উপলব্ধির বয়স হয়নি। কিন্তু একা একা, নির্জনে অদিত্য মাকে প্রায়ই দেখতে পেত, এবং দৃশ্যভাবনাটাই পরবর্তী বয়সে আদিত্যকে গড়ে দিয়েছিল ভিন্ন মাত্রায়। আহারে, পোশাকে, চিন্তাধারায় মল্লিক বংশের বাকি সদস্যদের থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন রাস্তায় সে বড় হয়। লজ্জা, বিবেক, ভয় এবং একটি জীবন বোধ তাকে আশ্রয় করে সুদৃশ্য পটভূমি গড়ে দেয়। যেমন ছবির পেছনে একটি ফ্রেম।

সংসারে অদিত্য দু-জন মানুষকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। দাদু দিব্যনাথ এবং পারিবারিক মাস্টারমশাই কিশোরীমোহন সেনশর্মা। অশীতিপর পন্ডিত-বৃদ্ধ শুধু আদিত্যর কাছেই নয়, মল্লিক পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে অসীম শ্রদ্ধার। যে কোনো পারিবারিক বিপর্যয় ও সংকটে ওনার মতামত

আলোর দিশার মতো। এখন তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে বিশেষ বেরুতে পারেন না। কোমরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ।

মানসিক বিপর্যয়-পর্বে, আদর্শ ছাত্রের মতো তিনি আদিত্যকে তৈরি করেছিলেন। শুধু আঁক বা ব্যাকরণে শিক্ষা নয়, তিনি বলতেন—ভুতু, কারো জীবনে মা চিরকাল টিকে থাকেন না।...ফল রেখে গাছ মরবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম!

—অনেকেরই মা বাঁচে বড় হওয়া পর্যন্ত, আমি কেন অকালে হারালাম?

—জগতে এটাই তো বিস্ময়!

—কী?

—কোনো কিছুই কষে ঘটে না।...ভাগ্য!

খানিক চুপ থেকে ভুতু—সব কিছুই ভাগ্য?

—চান্স!...বিশৃঙ্খলা!

কিশোরীমোহন আরও বলতেন—জীবনে কোনো কিছু চাইবে না! যদি পেয়ে যাও, নিজেকে ধন্যবাদ জানাবে! এটাই সত্য।

আদিত্য চোখ তোলে—সত্য? সত্য কী?

কিশোরীমোহন হেসে জবাব দিলেন—বহুর মধ্যে যা তুলনায় খাঁটি। গ্রিকরা বলত, সত্য এক ধরনের উপলব্ধি!

—সব মানুষের এটুকু বোঝার সাধ্য আছে?

—না । এটা মহৎ একটি গুণ। গর্জন করতে হয়।

—কীভাবে?

—জ্ঞান, দৃষ্টি, ভালোবাসা দিয়ে!... সংসারে সবাই তো জন্মায়, কিন্তু মানুষ হতে গেলে প্রকৃত জ্ঞানের দরকার।

আদিত্য কিশোরী স্যারের কাছে ইংরেজি, অঙ্ক এবং ইতিহাস শিখেছিল। কিছুদিন আশ্রমে হায়ার সেকেন্ডারি ও বি.এ. পড়লেও, স্যারের সম্পর্ক অটুট। দাদু দিব্যনাথ পর্যন্ত অবসাদে ভুগলে, নিজে গাড়িটি চেপে কিশোরীমোহনের নানা পরামর্শ নিয়ে আসেন। অদ্ভুত ক্ষমতায় তিনি বিষাদ ধুয়ে-মুছে দিতে পারেন।

বলতে গেলে, মল্লিক বংশের পারিবারিক দিশারি তিনি। তিনিই একদিন দিব্যনাথকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন— আপনাদের বংশে আদিত্যই বিরল!...ছোট বলে উপেক্ষা করবেন না ওকে!

—কী রকম?

—অন্যভাবে গড়ে উঠেছে। সত্যের জন্য সব ত্যাগ করবে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্য ত্যাগ করবে না। ওকে দয়া করে পারিবারিক কারবারে লাগাবেন না। সংসারে আস্থাবানের খুব অভাব।

—না, না, মাস্টারমশাই।... কেন লাগাব? আপনাদের আশীর্বাদে আমার অভাব কিসের?... এখনও মা-হারা সন্তানটির খরচ আমি বইছি!... ওর বাবার ওপর চাপাইনি।

সুখে-দুখে, উৎসবে-বিপদে কিশোরীমোহন মল্লিক পরিবারে আত্মিক শুভাকাঙ্ক্ষী। জরুরি দরকার হলে, দিব্যনাথ সম্মানীয় অতিথিটিকে গাড়ি পাঠিয়ে আনা করান, আশীর্বাদ নেন। আদিত্য যৌবনে পা দেওয়ার পর, কিশোরী স্যারই বলেছিলেন --মল্লিকবাবু, বস্তু খুব কাছে থাকলে যেমন দেখতে পাই না, দূর বেশি হলেও অন্ধ। আমার কাছে পরামর্শ করতে আসেন, অথচ ঘরের মধ্যেই আপনার খাঁটি মানুষটি আছে। ওকে নিজের আস্থার মধ্যে রাখুন!

দিব্যনাত খুশিতে হেসে উঠেছিলেন ---ভুতু? জানি মাস্টারমশাই। ইদানীং পরিবারের সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই আদিত্য বাণীমাসির স্নেহচ্ছায় খানিকটা স্বাভাবিক বিকশিত। ও বলে --জানো মাসি, মনের কিছু অভাব জীবভর জাঁকিয়ে থাকে, যায় না। তা মেটাতেই তোমার আসি।

--বড় হয়েছিস, সংসার করবি, তাহলেই দেখবি মাসি ফিকে হয়ে গেছে। আাদিত্য হাসে না। প্রতিবাদ করে না। এখানে এলেই তার অদ্ভুত জন্মায়। যে-ভাবমূর্তির আধারে ২৪/২৫ বছরে আদিত্যর জীবন-বৃক্ষটি ফ্রেমবাঁধা, সেখানে সামান্য ভঙ্গুরতার সে অপ্রান চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখতে। আবার কিছুদিন ও-বাড়ির যোগাযোগ না থাকলে ছোট্ট একটি তৃষ্ণা উড়িয়ে হাজির করে এখানে। মাসি কি টের পায়? নইলে হেঁয়ালি ভাষার টেলিফোন করে কেন? তার গোপন কিছু বাসনা আছে? কতদিন লক্ষ্য করেছে, আচমকা এ-বাড়িতে সে কযেক ঘন্টার জন্যও হাজির হলে, আগমনের খবর গুপ্ত থাকেন না। মেয়েটি হাজির হয় ঠিক। যেন কোনা দরকারি কাজে হঠাৎ বেমনা হাজির হয়েছে!

কিন্তু আদিত্যের মুখ ফুটে কথা বেরোনো কি চট্টিখানি ব্যাপার? অরপাধব্যোধ ও ভাবমূর্তির টানাপোড়েনে সে কুটিকুটি হয়। তবু জয়া হাজির হলেই মাসি অহতুেক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে --তোর পার্ট-টু এবার, না?

---জানো না তুমি?

----অনার্স যেন কিসে?

---সে কী! দর্শনে।

---আজকাল চাকরি-বাকরি হয় ওতে? নাকি পড়তে হয় বলে পড়া?

---দাঁড়াও, পাসটা করতে দাও, বউদি!

---তুই আবার পাস করবি না তা হয়?

---কিছু বলা যায় না। .... সবটাই চান্স!

প্রথমদিন এ আলোচনায় অংশ নিতে আদিত্যর প্রবল ইচ্ছে থাকলেও, নিজেকে ক্রমাগত সংযত রেখেছিল। মাসি যদি কিছু মনে করে বসে? হ্যাংলামি তাছাড়া ভালো মন্দ, নীতি

অনীতির প্রবল চাপে আদিত্য কখনোই নিজেকে মুক্ত করে সহজ হতে পারেনি । প্রতিটি মানুষেরই কিছু ভাবমূর্তি থাকে । তার জোরেই সে অনন্য ।

এভাবেই এ-বাড়িতে শুরু হয়েছিল বাণীমালি হেঁয়ালি । এবং অদ্ভুত, মাসি কাজের ছুতোর চলে গেলেই ঘরের মধ্যে কেবল জয়, অথচ দুস্তর বাধা । হীনমনত্যা ও মূল্যবোধ তাকে ঘা দিতে থাকত । তাই জয়ার সঙ্গে আলোচনার উপযুক্ত বিষয় পাওয়া যেত না । কোনো প্রসঙ্গ তাগিদ সৃষ্টি করলেই, নিষেধ চোক রাঙাত --এগুলো ছলনা ! এই বুঝি মেয়েটি টের পেয়ে যাবে, কথা বলার জন্যই কথা বলা । ছিঃ! কিন্তু গ্রীবা, দৃষ্টি বা চুলের কৃষ্ণ ঢল -এ তো মোহময় কোনো সৃষ্টি হতে পারে ! এই তো মাসির কাছে খানিক আগে, জয়া যখন কথা বলছিল, ঘরময় খুশির অজানা সঙ্গীত ! বিষয়-দর্শন নিয়েই তো আদিত্য আলোচনায় ঢুকে যেতে পারত । মনের মধ্যে গোছাতে গোছাতেই টের পেল, দু-জন প্রসঙ্গ বদলে ভিন্ন বিষয়ে চলে গেছে ।

প্রথম যে-প্রসঙ্গে আদিত্য জয়ার সঙ্গে মুখ খোলে, তা নিজের কাছে ভয়ানক জরুরি ঠেকলেও নিছকই ছিল মামুলি ।

শীতকাল । বাণী বউদির কাছে আদিত্যর আগমনের ইঙ্গিত পেয়ে, জরুরি কাজের ছুতোর হাজির হতে,জয়া ভুলেই গেছল চটি পরতে । উপর-নীচ ফ্ল্যাট বাড়ি তো । সাজপোশাকের অত নিয়মকানুন নাই ।

ঘরে টুকটাক কথার পর মাসি এদের ছেড়ে রেখে গেল । কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না । হঠাৎ, এতদিনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আদিত্য বলে ---আপনি খালি পায়ে ? মার্বেলের মেঝেতে ?

---কেন ? কী হয়েছে ? জয়ার নিষ্পাপ, উজ্জ্বল চাউনি । কৌতূহলী কণ্ঠ ।

---তাপ-বৈষম্য ঘটতে পারে । .... শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ ।

---কী হয় তাতে ?

---মানে ? কী হয় না বলুন ! মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত জানেন ? ..... আর জানুয়ারী মাসের মার্বেল ? ..... এই যে তাপের ফারাক .....

---আপনি সায়েন্সের ?

--সবকিছুই সায়েন্স ..বিজ্ঞান মানে প্রকৃতির নিয়ম ওই যে একদিন পাসের ব্যাপারে বলছিলেন চান্স ..... এই চান্স থেকেই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মানুষের আবির্ভাব!

জয়া মুচকি হেসে উত্তর দেয় --চটি না পরে ঠাণ্ডা লাগছে বটে ..... এত জটিল ব্যাপার তো ভাবিনি !

আচমকা জয়ার সঙ্গে সিলেবাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় আদিত্য ঈষৎ স্বাভাবিক হয়ে গেলেও আপনি সম্বোধনের আড়ষ্টতা ছাড়তে পারেনি । বাণীমাসি হেসে ধরিয়েও দিয়েছিল ---- তোর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট । আপনি করছিস কেন ?

জয়ার বাবা সমরেশ গুহ একজন উঁচু সরকারি আমলা । বাণীমাসিদের সঙ্গে পারিবারিক

সম্পর্ক খুবই নিবিড় । হপ্তাখানেক বাদে যখন আদিত্য ফের হাজির জয়া দুষ্টুমির জন্য এসেও যেন এ ঘরে ঢুকল না । এমনভাবে হেঁটে গেল, আদিত্য চটি পরাটুকু যেন টের পায় । এবং ব্যাপারটা তাকে ভীষণ আলোড়িত করে । তখনই সুতীব্র হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয় নিজের পৌরুষ ও ভাবমূর্তি নিযে। তাহলে কি মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না ?

এর পরে-পরে জয়ার সঙ্গে কিছু স্বাভাবিক কথাবার্তা হলেও টানপোড়েন শান্ত হাতে চায় না । আপনি সম্বোধনটি ছলনাই করে যায় । একদিন শীতের সকাল, ছুটির দিন, জয়া বাণী বউদিকে বলে -এলাকার মিলেনিয়াম পার্কটা দেখছ ? গত মাসে চালু হয় যেটা ?

--না রে ! শুনছি দারুণ হয়েছে ?

--গাছ, পাথর ঝর্ণা ...একেবারে ন্যাচারাল ।

আদিত্য যেন দু-জনের আলোচনায় অনুৎসাহী, মন দিয়ে একটা ম্যাগাজিন দেখছে । হঠাৎ বাণীমাসি বলে উঠল ----- যাবি নাকি ভূতু ?

জয়া হেসে বলে ---ভূতু ? আনপানর নাম ? .... এ নাম কেউ রাখে না আজকাল !

আদিত্য গম্ভীর ---নামে কী আসে যায় । গোলাপকে যে নামেই ডাকুন ...বলুন তো কার উক্তি ?

---কী জানি বাবা । .... অত মনে রাখতে পারি না । .... বউদি যাবে ? আপনি ও চলুন, ঘুরে আসি ।

--ভুতু আর তুই যা . মাংসটা নামিয়ে আমি যাচ্ছি ...কর্তার আবার ছুটির দিনে অফিস ।

বলতে গেলে বাণীর প্রবল উৎসাহে, জয়া এবং আদিত্য মিলেনিয়াম পার্ক দেখতে চলে এল । আদিত্য পাশাপাশি এমনভাবে হাঁটে যেন ছোঁয়া লেগে গেলেই অপরাধ । মেয়েটি গোপন উত্তেজনা অনুভব করে ।

----বাণীমাসি আসবে না ?

---দেখা যাক ! না এলে আর কী করবেন ! জয়া বলে ।

----কবে উদ্বোধন হয়েছিল এটির ?

--মাসখানেক । কাগজে পড়েননি ?

---কত কিছুই তো পড়ি সব কি মনে রাখা সম্ভব ?

---পার্কে ঢুকতে কিন্তু টিকিট কাটতে হয় ল

---ভাবছেন কেন ?

---হুট করেক বেরিয়ে এলাম, পার্সটা ।

---আনলেও কি ব্যবহার করতে দিতাম ?

জয়া ঠোঁট-লুকোনো, গ্রীবা বাঁকিয়ে বলে ---মেয়েরা খরচা করলে পৌরুষে লাগে ? নিজেরাই শুধু ক্রেডিট নিতে চান ?

---ক্রেডিট বলছেন কেন ? কর্তব্য মনে করি ।

তারপর জড়তা, লোকচক্ষু, পথ এবং আড়ষ্টতা নিয়ে আদিত্য পার্কে ঢুকে ভীষণ আনন্দ পেল ।অকেক্ষণ ঘুরে, যেন ক্লান্ত, জয়া একটা নিরিবিলি পাথরের খণ্ডে বসে পড়তে, আদিত্য ভেবে পায় না কী করবে । পাশে বসবে নাকি আপনমনে ঘুরে ঘুরে দেখবে ?

জয়া বলে --বিশ্রামে আপত্তি আছে ?

সমস্ত বাধা ঠেলে আদি... ...রে বসল বটে, ফারাক ছিল মাঝে।

জয়া বলে ---আচ্ছা, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না তো ?

--কী ?

---কর্তব্য-টর্তব্য শব্দগুলো কি শুধু পুরুষদের জন্য ?

--বিষয়টা ভোলেনি দেখছি !

--ভুলব কেন ? পুরুষদের মাতব্বরি দেখলে ভীষণ রাগ হয় !

আদিত্য বলে --যদি তাই-ই হয়, পুরুষদের সব মাতব্বরি কেড়ে নিতে আপনাদেরই বা এত মাথাব্যথা কেন ?

জয়া বলে --সব মাতব্বরির কথা বলছি না .. সেখানে পুরুষদের স্থান পুরুষদের ..। অন্য ব্যাপারে দাবি আমার রাখতেই পারি !

আদিত্য বলে ---কোন কোন মাতব্বরি ? যেখানে পুরুষদের স্থান পুরুষেরই ?

জয়া হেসে পাশ কাটায় । তার ফর্সা মুখ ঈষৎ রক্তিম হয় । ঘুরিয়ে বলে ---বউদির কাছে শুনেছে , আপনি নাকি মল্লিক পরিবারের বিবেক ?

---মানে ?

--বিবেক বলতে যা-যা বোঝায় !

--খুলে বলুন ।

---আদর্শ ..ভাবমূর্তি মূল্যবোধ !

--মেয়েরা বোধহয় ফ্রেম ছাড়াই ছবি পছন্দ করে ? ব্যক্তির পরিবারের সমাজের ? জয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে --আপনার ভীষণ দম্ভ ।

--কী কাণ্ড ! দাম্ভিক হব কেন ? আদিত্য অবাক ... আদিত্য অবাক- কী নিয়ে দম্ভ করব ? কী আছে আমার ?

---কেন, আপনার ভাবমূর্তি !

--সে তো কেউ পছন্দ করে না ।

---এখন কেউ, একটু আগে যে বললেন- মেয়েরা ? মেয়ে জাতটিকে অত হীন মনে করবেন না ।.... পার্লামেন্টে মহিলা বিল কেন পাস হয় না জানেন ? আপনারা ভয় পান ।

আদিত্য বলে ---পাস হলেও আমার-আপনার বাড়ির মেয়েদের কী হবে ? .... ছাড়ুন অর্থহীন বিতণ্ডা !

আদিত্যর মনে হল এই রোদ, আকাশ গাছের ছায়া, পাথরের কৃত্রিম অবয়ব --- সব যেন রঙে একাকার । ইস ! কখন যে-দুটি ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, টেরই পাওয়া যায়নি । সময় ! এর কোনো মাপজোখ হয় না । এটা পরিস্থিতি নির্ভর । কখনো ঘড়ি যেন চলে না, কখনো বা ঘোড়ার মতো ছুটে চলে ।

--বাণীমাসির মাংস কি এখনও সিদ্ধ হচ্ছে ?

--বউদির খোঁজ করে লাভ নেই চলুন । আসবে না আমি জানতাম !

--জানতেন ? কই বলেননি তো আমায় ? .... বাড়িতেই জানাতে পারতেন আপনি ! জয়া কপট বিরক্তিতে ---বাব্বা !

--কী ?

---আপনার ছাত্রী নই ... সেই থেকে আপনি করছেন কেন ?

তবু আদিত্য এই সম্বোধনটুকু শালীন মনে করে । সম্পর্ক জটিল থাকুক চটুল হবে কেন ? তাছাড়া কোনা অবস্থাতেই ফ্রেম খুলে ফেলা যায় না ছবির ।

এরপর, হপ্তাখানেক বাদে একদিন, সে সরাসরি জয়াদের ফ্ল্যাটেই টানে ফোন তুলে জিজ্ঞেস করে -- শুনলাম জ্বরে ভুগছেন ?

--জ্বর । .... কার কাছে শুনলেন ?

--জ্বর হয়নি ? আপনার তো হুটহাট খালি পায়ে চলার অভ্যেস । ..... বোধহয় বাণী মাসি বলছিল যেন !

অথবা কোন গভীর বর্ষায়, রিসিভার তুলে বিনা ভূমিকায় আদিত্য জিজ্ঞেস করে ----

---কিসের ?

---আপনাদের পাড়া ডুবে যায়নি তো ?

---আমি অন্তত ডুবিনি !

---আমি তা আশাও করি না !

---কেন ? কেন ? তবে কী আশা করেন ? জয়ার ইঙ্গিতময় হাসি ।

---না, না ইয়ার্কি নয় ..... যেভাবে নামল, দেখবেন বিপর্যয় না ঘটিয়ে ছাড়বে না ।

---ছাড়ুন, কেমন আছেন ?

--কাল ভিজেছিলাম, জ্বর এল বলে !

বেশ হয়েছে একা একা পড়ে থাকুন বিছানায় ...

জয়ার রিনরিনে হাসিতে, আদিত্যর খাঁচার সবকিছু বেলুনের মতো লঘু হয়ে উড়তে থাকে ।

বাণীমাসির কিছু প্রত্যাশা আছে ? কোনো সুদূর পরিকল্পনা ? খুলে কিছুই বলে না অথচ প্রায়ই ফোন করে নানা হেঁয়ালি । এমনকী জয়াকে নিয়ে একদিন ঘুরেও গেল এবাড়ি । বাবা ভীষণ খুশি হন বাণীমাসি এলে ।

জয়া এখন সরাসরি ফোন করলে, পরীক্ষার বিষয়ে কিছু জানতে চায় । মেয়েটি দশজনের মতো শুধু নোট মেরে নম্বর নিতে রাজি নয় । জটিল প্রশ্ন করেক আদিত্যকে । ও কি মনে করে নর-নারীর রক্তমাংসের অস্তিত্বের বাইরেও অনেক কিছু প্রয়োজনীয় আছে ?

---দুঃখবাদ সম্পর্কে কিছু নোট লিখে দেবেন ?

---দুঃখবাদ ! ..... সিলেবাসে আছে আপনাদের ?

---নিৎস আমাদের পড়তে হয় । এটা পাশ্চাত্য দর্শন, তাই না ?

--দুঃখবাদ ? ..... প্রাচ্যেও আছে । রামপ্রসাদ মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মাঝে মাঝে বাণীমাসির ফ্ল্যাট আদ্যিত বিবেকানন্দর কর্মবাদ নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন বোঝাতে চাইলে, হঠাৎ জয়া বলত ---মানুষ না আদর্শ ? কোনটা বড় বিবেকানন্দর মধ্যে ?

--দুটোই । .... একটি ছাড়া অন্যটি ফুটবে না । ..বস্তু ও শক্তির মতো ।

---কীরকম ?

--ফ্রেম ছাড়া ছবি বাঁধানো হয় ?

--বুঝলাম না ।

--আকাশ না হলে নক্ষত্র শোভা পায় ? আজ সব কিছুতেই বিশৃঙ্খল কেন ? দেখবে ন রেডিয়াম নিভে গেলে, শুধু সিসা পড়ে থাকে !

এরপর জয়া এ-বাড়িরই একজন হয়ে উঠল । এমনকী প্রিয়নাথ চিকেন -পক্সে আক্রান্ত বাণীমাসি আসবে ...আপনি কি সময় করতে পারবেন ?

---সময় ? করতে পারেন কেউ, করে নেয় সবাই ।

এত স্পষ্ট , এত সরল অথচ এতখানি রহস্যময়ী কোনোদিন জয়াকে বোধ করেনি আদিত্য । তবু আপনি সম্বোধনটুকু ত্যাগ করা যায়নি । বাবাকে কয়েকবার দেখতে আসর মধ্যেও ।

সেই বিয়েতে বাণীমাসির আসার পর থকে, এভাবে প্রায় তিন-তিনটি বছর রাতের বিভিন্ন প্রহরে সাক্ষী হয়ে কতে বিচিত্র ও সুন্দর আকাশ দেখেছে! এমনকী মল্লিক পরিবারের দিব্যনাথও ভেবেছিলেন আদিত্যর কি সংসার করবার ইচ্ছে করাবর জাগছে ?

তিন

বিয়েবাড়ির তৃতীয় দিনের দুপুরে বাণীমাসি বুঝতে পেরেছিল তাঁর মূল্যবান গয়না খোয়া গেছে । টের পায়নি, গত ২৪ ঘন্টা আগে, ব্যাপারটা ঘটেছিল । তখন গড়ানো দুপুর, সারা বাড়িতে শ্রান্ত-ছোঁয়া । আদিত্য বাড়ির কোনা উদ্বাস্তু মুহূর্তগুলো আপন করতে পারে না, বড্ড টেনশনে থাকে । তাই দুপুরে শ্রান্তিতে নিজের নির্জন ঘরে বিছানায় ছিল চোখবোজা, কপালে দুই হাত

চুপচাপ। সদ্য জয়া তখন পরিবারের নতুন নতুন দিগন্ত গড়ে তুলছে। দর্শন, গণিত, শহরে তাদের বসবাসের অংশের অতীত গৌরবের কথা --বাণীমাসির ফ্ল্যাটে গেলেই দুর্মর কিছু অনুভূত হচ্ছে। অথচ, সারা পরিবারে আদিত্যর অটল ভাবমূর্তি। কোথাও কিছুর স্খলন-পতন ঘটলে, দাদুর ঘরে পরামর্শের জন্য তার ডাক পড়ে। যেমন রাঙাকাকাকে যখন দিব্যনাথ, ব্যবসায়ে ভ্রষ্টাচারের দায়ে পরিবার ছেড়ে অন্যত্র থাকবার হুকুম দিয়েছিলেন, চোখমুখ ফুটে ওঠে আদিত্যর মনে। একদিন দিব্যনাথের ঘরে ঢুকতেই, দাদু মুখ তুলে অবাক ---তুমি ?

--কিছু কথা বলব !

আদিত্যকে না ডাকলে এ-ঘরে আসে না। তাই দিব্যনাথ কিছু প্রমাদ গুনেছিলেন। কম্প্যুটার ছেড়ে কর্মচারীরা সাময়িকরা সাময়িক চলে যেতেই দাদু --কিছু বলবে মনে হচ্ছে ?

---তেমন কিছু নয় !

--বসো ! বসো ! কে আছিস, শরবত .... !

----রাঙাকাকাকে ক্ষমা করে দিন !

---কেন ? বিদ্যনাথের ক্ষমা করে দিন !

----কেন ? দিব্যনাথের হাসি মিলিয়ে যায়।

--লঘু পাপে শাস্তিটা চরম হচ্ছে, দাদু !

---জানো, ক-ত সরিয়েছে ? ...অসাধু মানুষ !

--সবে বিয়ে করেছে ! .... কাকিমার কথা ভাববেন না ?

দিব্যনাথ দীর্ঘ সময় আদিত্যর চোখে দৃষ্টি স্থির রাখলেন। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন --তুমি ক্ষমার অনুরোধ জানাল অন্য কথা ! .... তাই-ই হবে !

আদিত্যর ভাবমূর্তিতে, সরল সত্যবাদিতায় দিব্যনাথ রাঙাকাকাকে মাফ করেছিলেন বটে, পরিবারে রইতেও দিয়েছিলেন কিন্তু কারবারে পুনরায় ঢুকতে দিননি। রুজিরোগারের জন্য রাঙাকাকা সেই থেকে বাইরে টোটো ঘুরে বেড়ায়।

রাঙাকাকা দিনে রাতে বিশেষ কথা বলে না, চলাফেরার মধ্যে সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রাখার লক্ষণ। সমনাসামনি কেউ পড়ে গেলে কৃপাপ্রার্থীরা মতো নির্বাক চোখদুটো তুলে মৃদু হাসে। পরিবারে আশ্রয়টুকুর জন্য আদিত্যর ওপর চিরকৃতজ্ঞ।

সেই রাঙাকাকা তার প্রথম সন্তান জন্মবার পর, চুপিচুপি আদিত্যকে একদিন ডেকে নিজের অন্ধকারচ্ছান্ন কুঠুরিটায় এনে বলেছিলেন ---আজ ছয়যষ্টি! একটু আর্শীর্বাদ করে দে !

---আ-মি ?

--হ্যাঁ, তুমি ! ....পূণ্য হবে ছেলের ! ..... পরিবারে তুই আমাদের অনেক কিছু ! চাঁদ-তারা ! আশীর্বাদের পর রাঙাকাকা একটি সন্দেশ হাতে তুলে দিতে, প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি আদিত্য !

সেই রাঙাকাকা বিয়েবাড়ির নির্জনতার ফাঁকে সেদিন এ-ঘুরে ঢুকেই ভূত দেখে। কাজের

বাড়িতে এ-ঘরে কেউ থাকবে অনুমান করেনি। উত্তেজনায় বলে ---ঘুমুচ্ছিস, আদিত্য ? শরীর খারাপ ?

---না, শুয়ে আছি। বলবে কিছু ?

---শুনলাম তোর কাছে বাড়তি একটা তালা আছে ?

---তালা ? কী করবে ?

--সব্বাই তো বেরুব। .... কাজ-কম্মের বাড়ি। ...

--ড্রয়ারটা টেনে দেকো !

আদিত্য স্পষ্ট দেখতে পেল, তালা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই রাঙাকাকা ঘন ঘন চোরাগোপ্তা বার দুই দৃষ্টিক্ষেপ সেরে, কী যেন ছোঁ মেয়ে ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে। গহনার ঝলক। অথচ আদিত্য বিহ্বল দৃষ্টিতে নির্বাক থেকে গেল। খাঁচার ভেতর মুচড়ে উঠল, ভেসে উঠল রাঙাকাকার বউয়ের মুখ এবং নবজাতকটি। আদিত্য আশীর্বাদ করেছে। ওদের পথেও স্থান হবে না শাস্তি পেলে।

এরই ২৪ ঘন্টা পর, বাণীমাসি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন গয়নার অস্তিত্ব দেখতে পেল না, চাপা টেনশন চোখমুখ গনগন করতে থাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে ফের একটু বাদে ঢুকল। সঙ্গে বাণীমাসির বর ---আদিত্যর মেসো। দু-জনের মধ্যে ইশারা, ফিসফাস নীরব কথাবার্তা। খানিক বাদেই মেসোর কথার ভাঁজে ভাঁজে বিরক্তি, দীর্ঘশ্বাস --এভাবে রাখে কেউ ? ...ছেড়ে দাও ! ডেলিকেট ব্যাপার ! মেসো বেরিয়ে যেতেই মাসির সঙ্গে এবার আদিত্যর চোখাচোখি। সামান্য পাতলা তন্দ্রা এসেছিল। হাতদুটো সরিয়ে চোখ বড় করে তাকায়।

---কী হয়েছে ?

---কিছু না।

--সত্যি কথা বলছ না। আদিত্যর দৃঢ়তায় মাসি এবার সামান্য এবার সামান্য হাসির অভিনয় করল।

--কাল সারাদিন এ ঘরে ছিলি তুই ?

--হ্যাঁ। .... কিছু হয়েছে ?

---তেমন নয়। .... কেউ এ-ঘরে ঢুকেছিল, ভুতু ?

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুল্লতার মতো আদিত্যর কল্পনার রাঙাকাকি ও বাচ্চাটার মুখ ভেসে উঠল। কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না।

---না তো এ? কেন মাসি ?

বাণী এবার বিষয়টি চেপে যায়। কিন্তু চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রিয়নাথের কানে পৌঁছলে, তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। একদিকে বাণী, অন্যদিকে মল্লিক বংশের আভিজাত্য। লজ্জায় ছোট হয়ে গেলেন তিনি। সোজা ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতার হাজির এবং পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে

ক্রমাগত চাপ দিতে থাকলেন, একটা বিহিত হোক। দিব্যনাথও যেন পারিবারিক সম্মানের জন্য সিরিয়াস হয়ে পড়লেন।

—কে ছিল তখন ও-ঘরে ?

—ঠিক ঠিক বলা যায় ? ..... ভুতুই তো দিনরাত থাকে।

দিব্যনাথ যেন পথ খুঁজে পেলেন। ভাবমূর্তির পরিচয়ে, নাকি এটুকু সন্ধান সে দিতেই পারবে। ও থাকলে বরং সুবিধে, ক্ল্যু পেতে অসুবিধে হবে না।

অল্প কিছু সময়ের মধ্যে তলব এবং দাদু জিজ্ঞেস করলেন —তোমায় মাসির গয়না খোয়া গেছে তোমার ঘর থেকে। ছিলে তখন ?

আদিত্য চুপ। সে ধন্দে পড়ে যায়। গলা শুকিয়ে ওঠে। রাঙাকাকার বউ এবং বাচ্চাটার মুখটা ভেসে উঠতেই, আদিত্য বলে —কই! আমি তো ছিলাম না!

এটুকু উচ্চারণই যথেষ্ট মল্লিক বংশের কাছে। এরপর কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকতে পারে না। দিব্যনাথ প্রিয়কে বললেন --সুপ্রিম কোর্টের রায় তো শুনলে ...অন্য কোথাও খোয়া যায়নি তো ?

বাণীর বর —— লালবাজারের দুঁদে অফিসার যিনি —ব্যাপারটা থামিয়ে দিল। কী এমন ঘটনা, যা নিয়ে অস্বাস্থ্যকর জের-তল্লাশি চলতে পারে ?

অমন গয়না দু-পাঁচখানা খোয়া গেলেও বাণীর সাজুগুজুতে টান পড়বে না। চম্পক গুপ্ত দিব্যনাথকে বলে —— মেসোমশাই, ব্যস্ত হবেন না। .... বাড়িতেও ফেলে আসতে পারে। বাণী কী বলছ ?

বাণীমাসি শুকনো গলায় বলে --হতেও পারে।

প্রিয় জোর দিয়ে বলে --চম্পক, ব্যাপারটা আমাকে ভাবতে দাও! তারপর সে বাণীকে ডেকে অন্য ঘরে চলে গেল।

উৎসব মিটবার কয়েকদিনের মধ্যেই রাঙাকাকা সম্পর্কে সন্দেহের বাতাস ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। এবং খোদ দিব্যনাথের কাছে ঘন ঘন দাবি উঠলে, তিনি বেকায়দায় পড়ে যান। কীভাবে ফের আদিত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির প্রসঙ্গভাজন ব্যক্তিটির প্রসঙ্গ ? তাহলে তো, নাতিকেই অবিশ্বাস করা হয়। যদি ক্ষোভে গুম মেরে যায় ! নাতির কাছে বুড়ো বয়সে ভাবমূর্তি ছোট হয়ে যাবে না দিব্যনাত্রের ? ও তো মল্লিক বংশের আস্থার শেষ কথা!

তবে রাঙাকাকা অর্থাৎ ফটিকের সম্পর্কে পুরনো ক্ষোভ দিব্যনাথের ষোলো আনা লুপ্ত হয়নি। উনি তখন কিশোরিমোহনে শরণাপন্ন হয়ে বললেন --মাস্টারমশাই, আপনি একবার ভুতুকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে .....কোনো ভুল বুঝবে না। ব্যাপারটা মল্লিক বংশের আঁতে এসে ঠেকেছে।

কিশোরী হেসে বললেন —কোনো প্রয়োজন আছে ? ঘটনা কিছু উলটো হবে তাতে ?

আদিত্য যখন সাক্ষী দিয়েই ফেলেছে ....

--তবু একবার । .... ছেলের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক ..ঘটেছে আমার বাড়ির উৎসবে এসে । ... কুলাঙ্গার ফটিকনাথের আমি ভূতুর কথাতেই ক্ষমা করে দিয়েছিলুম ।

--বে-শ ! কিশোররীমোহন মিহি হাসিতে, সাদা লম্বা দাড়ি আদর করতে থাকেন ।

দিন দুই পর, মাস্টারমশাইয়ের তলবে আদিত্য সব ব্যস্ততা রেখে হাজির হতেই, নানা কুশলের পর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন ..বাবা মনে করো না ..... তোমাদের ফটিকনাথ কোনো দুস্কর্ম করতে পারে ?

----ও নিতেই পারে না ।

আদিত্যনাথের সাক্ষীতে কিশোরীমোহন মাঝপথে থেমে গেলেন ।দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজের পরিত খেদ জ গায় । বিশ্বাস না করা পাপ! ব্যাপারটার ইতি ঘটল এখানেই । বাণীমাসির বর চম্পক অকপটে ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলে দিব্যনাথকে এবং ভায়রা প্রিয়নাথকে দেয় পিঠ চাপড়ে । এরপর, তিনবছর ধরে বাণীমাসির ফোন, হেঁয়ালি এবং জয়ার সঙ্গে পরিচয় ।

চার

ফোন পেয়ে, মাসির বাড়ি হাজির হতেই আদিত্য দেখল মাসি-মেসো বেরুবার আয়োজন করছে । সাদা অ্যামবাসাডরটা প্রস্তুত ।অফিসের গাড়ি বলে বাণীমাসি চড়তেই চায় না ।

--এসছিস ভূতু ? চল !

---কোথায় ?

--ঘুরেই আসবি না হয় ! মাসি হেঁয়ালি ছড়ায় ।

আদিত্য মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করল না --জয়া যাবে ?

সেবার বাবার অসুস্থতার মধ্যে জয়া বলেছিল --শোধবোধ না হলে আমি আর আসছি না !

---মানে ?

--মানে আপনি করে নিন ।

--- প্রশ্ন যার, মানে করার রদায়িত্বও তার । বুঝালেন ? .... জানান দিয়ে শোধবোধ করব না ।

---এই তা ধরেছেন ! ...... বেশ , আচমকাই না হয় শোধ দেবেন ।

তাহলে কি অচমকা বামামাসি তিনবঝর পরিকল্পনা চূড়ান্ত একটি রূপ দিতে চলেছে ? গাড়িতে অবশ্য দু-জন এখটু গম্ভীর হয়েই আছে ।

হঠাৎ গাড়িটা ব্রেক কষতেই ওবা নেমে আদিত্যকে নিয়ে মস্ত একটা জুয়েলারী দোকানে ঢুকে পড়ল এবং মেসোকে দেখে দোকানদার যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, সরে গিয়ে ভেতরে ঢোকার

পথ করে দিল । শেষে নিরাপদ একটি কক্ষে ঢুকে আদিত্য ভূত দেখে । রাঙাকাকা ফটিকনাথ কাচুমাচু বসে আছে ।

দোকানটি বনেদি ও প্রখ্যাত । মালিক মিহি ধুতি-পাঞ্জাবি ও সোনার চশমা চাপিয়ে মুচকি হেসে আদিত্যকে ইঙ্গিত করল ----এটিই সেই আধুনিক হরিশ্চন্দ্র, চম্পক বাবু ? বাণীমাসি বা মেসো উত্তর দিল না । রসিকতাটি বড্ড রুচিহীন ঠেকছিল তাদের কাছে । কিন্তু রাঙাকাকার উদ্দেশে মেসো এবার আইনের লম্বা আঁকাশি বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে ---- এবার যা যা ঘটেছিল বলুন । ..... কোনো থানা-পুলিশ কিংবা লকআপের স্ক্যাণ্ডাল হবে না । ..... মল্লিক বংশের থুতু আমার বুকেও পড়বে, ভাই !

আদিত্য কেঁপে উঠল । ভূমিকম্প । সাতদিনের আচাঁছা দাড়ি নিয়ে ফটিকনাথ সামান্য বাঁকিয়ে ভুতুকে দেখে নেয় । তারপর একটা রেকর্ডারের সামনে বলে ---হ্যাঁ, এ গয়না আমিই চুরি করেছিলাম ।

---কবে ? কোত্থেকে ?

---তিনবছর আগে, বউভাতের দুপুরে । ...... ভুতুর ঘর থেকে ।

---কেন করেছিলেন ?

--অভাবে ।

--ঘরে কেউ ছিল না তখন ?

---হ্যাঁ । ভুতু শুয়েছিল । .... ও নিতে দেখেছে আমায় ।

--কী করে বুঝলেন ?

---একটু আগেই কথা বলেছিলেন ওর সঙ্গে । হতের ফাঁক দিয়ে সব দেখেছে ! আদিত্যর চারপাশে সেই মুহূর্তে চুরমার কিছু ভাঙার শব্দ হল । তিলে তিলে গড়ে তোলা মূল্যবান কিছু ।

চম্পক মেসো এ নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না । হেসে আদিত্যকে বলে ----লালবাজারের অভিজ্ঞতা হিসেবে, কয়েকটা জুয়েলারী দোকানকে বলে রেখেছিলাম । ওরা জানে একদিন না একদিন চোর হাজির হবে ...এবং তোমার মাসির কপাল ভালো, তোমাদের ফটিক যে দোকানে বেচতে এসছিল, গয়না এখানেই গড়ানো । বালকটি দেখেই উনি ধরে ফেলেছেন ! ..... ফোন করে যে ওরা জানিয়ে দেবে, ফটিক ধবতে পারেনি ! ফিরতি পথে আদিত্যর মুখে একটি কথাও ফুটল না ।

পারিবারিক স্বার্থে কোনো মামলা-মোকদ্দমা বা পুলিশে-থানা হয়নি । দিব্যনাথ নিজের ঘরে ভুতুকে ডেকে নিয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন শুধু । যেন শ্মশানের পোড়া একখণ্ড কাঠ! শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটিবার বললেন --এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো ছিল !

আদিত্য উঠে এল টালমাটাল পায়ে । যেন দেহগত নিছক বেঁচে আছে । কিশোরী স্যার কী ভাববেন ? এই চিন্তায় সারারাত ঘুম হল না আদিত্যর । শুধু কেঁদে কাটাল । পরদিন ভোর হতে না হতে, বৃদ্ধর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য হাজির । ভেতরে যেন লক্ষ দহন । শাস্তি পাচ্ছে

না । কিশোরীমোহন সব খবর পেয়েছেন । প্রথম তিনি দেখা করতেই চাইলেন না ।

বহু অনুনয়-বিনয়ের পর, স্থির গলায় আদিত্যকে বৃদ্ধ বললেন --যদি বলতে, কাউকে দেখিনি ...কোনা ক্ষোভ থাকত না । .... কেন বললে ও নিতেই পারে না ? মানুষ কি আর কারো ওপর আস্থা রাখবে না ? বিশ্বাস ভাঙার আঘাত কেন দিলে ? .... তুমি আর এ-বাড়ি ঢুকো না আদিত্য !

সারা রাস্তা এবং নিজের কুঠুরির মধ্য রেডিয়াম ভাঙতে ভাঙতে আদিত্য নিছক একখণ্ড সিসায় পরিণত হল । তবু এ-সংকটে জয়াকে মনে পড়ে ভীষণ .....!

পাঁচ

বেশ কিছু মাস অপেক্ষার পর ।

বাঁণীমাসিকে নিজের গরজেই আদিত্য ফোন করে বলে --তোমরা কেমন আছ ? এরদম খোঁজখবর নিচ্ছ না ।

---আমরা ভালো আছি ... ! আমি, তোর মেসো ......

---আর কে ?

আদিত্য অপরাধীর মতো চুপ করে থাকে ।

তখন বাণী সামান্য খেলিয়ে বলে --জয়া ? ..... চরিত্রহীন একটা মেয়ে যেমন থাকতে পারে ! .... দশ পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ...হ্যাঁ তোকে যাচাই করছিল ! ..... হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে বলেছে ।

রিসিভার রেখে দেওয়া ছাড়া কী-ই বা করতে পারে অদিত্য !

এদিকে জয়াও অবাক । কোনো টু-শব্দ নেই মল্লিকবাড়ি থেকে । অভিমানে ফোন করতে বাধল তার । একদিন মুখ ফুটে বাণী বউদেকে জিজ্ঞেস করেই বসল --কী খবর গো ? সব ভালো ?

--মানে, বলছিলাম ....অনেক দিন .....

-----ও আদিত্যর ? .... মুখোশধারী, মিথ্যেবাদীদের কী খবর থাকতে পারে ? ---তোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ... দেখ অন্য কোথাও মজেছে !

জয়ার দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী দোলে । রেডিয়াম ভাঙে । সে গোপনে কাঁদে এভাবে বাণীর ভূমিকায় দু-পক্ষের দুস্তর ব্যবধানে, আদিত্য এক বিকেলে হৃদয়ের বিপুল টানে, মিলেনিয়াম পার্কটার পাশের রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে , আচমকা জয়ার সঙ্গে মুখোমুখি ।

দু-জনই দু-জনকে ভূত দেখছে । দু-টুকরো সিসা হয়ে গেছে ।

আদিত্য তৃষিতে কণ্ঠে --কী খবর তোমার ? ..... মানে আপনি কেমন আছেন !

জয়া যেন চিনতেই চাইল না । তার কান্না পেয়ে গেল আদিতকে দেখে ।

---এখানে আপনি ?

--ঘুরতে ঘুরতে এলাম ।

--অ্যাপয়েন্টমেন্ট ? কারো সঙ্গে ?

জয়ার চোখজোড়া সিসার মতো লাগছে আদিত্যর কাছে । জয়াও বা এখানে কেন ? জিজ্ঞেস করল না । ভীষণ অচেনা লাগল । অথচ এখানেই তো বেশ কিছুদিন আগে দু-জন এসে বসেছিল । পাথরগুলো পাথরই ছিল না --চারপাশে রেডিয়াম ঘেরা । ফ্রেম !

টেরই পেল না, কে কখন পরস্পর দূরে চলে গেছে সিসা হয়ে ।

অপারেশন মিলেনিয়াম

কুকুরটাই কেবল ঠাণ্ডা মেরে রইল।

ছেলে ফের দাবড়ে উঠল স্বরনালী ফুলিয়ে —একটা হারামি বাপ !

জানলার রুগ্ন পাল্লাটা খট খট করে উঠল। সন্তান বলেই চলে — হারামির কোনো মুরোদ নেই ..... ।

এবার দেওয়ালে দাঁড় করানো পুরনো সাইকেলটা নিজেকে ঝমাড় করে ঠেলে ফেলে দিল।

--জ্ঞান মারছে হারামি, আর তুমি বরের হয়ে চামচেগিরি করছ ?

'তুমি' মানে রণোর মা।

সদ্য মাস-ফুরনো ক্যালেণ্ডার পাতাটা এবার চোখ পাকিয়ে ছিঁড়ে জানলা গলে উড়ে গেল।

—বাবাকে যা-তা বলবি তাই বলে ? চামচেগিরি হল ?

রণো ফের --যা খুশি করোগে যাও। .... মুরোদ নেই ফুটো পয়সার ....।

এঁটো থালাটা মেঝের সাথে ভীষণ ঘিসিররকিচ্ ঘর্ষিত হতে থাকে।

--মুখ ভেঙে দেব রণো। মুরোদ ? গিলিস কার হোটেলে ?

—মা থামো বলছি। মট্কা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে ...বালের দু-হাজার টাকা ঢালতে পারো না ব্যাবসার জন্য ....

-----যা খুশি বলবি তাই বলে ?

---একশো বা-র। ...বাড়িতে লোকজন এলেই শাসন ? ছোট ছেলে পেয়েছে ? অ্যাঁ ?

-----রণো, মুখ সামলে !

---ক্যা-লা করবে আমার !

এবার জলদাগি ছাদের ছোট একটি চাঙড় উল্কা নেমে এল।

শুধু কুকুরটাই ঠাণ্ডা মেরে থাকল। সাদা লোমের, চোখের পাতায় লালচে এঁটুলি বোঝাই

একটা স্প্যানিয়াল । বারন্দায় পুরনো গ্রিল -দরজার মুখে পা ছড়িয়ে টালটুল চাররধার দেখছে, পিরপির করে লেজ নাড়ছে --আমি হাগু করব ! যেন । কেবল সাইকেলটা পড়তে, আচমকা তরাসে কয়েকটা খেউ জানিয়ে ঠাণ্ডা -খুশিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেঁকছে ।

কারো মুখে কফ ঘষে ক্ষোভ মেটালে যেমন গয়, রণোরও তাই । বাপকে । চারপাশের পড়শিদের লজ্জায় মা চট করে ভেতরের ঘরটায় ঢুকে গেলেও রণো ফাল দেখায়---পাস করিনি তোমাদের জন্য ! ..... এই সব ক্যালাই বাপদের জন্য ! ....

পুরনো গ্রিল-দরজাটা ঝন ঝন করল । কুকুরটারই সব-কুছ ঠিকঠাক ।

রণোর মা ভেতরে গিয়ে গর্জাচ্ছে । নিখুঁত বোঝা যায় না পড়শির ঘর থেকে । ছেলে নাভিতে ভর দিয়েও গলা তুলে মাকে শোনাচ্ছিল, তাতে বহু শব্দই নিষিদ্ধ, বহু বাক্যের অতলেই বেদনা । তারপর, কুকুরটার পাশ দিয়ে নিজের ঘরটার দরজা লাথিয়ে খুলে ---এখন যা তোরা ..বিকেলে আসিস !

---তুই ? বেরোবি না । দুই পার্টনারের একজন জানতে চাইল ।

--যা --না, বাল ! দেখা যাবেখন .... এটা ছোটলোক বাড়ি !

দু-জন চটপট বেরিয়ে রাস্তায় যার যার সাইকেলের সামনে দাঁড়ায় । দু-জনেরই গলায় ঝুলছে বহু কষ্টে-জোটানো একটুকরো সস্তা টাই, প্যান্ট-জামা বেল্ট । ১৯-২০ বছরের ছোকরাদের খ্যাঁচা খোমা যতটা নির্ভরযোগ্য এবং গুরুত্ব করে তোলা যায় উটকো খদ্দেরদের কাছে --ড্রেসগুলা তাই । দুটো সাইকেলের ক্যারিয়ারেই পেটফোলা ঢাউস ঢাউস ব্যাগ ? দু-হাজারের সাহায্য পেলে গতহপ্তা এক লট গেঞ্জি মিলত জলের দরে --লি ছাপের । পুলিশের নজরে লট-টি হাতে তহাতে দিয়ে দিচ্ছিল । চটকল এরিয়ায় রাস্তার ঢেলে টাকায় দু-টাকা লাভ ।

কর্নেল অবশ্য ছেলের দুহাতের মধ্যেই । ভেতরে-ভেতরে কিছু সময় গনগন জ্বলে, নেভা-ছাই হলে যা হয় । কর্নেলের গায়ে নানা ছিদ্রের একটা ময়লা গেঞ্জি খাকি হাফ প্যান্ট । এটা অভ্যস্ত ড্রেস তার ঘরের মধ্যে । সর্বদাই দীপ্তিহীন চোখ ।

ছেলের হারামি ছোটলোক সম্বোধনগুলোর বৃত্তের মধ্যেই সে ভোলোভালা ঘুরছে । কালাও নয় । অথচ একটা কেমন ফেখরক ওঘরে যেন অনেক কাজ পড়ে আছে ।

ঘরের মধ্যে রণোর মা চ্যাঁচাচ্ছে --বাপকে কোন ছেলে হারামি ছোটলোক বলে ?

বারণ করলে তা দালালি ? অ্যা-ত সাহস ?

আবার কিছু মতলবে টিপি-টিপি পায়ে কর্নেল বারান্দায় এল । যেমন এইট-নাইনে, হাতের মুঠোয় থাকতে, এভাবেই তক্কে তক্কে ছেলের অপারাধে বেমক্কা ঝাড়ত লাথি। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে বেড়াল-পেটানি । কতদিন পড়শিরা ছুটে এসেছে ! কী হচ্ছে ক্ষুদিবাবু! খুলুন ! ছেলেটা যে মরে যাবে মশাই !

পড়শিদের বাধায় বাধ্যত দরজা খুলে অমন ছেলে মরুক টুকরো টুকরো নিঃশ্বাসে কর্নেল কুকুরটি পাঁজকালো নেমে পলত রাস্তায় । নাইনে দু০-বার ফেলের পরই পরই রণো প্রথম একদিন

রুখে দাঁড়িয়েছিল --খবদ্দার বাবা, গায়ে হাত দেবে না ।

---কী করবি ?

---দিয়ে দেখো !

ঘন ঘন দু-বার কী করবি কী করবি ঝেঁকে উঠলেও কর্নেলের দৃষ্টিতে সেই প্রথম থমকানো ভঙ্গি দুলে উঠেছিল ।

আজ গায়ে হাত দিক ! লাথ ঝাড়ুক ! রণো হুলো বেড়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে । কর্নেল হেঁটে এসে কুকুরটা বুকে আঁকড়ে গ্রিল টেনে হাগাতে বেরোয় ।

---এসো আমার পয়সা চুষতে ! ..... আবার কুকুর মারাচ্ছে ! .... লজ্জা করে না ? ছেলের তড়পানিতে কর্নেল তবুও তাকায় না । ফের কতগুলো শব্দকে ধাওয়া করায় রণো । ফের । তবু হেরো কর্নেল আজ ধীর, ল্যাজগুটানো চ্যাদহীন । কিন্তু এমন টাইট খাবে রণো বুঝতে পারেনি ? ভেবেছিল বাপ ফুঁসলেই পালটা শোধ নেবে ধকধকে চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ । ঘন ঘন বুকের খাঁচা আরও পাড় ভাঙল তার । শেষে দরজা ভেজিয়ে নিজের খুপরিটাতেই আত্মরক্ষার প্রবল চাপে রণো হঠাৎই হেরে যাওয়ার অভিমান কেঁদে ফেলে ।

১৯-২০ বয়স শুক্র-দাপটে ঝড়-ঝাপটায় গলার স্বর-সুতগুলো বদলাচ্ছে বলে, নানা বিভঙ্গের আওয়াজগুলো কিছুটা দামড়া-চিৎকার মনে হল । কী বলে স্পষ্ট বোঝা যায় না, অথচ আলোড়ন আছে । আসলে রণো বলতে চাইছিল তার দিকটা কেউ দেখছে না । নাইন থেকে ড্রপ-আউট হয়েছে, তিন-তিনবার ক্লাস পরীক্ষায় উতরোয়নি ভিন্ন স্কুলে নোট গুঁজে চলে গেলে মাধ্যমিকটা অন্তত টোকার সুযোগে হয়ে যেত ! জানাশোনা ছিল ওর অনেকের সাথে ! সব ব্যর্থতাই কি তার। বাপের উচিত ছিল না টাকার হাতে বাড়িয়ে দেওয়া ? জয়চাঁদ স্কুলটা মাত্র দেড়হাজার ডোনেশন চেয়েছিল! গোপনে নিজের চেষ্টায় প্রাইভেটেও বসেছিল । দু-হাজার টাকায় সিওর সাজেশন । তাও পায়নি সংসার থেকে । বলতে গেলে তো লম্বা ফিরিস্তি । তিন পার্টানোর বিজনেস দু-হাজার ধার চেয়েও সহানুভূতি পাযনি বাপের । তাহলে আজ ওদের সামনে কেন শাসন ? প্রেস্টিজ নেই রণোর ? চারপাশে বাপেরই তো ছেলেদের টেনে তুলছে । খেলোয়াড় নায়ক নেতা --বাপের খুঁটিতেই তো হিল্লে হচেছ সব কিছু । আজ সন্টু আর দিলার সামনেই টোন কাটা ? ওরা সব বোঝে।

পরিস্কার বিজনেস-টক হচ্ছিল । ঘরে বোনটা আছে বলে কি ওরা আস্ত গিলে খাবে ? রাস্তায় ওরা মস্তি মারলেও এখানে কোনো বাজে ইঙ্গিত দিয়েছে রিনাকে ? বোন বলতে পারবে ? দুনিয়ার ভালো ছেলে এখানে কোনো বাজে ইঙ্গিত দিয়েছে রিনাকে ? বোন বলতে পারবে ? দুনিয়ার ভালো ছেলে জানা আছে রণোর । যখন অনুপমের সঙ্গে দিব্যি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কালাস ? ভাবিস, কিছু বুঝি না ?

কান্নার মধ্যেও পুরো স্বস্তি না মিলতে, রণো এবার এ-ঘরে এসে বাপের সাইকেলটা স্রেফ তুলে ফিক্কা মারে রাস্তায় । রণোর মা তখন ঠাসিয়ে দুটো চড় ।

---তোল ! তুলে আন !

ছেলে সুড় সুড় করে তুলে আনল বটে, প্রতিশোধ নিল মাকে চাপা গলায় —জন্ম দেওয়ার শ-খ !

ডুকরোনো গলার রণোর মা হঠাৎ রাস্তায় ছুটে এসে --শুনলে ---ন ! শুনলে ---ন ! যেন তার শালীনতার ওফর আচমকা কোনো দৌরাত্ম ঘটে গেছে ! তাই পড়শিদের কাছে সমর্থন ভিক্ষে চাইছে ।

বাহিরে তখন মাঘশেষের সকালে আট ঘটিকাতেও পর্যাপ্ত রৌদ্র নামিয়া আসে নাই পৃথিবীতে । আকাশ একটি মিহি মেঘের চাদর পরিয়া আছে । শীতের পশ্চিমি ঝঞ্ঝাট ইদানীং কয়েক বছর ধরিয়া আফগানিস্তান, পেশোয়ার ছাড়াইয়া উত্তর ভারত দিয়া পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত চলিয়া আসে । বৃষ্টি হয়। অপ্রস্তুত মানুষ মার খায় । আজ তাহারই রেশ হিসাবে আকাশ মলিন ; কিন্তু মাঝে মাঝে বাদা ঠেলিয়া সাদা সূর্যটা দেখা যায় ; তখন দুর্বল নবীন দিনটিকে ভীষণ আদর করিতে ইচ্ছা করে ; গাছপালা পাতাবর্গের রেখাগুলি, পাখির চক্ষু ভুঁইকামড়ি লতা-গুল্ম ----কত কী ! শীতের বুড়া বাতাস একটু দাঁত বাহির করিয়া দেখায় । মহিলাদের শরীরের উলের পোশাক বা কার্ডিগানগুলির রং প্রকৃত মাত্রা হইতে উপচাইয়া পড়ে । তাহারা পথেঘাটে এইসময় এমন গাম্ভীর্য লইয়া চলে যেন কোনোই নষ্টমতি তাহাদের মধ্যে নাই ।

বছর পঞ্চাশের শান্তি মুখুটি বিছানায় বসিয়া জানালা বাহিয়া নিজ বাগানের ফুল দেখিতেছিলেন । বউ বাগান পরিচর্যা করে । জানলার ধারে ধারে মাটির টবে প্রচুর গোলাপ, জবা গ্ল্যাডিয়েটের প্যাঞ্জি ফুটিয়াছে । নানা রং । প্রকৃতির সব বর্ণই সপ্রতিভ ।

প্রতিদিন সকাল আট ঘটিকায় শান্তিবাবু ঝিম মারিয়া নীরবে সব দেখেন । কর্নেলের ঠিক উত্তরের বাড়িটিই তাহারা । মাত্র দশফুট চওড়া রাসাতার ব্যবধানে । পাঁচালি ঘিরিয়া দেওয়া । বিশেষ বাক্যলাল নাই দুই বাড়ির । আজ শান্তি মুখুটি দেখিবার মগ্নতার মধ্যেই কর্নেল বাড়ির শব্দের ধাওয়া -ধাউই শুনিতেছিলেন । গুরুত্ব দেন নাই । চোখে পড়িল কুকুর-বগলে কর্নেল হাঁটিয়া যাইতেছে । কিছু পর শান্তবাবু একটি প্রাণীর খুশির ফিরতি দোলায়িত-লেজ দেখিতে পাইলেন । কোষ্ট সাফের আরাম-বিলাস । হঠাৎ কর্নেল হুমদা মারিয়া এমন ধাবিত হইল দুইটি শিশু শিকারের হাতে হইতে পলাইয়া যায় । তাহারা এতক্ষণ কর্নেলের কুলগাছটির তলা হইতে কয়েকটি ছোটখাটো দেশি কুল কুড়াইতেছিল । মালিকানা-অ্যাকট শিশুরা বিশেষ পাঠ করে না ? কর্নেল বাকি ফলগুলি হামলাইয়া মালিকানা রক্ষা করিল । ভাবিল শিশুরা ফিরিয়া আসিল কলা চুষিতে দিবে ।

শান্তি মুখুটি ইহাও দেখিলেন, ফের মেঘ আক্রান্ত হইতে দেখিলেন দুর্বল রৌদ্রকে, দেওয়াল-ঘলি দেখিলেন, আবার জানালার ওপাশে ফুল দেখিলেন । শুনিলনে । আরও শুনিলেন । তবে চক্ষু মেলিয়া থাকিলেই সব দেখা হয় না কানে শুনিলেও সব ছোঁয়া, বোঝা যায় না । তাহা হইলে রণোর মা কাহার কাছে সাক্ষী মানিল --শুনলে-ন! শুনলে-ন !

পশ্চিমে লাগোয়া পাঁচিলে দোতলা সম্ভ্রান্তলেকীয় ভঙ্গির বাহারি মনোবাসনায় বাড়িটি নির্মিত হইয়াচে । ছ'মাস হইল পুত্র মুম্বাই বদলি হওয়ায় এতবড় সম্পত্তি বুড়া-বুড়ির জিম্মায় । দশবছরের

নাতীন, পুত্রবধূ থাকিতে দিনরাত্রিগুলিকে কম চওড়া মনে হইত। এখন সময়ের এ-মুড়া ও-মুড়া ফুরাইতে চায় না ? বুড়া বয়সে টেলিফোনের বিল বেশি উঠিলে ছেলে মৃদু রহস্য করিবে। জগু বসু কেন কথার তলে থাকিবে ? তাই ফোনেও সময় কাইটাইতে পারেন না।

এখন জগু বসু কান-মাথায় ভোটকা একটি টুপি চাপাইয়া রণোদের দিকে পিঠ দেখাইয়া চেয়ারে কাগজ পড়িতেছিলেন। ইংরাজি কাগজ। দেশের খবরে তাহার নিত্যনতুন উৎসাহের বদলে, উত্তেজনা থাকে প্রতিদিনের শেয়ারেরর সূচকা। পুত্রের ইচ্ছার টানে পঁচিশ হাজার টাকা ঢুকাইয়াছে তিনবছর ধরিয়া দামই উঠিতেছে না। অস্থির অপেক্ষায় হপ্তা দুয়েক হইল সূচক কিছু চাঙ্গা হাওয়ায় বেচিব-বেচিব ভাব জন্মিতেছিল। আর একটু সময় দেখা যাউক ! প্রতিদিন ইংরাজি কাগজটি আসিলে বুড়া যেন লটারি কেনে --- দর আজ কত হইল !

কর্নেলের বাড়ির সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা ভালো-খারাপ কিছুই বলা যায় না। মাঝে মধ্যে গেট খুলিয়া রাস্তার দাঁড়াইলে কর্নেলের কুকুর খাউ-মাউ করিলে উনি দুই-পা হাঁটিয়া লাঠির গোল মাথাটা ঘুরাইয়া কুকুরের দৃষ্টির সঙ্গে খেলা করেন।

রণোর মা হাসিয়া বলে ---চিঠি পেলেন মেসোমশাই ?

তিনবারের পরে, খেলায় মত্ত জগু বসু উত্তর দেন --- ফোন করে !

রণোর মা বোঝে, কোথায় যেন সামান্য চিমটি খাইল। জগু বসুর বউ মাঝে মাঝে রণোর মার সঙ্গে তিথি যে-কোনো পরিবারের প্রাইভেট ব্যাপার।

এই মুহূর্তে জগু বুসর হাইপ্রেশার লইয়া কাগজে সূচকগুলি খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। তাহা হইলে রণোর মা কাহার উদ্দেশে বলিল --শুনলে-ন ! শুনলে-ন !

পুবের বাড়িতে, মূক-বধির, সুন্দর লালিত্যময় মুখের বছর বারোর কন্যাটি এমন মেঘ-মলিন আবহাওয়ায় শীত-শীত ভাব উপেক্ষা করিয়া ছাদের কোণে নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া কর্নেলের কুলগাচের মগডালে কয়েকটি লাল-হলুদ ফলে শরীরে লোভাতুর তাকাইয়াছিল। ও ক্ষিতীশের কন্যা মনি। ক্ষিতীশ অফিস গিয়াছে। বউ সামান্য তেল-ঝাল কিনিতে দোকানে। একমাত্র কন্যাটি ভীষণ গোঁয়ার, অবুঝ বলিয়া নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া যায় না। কাজের বউটি যে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, কে বুঝিয়াছিল ! রণোর চিৎকারে এ-বাড়ির কোনো মাথাব্যথা নাই। দুই পরিবারে এই -খটামটি, এই -স্থিতবস্থা --লাগোয়া পরিবার হইলে যাহা হয় ! তাহা হইলে রণোর মা কাহাকে সাক্ষী মানিল --শুনলে -ন ! শুনলে-ন !

আর দক্ষিণের পরিবারে চার-চারটি ভাই, পরিবার লইয়া এতই বেসামাল --জীবনের উর্ধ্বশ্বাস যেন দিনের শুরু হইতেই স্বভাবে পাকাপাকি আশ্রয় লইয়াছে। এ-বাড়ির একটি সদস্য রণোর স্কুলে সহপাঠী ছিল। এখন সে বি কম অর্নাস লইয়া পড়ে। সারা সকাল এ-পরিবারে স্নান-খাওয়া, অফিস-ছোটো,স্কুল-যাওয়া লইয়া খণ্ডযুদ্ধের অভিনয়। সুতরাং রণোর মা যে ইহাদের মানিবে না --নিশ্চিত। তবে কাহাদের উদ্দেশে আস্থা সঁপিয়া সে বলিল, পুত্র জননীকে পিতার সহিত যৌনক্রিয়ার সরাসরি ইঙ্গিত দিয়াছে। অগ্নি ও নৈঋত কোণগুলি পরিবারসকল অন্যসময়ে এ-বাড়ির দরজা কোলের শিশু লইয়া বেহুদা সময় কাটাতে হাজির হয়, কিন্তু পারিবারিক চোটপাট-

চিৎকার পক্ষ সমর্থনের ভয়ে যে-যাহার ঘরে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নিজেদের ছায়া দেখিতে দেয় না। এই আচার কর্নেলের বউ ও করিয়া থাকে।

ঘন্টাখানেক পর রণো গ্রিলটা খুলে রাস্তায় পা দিয়েই 'দেরি হবে আজ' তথ্যটুকু হাওয়ায় রেখে দিয়ে চলে যায়। আর পুর্ব-পশ্চিমে সৈন্ধতকে শোনাবার জন্যই মা চেঁচাল --বেশি রাত করবি না। তারপর ঘরে ঢুকেই মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে হা হা হাসি দেয়।

জগু বসু এটিও শোনেন, শান্তি মুখুটিও শোনেন ? তবু তারা ফুল দেখেন কাগজ পড়েন। ঝিমোত পছন্দ করেন। বাচ্চাদুটো লুকোচুরি খেলতে ফের কুলতলা খোঁজে।

রণোর গলায় একই ঢঙের বিঘত খানেকের টাই, জামা-প্যান্ট বেল্টে যতটা সম্ভব আস্থা কুড়োবার চেষ্টা। যখন গেঞ্জি বা শার্ট তুলে খদ্দেরকে বলবে—ধরে দেখুন স্যার!... নতুন লট্! আমরা পাতি হকার নই স্যার...কলেজের ছাত্র...সেল্ফ...হেল্প-এ বিশ্বাস করি! —তখন যেন খদ্দেরের আস্থাভাজন হতে পারে। দশজনের তিনজনকে টুপি পরালেই তো পাত্তি কম আসবে না!

রণোর হাঁটার স্টাইলে বোঝা যায়, চারপাশের চাপে ইদানীং পুরনো স্বপ্নটা বেশ ফিকে হলেও, পুরো ঝেড়ে ফেলেনি। চুলের মর্যদাটা হিরো অজয় দেবগণ হলেই তাকে স্টারের মতো লাগবে এবং কাঙ্ক্ষিত মেয়েরা উপচে এসে প্রেম করবে—ক্লাস নাইনের ভাবনাটি আজ ফিকে হলেও মুছে যায়নি। ঘাড়, কপালের চুল তেমনই দুলছে; তবে ড্রপ-আউটের ক' বছরে ঈষৎ কুঁজো হয়েছে, গালদুটো ভেঙেছে, ব্রণ উঠেছে, চোখে কালি। হস্তমৈথুন কমিয়ে দেলেও মাথা ঘোরে।

তবু অজয় দেবগণ চুলে এখনও মায়া। গু—রু—! দু-টাকার শ্যাম্পু দেয়, তিনটাকার চিরুনি রাখে পকেটে। আজকাল রাতে ফিরে, খেয়ে বিড়ি ধরালেই ভীষণ ঘুম পায়।

সন্টু আর দিলা অনেক আগে বেরিয়ে এলেও পরিচিত চায়ের ঠেকে সাইকেলে মাল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। রণো হাজির হয়েই ক্যাপ্টেনের মতো জানতে চায়—মন্টাদা নেই?

—আসেনি।

—আসেনি? বিলা করল তো? রণোর কপালে স্মার্ট ভাঁজ। তৃষিত দৃষ্টিতে চারধারে তাকায়। মন্টাদা যদি উদয় হয়! এসময়ে ঘন্টাখানেক মন্টাদা থাকে এই ঠেকে— সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। কাল রাতে পাক্কা চুক্তি হয়ে গেল। নোট খিঁচল, তারপরও এই সব নম্বরি?

তিনজন দাঁড়িয়েই থাকে। দিলা হঠাৎ সিগারেট ধরাতে গেলে, রণো মনে করায়— ওটা রাখ!... এখন বিড়ি খা, ভাই!

দিলা বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি যত্নে নিভিয়ে দামি প্যাকেটে ফের গুঁজে রাখল। কল মিলের মার্কেটে সিগারেট টানলে এখনও কিছুটা বিলিতি মর্যাদা আছে।

সোম থেকে শুক্র—যখন যে অঞ্চলের দোকানপাট ছুটি থাকে, ওদের অপারেশন শুরু। এরা নিজের নাম দিয়েছে, 'অপারেশন মিলেনিয়াম'। ফুট দখল করে, মস্ত ছাতা পুঁতে রাস্তায় মাল ঢেলে চেঁচায়। মাইকের ছোট্ট সেট থাকে। নিয়মিত দোকান ব্যাবসার দিন তো উটকো কেউ জাঁকিয়ে বসতে পারে না। এরা হপ্তায় ছ'দিনই অপারেশন চালাচ্ছে।

বারোটা থেকে সন্ধে পর্যন্ত। যা কামালো, গুটিয়ে হাওয়া। অনেক ভদ্দর ঘরের ছেলে নেমেছে—বি.এ., এম. এ!

—কিসের পেস্টিজ? নোট চাই, নোট!

প্রথম প্রথম দিলা বোঝাত রণোকে। এখন ক্যাপ্টেন রণো বলে—দ্যাখ, ছ'মাসে মারুতিভ্যান নামাব আমরা।

—হবে না গুরু! অত টাকা পাবি কোথায়?

—থো বে! ফিনান্সার আছে! নিচ্ছি না তো অন্য ঝামেলায়! খানিক চুপ থেকে রণো বলে—বাঙালির কিচ্ছু হবে না!

—কেন?

—কুত্তা সব!.... বিছ্সায়ন মারাচ্ছে বি-স্থ চাকরি দিতে বলো, জ্ঞান মেরে যাবে! দিলা কপাল ঠোকে— ভাই, এইটাই সব!

ওরা বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতের অজ্ঞতা কুহকে কার কী কপালে পড়ে গাছে কেউ জানে না। তুমি শালা সাট্টা বেচেও বিশাল মালকড়ি কামাতে পারো। তখন কিছু কুত্তা পুরনো বুলি ঝাড়বে, বুর্জোয়া-বুর্জোয়া বলে!

পৃথিবীতে নাকি এমন ঘটে, বিশাল শিল্পপতির সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য সব করতে পারে। তুমি তখন কোটিপতি। রণোদের কাছে অনেক উদাহরণ আছে। রাস্তায় ফল বেচত একজন; এখন সে বম্বের একনম্বর।

—মন্টাদা বলছিল...

—কী?

—তোরা ভয় পাস, কিন্তু ব্যাঙ্ক ডাকাতি খুব সোজা। স্রেফ একটা রিস্ক। লাখ তিরিশ যদি ঝেপে দিতে পারিস, কে পায় তোকে!

হঠাৎ দিলা হেসে বেপরোয়া হয়ে বলে—চ, শালা! একটা তো রিস্ক!

ওদের কাছে খবর আছে, অনেক কলেজের ছেলেরা স্রেফ ব্রেইন ধার দেয় ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে। হিউজ্ কামায়!

আজ বুধবার, কিনিসিং জুটমিলের বাজারটায় সাপ্তাহিক বিরতির দিন। চারঘন্টার মধ্যেই ঢালা গেঞ্জি আর প্যান্টগুলোর সত্তর ভাগ বিক্রি হয়ে গেল। দিলা একফাঁকে রণোকে বলে—গুরু, গুটাও!

রণো ইঙ্গিতে জানতে চাইল—কেন? এ-মার্কেটটা খুব ভালো। বাকিটা বেচে গেলে ক্ষতি কী?

দিলা কাছে এসে বলে—খতরনক পাবলিক!

রণো বুঝে ফেলে শ্যামের ছেলেপুলে। নিজের অজান্তেই বলে—আমরাও কম চমকাব না!

রণো জানে মন্টাদার সঙ্গে কী চুক্তি হয়ে গেছে।

রণো একটা সিগারেট ধরায় হাল্কা মুডে। আজকের বাজারে ভীষণ খুশি। কাগজকলটা বন্ধ। এখানে যে ঢালাও বিক্রি হবে মাল, আশা করেনি। রণো কল্পনার স্বপ্নে দেখতে পায় একটা মারুতিভ্যানে. ওরা তিনজন বিজনেস-টক করতে গোপন কোনো হংকং মার্কেটে চলেছে।

এভাবে টাকায় দেড়টাকা লাভ থাকলে, গাড়ি কিনবই। তবে যদি এইসব মালের অদৃশ্য মহাজনদের কাছে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে সরাসরি পৌঁছানো যায়। পুঁজি চাই। ব্যাঙ্কগুলো হয়েছে পার্টিদের দালাল। সব প্রাইভেট করে শালাদের টাইট দাও।

বাপের কাছে মাত্র দু-হাজার চেয়েছিল। এখানে নগদ টাকার দরকার ভীষণ। বাড়তি ক্যাশ থাকলে লাভটা বেশি।

দিলা ফের বলে—গুরু! বলছি এবার কেটে পড়ো।

কল্পনার স্বপ্নে বাধা পেয়ে রণো সামান্য বিরক্তি হয়—থামবি তুই? মায়ের আঁচলে থাক গে যা!...মন্টাদা কি এথি নিয়েছে গুটিয়ে ফেলব বলেঙ্গ? রণো আবার দেখতে পায়। এবার মারুতি নয়, তিনটে টাইগার-মোটরসাইকেল আকাশ বেয়ে চলেছে।

কোন শালা সৎ পথে চলে? ওসব বাতেলাবাজদের রণো কোনো দাম দেয় না। সব শালা সমান! পেলে, কে খাচ্ছে না? আমরা কি কম দেখছি? কম বুঝছি? আমাদের টুপি পরাবে কে? কিন্তু দিলার সংকেত, সে বাজপাখির মতো চোখ ঘোরাচ্ছে, দিলা ঘোরাচ্ছে, সন্টু সজাগ হচ্ছে। এক-ব্যাটারির মাইকে এবার গান থামানো দরকার। দুটো ছেলে ফালতু ঘাঁটছে গেঞ্জির জামিন। কেনার মতলব নেই! হঠাৎই ভোজবাড়ি হয়ে গেল।...

ছেলে যে ইদানিং রাত আটটা-ন'টার আগে বাড়ি ঢোকে না, কর্নেল বা তার বউ জানে। খেন কিছু মনে করে না। বরং স্বপক্ষে যুক্তি তৈরি করে। ক্ষীণ যুক্তি তৈরি করে। ক্ষীণ আশা রাখছে, অনেকেরই তো জীবন এভাবে শুরু। স্বচ্ছল হলে আর বিদ্যের যাচাই কে করে!

কর্নেল আছে দিন রাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে। চোখ আর চামলা দিয়ে দেখা-ছোঁয়া-জানা কিংবা থলি-বাক্স-পিন্ডের আকার ছাড়া কিনা শরীরের কোনো ভাব তাকে প্রভাবিত করে না। চাউনিতে কোনো ছটফটানি নেই, ঘেয়ো স্প্যানিয়ালটা নিয়ে যখন হাঁটে, শরীর থেকে চামসে গন্ধ আসে। মৃত মানুষের গন্ধ। কেবল নানা দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই, পাড়ার পুজোয় একটানা তিনঘন্টা ধুনুচিনৃত্যে সব্বাইকে তাক লাগায়। তখন লম্বা সিঁদুরছাপ ঘাম কপালে দগদগ করে।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে কীভাবে, টের পাওয়া যায় না। ছায়া-ছায়া অল্প আলোর রান্নাঘরে, শান্তি মুখুটি নীরবে আহার করে। মশা কামড়ায়। টেবিলে কোনো কথা নেই, খাওয়ার ছুটছাটি আওয়াজ ছাড়া।

কাজের বউটা মজায় বলে—দাদুবাবু, কর্নেলের ঘরে ছেলের বচন শুনেচো?

—ক্ষুদিবাবুর? কর্নেল হল কবে?

—নেকো বলে। মিলিটারিতে ছেল নাকি?

—সবাই কর্নেল সেখানে?... ও-ব্যাটা মড়া শুনত।...মরে গেলে টিকিট, ঠিকানা, খবর দেওয়া...

অনেক কাজ থাকে রে।

—কে জানে বাপু!

—মিলিটারিতে ক-ত ছোটখাটো কাজ থাকে।... ভাবিস, সবাই কর্নেল, সবাই রাইফেল কাঁধে যুদ্ধ করে?...খ্যাপায় ওকে!

কাজের বউ বলে—তাই বলে, ছেলে বাপকে যা-তা বলবে?

মুখুটি কথা বলে না। ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করে। রণো, দিলা এবং সন্টু রাত দশটায় ঢুকল। ওরা দু-জন ছোট্ট পুটুলিগুলো রেখে গেল। অন্যদিন, ওরা মালগুলো রেখে রাস্তায় উঠলে, রণো ইংরেজি কায়দায় বলে—গুড্ নাইট!... কাল কিন্তু চটপট চলে আসবি!

আজ ওরা নীরবে চলে গেল। এত রাত হয় না অন্যান্য দিন। আজ ফিরতি পথে চায়ের দোকানটার কাছে মন্টাদার দেখা। পুরো লোড হয়ে ছিল মারুতি ভ্যানটায়। দাঁড় করিয়ে যখন দু-চারটে সাঙ্গোপাঙ্গর কথা বলছে, ওরা হাজির।

—মন্টাদা!

রণোর ডাকে মন্টাদার প্রেস্টিজ খরখরে হয়। বুঝেই রণো আস্তে বলে—ফিট করোনি? বল্লে যে?

—কী করিনি? মন্টা খানিকটা তেড়িয়া জবাব দিতেই, রণো একেবারে গলে গিয়ে বলে—তালে, ক্যাচাইন কল্ল কেন?

—কিসের ক্যাচাইন, বাল!

ওরা তিনজন চুপ! পেটে লাথ দিলে মেজাজ ঠিক থাকে, বলো?

তখন রণো—তুমি শ্যামকে ফিট্ করবে, বল্লে! আমরা তোমাকে...

মন্টার নেশার চোখ রণোকে ওজন করে। হালকা গলায় বলে—কত খিঁচছে?

মন্টার খিস্তির ভয়ে তিনজন চুপ। শ্যামের ছেলেরা জলুম করে কেড়ে নিয়েছে, গায়ে হাত তুলছে। কলার খামছে শুন্যে তুলে ধরতে, রণোকে লাগছিল রোগা টিকটিকি। বাধা দিতে চেয়েছিল। দেখে নেবে বলে রড়পে উঠেছিল। কিন্তু একটা কিছুর বাঁটের বাড়ি, কষায় দু-দুটো ঘুষি। এখনও ঠোঁট ফোলা, রক্ত-চাপের নীলাভ দাগড়া।

তিনজন ক্লান্ত, পর্যুদস্ত চাউনিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে, মন্টা কিছুটা গলে গিয়ে বলে—থানায় কেস লিখিয়েছিস?

রণো মেজাজ দেখায়—তুমিও থানা দেখাচ্ছ মন্টাদা?

হাঃ হাঃ হাসিতে মন্টা—আচ্ছা, বলে দেব শ্যামকে!...কবে যাবি আবার?

—কাল স্টেশন রোডে বসব...বিষ্যুৎবার ছুট্টি ও-দিকটায়।

—যা! বাড়ি যা। চুপ করে খেয়ে ঘুমো!

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে চলে যেতেই, রণো চাপা খিস্তি দেয়। হেসে বলে—শালা লিডারি মারাচ্ছে!... পুরো তিনশো টাকা ঝেড়েছে, প্রটেকশন দেবে বলে!

রাতে বিছানায় শুয়ে রণোর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু চামড়ায় নীচে অদ্ভুত উত্তেজনা। কত কী ভাবে! কত সমস্যা আনে, সমাধান করে। পকেটে নল থাকলে আজ শ্যামার ওই ছেলেটাকে সে দানা ভরে দিত। মন্টা শালা ধাপ্পা দিচ্ছে...কিন্তু লোকটা হেভি বুদ্ধি রাখে। কত ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু পুলিশ কোনো ক্ল্যু পায়নি। ওকে চটানো যায় না। রণো বিশ্বাস করে দিন বদলাবেই। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় সবাই কুত্তা! ট্রেন, ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি ছিনতাই— একটা রিস্ক। বছর দুয়েক ঘাপটি, মোটর-পার্টস-এর ব্যবসা, বদলে গাড়ির, বদলে শেয়ার! খড়দার সানুদা দোকানে কাপ দুত। এখন সপ্‌ট ড্রিংকস এর কারখানা গড়ছে। লোক খাটে। ফ্লাইট-এ বম্বে যায়। তাহলে? যারা জ্ঞান মারে বড়লোকের ছেলেই বড়লোক হয়? কার ভাগ্য কোথায় ফুটে বেরুবে কেউ বলতে পারে?

রণো দু-দুটো কেস জানে যেখানে হেভি বড়লোকের মেয়ে—কী দেখতে! —সব পেছনে ফেলে ভালোবাসার টানে রাস্তার ছেলেকে তুলে নিয়েছে। ছেলেটার অবশ্য ফিগার ভালো, চুলটা হেভি! ওইসব মেয়েরা শুধু ইন্টু চায়! ছেলেটা যদি তুমি হও, গেল তোমার কপাল পালটে। হাঁ করতে গিয়ে ফের চোয়ালে লাগল, শ্যামের ছেলেটার কথা মনে হল। ব্যর্থতা, আনন্দ, ক্ষোভ ও নিজের ফিউচারের আস্থায় সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে, ক্লান্ত দেহে, সাময়িক বন্ধ রাখা অভ্যাসে, রিপুর দুরন্ত টানে রণো রাম-হস্তমৈথুনে ডুবতে থাকে। মুহূর্তগুলো এমনভাবে স্থির হয়ে যায় যেন রাতটি পাথরে মতো দাঁড়িয়ে রণোর হস্তকৌশলে সাহায্য করেই যাবে।

পরদিন ক্ষয়ের ক্লান্তিতে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় রণোর। উঠব-উঠব ভেবেও মাথা তোলে না। আজকের অপারেশন স্টেসন রোডের ওপর বলেই হয়তো রণোর মা একঝলক এ-ঘরে উঁকি দিয়ে ছেলেকে ডাকব-ডাকব ভাবছিল। হঠাৎ টেবিলে দেখে রণোর মানিব্যাগ ও খোলা দুটি দশটাকার নোট চাপা দেওয়া। মায়ের চোখে লোভ, ভয় এবং ছোট-ছোট খুশি।

—রণো।

'—'

—রণোরে!

'—'

—ও রণো!

—হুঃ!

গলে যাওয়া স্বরে রণোর মা—দশটাকা দুটো নেব রে?... ঘরে কিছু নেই আজ! ক্যালেন্ডারের পুরনো উড়ল না, প্লাস্টার খসল না, সাইকেল স্থির হয়ে রইল। রণো সামান্য বিরক্তিতে বলে—না-ও! না-ও!

রণোর মা বারান্দায় এসে, ঘাম মুছতে থাকা কর্নেলকে বলে—বাজারে যাও! থলি আর টাকা রেখে দিলাম!

কর্নেল খুব কাছেই ঘাস খুঁটছিল। শুধু তাকে শোনাতেই কি রণোর মা বাজার যাওয়ার হুংকার দিল?

শান্তি মুখটি সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া ঝিম মারিয়া ফুল দিতেছেন। পৃথিবীর আলো মেঘের বাধা সারাইতে পারিতেছে না। জগু বসু তাই ঠান্ডায় উঠোনে এখনও চেয়ার পাতিয়া কাগজ হাতে লয় নাই। আকাশ ঘোলা। চাদর পরিয়াও অনেকে ওম পাইতেছে না। কেমন নিরানন্দ চারিপাশে। কুয়াশার মৃদু আবরণের জন্য দূর স্পষ্ট হয় না। তাই চলাচলের মানুষজনদের নিছক আকৃতির মতো দেখাইতেছে। পরিচয় ভুল হয়।

ফিরতি কর্নেলের হাতে ছোট থলিটি। শরীর হইতে মড়ার গন্ধ আসিতেছে। মেঘলা সকালে স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কুকুরের শরীর হইতে দুটি এঁটুলি মালিকের ময়লা পোশাকে ঢুকিয়া আছে—আন্দাজে চুলকায় বটে—অনুমান করিতে পারে না।

সমস্ত রাস্তা তাহার কেবলই বোধ হইতেছিল, রণো মোটামুটি ভালোই কামাইতে শুরু করিয়াছে। দিন ফিরলে পৃথিবীটাকে সে দেখিয়া লইবে। আজকাল আর পুরাতন নিয়ম নাই, যে কোনো মানুষ এখন কপাল ফিরাইতে পারে। উদ্যমের ময়দান খোলা। মুক্ত টাকা উড়িতেছে। শুধু বুদ্ধি খাটাইয়া কুড়াইতে হইবে। সব কিছুই বরাত।

ঘরের সব কিছুই না-রোদ্দুরের বোটকা গন্ধে স্থির বসিয়া রহিল। কর্নেলকে দেখিয়া কেবল কুকুরটাই চোখ তুলিয়া অবিরত লেজ নাড়াইতে থাকে। তাহার সব কিছুই ঠিকঠাক।

কলাকৃতি : ২০০০

জাহাজের পথ ৭০০ বছর

দূর থেকে, আকাশে আবছা ধোঁয়ার মতো, সরণদীপ পর্বতের চূড়া যখন চোখে পড়ল, লালমিশাই-এর জাহাজ ৩ দিনের সমুদ্রপথ ৯ দিন লাগিয়ে দিয়েছে। দরিয়া মোটেই অনুকূল ছিল না। ঢেউ ও ঝোড়োবাতাস যে জাহাজটাকে ডুবিয়ে মারেনি, এটাই ছিল খোদার মহৎ কৃপা। তবু লালমিশাই-এর মনে হচ্ছিল, কাঠের জাহাজটি জাঙ্ক ধরনের ছিল বলেই রক্ষে, ছোট চীনাজাহাজ বা ককমে হলে আঘাতে গুঁড়িয়ে যেত। মনে মনে যখন আল্লা ও আপন নসিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন, দূরে পর্বত ও বন্দরের স্পষ্টতা মিলল। অন্তত সাঁতরেও প্রাণ রক্ষা করা যাবে। তবে তিনি জাঙ্ক এ তাঁর প্রাইভেট কুঠুরি থেকে বাইরে আসেননি বিপদে'। দড়ি-দড়া, পাল-দুর্ঘটনা এড়াতে নাবিকরাই আপ্রাণ হুকুমদারি চালাচ্ছিল। নৌপতি সুলেমান তেমন পাকা নাবিক না হলেও, বহুবার এই দরিয়া পারাপার করেছে। তখনও লালমিশাই ঘূর্ণীঝড়েও টের পাননি, ফের যখন তিনি অলৌকিক-পীরকে শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে বড় দরিয়ায় ৪০ দিনের পথে রওনা হবেন, পাড়ি দিতে ৭০০ বছর লেগে যাবে।

- হুজুর বন্দরটা সে-রাজার নয়।

বিপদ-এড়িয়ে জাহাজটা যখন ডাঙ্গার অতি-নিকটে এল, নাবিকদের ২ জন জানাল লালমিশাইকে।

- ঠিক বলছ ?

হ্যাঁ, হুজুর। এর রাজা কাফের। ... নিশ্চিন্তে জাহাজ ভেড়ালে বিপদ আছে।

- কেন ?

- খুবই দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির মানুষ।

- কি রকম ?

- ওর অনেকগুলো জাহাজ দরিয়ায় দস্যুগিরি করে ।

- রাজার কত সৈন্য ?

- দু-হাজারের মতো।

লালমিশাই-এর চোখেমুখে খবরটা কোনো প্রভাবই বিস্তার করল না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিনিই প্রথমে নামলেন এবং মস্ত শালের খুঁটিবাধা জেটিপথ দিয়ে তিনিই প্রথম পা রাখলেন রাজ্যের মাটিতে। একটু পেছনে, লালমিশাই দরিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন যেন। ঢেউগুলো বালি-মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। লালমিশাই-এর হাসিটুকু যেন বলল - সব কিছুই কোথাও এসে শেষ হয়। মাঝদরিয়ায় ঝড় ও তুফানের দাপটে, যখন মাটি-পর্বত-ভূখণ্ডটির কোনো আভাসই ছিল না, মনে হচ্ছিল টলোমলো বিপদগ্রস্ততার বুঝি শেষ নেই। এটাই চূড়ান্ত।

তখনই বেড়া ও গোলপাতা-ছাওয়া একখানা ছিমছাম ঘর থেকে দুজন মানুষ, কপালে চন্দন-তিলক ও মুণ্ডিত মস্তক, কাছে এসে পরিচয় দিল তারা রাজার শুল্ক আদায়কারী।

দুটি জাহাজের একটিতে ছিল ঠাসা উপহারসামগ্রী। ১২০ বুস্ত দামী সামুদ্রিক কড়ি, ২০ পাত্র নারকেল মধু, একটি মূল্যবান আরবীয় ঘোড়া এবং দামী মসলিনের কাপড়। সারা রাস্তা এই জাহাজটাকে কিছু তীরন্দাজি পাহারা দিয়ে এনেছে। উপহার দেওয়া হবে রবমের সুলতানকে। লালমিশাই-এর খুবই ঘনিষ্ঠ তিনি। রবম হচ্ছে কাফেরদের রাজ্যের পাশেই। বছর দুয়েক আগে লালমিশাই স্থলরাস্তায় রবম এসেছিলেন - উজিরের কাজও করে গেছলেন কিছুদিন।

লালমিশাই মুণ্ডিতমস্তককে বললেন - আমি রবমের সুলতানের বন্ধু।

- সালাম হুজুর।

লালমিশাই জানালেন তখন -এ জাহাজে তারই উপহারের জিনিষপত্তর। ... শুধু বন্ধু নয়, আমি তার নবম বেগমের চতুর্থ কন্যাটিক মুতাও করেছি। কাফেরের দেশ হলেও এরা জানে 'মুতা'-র অর্থ সাময়িক বিবাহের চুক্তি। কথাগুলোয় যাদুমন্ত্রের কাজ হলো। ধীরে ধীরে যে-সব কাফেররা লুট-পাটের ফন্দি-ফিকির খুঁজছিল, একে একে সরে পড়ল।

এবার লালমিশাই অন্যান্যদের নির্দেশ দিলেন জাহাজ থেকে একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে। তাঁর কুঠুরির বাইরে পাটাতনে ছিল সস্তায়কেনা পাঁচটি বাঁদি, কিছু ক্রীতদাস এবং রাঁধুনীরা। আর ভেতরে, তিনি সেবা নিয়েছেন মিশরীয় একজন বাঁদীর - প্রণয়বশত লালমিশাই যাকে দু'মাসের গর্ভবতী করে রেখেছেন। বাঁদীটি এজন্য শারীরিক অস্বস্তিতে ছিল না আদৌ; স্বচ্ছন্দেই খাটাখাটনি, সেবা যত্ন করেছে। দরিয়ার ঢেউ ঝাপটে বমি-পাইখানা করেছিল মাত্র। লালমিশাই মানুষ-জনের অসুস্থতা নিয়ে আদৌ চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না। এই যে জাহাজটি উঠছে নামছে, বড় বড় পানির ঝটকা খাচ্ছে, তা থেকেই শরীরে অনেকটা পিপার মতো গড়াগড়ি এবং দেহ খোলের মধ্যে যা কিছু পাপের কড়ি প্রতিদিন জমে - পায়খানা, বমি, পেচ্ছাপ বেরিয়ে পড়লে চিন্তার কী আছে ? এতবড় দরিয়া মানুষকে এভাবেই তো ধোয়া পাখলা করে দেয়। লালমিশাই-এর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ভিন্ন।

মাস ছয়েক আগেই লালমিশাই সুরাটের সুলতানের কাছে আসছিলেন জাহাজে উপহারসামগ্রী নিয়ে। ঝড়-ঝঞ্ঝাটে ১০ দিনের পথ ২৫ দিনে এসে ঠেকে। হিসেবের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় ফুরিয়ে গেলে, উপহারের কয়েকটা ঘোড়া ও বেশ কিছু বাঁদী খিদেও তেষ্টায় জাহাজের খোলে আধমরা অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে টেঁসে। শেষে তাদের সমুদ্রে খালাস করা হয়েছিল। উপহারের ঘাটতিতে সুলতান কিছুটা অপমাণিত বোধ করেছিলেন লালমিশাই-এর উপর। কিন্তু লালমিশাই জ্ঞানী, ধার্মিক

ও বহুবার মক্কায় হজ্জ করেছিলেন বলে, সুলতান কিছুটা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তো, এ-যাত্রা ৩ দিনের পথে ঝড়-তুফানে লালমিশাই-এর দুশ্চিন্তা হতে, রাঁধুনিদের দলপতিকে ডেকে জানতে পেরেছিলেন, হিসেবের ভুলে জাহাজে ১০ দিনের রসদ আনা হয়েছে। লালমিশাই তখনই বুঝেছিলেন, আল্লার কৃপা যখন আছে, তুফান যতই ভয় দেখাক, পাকা-বিপদ ঘটাবে না কিছু।

শুল্ক-আদায়কারীরা চলে যেতেই, লালমিশাই নতুন রাজ্যের আকাশে বাতাসে চোখ রাখলেন। দুপুরের রোদ চারদিক মাতিয়ে তুলেছে। যদিও বর্ষাকাল, বেশ কিছুদিন বৃষ্টি হয়নি এদেশে। দূরে সবুজ গাছপালার নিবিড় বিভঙ্গ। এত হরিয়ালি কোনো দেশ হতে পারে ? অথচ দরিয়ার পানি থেকে কত উঁচু উঠে আছে দেশের মাটি। ওদের আশপাশে কিছু কাফের ঘুরঘুর করছিল। বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই তাঁরা হাজির হয়। যেন নতুন কোনো দ্রব্য পেয়ে শুঁকতে এসেছে। লালমিশাই লক্ষ্য করলেন এদের প্রত্যেকের চোখেমুখে সন্দেহ - হয় তো জাহাজদুটো থেকে মুহূর্তে ঢাল-তীর-তলোয়ার নিয়ে সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে সব্বাইকে কচুকাটা করে রাজ্যটি দখল করে নেবে।

এলাকাটিতে অসংখ্য সরু সরু রাস্তা, দু'ধারে বাঁশ ও গোলপাতা ছাওয়া সারি সারি ঘড়-বাড়ি কোথাও সাময়িক নারকোলপাতা ছাউনি, লেন-দেন এর কারবার চলছে। প্রচুর মানুষের ভিড়। সাধু, ভেল্কিবাজ ও ভবঘুরেদের আড্ডা। আর ছিল সারি সারি কুষ্ঠরোগী। লালমিশাই অবাক হয়ে যান। এরা জাহাজীদের কাছে হাত পেতেই রেখেছে, এক আধটি দিনার পেলেই এদের মোক্ষলাভ হয়ে যায়। কারও নাকে শুধু মস্ত গর্ত, কারও হাত দুটো ঠুণ্ডা - একটিও আঙ্গুল নেই। কারও কানটি দুমড়ে-বেঁকে যাচ্ছে, কারও পায়ের পাতা বড় বড় পাতা দিয়ে বাঁধা। কেউ ঢোল বাজিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এরা যে জীবনে কোনো না কোনো সময়ে স্বাভাবিক সংসারী ছিল - লালমিশাই-এর মনেই হয় না। যেন রোজকেয়ামতের দিন আল্লার বিচারের পর এদের একত্রে নির্বাসিত করে গেছেন কেউ। মাঝেমাঝে সরু রাস্তা দিয়ে হাতি চলে যায়। মানুষের সাবধানের ফাঁকেই দু-চারটে পড়ে ভারি গোদা পায়ের নিচে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কারও, কেবল তলার লোকটা মুখ ফিরিয়ে কাতরেই চলে না-মরা পর্যন্ত।

শান্ত ছোট্ট কাফেরদের এই দেশটিতে পাওয়া যায় দামি কাঠ ও ঘৃতকুমারী। এদেশের বণিকরা ঘৃতকুমারীর বিনিময়ে অন্য দেশ থেকে আনে কর্পুর, কুমকুম প্রভৃতি। এই বন্দরে ইদানীং বেশি করে তীর্থযাত্রীদের জাহাজ এসে ভেড়ে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। সরণদীপ পর্বতে-সেই যে দরিয়া থেকে আকাশে যার অস্পষ্ট আভাস দেখা গেছল - আছে পবিত্র আদমের চিহ্ন। সেখানের স্থানীয় বাসিন্দারা আদমকে 'বাগ' ও ইভকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে। আগে এপথে চীনা বা কিছু যোগীরা যাতায়াত করত, স্থানীয় বাসিন্দারা মুসলমানদের ঘৃণা করত বলে, ওই পথ খুলে দেয়নি। রবসের সুলতান শক্তিশালী হবার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

লালমিশাই খুবই সুদর্শন পুরুষ। লম্বায় প্রায় ৬ ফুটের মতো। ছিপছিপে গড়ন, মেদের বিশেষ বালাই নেই। মাথায় ভেড়ার লোমের মতো বাদামী ঘন ঝোপ, ঈষৎ তামাটে বর্ণ, ঠোঁটদুটি পুরু এবং চোখের তারা ঈষৎ খয়েরি বর্ণের। দৃষ্টিতে অপূর্ব মাহাত্ম্য। কানে সোনার অংটি এবং গলায় সামুদ্রিক পুঁতির মালা। সাদা ইজার এবং তুর্কি দেশীয় বুকচাপা ভেলভেটের কোট। লাল টকটকে রং এবং প্রান্ত দেশে সোনালু লতাপাতার কাজ ঝকঝকে রোদে গণ্যমান্য অতিথির মতো লাগছিল।

'এরা কি বণিক না লুটেরা ? সন্দেহবাদীরা আড়চোখে দেখতে থাকে।

দেশটি আসলে জঙ্গল, পর্বত ও মাটিঘেরা ছোট্ট একটি দ্বীপ - বড় রাজা বা সম্রাটের একটা তালুক মাত্র। আর যা কিছু ক্ষুদ্র এবং তা বড়র যদি নকল হয়, হাতের মুঠোয় রাখতে ইচ্ছে করে। একটা আস্ত জাহাজের চাইতে হাতির দাঁতের নকলজাহাজ অনেক বেশি যত্নে সাজিয়ে রাখে মানুষ। অধিকার ছাড়তে চায় না। লালমিশাই-এর মনে হল, রাজ্যটি দখল করে মনের মতো সাজিয়ে বসলে মন্দ হয় না। আসলে লালমিশাই-এর মনে পড়েছিল, সদ্য যে দেশটা ছেড়ে তিনি এলেন, জাহাজপথে একটি দ্বীপ নজরে এসেছিল। দ্বীপটি ওই রাজ্যেরই ছোট্ট একটি টুকরো। সারা দ্বীপে মাত্র একখানা বাড়ি। মালিক একজন তাঁতী। ছেলে-মেয়ে-পরিবার নিয়ে সেখানে সে বাস করে। কয়েকটি মাত্র নারকেল এবং কলাগাছ আছে। তাঁতীটির ছোট্ট একটি ডিঙ্গিনৌকো আছে, তাতেই সে যাতায়াত করে, মাছ ধরে। লোকটিকে দেখে লালমিশাই-এর খুবই হিংসে হয়েছিল। যদি সরণদীপ-এ পবিত্র আদম-এর পায়ের ছাপ দেখবার উদ্দেশ্যে না থাকত, হয়তো জাহাজের সৈন্যদের দিয়ে যে-কোনো ছুতোয় ওর মুণ্ডুটা কেটে দ্বীপটা দখল করে বসত।

ইতিমধ্যে শুল্ক আদায়কারীর আশপাশে সন্দেহজনক যে-কাফেরগুলো মতলবে ঘুরঘুর করছিল, নতুন দল নিয়ে ফিরে এসেছে। লালমিশাই প্রমাদ গুণলেন। যদি দলটা এসে দাবি করে, 'যতদিন না সরণদীপ পর্বত থেকে ফিরছেন, জাহাজের অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের জিম্মায় রাখতে হবে, রাজার হুকুম'। তাহলেই বিপদ। কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া যাবে না। কখন ছোট ছোট জনপদ থেকে আচমকা আক্রমণ ঘটবে, বলা যায় ? অস্ত্র শুধু হাতিয়ারই নয়, মর্যাদারও চিহ্ন। আল্লার এই মর্যাদা কিছুতেই প্রতিপক্ষের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। কিন্তু দলটা এসে বলল, 'রাজা জাহাজ-সুদ্ধ সব্বাইকে আপ্লায়ন করেছেন।' লালমিশাই নিজের মনে হাসলেন। রবসের শক্তিমান সুলতানের বন্ধু ও আত্মীয় বলেই খাতির বেড়ে গেছে ? অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে দোলা এবং গোটা চারেক হাতি।

লালমিশাই-এর হুকুমে উপহারসামগ্রী হাওদায় তোলা হল। বিনা উপহারে কোনো রাজার সামনে হাজির হওয়া অপরাধের। দোলার বাহক চারজন ভীষণ কালো এবং কদাকার। মনে হয় হিংস্র প্রকৃতির বটে। লালমিশাই-এর ওজন এখন চারজনের কাঁধে। রাজা খুব ভারি হয় ওজনে কিছু এ-ও কম যান না। চারজন ছুটতে শুরু করল। বাকি সবাই ধীর লয়ে হাতির হাওদায় চলেছে। প্রথমে লালমিশাই ভেবেছিলেন গর্ভবতী বাঁদীটিকে - মুনিয়ম যার নাম - পাশে নেবেন। কী ভেবে বাতিল হয়ে গেল। হাওদায় সে তলপেটে চাপ বোধ করছিল, তবু হাসি হাসি মুখ। বাঁদীদের পুরো দলটাই যদি ঢেউয়ের উথাল-প্যাথালে বমি-পাইখানা না করত ঘনঘন, মুনিয়মকে হয়তো আরও বেশি খুশিখুশি লাগত। সিরিয়ার এক হাট থেকে লালমিশাই এটিকে কিনেছিলেন। কোন সম্রাটের হারেমে বেচে দেবেন, ঠিক করতে না পারায় মুনিয়ম গোটা চারেক রাজ্য ঘুরবার সুযোগ পাচ্ছে। মেয়েটি সারাদিনে দু'চারটে কথা বলে মাত্র, ভীষণ পরিশ্রমী, সেবাপরায়ণা ও বুদ্ধিমতী।

কাফেরদের এই ছোট দেশটিও বেশ সাজানো গোছানো। বর্ষার পর চারদিক যেন সবুজে থমথম করছে। দিন-রাত অবিশ্রান্ত ঢেউ-এর আছাড়ি-পিছাড়ির শব্দ। এরই তটে দরিয়া যে শেষ হয়েছে কিছুতেই যেন ঢেউগুলো মানতে চাইছে না। এখন সমস্ত উপকূলে দারুচিনির ডাল ছড়ানো।

বর্ষার তোড়ে, স্রোতের টানে ভেসে এসে কূলের কাছে টিবির মতো টালটাল জমা হয়ে আছে, বাতাসে সর্বক্ষণ মিষ্টি ঝাঁঝালো একটি গন্ধ। দোলাবাহকদের কাছে জানা গেল রবম রাজ্যের গরিব মানুষগুলো বিনে পয়সায় এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়। জ্বালানী করে। এ-টুকুর জন্য এক রাত্রিরের দুর্গম নৌপথকে হাসি মুখে মেনে নেয় তারা। এটুকু উদারতা ছোট্ট রাজ্যটি থেকে যায় বলে, রাজাকে ভেট দিতে বাধ্য থাকে। ফলমূল, টুকিটাকি হাতের কাজ, জঙ্গলের মধু-সামান্য যা-কিছু হোক, না দিয়ে দারুচিনি ডালে হাত দেওয়া নিষিদ্ধ। রাজার বাসস্থান বলতে সুন্দর ছোটখাট একটি শহর। দুর্গ নেই যদিও, কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এমনি গম্বুজগুলিও কাঠের। রাজবাড়ির কাছে পৌছতেই নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এল ভেসে। এটাই নিয়ম। রাজ-অতিথিদের সম্মান জানানোর প্রথা। নানা সুলতানদের দরবারের তুলনায় এর জাঁকজমক তেমন নয়। লালমিশাই বুঝলেন এ-রাজা স্বাধীন নন, কোনো বড় রাজার সামন্ত। লালমিশাই ঠিক করলেন, রাজার অধিক সম্মান না দেখালে এরা যে কোনো ছুতোয় প্রাণের বিপদও সৃষ্টি করতে পেছপা হবে না।

ছোট্ট একটি সিংহাসনে রাজা বসে আছেন। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখানি সাদা কাপড় পরণে। মাথায় বাসন্তী বর্ণের পাকানো ছোট্ট একটি পাগড়ি। খালি পা। একজন চাকর মাথার ওপর ছত্র ধরে আছে। ছত্রটিতে কয়েকটি মাণিক্য গাঁথা।

লালমিশাই পরিচয়পত্র একজন কর্মচারীর মারফৎ তুলে দিতেই, রাজা দেখলেন; চোখমুখে খুশি ঝরে পড়ল। ইঙ্গিতে বসতে বললেন অতিথিকে। লালমিশাই লক্ষ্য করলেন রাজা অনবরত চোয়াল নাড়িয়ে যাচ্ছেন; ভারি সুন্দর কর্পূরের গন্ধ ছড়িয়েছে। একজন হাতে ভৃঙ্গার নিয়ে সিংহাসনের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে। ইঙ্গিত পেলেই দ্রুত ধরতে হচ্ছে মুখের সামনে।

লালমিশাই-এর দৃষ্টির ইঙ্গিতে, ক্রীতদাসরা উপহার-সামগ্রী হাজির করতেই, দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন। তবে নারকেল মধু ও বস্তু-বোঝাই কুড়িগুলো মামুলি সরিয়ে দিয়ে, মসলিনে আকৃষ্ট হলেন বেশি এবং আরবী ঘোড়াটায়।

- বাঃ। এটির জাত কেমন ?

- হুজুরের জন্য, হজ থেকে ফেরার পথে, খোদ আরব থেকেই খরিদ করেছি।

- ভালো ছোটে-টোটে ?

- রোদের তেজ দেখলেই তো বুঝবেন বেলা কত। ... আমার মুখে শুনবেন কেন ? উত্তর শুনে রাজা তারিফ করলেন লালমিশাইকে এবং একজন রাজসৈন্যকে ডেকে পরীক্ষা করাতেই, ঘোড়াটা দরবারের কয়েকটা দরজা পেরিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। খুরের শব্দগুলো রাজার চোখে খুশি হয়ে ঝুলে রইল নিঃশব্দে।

খানিক বাদেই ঘোষক জানিয়ে গেল, লালমিশাই-এর পুরো দলটাই যেহেতু রাজঅতিথি, মর্যাদা অনুসারে যে-যার আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যাক।

প্রথমদর্শনে রাজাকে যতখানি মূর্খ ভেবেছিলেন, ততখানি তিনি যে নন, টের পেতে লালমিশাই-এর দেরি হল না। নানা প্রসঙ্গ-আলোচনায় লালমিশাই-এর মনে পড়ল, সেবার রবসের সুলতানের কাছে শুনেছিলেন এই রাজার নৌ-বহরের ক্ষমতা। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১০০ টির মতো জাহাজ

আছে। সে-গুলো সমুদ্রে দস্যুগিরিই করে না, বাণিজ্য করতে যায় আরব, ইয়েমেন কিংবা সুদকাওয়ান বা চাঁটগাঁয়।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন - কী উদ্দেশ্যে আপনার এ- আগমন ?

লালমিশাই ফার্শী ভাষাতে শুরু করেই, ডাকলেন এক দোভাষীকে

রাজা লালমিশাইকে চমকে দিয়ে বলে গেলেন - ফার্শী ভাষাটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না।

- এটা আপনার জ্ঞান ও উদারতার পরিচয়। বলেই লালমিশাই জানালেন - আপনার রাজ্যে আদমের পদচিহ্ন দেখতে এসেছি। মুসলমানের পবিত্র তীর্থ। রাজা খুব খুশি হলেন না শুনে। সরণদীপ পর্বত তাঁর রাজ্য, সুতরাং তিনি জানেন ওটা কাদের তীর্থস্থান।

- কোন কোন দেশ ঘুরেছেন এর আগে ?

- অনেক। সিন্ধ-মুলতান-কাবুল-গান্ধার-আপনার কাছের ধীবত-উল-মহল পর্যন্ত।

রাজা সর্বশেষ নামটি শুনে তাচ্ছিল্যে জানালেন - তাতো আপনার মধু আর বুস্তুর কড়ি দেখেই টের পেলাম।

লালমিশাই জবাব দিলেন - করলে আপনি ওদেশে অভিযান চালাতে পারেন। আশা করি তারা আপনার নৌবহরের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।

রাজা অমাত্যদের মুখে একঝলক তাকালেন। দৃষ্টি বিনিময় শুধু। লালমিশাই-এর মনে হল রাজ্যের সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুটি বড়ই রহস্যময়।

রাজা বল্লেন - আপনার জাহাজের অস্ত্রগুলো আমার কর্মচারীরা যদি পাহারা দিয়ে রাখে, আপত্তি আছে ?

প্রতিপক্ষের জবাবের আগেই রাজা বিনীত কণ্ঠে বল্লেন - অবিশ্যি আমার লোকেরাই আপনাদের আদমের চিহ্ন দেখিয়ে ঠিকঠাক ফিরিয়ে আনবে। রাজা কোনো প্রসঙ্গেই বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করেন না। ফুলে ফুলে মধু পানের মতো, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে দ্রুত উড়ে উড়ে যেতে চান। লালমিশাই-এর মুখে কিছুআগের দেশগুলোর নাম জেনে, কৌতূহলে বললেন - যে দেশগুলো ঘুরলেন, আমার রাজ্য থেকে কোন কোন গুলো বেশি সুন্দর ?

- তা বোধহয় কোনো দেশই নয়।

ক্ষমতার চোখে এক ঝলক আলো ফুটে উঠল। ভীষণ খুশি হলেন।

- দেশগুলোর নৌবহর কত ?

- সবগুলোতো পানির দেশ নয়... নৌবহর থাকবে কী করে। .... তবে খুন্দ আলমের নানা দেশে তারা বাণিজ্য করতে আসে।

রাজা ভাবতে তাকলেন চুপ করে। আর লালমিশাই এইসব প্রশ্নের গূঢ় কারণ খুঁজতে থাকেন। মনে পড়ে, মুলতান রাজ্যে ঢুকবার কিছুদিন পরই সুবাদারের এক আমির, কোতোয়ালকে সঙ্গে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল - কী উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ?

লালমিশাই চটপট জবাব দিয়েছিলেন - খুন্দ আলম-এর কাছে চাকরি করতে এসেছি। 'খুন্দ-আলম' মানে পৃথিবীর অধীশ্বর। একজন সুবাদারকে পৃথিবীর মালিক বলে সম্বোধন করলে কে না খুশি হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কাজী ও উদুল ডেকে চুক্তি পত্র সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বিদেশীদের চাকরির এটাই ছিল শর্ত।

এখন কিন্তু লালমিশাই এ-রাজাকে তেমন কোনো স্তোকবাক্য শোনাতে আগ্রহী ছিলেন না। চুপ করে থাকলে পাছে সন্দেহ জন্মায়, গায়ে পড়ে লালমিশাই ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা চালালেন।

- আপনার যা নৌবহর ধীবত-এর যে কোনো অংশ আপনি পদানত করতে পারেন।

রাজা তাচ্ছিল্যে বললেন কী আছে ওদেশে ? হলদেপেটের কড়ি ? আমার দারুচিনির ডাল ওর থেকে মূলবান!

- ও দেশের বাঁদীরা খুব সস্তা।

- তার জন্য যুদ্ধ ? একনৌকো শস্যদানা পাঠালে, জাহাজ ভর্তি বাঁদী কিনে আনা যায়। ধীবতের বিধর্মী বাঁদী দিয়ে কী করব আমি ? এ-রাজ্যে দেবদাসীর অভাব ? .... আপনি চাইলে গোটা চারেক পাঠিয়ে দেব। ... ক' দিন যত্ন আত্তিতে থাকতে পারবেন।

সে-রাতে লালমিশাই-এর ঘরে চারজন দেবদাসী সারা রাত সেবা করে গেল। তিনি বুঝে নিলেন, এ-রাজ্যের মেয়েগুলো ভীষণ অপরিষ্কার থাকে ও তাদের দেহ থেকে ধুনোর মতো গন্ধ ছড়ায়। শরীর অনেকটা ছিবড়ে ধরণের। সুরাটের সেই উপহারকেনা দু'দিন নিস্তেজ হয়ে মৃত ঘোড়াগুলোর মতো। লালমিশাই প্রত্যেক দেবদাসীকে ৫টি করে দিনার উপহার দিলেন। প্রথমে তাঁরা গ্রহণ করতে নারাজ হল।.রাজা জানতে পারলে রেগে যাবেন। প্রত্যেকে তাঁরা ঈশ্বরের সেবায় সম্পৃত।

- ভগবান ছাড়া আমাদের নিজের কিছু থাকতে নেই।

- জামা-কাপড়ও নিজেব ? লালমিশাই কৌতুক করলেন।

- ওগুলো মন্দির থেকে পাই আমরা।

- কাউকে ভালোবাসতেও শেখনি তোমরা ? তাতো তোমার নিজের।

একজন দেবদাসী কুণ্ঠায় জবাব দিল- দুঃখ পাওয়াই আমাদের ভালোবাসা। তাই অন্যদের আনন্দ দিয়ে আমাদের দুঃখ সইতে হয়।

উজির লালমিশাই-এর মধ্যে কিছু দয়া-মায়া আছে, কারণ ওর দেহে উচ্চবংশের রক্ত। ওদের বংশীয় পেশা ... (বিচার বিভাগীয় কর্ম) এবং মশীখত (দাতব্য-সংস্থা পরিচালনা)। এছাড়া ওনার মধ্যে আছে তীব্র ধর্মীয় প্রবণতা, সাধু-সন্ত ফকীর দর্শন ও তীর্থস্পৃহা। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় তিনি বহুবার তরোয়াল চালিয়েছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে। জ্যান্ত চামড়া ছাড়ানো বা কাঠের তীক্ষ্ণ শূলে চাপিয়ে দিতে কসুর করেননি প্রতিপক্ষকে।

শেষ রাতে দেবদাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে লালমিশাই দেহ পরিষ্কার ও গোসল সেরে পবিত্র হৃদয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। নিশ্চুপ বসে রইলেন একাগ্র মনে আল্লার ব্যাপ্তির কথা ভেবে। বড্ড শখ খুন্দ আলমের পুরো মুলুকটা ভ্রমণ করে আসেন।

বাইরে পা দিয়ে দেখতে পেলেন গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে দিনে প্রথম আলোর আভাস - জগতের নূর। কোটি কোটি মাইল দূর থেকে সাঁতরে আসা নূর-এর মধ্যে খুঁজলেন আল্লার বাণী ও করুণা। তিনি আপনমনে গুন গুন করে ফার্শি ভাষায় তত্ত্ববাণী গাইলেন, যার বাংলা অর্থ 'দুষ্ট শয়তান আছে অরাতি তোমার/টলাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার। তখনই মনে পড়ল শ্রদ্ধেয় পীরের কথা, যিনি থাকেন পাহাড়ের ওপর একটি গোফায়, যা এ- দেশ থেকে দরিয়া বেয়ে ৪০ দিনের পথ। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ফকিরটির বয়স তখন ১৫০ বছর; ওই বয়সেও নাগারে ৪০ দিন তিনি নাকি উপবাসী থাকতে পারেন। ফজরের প্রথম আলো, মহিমাময় গাছগাছালির সতেজ টাটকা রূপ, লালমিশাই ভাবতেই পারেননি তাদের ৪০টি দিনের জাহাজযাত্রা ক্রমে ৭০০ বছরে এসে ঠেকবে।

বেলা চড়লে, লালমিশাই রাজার সঙ্গে দরবারে দেখা করতে এলেন যখন, কিছু কর্মচারী হুজুরের সামনেই মুক্তা-ভেরি থেকে তুলে আনা একরাশ ঝিনুক থেকে মুক্তা ছাড়াচ্ছিল। কিছু বল্লমধারী তাদের পাহারা দিয়ে আছে। রাজা আয়রি গর্বে টইটম্বুর হয়ে নিজেকে নিয়ে কী যে করবেন, বুঝতে পারছিলেন না। বিদেশী অতিথিটির কাছে তাঁর মান কী যে স্ফীত হয়ে গেল! এরাজ্যের যেখানে যে অবস্থায় মুক্তোর ঝিনুক মিলবে সবই রাজার। এ-রাজ্যে ব্যক্তি মালিকানা বলে কিছু হয় না। এমন কি আমিরদেরও নয়। তবে নানা ঝঞ্ঝাটে তাঁরা রাজাকে অর্থ ধার দেয় বলে, আমিরদের প্রভাব ও প্রতাপ দোর্দণ্ড।

রাজা অয়রির অনেকগুলো মুক্তোভেড়ি। দামি মুক্তার ফলন হয় সেখানে। এগুলো তিনি তাঁর সম্রাট বা পাশের সুলতানের কাছে ভেট পাঠান। অথবা জাহাজে চাপিয়ে অন্য দেশ থেকে এর বিনিময়ে নিয়ে আসা হয় পারদ, মশলিন বা সুপুরি। রাজার হয়ে জ্ঞানী-গুণী কিছু পারিষদ পারদ পুড়িয়ে গোপনে সোনা আবিষ্কারের চেষ্টা চালাচ্ছেন বহু দিন ধরে।

লালমিশাই ছাড়ানো মুক্তোগুলোর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন। খুবই উঁচুমানের মুক্তো এগুলো। খোলা ভাঙ্গতেই বেরোচ্ছিল উজ্জ্বল, বড় বড় কাছিমের ডিম। একটির গায়ে আরেকটি ধাক্কা খেয়ে কী মধুর ধ্বনি তুলছিল। রাজা অয়রি আত্মপ্রাসাদে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন - যে-সব দেশে আপনি গেছেন সেখানে কোথাও মুক্তা-ভেড়ি দেখেছেন ?

লালমিশাই বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিছুক্ষণ অয়রির দিকে চোখে চোখ রেখে সহাস্যে তাকিয়ে রইলেন। প্রমাদ গুণছিলেন এমন কঠিন প্রশ্নের সরাসরি কী জবাব হতে পারে।

- হ্যাঁ, ধাবতের কইশ ও কিশ দ্বীপে দেখেছি। ও-দেশের রাজার ভেড়ি ওগুলো।

রাজা ঈষৎ গম্ভীর।

- হ্যাঁ, আমিও সেগুলির কথা শুনেছি। বলেই রাজা নীরব।

শুধু মুক্তোর শরীরে মুক্তো ঝরবার শব্দ। বাছাই চলছে। বল্লমধারীদের একজন একচোখ কানা, রোগা একটা মজুরকে হঠাৎই তুলে নিয়ে গেল। সে নাকি লুকিয়ে একটা দানা পেটে পুরে দিয়েছে। রাজা অয়রি তুচ্ছ ঘটনা ভ্রূক্ষেপই করলেন না। কিছু সময় গম্ভীর থেকে, হঠাৎ একজনকে ইশারায় ডাকলেন। লোকটা দৌড়ে একপাত্র মুক্তো রাজার সামনে তুলে ধরল। এক খাবলা মুক্তো

হাতে অয়রি ঈষৎ দৃঢ়তায় জিজ্ঞেস করলেন - সেখানের মুক্তো কি এর মতো ? দ্রুত জবাব দিলেন লালমিশাই-না, না, হুজুর। এর চেয়ে অনেক নীরেস মানের। শুনে রাজা খুবই খুশি হলেন এবং মুক্তোর মুঠো এগিয়ে দিয়ে বললেন - রাখুন। বিদেশী অতিথিকে দীন-ব্যক্তির সামান্য উপহার।

লালমিশাই ঈষৎ হাঁটু গেড়ে, অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে করতে বললেন - আপনার হৃদয় দরিয়ার মতো। দীনব্যক্তি কেন হবেন ?

এরপর লালমিশাই অয়রির কাছে আদমের পদচিহ্ন দেখতে যাওয়ার আর্জি জানালেন। রাজা উজির ও মন্ত্রীদের ডাকলেন, কর্মচারীদের মধ্যে দৌড় ঝাঁপ পড়ে গেল এবং যাত্রার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল চটপট।

সেই বান্দাগুলোই লালমিশাইকে দোলায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে চলল। কেবল দূরপথ বলে তাদের শরীরে উঠেছে পাতলা ফতুয়া এবং মাথায় কাপড়ের ফেট্টি। সঙ্গে চারজন যোগীও চলেছেন। পায়ে হেঁটে। তাদের সারা দেহ ছাইমাখা, কাঁধে পাতলা কম্বল, বড় বড় ময়লা নখ এবং মাথার জটাচুলে প্রচুর উকুন।এরা হঠযোগী, বামাচারে এদের কোনো সংস্পর্শ নেই। মূলাধারের বিন্দুপতনকে উর্দ্ধগামী করে পিঠের দণ্ড ধরে এরা সহস্রায় পৌঁছে দেয়ার সাধনা চালায়। লালমিশাই এর মনে পড়ে দিল্লির দরবারে একবার দুই যোগীকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখেছিলেন। দেখে তো মাথা ঘুরে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

দলের সঙ্গে যোগী-চারজন ছাড়াও চলেছেন তিনজন ব্রাহ্মণ, রাজার পারিষদের দশজন এবং পনের জন মালবাহক, রাঁধুনি ইত্যাদি। কারও কারও হাতে ছিল তীর ধনুক। পথে দস্যুর ভয় আছে কিনা।

রাজ্যটি যে কত ছোট টের পাওয়া গেলদলটা যখন বাঁশের কঞ্চির একটি খেয়ায় চড়ে নদী পেরিয়ে মনার-মন্দলী পৌঁছল। তিন-চারবার ধরে পারাপার করতে হয়েছে। খেয়ার পাটনী ছিল উগ্রসাজের এক ডোমবউ। কালো শরীর থেকে লাবণ্য চুঁইয়ে পড়ছে, নাকে নথ। পাড়ে উঠে লালমিশাই যখন ফের দোলায় চাপতে যাবেন, অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল।

পাটনী পেছু পেছু কড়ির জন্য ঘ্যান ঘ্যান করতেই পেয়াদা গোছের এক রাজকর্মচারী পাছায় বেতের দুই ঘা বসিয়ে দিল। ডোম বউটা চোখ পাকিয়ে চেঁচামেচি শুরু করতেই দ্বিতীয়বার বেত পড়ল শপাং। তবু বউটাকে দমানো গেল না, সে কড়ির দাবি জানাতেই থাকে। লালমিশাই-এর দয়া হল। পকেট থেকে পাঁচটি দিনার, ডেকে পাঠনীকে দিতে যাবে, পারিষদদের একজন দোলার কাছে ছুটে আসে।

- হুজুর, রাজার অপমান হবে এতে।

- অপমান ? কেন ?

- এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, রাজার মেহমানদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেয়া চলে না।

মনার-মন্দলী এ-রাজ্যের প্রান্তসীমায় গড়েওঠা ছোট্ট সুন্দর একটি শহর। ভীষণ শান্ত এবং অধিবাসীরা বেশি শান্ত। দেখতে দেখতে রোদ ও বাতাসে প্রহর পেরিয়ে যেতে ক্ষুৎপিপাসা ও বিশ্রামের জন্য শিবির বানিয়ে সিমাট (কাপড়) পাতা হল। এবং রাজার মেহমান বলে, শহরের

অধিবাসীরা দলটাকে ভোজ খাওয়ালো। পাশের জঙ্গলে শিকারীর তীর ধনুক, ভল্লা নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। অঢেল জন্তু-জানোয়ার, শিকারে কোনো অসুবিধে হল না। উনুন খুঁড়ে, কাঠ জ্বালিয়ে রান্না হল বাচ্চা মোষের মাংস, ভাত, তিতির পাখি, মাছ, মুরগী ও দুধ। রান্নার খুসবাইতে দলটার ক্ষুধা তীব্র হয়ে উঠছিল।

লালমিশাইকে কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছিল না। বিচ্ছিন্ন একটা শিবিরে জোহরের নামাজ সেরে, হাত-পা ছড়িয়েছিলেন। রাজ্যটি তাকে তেমন টানছিল না। একটিও মসজিদ চোখে পড়েনি। রবসের সুলতান কি সুরা আর নারীসংগ নিয়েই থাকেন ? ধর্মের নামে কাছের রাজ্যগুলিতে তাঁর অভিযান চলে না ? তবে এমন ছায়াচ্ছন্ন দেশ বড় দেখেননি তিনি। দুপুরে কী একটা পাখি ডাকছিল খুব কাছ থেকেই। লালমিশাই-এর কানে ঠেকল রবীন পাখির ডাক, ধবল দেশে ঐ-ডাক শুনেছিলেন। মরিয়ম লালমিশাই-এর সেবায় ব্যস্ত। হুজুর দীর্ঘপথ দোলা চে পেছেন, নিশ্চয়ই দেহের পেশি টনটনে হয়ে গেছে। সারা দিন মরিয়ম যে খাদ্য পায়নি, ঘুনাক্ষরেও জানাল না। কাঠকাটা, জলটানা এবং জাহাজের দাড়ি-মাঝিদের নানা ধান্দার মধ্যে সময় বয়ে গেছে, মরিয়ম মৃদু স্বরে ডাকল-হুজুর।

- কী ?

- বলছিলাম দুন্নি আর দাভি-কে কোথাও রেখে যেতে হবে। সঙ্গে যেতে পারবে না।

দুন্নি এবং দাভি হল বাঁদীদের দুজন।

- কেন ?

- ওদের শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘুমের চটকা ভাঙ্গতেই টের পেলেন স্বপ্ন। খোয়াব। গতরাতে দেবদাসী চারজনের সেবা,কসরত এবং শরীরে তাদের ধুনোর গন্ধে ঘুমোতেই পারেননি। তার ওপর এতটা রাস্তার ক্লান্তিতে, দুপুরের স্নিগ্ধ ছায়া ও আর্দ্র বাতাসে শিবিরের মধ্যে ঝিমুনি এসেছিল। সমুদ্র নিকটে বলেই বাতাস চব্বিশ ঘন্টাই আর্দ্র। মরিয়মের কথাগুলো খোয়াবের কথা বলেও, বাঁদীটি বাস্তবে একটানা পা টিপে যাচ্ছিল এবং হুজুর আরামবোধে ঝিমুনি দিয়ে ফেলেছিলেন।

'কাফেরদের দেশে মুসলমান দেখতে পাবেন না', বলেছিল জাহাজের নাবিক সুলেমান। সে তেমন দক্ষ নৌচালক নয়; না হলে ঢেউ কাটাতে ন'দিনকে দু'দিনের পথে নামানো যেত। এই মুহূর্তে লালমিশাই-এর মনে পড়ল সুলেমানের কথাগুলো। সে আসেনি। জাহ্নেই আছে। তার বরাদ্দ কয়েকটা ক্রীতদাস এবং গোটা তিনেক বাঁদিকে রেখে আসা হয়েছে। তবে, সত্যিই লালমিশাই এ-পর্যন্ত কোনো মুসলমান ধর্মের মানুষের সাক্ষাৎ পাননি।

যোগীরা ভীষণ খেতে পারে। প্রচুর ভাত ও মাংস তারা মনের সুখে গিলে চলল। দুধ ছুঁলই না। লালমিশাই টের পেয়েছেন ব্রাহ্মণরা যোগীদের ভীষণ ঘৃণা করে। কথাবার্তা বলে না, পাশে বসে খায় না। ছোঁয়া-ছানার ভয়। ব্রাহ্মণ ক'জন কেবল মাছ এবং দুধ খেল। মাংস ছুঁল না। যোগীরা মদে আসক্ত। খাওয়ার আগে তারা নারকেলের মালায় পান করল দেশীয় মদ।

লালমিশাই তৃপ্তি নিয়েই খেলেন। মাংসে দারচিনি, লবঙ্গ এবং অন্যান্য মশলার জন্য খুসবাই হয়েছে। এদেশের রাঁধুনিরা খাদ্যে খুব ঝাল দেয়। সামান্য কষ্ট হলেও, তিতিরের মাংস খেলেন

প্রচুর। বাচ্চা মোষের মাংসগুলো খেতে তেমন যুৎসই ছিল না - ঈষৎ তেতো।

কিন্তু ভোজন শেষে পুনরায় যাত্রা শুরুর মুখে দূরে হঠাৎ রুগ্ন মানুষটাকে দেখে লালমিশাই ভুরু কোঁচকালেন। লোকটির চোখেমুখে খুরাশানি ছাপ। লালমিশাই খুরাশানে ছিলেন বছর তিন। ওখানে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাঠ দেন। উনি পাঠ নিয়েছেন। মক্কা গেছেন বহুবার। কোনো মুল্লুকে উজিরের কাজে সুলতান বা আমিরদের সঙ্গে মন কষাকষি হলেই তিনি মক্কা রওনা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তখন কোনো শক্তিমান শাসকই আর লালমিশাইকে আটকে রাখার জুলুম করতেন না।

সেই রুগ্ন মানুষটা এতক্ষণে গুটিগুটি কাছে এগিয়ে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্ল - আস্ সালামো আলাই কুম!

- ওয়া আলাই কুম আস্ সালাম!

লোকটির থুথনিতে পাতলা দাড়ি। এত রুগ্ন, মনে হয় বুকের খাঁচায় বহু দিন ধরে যক্ষা-রোগ পুষে চলেছে।

হুজুর কি বাবা-কে দেখতে চল্লেন ?

- খোদার তেমনই ইচ্ছে !

- বেয়াদপি যদি মাফ করেন, দলে আমিও যেতে চাই। পথ আমার চেনা ।

- কি পরিচয় তোর ?

- হুজুর, আমি সামান্য ঘোড়ার লস্কর ছিলাম। নাম ঘিয়াম-উদ-দীন-দামঘানী।

লালমিশাই একান্তে শিবিরের মধ্যে নিয়ে এলেন দামঘানীকে। লোকটা খানিকটা লেংচে চলে। বোঝা গেল কেন সে বাতিল হয়ে গেছে।

লালমিশাই বললেন - যেতে চাইছ যে, এত পথ হাঁটতে পারবে ?

- আল্লায় কিরপায় এই একটা ঠ্যাং নিয়েও তামাম দুনিয়া ঘোরা যায়!

এতো সামান্য সরণদীপ পর্বত!

- রাজা অয়রির লস্কর ছিলে ?

দামঘানী হেসে বলে - অয়রি আবার রাজা নাকি! আমি কুনার রাজার সৈনিক ছিলাম! ... অয়রি খাজনা দেয় কুনার রাজকে!

দা ঘানীর কথায় মস্ত ভুল ভাঙ্গল লালমিশাই-এর। শুধু রবম-এর সুলতানের দোস্ত এবং আত্মীয় বলে তিনি অয়রির কাছে খাতির পাননি, আসলে সুলতানের বন্ধু হচ্ছে কুনার রাজা এবং অয়রি কুনারের একজন শক্তিশালী সামন্ত মাত্র। জঙ্গলটা পেরুলেই কুনার রাজার সীমানা শুরু। কাঠের বেড়া দিয়ে চিহ্নিত। আয়রি এর অধীন; নানা কর দিতে হয় বৎসরে। কুনার রাজেরও সমুদ্র আছে এবং সলাওয়াত একটি বন্দর। এ রাজাও কাফের। দুই পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকার মতো - এটাই কুনার সাম্রাজ্য।

- কুনার রাজ একবার রাজাকে বেঁধে নিয়ে গেছলেন।

- কেন ?

- একবছর খাজনা পাঠায়নি। তাছাড়া, অয়রির দস্যুরা কুনারের একজাহাজ পদ্মরাগমনি লুঠ করেছিল। জাহাজটা যাচ্ছিল মালাবারের পথে।

- কুনার রাজের সৈন্য কত ?

- হুজুর, তা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি হবে।

সালাওত বন্দরটি ছাড়িয়ে যেতেই পথ বেশ দুর্গম ও কষ্টকর হয়ে পড়ল। দোলাবাহকদের শরীর ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বোঝা গেল তা। লালমিশাই আল্লার দুনিয়ায় এমন বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ। অবাক হচ্ছিলেন যোগীদের হাঁটবার ক্ষিপ্রতা দেখে। ভোজনে প্রচুর মাংস পেয়ে এদের শক্তি যেন দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দামঘানী হঠাৎ দোলা ছেড়ে নামার ইচ্ছাপ্রকাশ করল এবং পাশে পাশে চলল দলের সঙ্গে। লালমিশাই বেশ কিছু হাতি দেখতে পেলেন। অঞ্চলটা হাতিরাই শাসন করে।

দামঘানী বলে - হুজুর, এরা যাত্রীদের কোনো ক্ষতি করে না।

- তীর্থযাত্রী এ-পথে নিয়মিত যাতায়াত করে ?

- না হুজুর !

- কেন ? মুসলমানরা আসে না ?

দামঘানী চট করে উত্তর দিল না। দোলার পাশ ধরে নীরবে খানিক হাঁটল, শেষে 'তবে শুনুন 'হুজুর' বলে কষ্টকর পথে বক বক করতে থাকল। আর লালমিশাই শুনতে শুনতে না-ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখে ফেললেন।

আগে এ-পথে হাতির উৎপাত ছিল ভীষণ। তখন বিধর্মী মুসলমানদের জন্য তীর্থের পথ স্বীকৃত ছিল না। কাফেররা বাধা দিত। যোগীরা বিশ্বাস করত, ঐ আদমপাহাড়ের চিহ্নটি আসলে বুদ্ধের পায়ের ছাপ। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর চিহ্ন হিসেবে পাহাড়টিকে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা চালাত। অনেক লড়াই-এর পর শেখ আবু আবদুল্লা বিন খফিক প্রথম পদচিহ্ন দর্শনের পথ খুলে দিয়েছিলেন। তিনি আরবদেশীয় সাধু, মক্কায় দীর্ঘদিন একটি দাতব্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ-দেশের বহু জঙ্গল কৃষিভূমিতে পরিণত করে জন্ম দিয়েছিলেন কৃষকশ্রেণীর। এই সাধুর অলৌকিক প্রভাবেই হাতিগুলোর উগ্র স্বভাব বদলে যায়। যাত্রীদের আর ক্ষতি করে না। আগে অঞ্চলের কাফেররা নানা ছুতোয় মুসলমানদের অতিষ্ঠ করে তুলত। খানাপিনা একসঙ্গে দূরে থাকুক, মেলামেশা পর্যন্ত করত না।

এ-অবস্থায় শেখ সদলবলে এখানে আসার উৎসাহে অভিযান শুরু করেছিলেন। দেখতে-দেখতে হাতির কবলেপুরো দলটা মারা পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য হুজুর, হাতিরা শেখের কোনো ক্ষতি করল না। উল্টে তাকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে চলল। এই অদ্ভুত ঘটনার পর থেকেই কাফেররা মুসলমানদের সম্মান দেখাতে শুরু করে। তখন নিজেদের বাড়িতেও থাকবার সুযোগ দিত। গাঁয়ের মানুষ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশাতেও আপত্তি করত না। এখনও সাধারণ

কাফেররা শেখ-কে 'মহান শেখ' বলে সম্মান দেখায়।

লালমিশাই দুপুরে ভোজের আগে শিবিরে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, প্রিয় বাঁদীটি নাগাড়ে পা টিপে দিচ্ছিল, স্বপ্নে হুজুর শুনেছিলেন তার কথাবার্তা। আসলে মেয়েটি কোনো কথাই বলেনি। এখন দামঘানী হাঁটতে হাঁটতে সত্যিই কথাগুলো বলছিল, উজিরের বোধ হচ্ছিল, তিনি স্বপ্নে আছেন। দোলাবাহকদের সামান্য পদস্খলনে, টাল খেতেই লালমিশাই-এর স্বপ্ন ভাঙল। তিনি উৎসাহে জানতে চাইলেন - মহান শেখ কি জীবিত ? কোথায় আছেন ?

- কুনারের বাইরে। এই সিরাজী পীরের একটা মসজিদ আছে, সেখানে। কুনার বলতে বড় রাজার রাজধানী। পদচিহ্ন দেখবার যাত্রাপথেই পড়বে। লালমিশাই বললেন - সিরাজী পীর ? তালে তো উনি পারস্যের ... আরবের মানুষ বলেছিলেন কেন ?

দামঘানী চুপ করে থাকে। সে মনার-মন্দলীর লোক; কুনার রাজের সামান্য একজন লস্কর ছিল। খোদার দুনিয়া কত বড়, কোথায় কোন দেশ, কী করে জানবে। একেবারে আনপড় মানুষ সে। আরব কী পারস্য কোথায় - কিছুই জানে না। সে এককোপে তরোয়াল চালিয়ে মাথা কেটে ফেলতে দক্ষ।

লালমিশাই জিজ্ঞেস করেন- পীর তালে মসজিদেই থাকেন এখন ?

- হুজুর।

রাজধানী দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায়, বড়ো একটি উপসাগরের কুলে। প্রচুর মাণিক্য পাওয়া যায় বলে, ওটির নাম লোকের মুখে মুখে মাণিক্য উপসাগর। সে-কথা পরে।

তো, পীরের প্রতি লালমিশাই-এর অতিরিক্ত কৌতূহলে, দামঘানী বলে- হুজুর, ঐ শেখই আগে আদমের পদচিহ্নে নিয়ে যাবার দিশারী হতেন। কাফেরই বলুন বা ঐসব যোগী, সাধারণ মানুষ তাকেখুবই শ্রদ্ধা করে.... এখন তাকেই দর্শন করতে যায় সবাই।

- দর্শন করতে ? লালমিশাই আশ্চর্য হয়ে বলেন - আদমের রাস্তায় তবে দিশারী কে হন ?

- শেখ-এর হাত-পাজোড়া কাটা যাবার পর, ওনার ছেলে বা বান্দারাই সে-কাজ করে।

- কাটা গেল কেন ?

- উনি একবার একটি গোরুকে বধ করেছিলেন বলে শাস্তি।

কুনার দেশে আইন খুবই কড়া। একটা আইন বলবৎ আছে দেশে, কেউ গো হত্যা করলে তাকে একই ভাবে মরতে হয়। হাত-পা কেটে, মরা গোরুটার ছাড়ানো চামড়ার জড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে মারার নিয়ম। যেহেতু সাধারণ কাফেররা শেখকে সম্মান-ভক্তি করে, রাজা শাস্তি কমিয়ে শুধু হাত-পাজোড়া কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন মাত্র। তবে এ-অবস্থায় মহান ব্যক্তির খোর-পোষের জন্য একটি বাজারের আদায়ীকর পুরোটাই পীরকে দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। সব শুনে লালমিশাই ব্যথিত হলেও, রাজার কড়া আইন ও যথাযথ নিশ্ছিদ্র প্রয়োগের জন্য কাজি হিসেবে কুনার রাজের প্রতি নীরবে সম্মানবোধ বেড়ে গেল। লালমিশাই কোনো কোনো সুলতানের অনুরোধে কাজির দায়িত্ব পালন করেছেন; তখন কর্তব্যবোধে কোথাও আপোষ করেননি। 'তরোয়ালের ধার না

থাকলে, কী মূল্য রইল ? মনে মনে ভাবলেন।

তাঁর মনে পড়ল একটি ঘটনার কথা। কোনো এক সুলতানের অধীনে তিনি কাজির দায়িত্বে আছেন; একদিন একজন স্ত্রীলোক এসে তার স্বামীর নামে অভিযোগ জানাল। স্বামীটি নাকি পূর্বতন সুলতানের ক্রীতদাস ছিল এবং সুলতানেরএক উপপত্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। প্রধান উজির অভিযোগ শুনে তক্ষুণি কয়েকজন লোককে সেই-উপপত্নীর বাড়ি ঢোক নিতে পাঠালেন। এক বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় তাদের দেখতে পেয়ে উভয়কেই ধরে আনা হল। এ-ব্যাপারে যখন কাজির মর্যাদা হিসেবে লালমিশাই-এর রায় চাওয়া হয়, তিনি দুজনকেই সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন। পরে স্ত্রীলোকটিকে ছাড় দিয়ে দাসটিকে কারাদণ্ডর ব্যবস্থা করা হয়। অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুদিন পরই প্রধান উজির ক্রীতদাসটির মুক্তির জন্য লালমিশাইকে নানা প্রলোভনে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালালেন। কাজি একদিন লিখে উজিরকে জানালেন, যেখানে আপনারা এক দাসের হারেমে অবৈধ ভাবে যাবার জন্য পূর্বের সুলতানকেই হত্যা করেছিলেন, সেখানে মনিবের হারেমে অবৈধ-সম্পর্কের অপরাধে মামলুক ক্রীতদাসের মুক্তি চাইছেন কী করে ? লালমিশাই সঙ্গে সঙ্গে দাসটিকে বাঁশপেটা করে গলায় দড়ি বেঁধে সমস্ত শহরটা ঘোরাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তরোয়ালের ধার না থাকলে, কী মূল্য রইল ? তখন রাজা-উজির বিচার করলে চলে ?

হঠাৎ লালমিশাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, ফিরতি পথে কুনার রাজের মুখোমুখি হতে হবে। অয়রির পারিষদদের ডেকে বললেন - কুনার রাজের সঙ্গে ফেরার পথে সাক্ষাৎকরা দরকার। সৌজন্য বোধের পরিচয় হবে।

পারিষদরা চুপ করে থাকতে, উজির বললেন - তা না হলে রাজা খুবই অপমানিত বোধ করতে পারেন।

এবং সম্মতির অপেক্ষা না করে নিজের বান্দাদের ডেকে বাকি উপহার ঠিকঠাক আছে কিনা জানতে চাইলেন। তখনও লালমিশাই টের পাননি পদ্মরাগমনির দেশ ছেড়ে রবম যাওয়া হবে না এ -যাত্রা।

নানা অঞ্চল ঘুরে দলটা এবার সরণদীপে হাজির। যখন চূড়ার দিকে বেশ খানিকটা উপরে উঠে যাওয়া হল, লালমিশাই নিচে তাকিয়ে দেখেন সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘ হয়ে ভেসে চলেছে। আবরণে তলার কিছুই চোখে পড়ছে না। তিনি ঘাড় কাৎ করে পর্বতের চূড়ান্ত দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কালো পাথুরে স্তূপের ছুঁচলো দন্তগুলো আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। যেন বলছে, এসো, আমায় ছুঁয়ে দেখো তো। লালমিশাই অবাক। তালে কি এর ওপরেই বেহেস্ত ? আল্লার বাসস্থান ?

নিচে মেঘ-মেঘ কুয়াশার জন্য উপসাগর চোখে পড়ে না। থেকেও হারিয়ে গেছে। যেমন মোহ ও মিথ্যায় আমাদের সত্যের চোখ সর্বদাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তবু লালমিশাই জানেন এরই নিচে মাণিক্য উপসাগর। চার দিকে বিশাল বৃক্ষরাজি। এত ঘণ, এতস্তব্ধ - মনেই হয় না পৃথিবীতে লাখ-লাখ মানুষ আছে। প্রাচীন এইসব বৃক্ষের পাতাগুলো কখনই ঝরে না। লাল-হলুদ বর্ণও ধারণ করে না।

বেশ শীত-শীত বোধ হচ্ছিল লালমিশাই-এর। তিনি ভাবছিলেন, যদি এখান থেকে তাঁর

প্রিয় বাঁদীটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়! একদিন না একদিন সে মাণিক্য সাগরের জলে ঠিক পৌঁছে যাবে। একটি পাথর বিনা কারণে মেঘ-কুয়াশার মধ্যে ছুড়ে মারলেন। বস্তুটি নিঃশব্দে হারিয়ে গেল। খোয়াবার সামান্য শব্দ পর্যন্ত জাগল না।

দোলাবাহকদের একজন হঠাৎ আলুথালু শব্দে খাদের পাশে বমন শুরু করে দিল। টুকরো টুকরো মোষের মাংস আস্ত এল বেরিয়ে। অন্যান্য চাকর-বাকর এবং যোগীরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নিশ্চয়ই ভেদবমি উঠছে। এ-রোগে আক্রান্ত হলে বাঁচা খুব কঠিন - এটাই বিশ্বাস এদের। লোকটাকে সুস্থ হবার জন্য ফেলে রেখে দিয়ে দলটা এগিয়ে চলল। আরও খানিকটা এগোলে তবেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পদচিহ্নের দিকে সড়ক চলে গেছে দুটো। সাঁঝ আকাশে যেমন জোড়াবক পাশাপাশি উড়ে যায়; ঝাকড়া গাছের মাথায় চুপচাপ যেমন এক বোঁটায় দুটি ফল থাকে ঝুলে। একটি নাম 'বাবা' সড়ক অন্যটি 'মামা' সড়ক।

'বাবা' মানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের 'বাবা'। এ-যাবৎ পৃথিবীতে যত মানুষ মরেছে, একসঙ্গে জেগে উঠলে যাকে সব্বাই 'বাবা' ডাকবে, তাঁর নামে সড়ক। 'বাবা' সড়কটি খাড়া, তাই চওড়া এবং বেশ কঠিন। আদমের পাঁজর ছিঁড়েই ইভের জন্ম, ছেঁড়ার যন্ত্রনা নিশ্চয়ই নিঃশব্দে সয়ে ছিলেন তিনি, ঘন বেদনা মুখে জমিয়ে রেখেছিলেন। তেমনি রহস্যে এখন 'বাবা' রাস্তাটা পড়ে আছে সামনে। পাথরের একটি কৃপণ ফাটল বেয়ে ক্রমাগত পানি গড়িয়ে পড়ছে। পাথরে শ্যাওলা থাকলেও পানি এতই পরিষ্কার, স্বচ্ছ - ভালোবাসার কোনো পাত্রী যেন হৃদয় মেলে ধরেছে। হঠাৎ একটা ছোট গুহা দেখা গেল। দামঘানী হুজুরকে ডেকে বলল - দেখুন কি অন্ধকার ভেতরে।

সামান্য উঁকি দিয়ে লালমিশাই - কেউ বাস করে ভেতরে ?

- মহান শেখ বলতেন, এখানের বনেপাহাড় অগুনতি বাঁদর। দামঘানী তথ্যটা জানিয়ে মজা পায়।

লালমিশাই এবার বিরক্তই হলেন দামঘানী-র উপর। সেই থেকে গায়ে পড়ে বকবক করেই চলেছে। জানে না, এমন সুন্দর স্থানে আল্লার চোখ দুটিই কাজে লাগাতে হয়, মুখ নয়। তীর্থযাত্রা না থাকলে, ওর মতো মানুষ যে উজিরের সঙ্গে কথাবলারই সুযোগ পেত না, আনুগত্যটুকু থাকা দরকার। কাফেরের দেশে একজনও মুসলমানের মুখ খুঁজে পায়নি বলেই না দামঘানী লালমিশাই-এর পাশে একই দোলায় চড়বার সুযোগ পেল ?

লালমিশাই দেখলেন গুহাটি কী ভীষণ অন্ধকার ও রহস্যময়। এখানে আসমান খুবই নীল; তারই ঠিক ছায়ায় এমন গোলাকার অন্ধকারটিকে লাগছে ডাগর চোখের কালো একটি তারা। গতরাতের একজন দেবদাসীর সেবার কথা মনে পড়ে গেল। সারা রাত মশালের আলোয় তার চোখের মাঝে এমনই অন্ধকার জমা হয়েছিল। তবু মেয়েটি ছিল হাসিখুশি। ভোররাতে দেহ পরিষ্কার ও গোসলের সমস্ত পানি তাকে দিয়ে টানিয়ে ছিলেন লালমিশাই।

দামঘানী সেই বাঁদর প্রসঙ্গে মহান শেখের কাহিনী বকবক করেই চলেছে। বাঁদরগুলো নাকি কালো-রঙা মুখ, লম্বা লেজওয়ালা। মানুষের মতো বাঁদরদেরও স্ত্রী-পুরুষ আছে। থাকতেই হবে তা নইলে দলকে দল ফুরিয়ে গেলে, নতুন জন্মাবে কী ভাবে ? এখানে পুরুষ-বাঁদরদের মুখে অবিকল

মানুষের মতো দাঁড়ি। সব মানুষ যে দাঁড়ি রাখে এমন নয়, যারা রাখে তারাও আবার বিচিত্র নানা কায়দায় ওগুলোকে সাজায়। তবে, এ-দাড়িগুলো নাকি অনেকটা সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো। শেখ উসমান আরও মন্তব্য করেছিলেন - এমনকি বর্তমানে তার ছেলেমেয়েরাও বিশ্বাস করে - এই বাঁদরকুলের একজন রাজা আছে। অন্যান্য বাঁদররা তাকে সম্রাটের মতো সম্মান দেখায়, অভিনন্দন করে। সম্রাট-বাঁদরটি পাতা দিয়ে মাথায় ফেটি বাঁধে; নির্জন বৃক্ষের এই পাতাগুলো দিয়ে, যা কখনই ঝরে পড়ে না। এই অমর, অঝর পাতাগুলো সমস্ত শক্তির প্রতীক। সম্রাট-বাঁদরটি একটি কাঠি নিয়ে চলা ফেরা করে। যখন একটি দাঁড়িয়ে থাকে, তার দুপাশে চার-চারটে বাঁদর লাঠি হাতে প্রস্তুত। যখন কোথা ওবসে পড়ে তারা ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্রাটের বউ-বাচ্চারা রোজ এটির সামনে এসে বসে। তখন অন্য সবাইকে দূরে সরে বসতে হয়। এ-সময়ে প্রহরীর মতো পেছনে দাঁড়ানো চার-বাঁদর সম্রাটের বউকেও সম্মান দেখায়। এর পর সবাই যায় চলে। প্রত্যেকে একটি কলা, লেবু না হয় একটা কিছু ফল এনে রাজাকে উপহার দেয়। রাজা, বউ বাচ্চারা এবং প্রহরী চার-বাঁদর সেগুলি খায়।

হঠাৎ রাজা অয়রির দুই কর্মচারী ছুটে গিয়ে লালমিশাই-এর সামনেই দামঘানীকে জাপটে চ্যাংদোলা করে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলতে যায়। যেমন ভঙ্গিতে লালমিশাই পাথরের খণ্ডটি ছুঁড়েছিলেন বা ভেবেছিলেন প্রিয় বাঁদীটিকে ছুঁড়ে ফেললে কোনো একদিন মাণিক্য উপসাগরের জলে ঝপাং করে পৌঁছে যাবে।

- আমাদের রাজাকে বিধর্মীটা অপমান করছে!

লালমিশাই বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

লোকদুটো বলল - হুজুর, এ-দেশে রাজাকে কটাক্ষ করলে ফুটন্ত জলে চুবিয়ে মারা নিয়ম।

কাজি লালমিশাই খুবই নিষ্ঠাবান ও শৃঙ্খলাপ্রিয়। তিনি বিশ্বাস করেন, যে-শক্তি যত কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, তিনিই আল্লার সবচেয়ে নিকটে বাস করেন। এখন মেহমান হয়েও, তিনি বিচারের উদ্যোগ নিলেন। একদিকে নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা, অন্যদিকে কাফেরের দেশে দামঘানীই একমাত্র মুসলমান অনুচর।

লালমিশাই বললেন - এ দেশের নিয়মকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এর সবটাতো রাজা অয়রির দেশ নয়, কুন্নার রাজের সীমানাও আছে।

- আমরা বড় রাজার অধীন!.. তাঁকেও এই বান্দারা শ্রদ্ধা করে হুজুর।

- বেশ। তোমাদের নিয়ম মেনেই একে ফুটন্ত পানিতে চোবাও... ছুঁড়ে ফেলা যাবে না। তা আইনে নেই। কোথায় মিলবে ফুটন্ত পানি ?

তখন প্রতিপক্ষ কিছুটা দমে গেল। যুক্তিটা কাজি মন্দ দেননি। তারা চুপ করে থাকতে, লালমিশাই বললেন-তবে এর শাস্তি ছড়ি পেটানো।

. বিশ ঘা হেত।

কাজির হুকুমে দামঘানীকে একটা গাছের গায়ে বাঁধা হল। এবং যে-গাছের পাতা ঝরে না, তারই একটি মাঝারি শক্ত ডাল ভেঙ্গে গুনে গুনে বিশ ঘা বসানো হল। দামঘানীর চোখমুখ যন্ত্রণায়

ছিটকে পড়লেও, পুরনো লস্করের অভ্যাসে কোনো কাকুতি-মিনতি জানাল না। এরপর দামঘানীকে হুকুম করা হল পথ দেখিয়ে ঠিকমতো পদচিহ্নে নিয়ে যেতে।

ভেতরে ভেতরে লালমিশাই খুব তৃপ্তি পেলেন। কানের ফুটোয় ঢুকে পড়া কোনো মশার পিন পিন বিরক্তি হঠাৎ নিষ্ক্রমনে যেমন স্বস্তি অনে, লালমিশাই হাল্কা হলেন।

কাজি হিসেবে নিজের প্রতি শ্লাঘা বোধ করলেন। তাঁর নিজের ধর্মের একমাত্র মানুষ এবং রাজ্যের সর্বশক্তিমানের মর্যাদা - দুই-ই রক্ষা পেল। নইলে এমন একটি সুন্দর আশ-পাশে, চোখের সামনে, অনিবার্য একটি দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে হত তাঁকে।

এরপর দল চলতে থাকল। যেতে যেতে টের পেল প্রাচীন কালের কিছু মানুষজন পাথরে খাঁজ কেটে কেটে ধাপ তৈরী করে বিপদ লাঘব করে গেছে কিছুটা।

এ-পথে অতীতে কতবার মানুষ উঠেছে ? কিংবা আজ পর্যন্ত কত তীর্থযাত্রী ? তারা বারবার স্বার্থপরের মতো পুণ্যটুকু সেরে গেলেই পারত। খাঁজ কেটে ধাপ তৈরী বা পাহাড়ের গায়ে লোহার গোঁজ পুঁতে তার সঙ্গে শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া - সবই অনাগত মানুষের জন্য। এই মমতা ও কর্তব্যই মানুষকে 'মানুষ' করে দিয়েছে। শুধু কি অনাগত ? মানুষ বিগতদের নিয়েও ভাবে। নইলে, কবরে গিয়ে ফুল কিংবা চোখের জল রেখে আসে কেন নিঃশব্দে ?

মোট দশটি শিকল এভাবে ঝোলানো আছে। অবিশ্যি পরের রাস্তা আর সুরক্ষিত করা হয়নি। দশম শিকল থেকে খিজর গুহা এক মাইল দূর। আরও দু'মাইল গেলে আদমের পদচিহ্ন। খিজর গুহাটি বেশ খোলামেলা পরিবেশে। সেখানে একটি মাছে পূর্ণ ঝর্ণাও রয়েছে। সেটির নামও খিজর। গুহার শেষ কিনারায় পাহাড় কেটে কে বা কারা দুটি জলাধার তৈরী করেছে। মানুষ যেখানেই যায় বানায় জলের উৎস। জল যেমন মানুষের অঙ্কুর সৃষ্টি করে, মানুষও তেমনি জল ছেড়ে বাঁচতে পারে না। জলের সঙ্গে মানুষের শত্রু-মিত্র সম্পর্ক খুন্দ-আলমের দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে।

পদচিহ্নের মুখোমুখি লালমিশাই নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। এই হচ্ছে তাহলে আল্লার প্রথম সৃষ্টির চিহ্ন। সে কি আজকের কথা। কত দেশ যে ইতিমধ্যে ঘুরে দেখেছেন লালমিশাই, ইয়ত্তা নেই। যেখানেই পা রেখেছেন কত বিচিত্র মানুষ। পাপী-পূণ্যবান থেকে গরীব-আমির-উজির-সুলতান-কৃষ্ণ... কত বিচিত্র বুলির ইনসান। এবং তাদের সকলের প্রথম পিতার পায়ের ছাপ এটি। সকল ধুলো-ময়লা এড়িয়ে নির্জন পবিত্র হয়ে আছে। এই দুটি নিয়ে তিনিই প্রথম পৃথিবীর মাটিতে হেঁটে ছিলেন। বহু যুগ পেরিয়ে কোটি কোটি পায়ের ছাপে দুনিয়া বাসি ও একঘেয়ে হলেও যিনি প্রথম পবিত্র, যিনি পাঁজর খসিয়ে দুনিয়ায় প্রথম ভালোবাসা-যৌনতা-ব্যথা ও দুঃখের প্রবর্তন করেছিলেন, তাকে জল-মাটি-পাহাড় আজও ভোলেনি, একেবারে মাথায় স্থান দিয়ে রেখেছে।

পদচিহ্ন ১১ বিঘত লম্বা। অয়রির লোকদের মুখে লালমিশাই জানতে পারলেন, চীনারা বহুকাল আগে এই পদচিহ্ন দর্শন করতে আসত। তারা এ থেকে বুড়ো আঙুল ও খানিক পাথর কেটে নিয়ে দেশে চলে গেছে।

লালমিশাই নতুন করে আঙুলটার অভাব টের পেলেন। তখনই মনের মধ্যে ক্ষোভ-প্রতিহিংসা ঝলসে ওঠে। ভাবলেন, পবিত্র স্থানটি কখনই কাফেরদের শাসনে থাকা ঠিক নয়। এ-যাত্রা রবম

রাজ্যে গিয়ে বহু সুলতানকে সবিস্তারে অনুরোধ রাখবেন কুনার আক্রমণের জন্য। রবমের সুলতান দিল্লির দোস্ত। ঘোড়া, বন্দুক ও সৈন্য পাঠিয়ে দিলে কাফেররাজ পর্যদুস্ত হবেন। তাছাড়া পদ্মরাগমণির প্রাচুর্যের কথা শুনে হয়তো দিল্লির সুলতান নিজেই আক্রমণ করে বসতে পারেন।

লালমিশাই দেখলেন দলের যোগী ও ব্রাহ্মণরা, পদচিহ্নের পাশে যে ন'টি গর্তের মতো, তাতে ভেড়ির দামী কিছু মুক্তা প্রণামী ফেলল। রাজা কেন যে দলের সঙ্গে যোগী ও ব্রাহ্মণ পাঠিয়েছিলেন, আসল মর্মটুকু বোঝা গেল। এরা কেউ কেউ এটাকে বুদ্ধের পায়ের ছাপ কেউ বা বিষ্ণুর বলে বিশ্বাস ও ভক্তি করে। মুসলমানের তীর্থ হিসেবে দুর্গম পথের কষ্ট বরণ করেনি। তবু কাফের রাজার কাছে অতিথির সম্মান পেয়ে ক্ষোভ বেশি দানা বাঁধল না। ফেরার পথে আদমের পুত্র শইম-এর গুহায় রাত কাটালেন। তারপর নেমে এসে অসুস্থ দোলাবাহকটির সন্ধান মিলল না। কারো মনেই পড়ল না কথাটা। কেবল তিনজন নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ ফিস ফিস করল।

এরপর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট কিছু গ্রাম পেরিয়ে ফের যখন পাহাড়ের পাদদেশে পা রাখা গেল, লালমিশাই অনুভব করলেন উদ্ধত পাথর মাটি হয়ে গেলে মানষকে কত আপন করে নিতে পারে। পাহাড়ের গোড়ায় বিরাট এক উপসাগর। এখান থেকে পদ্মরাগমনি সংগ্রহ করা হয়। সাদা চোখে এর পানি ঘন নীল। হাতের কোশে উঠলে রং যায় হারিয়ে। পানি ছোট হয়ে গেলে কি রং ধরতে পারে না ? আল্লার দুনিয়ায় আসমান ও দরিয়া — যে দুটো বিশাল, তা নীল। তাই বোধহয় তুফান এবং ঝড়-বিজলিই পারে বান্দাদের শাসনে রাখতে।

এখান থেকে দু'দিন চলার পর দীনবর শহর। বেশ বড়সড়, ঠাসা ঘর-বাড়ির শহর। সবই কাঠ ও বাঁশের তৈরী। বণিকদের বসবাস বেশি। এরা জাহাজে পদ্মরাগ নিয়ে যায়। এখানে বিরাট একটি মন্দির আছে। বিগ্রহের নামও দীনবর। প্রায় হাজার খানেক ব্রাহ্মণ ও যোগী বাস করে মন্দিরে। সারা রাত বিগ্রহের সামনে নাচগান করার জন্য মজুত আছে হিন্দুমেয়ে বা দেবদাসী। এই শহর ও তার রাজস্বের রোজগারেই মন্দির বাসিন্দাদের যাবতীয় খরচ-খরচা চলে।

লালমিশাইসহ তার লোক-লস্কর, বান্দা-বাঁদীদের মন্দিরের সীমানায় ঢুকতে নিষেধ জানানো হল। তবে সঙ্গের ব্রাহ্মণ ও যোগীরা বিগ্রহ দেখে ফিরে এসে লালমিশাইকে জানায় মূর্তিটি নাকি নিখাদ সোনায় গড়া এবং আকারে স্বাভাবিক জীবন্ত একজন মানুষের মতো। চোখদুটিতে দুটি বড় পদ্মরাগমণি বসানো।

দামঘীও নিষিদ্ধ ছিল মন্দির প্রবেশে। বেচারা আদমচিহ্নে যাবার পথে শাস্তি পেয়ে কেমন ঝিমিয়ে গেছে। প্রাণের ভয়ে সে আর অতিরিক্ত বকবক করছিল না। লালমিশাই চলে গেলে, রাজা অয়রি কি নতুন কোনো শাস্তি দেবেন ? রাজ পরিষদের আস্থা কুড়োতে, উদ্বেল গলায় লালমিশাইকে শোনায়-হুজুর মণি দুটো রাতে চেরাগের মতো জ্বলজ্বল করে।

লালমিশাইয়ের তামাটে মুখটা ঈষৎ রক্তিম। শুকনো হাসি দিয়ে বললেন - মানুষের দিলই হচ্ছে একমাত্র চেরাগ।... বাকি সব মরীচিকা।

দীনবর শহরেই দলটা একটু বিপদে পড়ল- বিশেষ করে লালমিশাই। বিপদ আর কিছুই নয়, তাঁর গোটা তিনেক বাঁদী গেল মরে। নীরোগ ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাজারে মিললে হয়তো অভাব

মেটাতে পারতেন। কিন্তু এ দেশে কুষ্ঠ রোগী ও অর্ধমৃত ঘোড়ার ছিবড়ে মাংসের মতো মেয়েদের মনে ধরেনি। এখানে মেয়েদের শরীর থেকে ধুনোর গন্ধ বেরোয়।

লালমিশাই জানতেন না, দীনবর শহরে যখন ঢুকলেন, সেখানে এক সাংঘাতিক ধরনের জ্বর মহামারী হিসেবে দেখা দিয়েছে। সে-জ্বরে আক্রান্ত হলে আর রক্ষে নেই। সেদিন তিনি মরিয়মের মুখে যে-কথাগুলো শুনেছিলেন- যেগুলো ভেবেছিলেন বাস্তব, কিন্তু সবটাই ছিল চটকা ঝিমুনির মধ্যে ছোট ছোট খোয়াব - আশ্চর্য, তা যে খোদার আগাম নির্দেশ, কে টের পেয়েছিল ?

তিনটে বাঁদী জ্বরে আক্রান্ত এবং দুজন টপাটপ গেল মরে। দুন্নি আর দাভি। ঐ অবস্থাতেই রাস্তাতেই ছড়িয়ে রইল কারণ কুণার রাজের দরবারে যেতেই হবে। তাছাড়া জ্বর যদি অন্য আরও শরীরে ঢুকে পড়ে, মহামারী যে আতঙ্কের চাইতেও দ্রুত ছড়ায়, রাজ্যে ঢুকেই টের পেলেন লালমিশাই। কুনার রাজের প্রাসাদের বাইরে হাজির হতেই চাক্ষুষ দেখতে পেলেন, প্রাসাদের বাইরে বেশ কিছু মজুরণী রোগে আক্রান্ত হয়ে খোলা আকাশে রোদের মধ্যে পড়ে আছে। রাজপ্রাসাদের বাসিন্দাদের খাবার ধান কোটার জন্য এদেরকে আনা হয়েছিল।

কুনারবাজ যে অয়রির চাইতে অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও ক্ষমতাবান বোঝা গেল দরবারের কড়া-আইনকানুন দেখে। এখানে ঢুকতে গেলে, বাইরে জুতো ছেড়ে আসতে হয়। কুণার রাজের বিশ্বাস, পৃথিবীর সবচেয়ে অপবিত্র বস্তু হচ্ছে জুতো। ওর কাজই হল রাস্তার ময়লার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা রাখা। তা দরবারে জুতো নিষিদ্ধ। কুনার রাজ দেশের সর্বময় কর্তা। বয়সে নবীন ছেলেটি কিছুদিন আগেও ছিলেন যুবরাজ। বৃদ্ধ রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। বৃদ্ধ রাজার হুকুমে আইন শিথিল করে শেখ-উসমানের কেবলমাত্র হাত-পাগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল। তবে রাজ্যের গণ্যমান্যরা শলাপরামর্শ করে একদিন বৃদ্ধ রাজাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে চোখদুটো তুলে অন্ধ করে দেয় এবং যুবরাজকে বসায় সিংহাসনে। বর্তমান রাজা কিন্তু বৃদ্ধের পুত্র নন, ভাগ্নে - অর্থাৎ বোনের পুত্র। কাফেরদের এই রাজ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ্নেকেই সিংহাসনে বসার নিয়ম। বৃদ্ধ, প্রাক্তন রাজা আজও বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন, কারণ রাজকীয় আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হয় না তাঁর জন্য। তবে অন্ধরাজা এখন দুচারজন কাছের মানুষের কাছে নাকি বলে বেড়াচ্ছেন - এখন আগের চেয়েও পৃথিবীটাকে ভালো দেখতে এবং বুঝতে পারছেন তিনি।

দরবারে ঢুকতেই যা লালমিশাইকে মুগ্ধ করল, তা একটি ধবল হাতি। সামর্থ ও ভারের প্রাচুর্যের মধ্যে হাতির কালো রংয়ের বদলে ধবল হলে লঘু এবং শৌখিন বোধ হয়। ওর রংটুকুই যেন ওর আভিজাত্য। লালমিশাই দেশবিদেশে অনেক হাতি দেখেছেন, শ্বেত হাতি দর্শন এই প্রথম। যেন সাদা পাথর দিয়ে তৈরী। হাতিটির গলায় ঝোলানো আছে একখণ্ড মস্ত বড় মাণিক্য। দিল্লির পিলখানায় যেমন পেতলের ঘন্টা ঝোলে চলাফেরায় টুংটাং আওয়াজ হয়, এখানে নিঃশব্দে একখণ্ড মাণিক্য নিজেকে জাহির করে রেখেছে। মাণিক্যটি এই মুহূর্তে লালমিশাই-এর দৃষ্টিতে মূল্য খুইয়ে বসল। মাণিক্য বলে নয়, হয়তো ঘোড়া বা উটের গলাতেও সোনার ডেলা ঝুললে, এমন কমদামী বোধ হবে। অলংকারের প্রকৃত মূল্য মানুষই নিজের দেহে বানিয়ে তোলে।

কুনারবাজ বিশেষ আনন্দ উৎসবে হাতিটিতে চড়েন। লালমিশাই-এর জানতে ইচ্ছে করল,

ওর পিঠে হাওদা চাপিয়ে তরুণ-রাজা চড়বার সময় পেয়েছেন কিনা, নাকি বৃদ্ধ রাজার স্মৃতিতেই ওর পিঠের লোম মসৃণ হয়ে আছে।

তরুণ রাজা বললেন-না, এখনও সুযোগ আসেনি। তবে গলায় যে মাণিক্যটি দেখছেন, আমারই হুকুমে ঝুলেছে।

- আগে হাতি কী পরত ?

- পরত দামি পাথরই, কিন্তু তা পদ্মরাগমণি নয়।

- হুজুর কি ফারশি ফাষায় কথা বলার অনুমতি দেবেন ?

তরুণ রাজা হেসে জবাব দিল - বলুন! বলুন! আমি বলতে পারিনা কিন্তু বুঝি।

লালমিশাই উপহার দিয়ে সেলাম জানালেন। তরুণ রাজা উপহার পেয়ে খুশি হলেন না। কড়ি ও মধু ছুঁলেনই না, মসলিনে খানিক সময় চোখ রেখে, সরিয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন।

অয়রি আমার অধীন।... খাজনা ও লস্কর পাঠাতে হয় আমার কাছে। লালমিশাই সম্মান জানিয়ে বললেন - তাই এ-বান্দা আপনার রাজ্যে পা রেখেই দেখা করতে ছুটে এসেছে।

রাজার ইঙ্গিতে একজন কর্মচারী একটি স্বর্ণপাত্রের ওপর একখণ্ড পদ্মরাগমণি এনে ধরল। আকারে বিশাল, মুরগীর ডিমের মতো। লালমিশাই-এর পরিচয়পত্র দেখে এবং রবমের প্রসঙ্গ শুনে, রাজা বুঝে নিয়েছেন ইনি একজন সম্মানীয় অতিথি। এবং এ-ভাবেই আপ্যায়নের নিয়ম এ-দেশে।

তরুণ রাজাকে ঘিরে বসে আছে অমাত্য, উজির এবং কাজি। উজির বললেন - আমাদের রাজার তরফে এটা আপনার উপহার। লালমিশাই আপ্লুত। দেখলেন গোলাকার বস্তুটির গভীর অভ্যন্তরে নরম গোলাপী আভা স্থিরহয়ে আছে। কে যেন বাঁধিয়ে রেখেছে। তাই কি এটি বেশি মূল্যবান ? নইলে ফজরের নামাজের পর, পুর আকাশে সূর্যের প্রথম আভা এর চেয়ে বেশি পবিত্র। সে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়তে জানে লালমিশাই-এর মনে হল হাল্কা গোলাপী স্থির আভাটুকু এই মুহূর্তে যদি ছড়িয়ে পড়ে সারা দরবারটি আলোকিত করার পরবাইরেরজগতে ডানা মেলেদিত, হয় তো বেশি দামী হয়ে যেত মুহূর্তেই। তবু, লালমিশাই আসন ছেড়ে উপহারটি গ্রহণ করে তরুণ রাজা ও অমাত্যদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালেন সামানা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন - তীর্থ করতে এসেছিলেন ?

- খুন্দ-আলমের রাজ্যে সবই তীর্থ।

একজন উজির হেসে উঠলেন - তবে পায়ের ছাপ একটাই! ... সব রাজ্যে নেই।

- হ্যাঁ, আল্লার প্রথম সন্তানের ছাপ একটাই কিন্তু ...

- মুসলমানরা মনে করেন। চীন সম্রাট আদৌ তা বিশ্বাস করেন না।

লালমিশাই হেসে উঠলেন - তাইতো নবী বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করতে দরকার হলে চীনেও যাওয়া যেতে পারে।

রাজা হঠাৎ উৎসুক হলেন-কার কার দরবারে গেছেন এর আগে ?

- আপনাদের কৃপায় তা অনেক মুলুকেই পা রেখেছি।

- সব চেয়ে শক্তিশালী কে ?

- খোদাতাল্লা।

- আমি ঈশ্বরের কথা জানতে চাইনি।

এরপর উজির-আমাত্যরা রাষ্ট্রশক্তি, ঘোড়া-তলোয়াল-সৈন্য, ধর্ম ও ঐশ্বর্যের নানা অভিজ্ঞতা শুনতে চাইল লালমিশাই-এর কাছে । নতুন রাজার অভিষেক সম্পন্ন হলেও এখনও যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া হয়নি। পরিকল্পনা চলছে। সাম্প্রতিক খরা ও মহামারীতে সৈনিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছে; রাজ্য জয়ের লুঠতরাজের ভাগ না পাওয়া পর্যন্ত তারা অনুগত হবে না।

—রবমে যাবেন এরপর ? সুলতান আপনার বন্ধু ?

লালমিশাই খুশিতে মাথা নাড়লেন।

—তাকে তো রাজ্যে পাবেন না।.....খবর এসেছে, উনি উত্তরে যুদ্ধ করতে গেছেন।

—তালে সোজা পাড়ি জমাবো পীরের রাজ্যে। পীর তাব্রিজের মানুষ কিন্তু বিশ বছর ধরে বাংলা মুলুকে পড়ে আছেন।

পীরের কিছু অলৌকিক কাহিনী শুনে তরুণ রাজা চমকে গেলেন।

—কত দূরের দেশ ?

—বড় দরিয়ায় ৪০ দিনের পথ।

— দেশের সব মানুষ শ্রদ্ধা করে ? হিন্দুরাও ?

লালমিশাই বললেন-হিন্দু, যোগী সব্বাই । উনি গোফায় ধ্যান করেন।...... শুনেছি সব ধর্মের মানুষ শিরনি দিয়ে যায়।....উনি গরিবের অসুখ এলাজ করান।....পীর আগে থেকেই সব জানতে পারেন ।

এরপর অমাত্যরা শোনালেন এ-দেশের নানা অলৌকিক কাহিনী। এমন কী একশ্রেণীর যোগীরা নাকি জলে হাঁটে ও মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলতে পারে ।

লালমিশাই বল্লেন—পীর শুধু অলৌকিক ক্ষমতাই দেখান না...তিনি বিশাল বিশাল জঙ্গল সাফ করিয়ে বুনো মানুষদের চাষ-বাস শিখিয়েছেন ।.....ভক্তি শ্রদ্ধায় দলে দলে তারা ইসলাম হয়েছে..... দেশে বন্যা দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকে...আশ্চর্য। পীরের শাসনে এ-সব কিছুই হয় না। ওদের সুলতান পর্যন্ত পীরকে দেখতে পায়ে হেঁটে চলে আসেন।

এরপর তরুণ রাজার বিশেষ অনুরোধে পাঁচটি দিন লালমিশাই দলবল নিয়ে রয়ে গেলেন কুনারে । রবসের সুলতানের যুদ্ধযাত্রায় লালমিশাই খানিকটা চিন্তিত । অয়রির বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো আছে জেনে, তরুণ রাজা তাচ্ছিল্যে জবাব দিলেন-এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে আমার বন্দরে নিয়ে আসছি।....

অয়রি 'রাজা' কোথায় ? একজন সামন্ত। তবে ওর নৌবহরের সুখ্যাতি করতেই হয়।

এরপর একে একে শক্তি, সম্পদ, আইনকানুন ও সৈন্যদের প্রসঙ্গ উঠল। লালমিশাই ক'দিনেই টের পেলেন, রাজবাড়ির হারেমেও মণি-মাণিক্য ব্যবহার করা হয়। রাজার বাঁদীরা মাণিক্যের জালিকা বানিয়ে মাথায় পরে। শ্বেত হাতিটির মাথায় পর্যন্ত সাতটি পদ্মরাগ দেখা গেল। বিরাটও গোলাকার। মাণিক্যের ছড়াছড়ি ঘটলে, বিশেষ মূল্য রইল কোথায়। যা কিছু বিরল তাই তো মূল্য বান—লালমিশাই ভাবলেন।

—রাজ্যে কোথায় পাওয়া যায় এগুলো?

—কিছু সমুদ্রে, কিছু পাওয়া যায় মাটি খুঁজে। এ দ্বীপের সব অঞ্চলেই পাওয়া যাবে।

আমাত্যদের একজন মন্তব্য করলেন—নতুন রাজার আইনে এখানকার জমি অনায়াসে কেনাবেচা করা যায়। অনেকেই তাই কিছুটা জমি কিনে মাণিক্য পাবার আশায় খোঁড়াখুড়ি করে।

—কিন্তু জমির মালিকানা তো রাজার ?

— কেন ?

লালমিশাই যথাযথ উত্তর না দিতে পারায়, অমাত্যটি বললেন—আমাদের বৃদ্ধরাজা তেমন জেদেই কানুন করেছিলেন.....আমরা তাঁর চোখ দুটো তুলে ফেলেছি...তরুণ রাজা উদার, আমাদের পরামর্শ ছাড়া চলেন না।

হঠাৎ দূরে বসেথাকা ভাট-রা সঙ্গীতে রাজার গুণগান গাইতে থাকল। অন্ধরাজা বেঁচে আছেন। প্রাসাদেই তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাখা হয়। বৃদ্ধ রাজা খুব কাছের মানু,দের ডেকে বলেন—অদ্ভুত। আগের চেয়ে পৃথিবীটাকে অনেক ভালো দেখতে ও বুঝতে পারি।

কয়েক দিনের মধ্যেই লালমিশাই তরুণ রাজার মতলবটুকু আন্দাজ করলেন। কাগজপত্তর আনিয়ে স্বয়ং রাজা লালমিশাইকে এ-দেশে কাজিগিরি করার অনুরোধ জানালেন। কাফেরের দেশে কেন অনুরোধ জানাচ্ছেন রাজা, ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না লালমিশাই। দু-দুটো কাফের রাজার অধীনে তিনি দায়িত্বপালন করেছিলেন বটে সে-রাজ্যগুলো শুকনো এবং দুর্গে ঘেরা। কিন্তু এ-রাজ্যের কোথাও ডাঙ্গা শেষ হয়ে হঠাৎ উপসাগর, আবার পানিকে বিদায় দিয়ে ফের মাটি, ঘন গাছ পালায় সারাদিন কেমন স্যাঁতস্যাঁতে লাগে —মনে হয় বিপদ ঘাড়ে আসার আগে, বাতাসে টেরই পাওয়া যাবে না। তরুণ রাজার লক্ষাধিক সৈন্য। এছাড়া ২০ হাজার মুসলমানের একটা বাহিনী আছে। গুণ্ডা-বদমাস, দাগী আসামী ওপালিয়ে আসা দাসদের নিয়ে বাহিনীটি গড়া। এদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের জন্য কি লালমিশাই-এর প্রয়োজন? তিনি কাকের বাসায় কোকিল হয়ে থাকতে চাইলেন না। তাছাড়া বয়সের সুলতান ফিরে এসে টের পেলে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতে পারে। বোঝা গেল, তরুণ রাজা গোপন গোপনে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নিক তা। ঘোড়া ও তরোয়াল হাঁকিয়ে শত্রুর মুখোমুখি বহু লড়াই করেছেন লামমিশাই। কত বিধর্মীর রক্তঝরা মুণ্ড দুর্গের দেওয়ালে গেঁথে রেখেছেন। আবার কত কাছাকাছি নিজের কলজেটি এ-ফোঁড় ও -ফোঁড় হওয়ায় হাত থেকে অলৌকিক বেঁচে গেছেন। মৃত্যু ভয় কী, লালমিশাই আজও টের পান না। পবিত্র কোরাণই তাঁর একমাত্র ধ্রুবতারা।

লালমিশাই তরুণ-রাজাকে জানালেন— হুজুর, পীরের ১৫০ বছর বয়স।......এরপর চোখে দেখার সুযোগ মিলবে না। যখন ভেসে পড়েছি, হুজুর আর টলিয়ে দেবেন না।

—তালে ফিরে এসে দায়িত্ব নিন।

—তা ভাবা যেতে পারে।

কত সময় লাগবে ফিরে আসতে ?

—পথের কথা কেউ বলতে পারেনা হুজুর।

বড় দরিয়ায় পীরের উদ্দেশে যাত্রার আগে লালমিশাই পুর্বতন অন্ধ রাজাকে দেখে গেলেন। সিংহাসন তাঁর নেই, তবু উঁচু একটি পালঙ্কের ওপর তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চোখ দুটো গভীর গর্তে। রহস্যময় অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে। নাভি থেকে হাঁটু অবধি সাদা কাপড়ে মোড়া। গলায় ঝুলছে পদ্মরাগমণির একটি মাদুলি। পাশেই হাতের থাবার মতো বড় মাণিক্য দিয়ে তৈরি একটি পাত্রে ঘৃতকুমারীর তেল। মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলে বৃদ্ধকে তালুতে তেল মাখিয়ে ঠাণ্ডা রাখা হয়। কবিরাজের হুকুম। হাসিহাসি মুখে বৃদ্ধ বললেন-এর চেওে বড় পদ্মরাগের পাত্র আমাদের আছে।...... আশ্চর্য হবেন না।

লালমিশাই চমকে ওঠেন। বিনীত গলায় জিগ্গেস করলেন — আপনি দিন ও রাত কী ভাবে টের পান ?

অনেকটা সময় থেমে, হাসিমুখে বৃদ্ধ বললেন—ফিরে আসুন তখন উত্তরটি জানাব।......ফিরে আসছেন কি ?

লালমিশাই বললেন—আল্লার কৃপায়, মানুষের পুরো জীবনটাই হওয়া-না হওয়ায় জর্জরিত। কি করে সোজা উত্তর দেই আপনাকে ?

—ওটা তো জীবনের ব্যাপার.....রাজ-শক্তির কাজে সম্পর্ক কি ? শুধু হয়ে ওঠাই তার সার্থকতা। কাবিজ হিসেবে কি বলেন ?

লালমিশাই নিরুত্তর রইলেন।

বড় দরিয়ায় ৪০ দিনের পরব। ২০ দিনের মাথায় সত্যিই লালমিশাই দেখতে পেলেন দূরে অলৌকিক একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে। বাংলার পীর আগাম জানতে পেয়ে চারজন অনুগামীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠিক ঠিক পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে তার। কিন্তু ঢেউ অর বাতাসে দরিয়ার পথ আর ফুরোতে চাইল না। চলছে তো চলছেই পাণিতে, লবনে রোদ্দুর বৃষ্টির দড়ি দড়া পাল মাস্তুল জীর্ন হতে থাকলেও পথ আর ফুরোতে চায় না। যেন ঢেউগুলোই শেষ কথা বলবে।

অবশেষে ৭০০ বছ পেরিয়ে গেলে একদিন লালমিশাইয়ের জাহাজটাকে কোস্ট গার্ডরা বিদেশী গুপ্তচর সন্দেহে গঙ্গায় টেনে নিয়ে এল। অদ্ভুত জাহাজ ও লোক-লস্করদের কথাবার্তা তীরধনুক দেখে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নগুলো সরব হয়ে উঠল। নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর পীরকে সণাক্তকরণের জন্য লালমিশাইকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসা হল— কোথায় পীর বা কোথায় তার খোদা। লালমিশাই দেখলেন দুর্ভিক্ষ বন্যা, মহামারী চাষের বিস্তীর্ণ ক্ষেত এবং কাফের ও বিধর্মী

সবই রমরমা হয়ে আছে কিন্তু যে-পীরের প্রসঙ্গ কোস্ট গার্ডদের বলেছিলেন, সে-সব মিথ্যে, মরীচিকা। সুতরাং লালমিশাই ভয়ঙ্কর সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে চালান হলেন রাজধানীতে। সেখানে যোগী, সাধু, সৈন্য, সামন্ত এমন কি দামঘানীর মতো প্রচুর মানুষের দর্শন মিলল। নগরে দেখতে পেলেন পদ্মরাগমনি। হাতের থাবার চেয়েও বড় বড় পদ্মরাগমণি আছে। কত যে মূল্য এগুলোর লালমিশাই-এর ধারণাতেই আসবে না। মনে পড়ে অন্ধ রাজার কথা—এর চেয়েও বড় পদ্মরাগের পাত্র আমাদের আছে। আশ্চর্য হবেন না। উনি তো বলতেন আগের চাইতে আরও বেশি স্পষ্ট ও সহজে পৃথিবীটা দেখতে পাচ্ছিলেন। এগুলো কি দৃষ্টিগোচর হয়েছে?

ডজনে ডজনে ছেলে-মেয়ে ক্যামেরা ঘাড়ে লালমিশাই-এর ছবি তুলছিল ক্লিক্ ক্লিক্ পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পথ করতে হচ্ছিল, অগুণতি মাথা দেখে লালমিশাই ভাবলেন, এত সন্তান যার, তিনি পাহাড় চূড়ায় পায়ের ছাপ বসিয়ে নিঃশব্দ।

লালমিশাই কি দরিয়াতে খোয়াব দেখছেন? কাফের এর দেশ ছেড়ে এসেছেন বলে? নাকি সে দেশে ফিরে যাবেন বলে?

আধুনিক নতুন দেশে একটা কুঠুরিতে লালমিশাই আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্বতন অন্ধ রাজাকে দেখেতে পেলেন। তিনি অন্ধ নন। ফিরে পেয়েছেন দৃষ্টি। লালমিশাই বললেন—আপনি চোখ দুটো ফিরে পেলেন? কী ভাবে?

বৃদ্ধ হাসতেই থাকলেন, হাসতেই থাকলেন, যখন লালমিশাই-এর মনে হল, এবার হয়তো প্রশ্নটির উত্তর আসবে, তখনও নতুন করে বৃদ্ধ হাসতে থাকলেন।

মাংসখেকো ঘোড়া

উঁচুটা ৫০ ফুটের কম তো নয়ই, বেশিও হতে পারে। পাঁচতলা বাড়ির ছাদে পিলার গেঁথে লোহার খাম্বা-খাঁচায় লটকে উঠল যে-বিশাল হোর্ডিংটা —লালে, হলুদ, কনট্রাস্ট। হ্যাঁ, পুরোপুরি উঠল বলা যাবে না এখন, ফ্রেমের মধ্যে পশ্চিমের টুকরোটা বেঁকে আছে কিছুটা। দু' দু'জন মানুষ লোহার ছোট-ছোট খাম্বাতে স্ক্রু-এঁটে কাঠামোটা সামান্য উঁচিয়ে ধরলেই ব্যস।

কাজ চলছিল সকাল থেকেই। এখন বিকেল ঢলো-ঢলো। রাত নামলেই চারপাশের আলোর রোশনাই জেগে উঠবে অক্ষর ও ছবিতে। ফ্লাইওভারে বাসে বসেই জানালার যাত্রীটি চোখ ভালেই দেখতে পাবে লাল ঘোড়াটাকে। চোখের ড্যালা, ঘাড়ের চুল, পেছনের দাবনার পেলব পেশিমগুলের চকিত শিহরণে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভঙ্গি সুকুমার উরুর মেয়েটিকে রমণের আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত। 'জীবন মানেই গতি'— অক্ষরগুলো ইংরেজি বর্ণমালার এবং তফাতে—ফ্রেমের কোণ ঘেঁষে — ক্লাচ ও এক্সিলেটর এবং শিং জোড়ায় আয়নার চিহ্ন। পশ্চিমের টুকরোটা বিকেলের ঠিকঠাক স্ক্রু-বলটু নিয়ে খাম্বায় কামড়ে গেঁথে গেলে, এখন হারানো বিকেলের মধ্যেও ঘোড়াটার শরীরে গোধূলির কিছু মোহময় আশীর্বাদ যাবে লেগে। ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটি।

লম্বা একটা রেঞ্চের সাহায্যে আধা জং-এর একটা বল্টু জোরসে টাইটের সময় হঠাৎ অন্য একটা খাম্বা খসে বিজু —বিজলিপদের কাঁধ পিছলে পড়তেই --পাশের পঞ্চা দেখল বন্ধুর হাতটা মুহূর্তে বাতাসে ঢেউভাসা হয়ে মিলিয়ে গেল। শুধু কনুইটা অর্দ্ধেক অবস্থায় ঠুঁটো জেগে আছে।

ভাগ্যিস বিজু চকিতে বাঁ-হাত শক্ত করে পাশের ফ্রেমটা ধরে ফেলেছিল, নিচের দু'টি পা একটা লোহায়, নইলে এতক্ষণে সে ওলট পালট খেয়ে চোঁ করে বাতাস চিরে মাটিতে পড়ত আছড়ে। কতটুকু আর পতনের সময়? দু' থেকে আড়াইটি সেকেণ্ডের অবসর মাত্র।

—বি-জু দা।

—ঠিক আছি।

—হাতটা?

—রেঞ্চটা চলে গেল!

--রক্ত ?

---একটু পর চোঁয়াবে । কিছু ভেবেছিস ?

--নেমে পড়ো । কাঁপছে কেন ?

--ঠিক আ-আছে ।

তখন একেবারে তলায় ---ভূমিতলে --পিচ্ পিচ্ করছে মানুষ । এত উঁচুর কোনো খবরই নিতেপারল না । বিজু যদি বাতাস ফুঁড়ে নেমে আসত দু-আড়াই সেকেণ্ডে, তবে তক্ষুণি ব্যাপারটা খবর হয়ে ছড়াত। বিজুর পরিচয়, বীভৎস চেহারার খুটিনাটি, ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা, নাকি হত্যা বা আত্মহত্যা, পঞ্চা-নীলু যাদব--বাকি তিন সহকর্মীকে পুছতাছ ও কোম্পানীর কর্তাদের কাছে ফোন--সব মিলিয়ে সংবাদগুলো যে স্বাভাবিক শীতল থাকত না, অবশ্যই তা অনুমেয়।

সাড়ে তিনজন ফ্রেম থেকে নেমে ছাদে **এখন** । **বিজলিকে আর পুরো** মানুষ হিসেবে গুণতি করা যাবে না । হাফ অর্থাৎ অদ্দেক । **পুবের দিকে ফ্রেমটায় হাতু**ড়ি পিটছিল নীলু-যাবদ এবং পঞ্চাকে নিয়ে মোট সাড়ে তিন ।

বিজলির হাতে ছিল লোহার লম্বা হাতওয়ালা **একটি রেঞ্চ, আঙুলে** ঘোড়ার নালের আংটি । ওটা ছিল বাঁ হাতে --অর্শের প্রতিকার । আজ ফ্রেমে উঠবার মুহূর্তে কোন খেয়ালে যে হাত বদল করেছিল, বলা মুশকিল । আর ছিল কনুইর ঠিক নিচে গুড়িগুড়ি ফুসকুড়িসহ কিছু চুলকানি ।

কনুইয়ের মাথাটা অসম্ভব জ্বালা করছে কিন্তু এখনও রক্তের সাক্ষাৎ মিলছে না । বিজু টের পাচ্ছিল ফল্গুধারার মতো শরীরের অতলে কোনো কিছু কুলকুল করছে যেন । শিরা-ধমনি জালিকা ও অসংখ্য পেশি ও মাংস-আঁশের চোরাপথে ঐ কি ঘুমিয়ে পড়া যেতে পারে? জেগে থাকার সমস্ত ভয়-ত্রাস- যন্ত্রনার বস্তা চাপার উপর অচেতন পড়ে থাকা ?

কার্ত্তিকের বেলা-যাই-যাই করে কখন যে সন্ধ্যা নামে । তখন আর অস্পষ্ট আলোতে টের পাওয়া যায় না, বিজুর ঠোঁটজোড়া ফ্যাকাশে অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। ভোর-রাতের আধফোটা পাতি টগরের মতো ।

--শোনো । পঞ্চা ও নীলুকে ডেকে, খানিকটা তফাতে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে যাদব—হাতটা কোথায় ?

--কোথায়, আমি গুণে রেখেছি ? পঞ্চা বলে ।

--তা বলিনি । জোগাড় করতে হবে তো !

----কেন ? নীলু জানতে চাইলে, যাদব ধুরন্ধরের মতো বলে ----

প্রমাণ ! কোম্পানি বীমা করালে, প্রথমেই হাতটা চাই ।

পঞ্চা জিজ্ঞেস করে --মালিকদের ব্যাপারটা কী ভাবে জানাবে ?

--তা পরের ভাবনা । নীলু পেছনে তাকিয়ে বলে --বিজুদা শুয়ে পড়েছে ।

এত উঁচুতে বিজু কোনো জন্মেও শোয়নি । ঘোর লাগছে চোখে । আকাশ যেন নাকে এসে লাগবে । নাকি এত উঁচু বলেই, চিৎ হওয়া অবস্থায় মনে হয় এক্ষুণি ঝুরঝুর কয়েকটা

তারা খসে নাকে-চোখে-মুখে ঠোকা খাবে। কুমড়ো ক্ষেতে শিলাবৃষ্টির মতো।

এখনও রক্ত ফোটেনি। সবে বর্ণহীন কিছু রস ভীষণ জ্বালা বানিয়ে ভিজিয়ে তুলেছে জায়গাটা । ঘন চিনির সরবৎ এর মতো ।

এতক্ষণ বিজু স্বপ্ন দেখছিল । এবার মনে হল কনুইর পর, হাতটা তার নেই । খাঁ খাঁ করে উঠতেই, বিজু ডুকরে উঠল ।

পণ্ণা বলে --বিজু ! কাঁদবে না । ঘুমোতে হবে তোমাকে । .

---আমার বাড়ি ? বৌ কোথায় ?

--সব ঠিক আছে ।

পণ্ণা কিছুতেই যাদবের যুক্তিটা মাথায় নিতে পারছে না । হাতটা যে নেই, খুঁজে পেতে প্রমাণ করতে হবে কেন? ঠুঁটো রক্তাক্ত কনুইটার উলঙ্গ বীভৎসতাই সকল প্রমাণের বড় ।

--তা কেন ? যাদব বলে, দুর্ঘটনা না হয়ে, তোমরা কেউ এক কোপে নামিয়ে দিতে পারো।

---কেন ?

--শত্রুতা ।

--কিসের শত্রুতা ?

--কিসের- টিসের নয় । বীমার টাকার জন্য তাদের কর্তারা যুক্তি রাখতেই পারে।

আঘাত নামানো খসা বিমটা এখনও একটা শক্ত স্ক্রুর মাতব্বরিতে মাথা ঝুলিয়ে আছে। বিজু যদি ঘৃণাক্ষরেও অনুমান সিদ্ধ হত, ঐ স্ক্রুটা আগেই রেঞ্চে 'টাইট' দিয়ে নিতে পারত। আসলে, তখন সে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সংযোগ হারিয়ে ঘোড়াটাকে দেখছিল । দানবীয় একটি কাম-বাসনা চোখে থমকে থাকা, পশুটা যেন জীবন্ত । বিজুর বার বার মনে হচ্ছিল, সত্যিই কি ঘোড়া পশু হয়েও. নারীসংগমের ইচ্ছা পোষণ করে ?

জীবনে সে একই কোম্পানীর হয়ে, প্রায় আড়াই শো হোর্ডিং টানিয়েছে । পেছল বিম বা তেতে থাকা লোহার রডের ওপর দিয়ে হেঁটেছে, কাঠের ফ্রেমে জল-বাতাসের তাড়নায় জন্মানো চারা গাছ ছিঁড়েছে ক-ত । ইচ্ছে করেই গাছের ছোট্ট ছোট্ট ছানাগুলোকে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়েছে এবং ও-গুলো অবাধ স্বাধীনতায় গেছে তলিয়ে । পণ্ণা বলে --নীলু চলে যা আপিস । বস-দের জানা । আমি যাচ্ছি ....

---কোথায় ?

---যাদবকে সঙ্গে রাখব ।

----যাবে কোথায় ?

----দেখি, সাক্ষিটা খুঁজে পাই কিনা ।

---যাদব আমার সঙ্গে থাকুক !

---কেন ।

----একা বস-রা আমাকে বিশ্বাস করবে না । ..... বিজুদাকে পাহারা দেবে কে ?

--লাগবে না । ও এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে । ..... একবার ঘুমোলে সক্কাল কাবার ।

--ওকে ঘুমোতে দেওয়া ঠিক নয় ।

---কী হয় ?

---ব্যথা। পিঠ-মাথা কামড়ে ধরবে ।

--কোনো ওষধের দরকার নেই ? পচে যায় যদি ?

----এত উঁচুতে ডাক্তার উঠবে না। .... তুমি তা'লে থাকো ....রক্ত বিদ্দিগ-দিগ ছড়িয়ে মাখামাখি হলে, ভাল্লো করে বেঁধে রাখবে। ....

আমি নামছি

ঠিক ঘুম নয়, জ্ঞান হারাবার আগে বিজলিপদ ভাবল, বাড়ি ভারি বউবে কী জবাব দেবে ? যখন বাঁ-হাতটায় পাঞ্জাকে চওড়া করে দেখতে গেল বিজলি, তখনই আঁৎকে উঠে জ্ঞান হারালো। বাঁ হাতের পাঞ্জাটা কেমন দব-দবিয়ে আছে, কব্জি, ত্বক, ত্বকের লোমগুলো, মেলায় দুটাকা দিয়ে উল্কিতে নাম, বিপি হালদার, —পুরো বিজলিপদ লেখালে অনেক বেশি পয়সা নিত।

পঞ্চা ভুমিপৃষ্টে নেমে, টেরই পাচ্ছিল না সত্যিই বিজলির হাতটা ডেউভাসা হয়েছে কিনা। এত সাবলীল পরিবেশে আতঙ্ককর কোনো ঘটনা বিশ্বাসে করতে মন চায় না। তার উপর পঞ্চা কোথা থেকে শুরু করবে খুঁজতে বুঝে উঠতে পারে না। কী খুঁজছেন ? বললে, কী জবাব দেবে ? আর ঐ পাঁচতলার একদিকে রেললাইন, ফ্লাইওভার, অন্যদিকে অসংখ্য বস্তি আর পাঁচিল ঘেরা এঁদো নিচু জমি আছে কিছু চিহ্নিত করা। বস্তির মধ্যে ঢুকলে তো হাজার চোখ, শত শত কান ও অসংখ্য কৌতূহলের জেরবারে পঞ্চা বিপদে পড়ে যাবে। তাছাড়া খুঁজতে কৌতূহলের জেরবারে পঞ্চা বিপদে পড়ে যাবে। তাছাড়া খুঁজতে গেলে জোরালে টর্চ দরকার।

সে বুথ থেকে হঠাৎ -খেয়াল অফিসের বস্-কে ফোনে জানালো।

—কাজ ফিনিস বাকি।

—সামান্য বাকি।

মালের ঠেকে ঢুকে পড়েছ তার আগেই ?

—স্যার আপনি.....

—পঞ্চানন, সোজা অফিসে রিপোর্ট করো।

—যাদব গ্যাছে।

—নীলু কোথায় ?

—বিজলিকে পাহারা দিচ্ছে।

—পাহারা দিচ্ছে ? কী যা-তা বকছ ?

—সত্যি স্যার, ও এখন পাঁচতলার ছাদে।

বস্ খেপে রিসিভার ঝপাং করে রেখে দিল।

পঞ্চার দ্বিতীয় অসুবিধে, দূরত্বের আন্দাজ তার আসে না। মনে হয় উড়তে উড়তে অত উঁচু থেকে হাতটা যে কোনো তফাতে গিয়ে পড়তে পারে। সমুদ্রে, পাহাড়ে, ধান ক্ষেতে, কোনো ভিন্ দেশের সীমানায়, ভাগাড়ে—ঠিক ঠিক মাথায় আসে না। তবে তার খেয়াল আছে লম্বা একটা রেঞ্চ মুঠোয় ধরা ছিল। ঘোড়ায় নালের কথাটা জড়ানো ঠোঁটে বলেছিল, বিজলি। ভারি রেঞ্চটা যে মৃত হাতের মুঠোয় থাকবেই, এমন কোনো নির্বন্ধ নেই। জ্যান্ত হাত থেকেই যদি শত শত

হাতুড়ি, গাঁইতি সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, তো বিচ্ছিন্ন হাতের কতটুকুই বা শক্তি। হয়তো ঢংকরে কোন চালায় বা খাজে শব্দ উঠে ছিল — পৃথিবীর কোনো শ্রবণ যন্ত্র টের পায় নি । তবে আঙ্গুলে ঘোড়ার নালের আংটিটি জড়ানো থাকবেই ।

লাইন ধরে, সাবধানে বেশ খানিকটা উত্তরে গেলে ফ্লাইওভারটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ল । এত দূর ভেসে আসতে পারে? মাঝে মাঝে শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে প্রস্রাবের জন্য বাইরের জড়ানোর চোখে তাকালে, পঞ্চা প্রায়ই দেখে তার আম গাছের ফাঁকে জ্বল- জ্বলে তারাটা এত কাছে যে

ভুলুদের নারকেল গাছে চড়লেই ছিঁড়ে আনা যাবে । দূরটুকু সে কল্পনা করতে পারে না।

আসলে পঞ্চা তখন বুথে গেছল নীলুর এক পড়শিকে জানানোর জন্য রাতে নীলু ফিরবে না। পই পই করে স্মরণ করানোর পরও, বুথে গিয়ে সে ভুলে বসের টেবিলের ফোন নম্বর দিয়েছিল টিপে । এখন তার সেই বিভ্রমের কথা মনে পড়ে । সারা রাত না ফিরলে, নীলুর বাড়ি থেকে থানায় ছোটে যদি ? পঞ্চার নিজের ঘরেও জানে না— এমন বিপত্তি ঘটেছে কর্মক্ষেত্রে আজ।

দু' দু'টো আপ-ডাউন ঘিরিং ঘ্যাট ঘ্যাট বেরিয়ে গেল । সাবধান দৃষ্টি না রাখলে সে ওভার-রান হয়ে যেতে পারে । মানুষ সব কিছু নোংরা রেললাইনের পাশেই রাখে । পঞ্চার হাঁটু পর্যন্ত ইতিমধ্যেই দুর্গন্ধে মাখামাখি । দু-চারটে পোকাও পোষাক বেয়ে ঘুরছে ।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল, যদি খুঁজে পাওয়াও যায়, কী করবে সে ? কী কর্তব্য ? হাতে ঝুলিয়ে প্রকাশ্যে নিয়ে পাঁচতলায় উঠবে, নাকি অফিসে বসের ঘরে প্রমাণ দেবে, নিছক দুর্ঘটনাতেই হাতটির বিচ্ছিন্ন হওয়া ? প্রকাশ্যে একটা ছেঁড়া হাত ঝুলিয়ে বা কাঁধে ফেলে নিয়ে যাওয়া বিপদের। পুলিশ, জনতা, পার্টি --যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জেরার মুখে পড়তে পারে । এর চেয়ে নীলুকে এই দায়িত্বে পাঠিয়ে তার পাঁচতলার ছাদে বসে থাকা দরকার ছিল। বিজু তো তার পার্টনার । নীলুর পার্টনার যাদব । কিন্তু বিপদে কোনো ঘেরাটোপ আনা ঠিক নয় । আর যদি হাত-টা না-ই খুঁজে পাওয়া যায়, কোম্পানি কি বীমার পাওনা দেবে না বিজলীকে? তাছাড়া ঠুঁটো কনুইতে ফ্রেম তুলবে কী ভাবে ? অথচ রোমশ ঘোড়া, সুকুমার উরু, ঝর্ণা, স্নান, মিষ্টি বরফের সুন্দর গন্ধে বাতাস ২৪ ঘন্টা ম-ম করলে, বিজুর মনে হবে হোর্ডিংগুলো নিশ্চয়ই ঘুড়ির মতো আকাশে প্যাঁচ খেলছে, এবং ভাবনাটা যে অমূলক হবে না, তা পরদিন অফিস খুলতেই টের পাওয়া যাবে । তার আগে রাতটাকে ফুরোতে হবে । পঞ্চা এ-সব ভেবে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঝোপের জঞ্জাল থেকে যেটি টেনে তুলল, আসলে সেটি গ্লাবস ব্যবহৃত ও বহু পুরনো একটি হাত-দস্তানা । ঠিক যেন উড়ে এল, হাতটা খানিক আগে দুলতে দুলতে পড়েই খানিকটা গেঁথে গেছল জঞ্জালের মধ্যে । পঞ্চার খোঁজটুকু ধাক্কা খেতেই ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল আঙ্গুলগুলো । স্পর্শ করেছিল সহকর্মীর খোয়ানো হাত ভেবে, আসলে রোদ-জলে শক্ত হওয়া একটি দস্তানা, যার সাহায্যে মানুষ অপারধকর্ম করে অথবা ---। কী অথবা ? অথবা মানুষ যা চোখে দেখেনা, পরে হাতের অনুভবে ছুঁয়ে -ছেনে, দরকারে আলোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় । গর্ভ থেকে এ-ভাবেই গ্লাবস এর হাতে শিশু বেরিয়ে আসে । তবে, এটা ভীষণ মোটা ও ফাটলযুক্ত । কোন কু-কর্মে ছদ্ম হাতটা প্রয়োজন মিটিয়েছে কে জানে । ছুঁয়ে দিয়েই ভীষণ জলের যোগাযোগ অনুভব করল । এ-ভাবে আনাচ-কানাচ

ঘুরে লাভ নেই। বিশাল অলিগলি ঝোপে-ছাদে বিজুর হাতটা লুকিয়ে গেছে বলা যাবে না। বরং, থানায় একটি খবর লটকিয়ে রাখা ভালো। কাল দিনের আলো ফুটলে, কেউ অভিযোগ করবে না, তক্ষুণি থানায় জানাতে পারলে না ?

পঞ্চা থানার হাবভাব বিষয়ে খুবই পোক্ত। ওদের ভাষা, চোখের চাউনি, ব্যবহার -- হুবহু বলে দিতে পারে।

হয়তো, বড় বাবু চেয়ারে আসনে কটে বলবে --বাপু, একেবারেই রোজগার কর না, যে চুরিতে নাবলে ?

---না স্যার।

---আর নাবলেই যদি ভাই, নাবার মতো নাবতে পাল্লে না? ঝুটমুট আমাদের বিপদে ফেল কেন ?

অথবা, কাউকে বেঞ্চিতে বসিয়ে, মেজো বাবু গুণগুণ করবে --- ইলোপ কল্লে যে মেয়েটাকে, তোমার বোনের মতো দেখতে,জানো তো ?

--বুঝতে আর পাল্লাম কৈ ?

--চোখে চোখ রাখলে আর গায়ে হাত দিতে পারবে এরপর ?

তাই তো সমস্যা।

--ভালো কী খেতে চায়, শুনে নিয়েছ ?

অথবা, কোনো ড্রাইভারের পিঠে হাত বুলিয়ে বড় বাবু --বাছাধন, কোন পথে নিয়ে গেছলে শাঁসলো পার্টিকে ?

--স্যার, টের পাইনি আমি।

--কচি খোকা, না ? গাড়ি চালালে আর পথ বাতলাতে পারবে না ?

---আমার চোখে পট্টিবাঁধা ছিল।

--চালালে কি করে ? তোরাও যদি মিছে কথা বলিস, ভদ্দর লোকরা কি করবে ?

--চোখ ছুঁয়ে বলছি স্যার! ছোট বেলা থেকে ট্রেনিং ..... পট্টিবাঁধা অবস্থায় গাড়ি চালাতে পারি। গন্ধে গন্ধে পথ বুঝতে হয়!

বড় বাবু হাসতে হাসতে ভুড়িটাকে কাঁপাতে থাকেন। তো, থানায় এতটাই যখন অভ্যস্ত, জানিয়ে রাখা ভালো। পঞ্চা চলে গেল থানায়।

এদিকে, নীলু সময়ের তালে-তালে ভীষণ রগচটা বনতে থাকে। ভয় ও সংশয় জন্মাতে থাকে মনে। তাল, পঞ্চা তাকে ঢপ দিয়ে বসিয়ে, বাড়ি চলে গেল ? নাকি হাত খোঁজা সামান্য ছুতো ? বাড়িতে খবর গেলে, তার তিনছেলের একজনও খোঁজ নিতে আসত না ?

আসলে, সারাদিনের অমানষিক শ্রমের পর চোখজুড়ে ঘুম আসছিল। এত উঁচুতে সে কোনো দিন রাত কাটায়নি। উচ্চতা অনুসারে রাত ভিন্ন ভিন্ন হবেই। চেহারায়, গন্ধে, কথায় এমনকি ভাবনা চিন্তাতেও। সেটেলাইটে বসে রাত, ২০ তলায় রাত কিংবা খনির পিটে বসে রাত --নানা রূপ নেবেই। এখন সে পাঁচতলার রাতের গন্ধ পেল আচমকা। অনেকটা, রবার পোড়ানো শেষ হলে যে গন্ধ ছড়িয়ে যায়।

বিজলি চিৎ হয়ে অসাড়। বেঁচে, কি মরে, টের পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে ঘুমন্ত কনুই থেকে রক্ত ঝরতে শুরু। শব্দ নেই যদিও ঝাঁঝরির জলের অনুভব টের পাচ্ছে নীলু। তখন ভয় জাগে। এত উঁচুতে পাশের অচেতন মানুষটি হঠাৎ যদি উঠে বলতে থাকে—আসলে এটা পর ট্রিকস্। ইচ্ছে করেই বিমটা খসিয়ে দিয়েছে। তা'লে কী কতর্ব্য হবে তার? কিংবা আজ সকালেও যেমন বিজু টের পায়নি, হাতটা বিকেলে থাকবে না, কেমন, একটু পর অলৌকিক ভাবে নীলুকেও যদি হাতটা খোয়াতে হয়? নিছক একটা শুকনো কনুইতে ঝুলিয়ে বন্দরে একটা কুলিকে সে-মাল টানতে দেখেছিল। বন্দরে জাহাজ থাকে, জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয়। তবে কুলিটা কোনো দিন সমুদ্র দেখার কথা কাউকে ঘৃণাক্ষরেও জানায়নি ছুটির রাতে প্রেম-ট্রেম করবার মধ্যে। নীলুই বা কি সমুদ্র দেখত, যদি ট্যুরিষ্ট বাসে বউ-ছেলেপুলে নিয়ে একবার দীঘা না-যেত। কবে কোন দিন বিল্বপত্র ধরিয়ে ভি আর দিয়ে দিয়, তাই পাড়ার ক্লাবের আহ্বানে কোনোদিক না তাকিয়ে দীঘা। নীলু বোঝে রাত ভীষণ বেড়েছে। নইলে, বাতাসের পোড়া ঘ্রাণ থেকে গিয়ে, চারদিকে এত স্নিগ্ধ গন্ধ বেরোত না। যত এইসব গন্ধের পোয়া-বারো, নীলুরা শহরের সব উঁচুগুলো আগাম কিনে নিয়ে রঙিন বোর্ডে তাদের ঠিকুজি-কোষ্ঠি তুলে ধরছে। নীলুর বস্‌দের ঘড়ি যেন ২৬ ঘন্টায় কাঁটায় ঘুরপাক খায়। ওরা বলে, বিমানের পরিচারিকারা ইদানিং সহাস্য চোখ মারতে-মারতে যাত্রীদের সামনেই চুলগুলো সিল্ক বানিয়ে ফেলেছে। ছুঁচলো রঙিন নখে এখন চকোলেট ধরে, তারমধ্যে অতিরিক্ত কয়েক ফোঁটা ব্রাজিল-মধু মাখিয়ে দিতে চায়। যাক্ গে সে কথা। এমন বিপদে ফেলে পঞ্চা এবং যাদবের সটকে পড়ার অর্থ হয় কোনো?

রাতে ঘুম না হলে অম্বল ও পিত্তস্খলন হয় তার। চোঁয়াঢেকুর ওঠে। চোখ গর্তে ডেবে যায়। শরীর তখন ভেতরে কাঁপতে থাকে। দুর ছাতা। নীলু মরলে তার সংসারটা কে দেখবে? দুর্ঘটনায় জড়ালে না হয় বীমার কাছে সাক্ষী মানা যায়। কিন্তু জলজ্যান্ত অকারণে মরলে কোনো বাড়তি সুবিধে নেই। সে বিজলির খানিকটা তফাতে চিৎ হয়ে আকাশ দেখে। এত তারা কি সত্যিই তারা? না, না, এগুলো যে বাপঠাকুদ্দার সংস্কার—তা নীলু টের পায়। তবু নির্জনে, এত উঁচু রাতে এ-সব ভাবলে রহস্যময় লাগে। দু-হাত ছড়িয়ে থাকায়, বাতাসের দু-চারটে জলসাতেই নীলু টপাস করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘন্টা দেড়-দুই পর, বহু কষ্টে দু'টো মদ্যপ পুলিশ, থানায় খবরের জেরে, পঞ্চাকে টানতে টানতে স্পটে টেনে তোলে। ওরা ভেবেছিল গুপ্তচর। আসলে মতলব লুকিয়ে থাকায় গল্প বানাতে এসছে বোধ হয়। সিঁড়িতে ওদের জুতোর শব্দে কারও ঘুম ভাঙে না। বাতাসের গন্ধে এতটা উঁচুতে উঠে হঠাৎ ছাদে পা দিয়েই স্তম্ভিত।

নিঃশব্দে, নিরিবিলিতে, ফ্রেমের ঘোড়াটা লাড়িয়ে নেমে এসে ঘুমন্ত নীলুর ডানহাতটি চিবিয়ে খাচ্ছে। আঙুল, কব্জি, বল্টুর ঘষা জং, শিরা, ত্বক—কনুই অবধি ওঠার আগেই তিনজন ছাদে পা দিয়েছে। হলদে দাঁতে সামান্য চিঁহিঁ ভাব দেখিয়ে ঘোড়াটা সামান্য লাফ দিয়ে ফের ছবি হয়ে গেল। ঘোড়ার শরীর থেকে সুন্দর গন্ধ ছিটকে এখন বাতাস মাতিয়ে রেখেছে।

পরদিন সংবাদপত্রে সারা শহরে ঘরে ঘরে একটি লাল ঘোড়ার কাহিনী বেরোল কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না প্রাণীটা মনুষ্যহাত চিবিয়ে গিলে ফেলতে পারে কিনা। ঘোড়া কেবল ঘাস ও ছোলা খায়।

·

অনীক ১৯৯৩

নদী অথবা

ফের দেখা ট্রেনের মধ্যে। ফের দেখা। বিনায়ক হাতের ইশারায় ডাকল ওদেরকে। ছোট্ট হাত-ইশারায়। কিছুটা তফাতে ছিল বলেই। দরজা বরাবর পাশের গলিতে ওরা সাইডে হেলান দিয়ে ছিল। ঝোলানো আংটার হাতের ভর সামলানো। হঠাৎই ঝিমুনিতে বিনায়ক ওদের রংচঙে পোশাক ও ভিড়ের ফাঁকফোকরের মধ্যে শান্তপ্রিয় চোখগুলো এবং বিরল হলুদ বর্ণের ফিতে বাঁধা একজনের একটি কপাল দেখতে পাচ্ছিল— ফলত দীর্ঘ চুলগুলো এলিয়ে বাতাসে ঝাল-ঝামুর হতে পারছিল না তার। চুলের ঝাড়ের ডগাগুলো ফাটা, মাঠঘাটের নিয়মিত ধুলোয় অলংকৃত। অথচ, ফিতেটা চওড়া পাটি হয়ে কপালটিকে সামলে রেখেছে এখন, পেছনের চুলগুলো কানের দু-পাশ বেয়ে শনশন ওড়ে কামরার বাতাসে। মাঠ চপচপ ধান, সরু খাল, শিমূল বট, ভুঁইচাষের কুমড়ো, গম এবং স্যালোর বাতাস—সবকিছুই মিলেমিশে এখন কামরার বাতাস। মানুষ ঠেলে ওই তিনজন পথ করে বিনায়কের সামনে দাঁড়াল এবং ফের দেখা। ফের কেন? আগে কি মুখ পরিচয় ঘটেছিল? তবে ফের বলার তাৎপর্য? না, বিনায়ক 'ফের' দেখা বলেনি। তাহলে এ-শব্দটি কার? সকাল সাড়ে দশটার আগে 'ফের'- শব্দটি ছিল কোথায়?

বেলা এখন চার-এ চলছে। প্রহরের চেহারায় লাগতে শুরু করেছে দিলখোলা, বহু চিকন সব মন-বেদনার স্মৃতি। এভাবেই তো ছুটতে থাকা, দোল-দে-দোল-ঢঙের সিঙ্গল লাইন মেঘ-মেঘ ধুলো ছেটানো পশ্চিমপ্রান্তে লাল ফিল্টারের সূর্যটিকে অস্ত দিয়ে দেবে। কামরার কেউ কেউ জানলা দিয়ে সাক্ষী, কেউ বা ঝুড়ি ও লঙ্কার বস্তায় পা রাখার অভাবে গুঁতোগুঁতি করেই যাবে।

অথচ, বেলা সাড়ে দশটায়, মেঘ-মেঘ বাধাটির জন্য চোত-শুরুর সূর্যটি যখন শরীরে বেশ কুটকুটে দাহ সৃষ্টি করছে, ওরা তিনজন, উঁচু বাঁধ টপকে দাঁড়াল নদীর কিনার-জমিতে। বিনায়করা তিনজন। মানে, তিনটে বিনায়ক নয়; সাধনা মল্লিক আর পঞ্চানন গুহ। ওরা নদী-সঙ্গম দেখতে যাবে, যেখানে এই জল গিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় একটার জলে। ৮১/২ কিলোমিটার দূর। এই পথে বিশেষ মানুষজন নাই, কলহ কম, শুনশান শব্দ, পাখির ডাক আর চিত হয়ে থাকা ফসল সব্জির ঘ্রাণ এবং...। 'এবং'-টুক থাক। কারণ সাধনাই বলল— 'সামলে। মাড়াবেন না যেন!' নাকে রুমাল চাপিয়ে বিনায়ক— 'এম এল এ হয়ে করলেন কী? "সুলভ" থাকলে আর নদীর ধারে

বসত না।'

বাঁধটি সবটুকুই নদীর চোখে-চোখে রেখে ছোটেনি। যখন ফারাক হয়েছে বেশি, চাষ জমির বিস্তার হয়েছে এবং বাঁধের সুবাবুল-আকাশমণির সারি তখন অস্পষ্ট অরণ্য হয়ে যাচ্ছিল। এই বাঁধ শহরের প্রহরীর মতো।

কম কোলাহলের ৮১/২ কিলোমিটার ধরে বাঁয়ে কেবলই নদী; যদিও এখন নদী রুগ্ন একটি পিঞ্জর। তবু নদী তো বটেই। সুগভীর খাড়া পাড় হাঁড়ির দৈ-কাটা বিভঙ্গের বিপজ্জনক মাটি—কিছুটা অবশ্য পাথর-বাঁধানো ছিল। শহরের এলাকার কিছুটা—ঠিক যেখানে ওরা তিনজন বাঁধ টপকে দাঁড়িয়েছিল। ওদের যাত্রা শুরুর পয়েন্ট। লম্বা সাড়ে আট কিলোমিটারের মধ্যে প্রথম ক্লান্তির ছায়া-বাতাসে দাঁড়িয়ে সাধনা মল্লিক বলে যাবে, শুনবে দু-জন; দ্বিতীয় ক্লান্তির আশ্রয়তেও সাধনা মল্লিক, শুনবে দু-জন; কেবল তৃতীয় স্পটে ছোট্ট সামান্য একটা বাজিতে সাধনা হেরে যাবে এ দু-জনের কাছে হেরে যাবে। পরাজিত।

নদীর ওপারটা ধরেও ক্ষেত্ ধূ ধূ নিবিড়, গ্রাম ও তলে তলে আরও গ্রাম, চারচালার মন্দির, মজবুত বাঁশ-মাটি-খড়ের ঘর, রাস্তা, হাট, হাঁড়ি-পাতিল-তাঁতের কুটির শিল্প। এপারের মতো পাঁচশো বছরের পুরণো শহর ঘিরে থাকবার সুযোগ নেই ওখানে।

যাত্রা শুরু করার ঠিক আগে বিনায়ক যখন ওপারটায় মুগ্ধ তাকিয়েছিল, সাধনা বলল, 'দেখছেন যে ঘর-বাড়িগুলো! গ্রামটায় ভালো কাঁসা-পেতলের কাজ হয়!'

—কোন জেলা ওটা?

—অমুক!

এবং রোদ ও হাঁটার শ্রান্তিতে, প্রথম বিশ্রামের সুযোগেই, বিনায়ক দেখবে সেই গ্রামটা এখন সরাসরি, তখনই এম এল এ সাধনা মল্লিক আল ঘেরা ছোট্ট একটি জমিতে দরকচা কিছু অযত্নের ফুটির চাষ দেখিয়ে বলবে—'এই যে খেতটা দেখছেন......'

— এই খেতটা? বিনায়ক পায়ের পাশের মাঠটা দেখাবে। পঞ্চানন খেলবে হলদে ফুলের লতানে কিছু চাষে অনাদরে শুয়ে আছে ফুল-জালি বেশ কয়েকটা ফুটির ছানা। নীরব আকাশের তলায় দামি পান্নারা যেন পাতার আড়ালে সবুজ ঝিল ঝিল করছে। সাধনা বলবে— 'হ্যাঁ। এটা!'

—কী? খেতটা কী?

—মনে পড়ে, একটা খুন নিয়ে কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল? দলবাজির রং চড়েছিল?... ঠিক এই স্পটটায়। হাঁ ঠিক এমন সময়তেই। সাধনা আন্দাজ নেবে আকাশে। বিনায়কের রক্তস্রোতের ধাক্কায় রোমকূপ জাগবে পোশাকের নীচে।

চলা শুরুর কিছু পরই ওরা সতর্ক চোখ দেখল কটু গন্ধের আর তেমন বিপদ নেই। পাথরের বাঁধাই শেষ হয়ে যেতেই, ঝোপ জঙ্গল, নানা ভুঁইকামড়ি লতা জড়িয়ে বালি-এঁটেল মাটি মেশানো নির্জন পাড়ের ঢালগুলো কখনো বিপজ্জনক ভাবে সোজা নদীর বুকে ঢুকে পড়েছে।

গড়িয়ে গেলে ক্ষমা নেই।

নদীর এ অংশে জল-জল নেই — কিছু জল। তলায় বালির দৃশ্য—জলের ঈষৎ নীলচে ধাতের জন্য স্বচ্ছ-স্পষ্ট তলে জেগে থাকা বালির পিঠ দেখলে বোঝা যায় কী বিপুল পলি টেনে টেনে নদী আকণ্ঠ আইঢাই করছে। এসব নদী ভীম সাইজের নয় বলে, খসা পাঁজরের মরসুমে ওপারটা স্পষ্টতর হয়ে থাকে।

এখন ওপার-ঘেঁষা সোঁতটায় জেলেরা লম্বা বাঁশের তে-কানা যে জাল পেতেছে, তারই সামনে একঝাঁক ছোট ছোট ধূসর পাখি দল বেঁধে বুক ভাসিয়ে জল কেটে চলেছে। গোটা তিরিশ হবে।

—পানকৌড়ি! পঞ্চানন বলল।

—পানকৌড়ি কালো হয়।...ধূসর-ধূসর লাগছে যেন? বিনায়কের মৃদু সংশয়ে ফের পঞ্চানন— 'না,না পানকৌড়ি!'

বিনায়ক সংশয় নিয়েই দ্যাখে,

সাধনা মল্লিক কোনোই রায় দিল না। দু-জন যখন ব্যাপারটা ফয়সালার জন্য গতি থামিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি, 'বালিহাঁস'! সাধনার রায় পেয়ে, উৎসুক দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, বালিহাঁস বটে। পানকৌড়ি বেশি কালো, কুচকুচে এবং ওরা সামান্য ভেসে থেকেই ডুব দেয়। বালিহাঁসের ঝাঁকটা শান্ত ধীর গতিতে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। সারা নদীতে হাঁটু কোমর, বা একবুক জল কোথাও কোথাও। ওপার থেকে ক্রমাগত, লিফ্‌ট ইরিগেশন পাম্প চালু থাকায়, কাঁথাফোড়ের ফ্‌টফ্‌ট শব্দ ভেসে আসছিল। বালিহাঁস সৎ, শান্তিপ্রিয়, কোমল পাখি। অথচ এরাই বেশি বেশি টার্গেট। বিনায়ক দ্যাখে জলের তলে রক্তের ধারা ক্রমশ লোহিত করে দিচ্ছে সাঁতারের পথ।

—কী ভাবছিস? পঞ্চানন বলে।

—কিছু না।

সাধনার পা-দু'টি এবং হাঁটার কায়দায় বোঝা যায় জনপ্রতিনিধি বললেও আগান-বাগান দিয়ে চলবার অভ্যেস বদলায়নি।

হঠাৎ বিনায়ক—'ম্যাডামের ক' টার্ম হল?'

—টার্ম মানে?... ও? এই দু-বার পাস দিলাম।

পঞ্চানন বলে, 'কলেজের গভর্নিং বডিতে অনেক বছর, কী বলেন?'... 'হবে।' মৃদু হাসল এম এল এ।

পঞ্চানন আবারও— 'আমারই তো দু-টার্ম হল গভর্নিং বডিতে।'

বিনায়ক—'সেই পরিচয়সূত্রটাই বড় কি?'

—কিছুটা।... নইলে এস এল এ-র সঙ্গে আমার কী দরকার?... উনিই বা আমার অনুরোধে নদী দেখতে সময় নষ্ট করবেন কেন?

সাধনা জবাব দিল—'না, স্যার, তা নয়।...আমি নদী পছন্দ করি...নদী ছিল আমাদের বংশের অন্ন।'

—মানে?

সাধনা বলে, 'আমার দাদামশাই, বহুকাল আগে মাছ ধরত।... আমরা নিকিরি।'

—দাদা বলতে?

—মায়ের বাবা।... আপনারা দাদু বলেন।

বিনায়ক বিস্ময়ে বলে, আপনার নাম আর টাইটেলে বোঝার উপায় নেই।... ক' পুরুষ আগে কনভারটেড?... মানে ধর্মান্তরিত?'

—বলতে পারব না।... পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়? বন্ধু?

পঞ্চানন লঘু রসিকতায় বলে, 'বন্ধু না ছাই! বছরে খোঁজ রাখে না।.... সরকারি ডাক্তার তো! ব্যস্ত... তবে বলতে পারেন কলেজে-স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। কী?'

সাক্ষীর দায়িত্ব বিনায়ক লম্বা হাসিতে বুঝিয়ে দেয়।

ধার ধরে ছিলে রাস্তা দেখলে বোঝা যায়, নদীর পাশ দিয়ে চলাফেরার নিয়মিত গোপন রেওয়াজ আছে। থেঁতলানো জালি-কুমড়োর লতাটি সাধনা তাই সরিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আর তখনই হাত দশেক দূরে, খেঁো-পাচনটি ঘাড়ে অলস চাপিয়ে লোকটা একেবারে তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার হালের মোষ দু'টো মাটি গুড়িয়ে, লতা-ঝোপ দলে মুচড়ে, কিঞ্চিৎ ধুলো তুলে মোটা শরীরে ঢালু বেয়ে নদীর জলে ছুটল। আলুথালু কাদা ঘুলিয়ে, ঝুপসি মেরে নিজেকে ডুবিয়ে দিল জলে। উত্তাপে ঘোর লাগা চোখের ড্যাল দু'টো, গরম শিং ও খুলিটা জাগিয়ে নাকের ফুটোজোড়া সামান্য ভাসিয়ে রাখল জলে। সকাল থেকে দু-প্রহর শেষে দেহ পুড়বার উপক্রম হতেই ওদের বিশ্রাম—কিছু সময়ের জন্য। নইলে কখন যে হাল কাঁধে গোটা শরীরটাই জ্বলে উঠত দাউ দাউ করে। মালিক সময়টুকু টের পায়। মোষজোড়া এখন শীতলতায় চোখ দু'টো বেশি বেশি নির্বাক করে দিচ্ছে। যেন পাতাল ফুঁড়ে দ্বিতীয় কোনো অদৃশ্য জল মুছে দিচ্ছে সমস্ত যন্ত্রণা।

লোকটা কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে দৃষ্টি ভাসিয়ে রেখেছে এখন। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তার সম্পত্তি মোষে, নাকি অনাদি কালের নদী-বালি-জল, না ওপারের সবুজ নিবিড় বীর্যমান গমের ক্ষেতটায়? ওকে দেখলে ৪০ থেকে ৭০-যে কোনো বয়সই লাগানো যেতে পারে। শতছিন্ন ঘাসে-লেপ্টা ঘিঞ্জি অসম্ভব কালো চামড়ায় ফ্যাটফেটে ফর্সা চোখে, চোয়ালটা সেয়ানা গোছের।

—বাবুরা কোথাকার? বেড়াতে?

নৈমিত্তিক সরল প্রশ্নে, বিনায়ক— 'আমরা নদী দেখতে...

—হ্যাঁ, বেড়াতে। সাধনা মল্লিক জবাবটা ছিনিয়েই সম্পূর্ণ করে দিল। খানিক তফাতে এসে বলে, 'বলবেন না নদী দেখতে এসেছেন।'

—কী হত তাতে?

—লাস্ট বন্যায় এই নদী!... বাবা-রে!... এই যে রাস্তায় হাঁটছেন, মাথার ওপরও দু-হাত জল বইছে।

—অদ্ভু-ত। বিনায়ক আঁতকে ওঠে।

—হাজারো অভিযোগ এদের।.... ছেঁকে ধরবে!... টিটকিরি দেবে!... নদীর সমস্যাটা পুরোপুরি বোঝে না এরা!... পলিটিক্যাল উসকানিও আছে।

—আপনাকে চিনতে পারল না? বিনায়ক সরলভাবেই জিজ্ঞেস করে।

—না। চিনতেই যে হবে, কেন?

—আপনি তো এদেরই প্রতিনিধি!

—আমার ২ লাখ ৯৭ হাজার ৪ শো ১৩ জন ভোটার।

—সে তো আপনার ভোটার! ওদের তো আপনিই ১ জন।

সাধনা বলে, 'যুক্তি টুক্তি পারব না।... আসল কথা এরা চেনে না।'

—ভোট ?

—না দিলে আর পাস দিলাম কী করে!

খুনের প্রসঙ্গ উঠল আরও পোয়াটাক কিলোমিটার হাঁটার পর। ওদের পা ফেলার মৃদু শব্দ উঠছিল মাটি-ঘাস থেকে। বিনায়ক ছোট্ট থেকে মাঝে মাঝে লম্বা শ্বাসে অক্সিজেন অতিরিক্ত ভরে নিচ্ছিল দেহ-খোলে। জুলফির দু-পাশ বেয়ে ঘাম। তাত লেগে লেগে মুখটা লালচে; আর পঞ্চাননের রগ টানটান হয়ে আছে।

—কদ্দুর? বিনায়ক জানতে চাইল।

—এই তো। খানিকটা! সাধনা মল্লিক বলে তার অভিজ্ঞতা মতো।

—খেয়া আছে?

এম এল এ— 'এতেই হাঁপিয়ে উঠলেন?'

—না, না! চড়ব না।

—তা'লে?... বাজপুর.... যেখানে এ নদীটা অন্য জলে মিশেছে....ভুটভুটি খেয়া চালু করেছি আমরা।

বিনায়ক হেসে, ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে, 'জলে জল মেশা।.... ভারি অদ্ভুত, তাই না?'

পঞ্চানন বলে, 'কষ্ট করে হাঁটছি কি ফালতু?...তাছাড়া কথা হচ্ছে...'

—তুই কিন্তু হাঁপাচ্ছিস।

—কথা হচ্ছে... একের সঙ্গে এক মিললে দুই... কিন্তু একটা নদী দ্বিতীয় নদীতে যোগ হলে দুই নদী হয় না... ওই একটাই।... তাই না?

বিনায়ক বলে, 'চওড়া হয়। জল বাড়ে।'

সাধনা মল্লিক তীক্ষ্ণ মনে দু-জনের আলোচনা শুনছিল। বিয়ের আগে হায়ার সেকেন্ডারি পাস দিয়েছিল। তারপর নানা ঘোরপ্যাঁচের পর রাজনীতির হাতেখড়ি, পঞ্চায়েত এবং পাস দেওয়া। সে এবার বিনায়কের আগের জবাবের খেই ধরে বলে, 'যেমন সাধনা মল্লিকরা!... কনভারটেড!'

—মানে? আপনি কি রাগ করলেন?

বিনায়ককে পঞ্চানন বোঝায় 'রাগ? কেন করবে? ব্যাপারটা তো আমিও জানতাম না।' সাধনা এই প্রসঙ্গ কানেই নেয়নি, আস্তে বলে, 'যেখানে দু-নদী মিশেছে, বাজপুর তো শহর থেকে রিকশা করেই যেতে পারতেন। ফালতু নদী ধরে হাঁটছেন কেন।'

কুচকুচে কপালটি আঁচলে একবার মুছলেও, কানের দু-পাশে চুল ভিজে লেপটে আছে। তারপর খানিকটা আরও হেঁটে ঝাঁঝড়া একটা শরীষের তলায় দাঁড়াল তিনজন। বুকের ছাতি খটখটে, এখন বোতলের জলে গলা ভেজানো দরকার। পঞ্চানন দ্যাখে নদীতে এ অংশে এককোঁটা জল নেই। পুরোটাই বালি। মাঝে মাঝে বালি-তোলা মস্ত-মস্ত গর্তে জল। হিশিয়ে ওঠার মিহি ছায়া মেখে বালিগুলো হলদেটে আভায় অসংখ্য অভ্রকুচিতে ঝিকঝিক করছে।

—ওপারটা কোন জেলা! বিনায়ক সাধনার কাছে ভূগোল জানতে চায়।

—তমুক!

—শুরুতে যে অমুক জেলা বল্লেন!

—তমুক জেলাটার সরু একটা গোঁজ নদী পর্যন্ত ঢুকে গেছে... এমনকী

দাঁড়িয়ে আছি যেখানে, কিছু দাগ নম্বরও ওই জেলার।... আমার এরিয়ার নয়।

—ভোট?

—ভাগ্যিস শুধু চাষ!

—কেন এটা?

—প্রশাসনের খেয়াল.... কী আর বলব এ ছাড়া.... এই যে ফুটি ক্ষেতটা চষে ওপারের মানুষ।... খুন হয়েছিল এমনই প্রকাশ্যে... কালপ্রিট সব ওপারের... থানাও ওপারের... লাশ নিয়ে বালি পেরিয়ে ওপারেই চলে গেছল।

—কাগজে কত ছবি, স্টোরির পর স্টোরি...

সাধনা বলে, 'এখানেও কম হৈ চৈ হয়নি!'

—আসল ব্যাপার?

এম এল এ কী ভাবল সময় ধরে। বিনায়ক এই মুহূর্তে ওর চোখজোড়ায় স্থির দৃষ্টি রেখে টের পেল, বেশি বয়স হবে না।

সাধনা বলে, 'সব মানুষই মরণ টের পায় আগাম... কী বলেন?'

—কেন?

—দু-দিন আগে তালেম কেন অন্য পার্টির সাহায্য চেয়েছিল, খুন হতে পারে ভেবে...? এবং ওর ভাই খুনি আলেম... মার্ডারের পর আমাদের শেল্টার চেয়েছিল... দিইনি.... ঘুরঘুর করেছিল কত।... ব্যাস দু-রকম রং চড়ে গেল।

—ভেতরের কাহিনিটা কী? গরিব চাষি তো?

—হোক না।... যদি দিনরাত মদ গেলে। ইয়ে মানে... চরিত্তিরের দোষ থাকে, বদমেজাজি হয়.....চাষি হলেও বা কী এসে যায়? জানেন, যে খুন হয়েছে, ছোট ভাইটা দাদার বউটার সঙ্গে... অনেক দিন ধরে চাপা অশান্তি। দাদাটিরও সব রকমের দোষ আছে। আলসের ডিম... চাষের নামে খুন করল বটে... অনেক জটিল ব্যাপার...। তবে—

কিছু বলতে গিয়েও সাধনা নিরুত্তর।

—তবে কী?

—খুনটা ছিল কষ্টের।... চোখ দেখা যায় না।

—দাদাটা কি নিজের হাতেই...?

—দলবল ছিল সম্ভবত।... ধরতেই পারেনি।.... সকাল থেকে মাটি চষে, হালের মোষ নদীতে পাঠিয়ে, এই এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছিল। নেশা করেছিল... ওরা পেছন দিয়ে নদী টপকেছিল... চুপিচুপি আড়াল থেকে হেঁসোয়... এক কোপে মুড়োটা লকলক করছিল... রক্তে মাটি কাদা... তাতেও ছাড়েনি, চোখদু'টো তুলে, কান কেটে নিয়ে, নাকটা উপড়ে জিভের খানিকটা অংশ একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালায় জমিয়ে রাখে আলাদা। চিনতে না-পারে যেন, শেষে চোখমুখে, বালি ঠুসে রেখে যায়। আমি এসে রক্তে ওপসানো থালায় ওইগুলো ভাসতে দেখে...।

বিনায়ক গভীর শ্বাস ফেলে দেখতে পেল, পাশে ঝুনো মাটির ড্যালার ওপর একটা বড় টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের থালা রোদে ঈষৎ ঝক ঝক করছে। ভেতর নদীর খানিকটা শান্ত জল, ওপরে ভাসছে বেগুনের একটা টাটকা ফুল পুরু, দূর্বলতার টুকরো, অতি পবিত্র পান্নারঙের ফুটির ছানা এবং কোত্থেকে কুমড়ো ক্ষেত উড়ে একগুচ্ছ চঞ্চল হলুদ প্রজাপতি ভান্ডটার গায়ে নরমভাবে বসে আছে এবং বাতাসে বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ।

—হরিবল্। চলুন। বিনায়কের তাড়ায় তিনজন ফের চলতে শুরু করল। ঘড়িতে বেলা খরচ হচ্ছে একটু-একটু। বিনায়ককে আজই ফিরে যেতে হবে। বিকেল তিনটের মুখে সিঙ্গল লাইনের গাড়ি ফসকালে বিপদ।

আনমনা বিনায়ক জানতে চাইল 'মানুষ আসলে নিষ্ঠুর? বাঁধে না কিছুতে?'

—হ্যাঁ না বলা যাবে না।... আসলে মিস্টিরিয়াস। পঞ্চানন জবাব দিল।

সাধনা মল্লিক এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে আঙুল তোলে 'ওই যে বহুদূরে পানির আভাস দেখছেন...'.

—ওটা কতটা রাস্তা? বিনায়ক জানতে চায়।

—হিসেব মুশকিল।

—আন্দাজে?

—আন্দাজ তো যার-যার, তার-তার।

বিনায়ক গলা উঁচিয়ে দেখল, দূরে দিগন্তের কোলে বিপুল জলের আভাস। ওটাই দুই নদীর সঙ্গম। নীল-নীল, ধোঁয়াটে অস্পষ্টতায়, দু-পাশের অফুরন্ত ক্ষেত ছাড়িয়ে চকচকে কিছু আভাস। আকাশ ওখানে শেষ হয়েছে।

—ওটা তো বহু দূর।

—যা ভাবছেন তা নয়। সাধনা মুচকি হাসল।

—অদ্ভুত দেখুন। বিনায়ক অবিষ্কারের আনন্দে বলে, 'কখনো নদী ঠিক সোজা চলেনি।... দশ হাতও সোজা চলেনি।'

—পানিও সোজা চলে না। দু-আঙুল পথও না। সাধনার কথায় ফের চলা শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিন্দুতে, জিরনের জন্য ফের একদফা থামার আগে, ওদের চলবার স্পিডটা কমে আসছিল। ততই ঘাম ফুটছিল, জল ঢালছিল গলায় ঘন ঘন। সাধনা মল্লিক আপন মনেই প্রশ্ন করে জবাব পেয়ে গেল, শহুরে ডাক্তার মানুষটা সুবিধের নয়। সম্প্রদায়ের ব্যাপারে টনটনে নইলে কানভারটেড— ধর্মান্তরের কথা তুলে ফের আলোচনা বন্ধ করে দিল কেন? এ-দেশে কবে কখন কার উর্ধ্বপুরুষ বিশ্বাস বদলেছিল—এত কৌতূহল কেন? মানুষ এবং নদীর পানি এক— কেউ খাঁটি সাচ্চা বলে দাবি রাখতে পারে? সব মিলেমিশেই তো পানি। মানুষটা অহংকারীও বটে। বিনীত হাসি হেসে কথা বললেও নেতা হিসেবে সাধনাকে আদৌ সমীহ করছে না। হোক না এটা মফস্বল তাই বলে এখানের এম এল এ কি কলকাতা থেকে এতই খাটো?

সাধনা মল্লিক লেখাপড়ায় সামান্য হায়ার সেকেন্ডারির জন্য এদের মধ্যে খুবই খাটো ভাবছিল নিজেকে। তবে পঞ্চানন স্যার লোকটি শহর থেকে এলেও ভালো। কলকাতার গন্ধ শরীর থেকে ডলে ফেলে, বিশ বছর এ কলেজে আছে। শহুরে পানির চকচকে চামড়াটা এতদিনে মফস্বলের ধাঁচ পেয়েছে। এটা কি কনভারটেড নয়। জিলা কমিটিতে নেতা ব্রজ দুলাল আঙুল ফুলে কলাগাছ সেটাও কি কনভারটেড নয়। দুনিয়ার মানুষ ক্রমাগত কনভারটেড হচ্ছে। যে মানেই ধরো না কেন।

তবে বিনায়ক খুবই মার্জিত হসে বলে, 'ম্যাডাম চুপ করে গেলেন যে?'

—কথা বললে নদী দেখবেন কী করে? আমার এলাকায় এসেছেন!

'আমার' শব্দটিতে জোর পড়ল।

পঞ্চানন কলেজ প্রসঙ্গে বলে, 'বাংলার নতুন মেয়েটি তো কাল জয়েন করল।' সাধনা জানতে চায়— 'কোত্থেকে এল?'

—শান্তিনিকেতন

—হস্টেল পেয়েছে?

—কেন?

—যে-রুমটা দিল মেয়েটিকে, তা তাপসের নামে অ্যালেট্ করা।... একবার ওকে জানাল না পর্যন্ত!

এক ঝাঁক বালিহাস বুক ভাসিয়ে জল কেটে যায়। ভাসতে ভাসতে যায়। শুকনো নদীতে বালি পড়ে থাকে। অভ্রকুচিরা মুহূর্তের সূর্য হয়, সূর্য হয় নিভেও যায়। জলের রং ভিন মরসুমে এত স্বচ্ছ থাকে না। যখন মেঘ জন্মলাভ করে, স্তরে স্তরে জমে গাভিন, নদী ঘোলা-কাদা জলস্রোতে তাথৈ নাচে ফোলে, ফাঁপে ফুঁসে ওঠে, ঘূর্ণিতে চক্কর খায়, মাটি ফাটায়, পার উড়িয়ে সব ভাসিয়ে খড়ের চালা, আশ্রয়, শস্য পশু ও মানুষ সব কী ভয়ানক তুচ্ছ টানে একাকার!

দুটি পাখি এখন নিভৃতে ডাকছিল। বোলটি ভারি শান্তি আনে। হাত পঞ্চাশেক লম্বা ঘন একটি বাঁশঝাড়—নদীর তীর ঘেঁাষেই। এখানেও শুকনো খটখটে বালি পর্ব চলছে। ওরা দ্বিতীয় বার নির্জন ছায়ায় জিরোচ্ছিল। তখনই পঞ্চাননের নজরে পড়ে বাঁশের উঁচু উঁচু গাঁটে সেঁটে আছে পুরনো পাটাটে খড়ের অংশ। আঙুলে টানলেও মাটির গুঁড়ো ঝরে যাচ্ছে।

—বন্যার চিহ্ন? বিনায়ক বলে।

সাধনা বলে, 'হ্যাঁ, জল এ পর্যন্ত উঠেছিল।'

—সাত মাস পরও চিহ্ন যায়নি?

দুই বন্ধু পচা খড়ে আঙুলের স্পর্শে শুনতে পায় কান্নার রোল, নির্বাক কোলাহলের শব্দ।

—কারো চালার অংশ! বিনায়কের গবেষণায়, পঞ্চানন বলে, 'বুঝলি কী করে?'

—এই যে পলিথিনের টুকরোটা।

সাত মাস টুকরোটা খড়ের মধ্যে হিমে রোদে বাঁশের শরীরে লুকিয়ে আছে। খড় পচে ওর লয় নাই। হয়তো হাট-ফেরত কোনো চাষি বউয়ের শখ মেটাতে কিছু কিনে লুকিয়ে গুঁজে রেখেছিল বিছানায় নির্জনে খুশি ফোটাবে বলে, বিকেলের ভাঙা বাঁধের ওলটাপালটে সব হারিয়ে যায়।

শহরের বেষ্টনীটা দূরেই আছে এখনও। ও-পারে নতুন একটা গ্রাম। বালির বুকে চলাচলের পায়ের চাপ কাটাকটি হয়ে ঠেলে উঠে গেছে দু-পারেই। সাধনা বলে, 'নদীতে পানি থাকলে আমাদের বাঁশঝাড়টা খুবই গোলমেলে... এভাবে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়া যেত না।'

—কেন

—পেছনে হুড়ো লেগে যেত।

—হুড়ো?

পঞ্চাননের মৃদু হাসি দেখে এম এল এ বলে, 'স্যার ঠিক ধরতে পেরেছেন।'

—জায়গাটা ভালো না। পঞ্চানন বোঝাতেই সাধনা খোলসা করল— 'স্মাগলিং হয়।'

—স্মাগলিং? এটা তো বর্ডার নয়। কী স্মাগলিং?

—ওই যে, গাঁ খান দেখছেন... নৌকোয় অস্ত্র এনে বাঁশঝাড়ে লেনদেন চলে। অবশ্যই রাতে। দিনে ছড়োরা নজরে রাখে।... ওই ইটভাটাটা ওদের ঘাঁটি।

—পুলিশ... প্রশাসন?

—ধরে... জমিন নেয়... ফের চলে এসব।

—এত নির্জন? জায়গাটা বেছেছে বেশ।

সাধনা বলে, 'ইয়ং ছেলেরা খেতে নামতে চায় না। দু-টিপ মাল্লেই তো ব্যাস!... চাষে আর ক'টাকা পাবে।'

—যাই বলুন নৌকা না থাকলে নদী বড় বোরিং। বিনায়কের হঠাৎ মনে হল।

—ক্লান্ত লাগছে? পঞ্চানন— জিজ্ঞেস করল।

আবারও পঞ্চানন— 'তা হবেই। দু-ঘন্টা পনেরো মিনিট হাঁটলাম।'

বিনায়ক ঘড়ি মেলায়। সাধনা বলে, 'এছাড়া এই স্পটে অন্য কুকীর্তি...।'

বিনায়ক যৌনতা বোধ করল। এই প্রথম খেয়াল করল মনে মনে, সাধনা অত্যন্ত কুচকুচে কালো এবং মর্দা চেহারার হলেও, গোপন টান আছে। সে শিবমন্দিরের নানা কারুকার্যের মধ্যে দ্যাখে বিশালাকার একটি শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট।

বিনায়ক সাধনার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের ফ্যামিলেতে এখনও কমন কিছু আছে?'

—মানে?

—হিন্দুর আচার কিংবা...।

সাধনা হঠাৎ গম্ভীর হলেও পরেই হেসে জবাব দিল, 'কী কমন, আর, কী নয়। আমরা কেউ বলতে পারি?'

জবাবটি বিনায়কের ভালো লাগল না। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে। কষ্ট হলেও নদীর সঙ্গে এতক্ষণ চলতে থাকায় মন্দ লাগছিল না। তাই তৃতীয় স্পটে বিনায়কই উৎসাহে দাঁড় করাল দলটাকে। কারণ বেশ কিছু খাটুয়ার দেখা মিলেছে এখানে। খাটুয়া অর্থে নিছকই শ্রমিক। নদী থেকে বালি তোলা চলছে। গর্ত খুঁড়ে বালি ভরা হচ্ছে বস্তায়— ভেজা বালি। ঠাসা বস্তা মাথায় চাপিয়ে দিলেই গোটা চারেক মানুষ লঘুছন্দে, পিঁপড়ের মতো সাবধানে খাড়া পাড় বেয়ে উঠে আসছে ওপরে। গায়ে মুখে বালি। বিশাল চাপে যেন শরীরটা টনটনে হয়ে আছে।

বালি ফ্রি? কাউকে দিতে হয় না কিছু?

—না।

কাজ হয় এই বালিতে?

—জুতসই তেমন নয়।... অনেকেই বাড়িঘর বানাচ্ছে আজকাল।

বিনায়ক বলল, 'বস্তায় কতটা আছে?'

সাধনা বলে, '২৫ কিলো হবে।... কী স্যার?'

—তা হবে।

—উঁহু। ২৫-এর অনেক বেশি।—বিনায়ক দৃঢ়।

—না না। আমরা দেখে দেখে-অভ্যস্ত। সাধনা উড়িয়ে দেয় বিনায়ককে।

বিনায়ক আদৌ মানল না। সে একটি খাটুয়ার পায়ের বীভৎস ডিমদুটো দেখছিল। দেড় কিলো করে তো হবেই মাংসপিন্ড। বস্তা মাথায় খাড়া থাকে কী সহনশক্তিতে, টান টান ফুলে ক্ষিপ্র হয়ে আছে। চারপাশ ঘিরে আছে মোটা কিছু রগ। এমনকী পাড়ে বস্তাটা খালাসের পরও দুম্বা দু'টো পোক্ত তাকিয়ে থাকে। যেন দেহের বাড়তি একটা অঙ্গ। মোটা মালাই হাড়ের দন্ড, পাতা আঙুল ওদের জন্য যেন স্পেশাল বানানো। নইলে বুঝি মহাভার মাথায় মানুষটা পুঁতেই যেত মাটিতে।

বিনায়ক হাতের তালুতে হাত ঠুকে বলে, 'বাজি? ৪০-এর কম কিছুতেই নয়।'

—আরে না না। সাধনা তাচ্ছিল্যমুদ্রায় বলে, 'আপনার অভিজ্ঞতা কম।'

—শুনুন ম্যাডাম... এতক্ষণ দুটো স্পটেই আপনি বলেছেন,..... শুনেছিলাম আমরা..... এবার হার মেনে নিন।

— হারের কথা কেন? জিজ্ঞেস করেই দেখুন না ওদের।

এখানে নদীর পারে কিছু লোক সমাগম আছে। ওদের বাজির লড়াইতে পাশের দু-একজন মজা পায়। বস্তা মাথায় মস্ত ডিমগুলো কারও উৎসাহে কালক্ষেপ করে না। ভার মাথায় নদীর খাড়া ঠেলে ওঠে আবার নামে, ফের ওঠে নামে, আবার ওঠে এবং...।

ঠিকেদারটির লাল রঙের সদ্য কেনা বাইকটা রোদে সতেজ। বিনায়ক সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'প্রত্যেক বস্তার ওজন কত?'

—৪০ কেজি। বেশিও হবে।

—৪০? বলছ কী। সাধনার প্রশ্নে সম্ভ্রম লোকটা ডলা খইনিটুকু মুখে পুরে কাছে এসে বলে, 'তা হবে দিদি... ভেজা বালি তো!'

—কোথায় কাজ হচ্ছে?

—রাস্তা সোলিং।... পুব পাড়ায়।

মিউনিসিপ্যালিটির টেন্ডার?

—হ্যাঁ।

মনে হল, লোকটা সাধনাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু এম এল এ বাজিতে পরাজিত হয়ে

ভীষণ আহত হয়ে পড়ল। লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা বাড়াল না।

বাকি আর দেড় কিলোমিটার পথ। নদীটা এখানে চোখে লাগার মতো মোচড় খেয়েছে। বালি ফুরিয়ে ফের জেগেছে জল। হালকা নীল। মাঝেমধ্যে জালসহ জেলে নৌকা। ডাঙায় একআধটা পলিথিনের তাঁবু, জেলেদের সংসার। ছড়ানো হাঁড়ি-পাতিল, চাল-আলু-উনুনের চিহ্ন। পক্ষকাল তীরের কোথাও এরা তাঁবু পাতে। ব্যাপারটা দেখিয়ে সাধনা বলল, 'দেখুন পারে চাষ নিষিদ্ধ তবু করেই যাচ্ছে।'

—নিষিদ্ধ কেন?

—সেচ বিভাগ অপত্তি করে।... নদীর পাড় ভেঙে যায় এতে।

বিনায়ক দেখল ওদের পথের পাড়টাও বিপজ্জনক ভাবে ভাঙছে। টাটকা ধসের বড় বড় চাঙড়।

—বেশি ধার দিয়ে হাঁটবেন না। সাধনা সাবধান করল বিনায়ককে।

—এত যে জাল, মাছ ওঠে?

—কমে গেছে। এখনও পায় তবু... এর মাছ খুব মিষ্টি। বেরোলি মাছের নাম শোনেননি?

দু'টো মানুষ হন্তদন্ত সাইকেল হাঁটিয়ে আসছিল উল্টো পথে। বিনায়ককে জিজ্ঞেস করে, 'মোটরটা সেরেছে?

—মোটর কিসের?

—ইলেকট্রিকের লোক নন? কাল থেকে পাম্পটা পুড়ে আছে।... ভাবলাম সারিয়ে গেলেন।

বিপুল সবুজের মধ্যে ধূ ধু একপ্রকার গঞ্জ। নদীর লিফ্‌ট গতকাল থেকেই তার-ফার পুড়িয়ে মোটা পাইপগুলো খটখটে হয়ে আছে। দূরে গাছের মাথায় দু'টো পাখি গলায় দোল দিয়ে ডেকে যাচ্ছে—খিল্‌লো। খিল্‌লো! ওরা শোনে— চোখ গেল!

আরও আধঘন্টা পর ওরা যখন দুই জলের মেশার মুখটায় এল, বিনায়ক পথের অতীতটুকু সব ভুলে যায়। সে আড়াইশো গ্রাম থেকে এক কিলো হয়ে গেছে। জলের কোনো দাগ থাকে না কিন্তু পরিচিত জলটা যেখানে দ্বিতীয় নদীতে ঢলে পড়ছে, একটা সূক্ষ্ম চিহ্ন। খানিকটা সজাগ চোখ রাখলে আভাস পাওয়া যায়। ওপারের মাটি বিশাল খেত সরু যোঁজ হতে হতে দুই জলের মিলনের ক্ষেত্রে ফুরিয়ে গেছে। এধারটায় যত্রতত্র নৌকো, জেলে নৌকোও—আছে বেশ কিছু। একটা নতুন মন্দির দেখিয়ে পঞ্চানন বলে, 'মন্দিরটা হাল আমলের।'

বেশ কিছু ছেলেপুলে চানের আগে গুলেমাছ হয়ে কাদায় লেপটাচ্ছে। মন্দির ছাড়িয়ে ডাঙা শেষ হয়ে গেছে যেখানে, শুধু জল এবং একটাই জলের শুরু, পথের কুকুরটা হাঁটু ভিজিয়ে কিনারা পাচ্ছে না কোথাও। স্থির তাকিয়ে আছে চারপাশটায়। শুধু জল। একটা যাত্রীবোঝাই ভুটভুটি চলে গেল দ্বিতীয় নদীর ওপারের উদ্দেশে। দ্বিতীয় নদী? বিনায়ক দেখল একটাই। পরের জনপদরা এক নামেই নদীটাকে ডাকবে নানা ঘাটে-ঘাটে।

সাধনা বলে, 'এটাই আমাদের বিখ্যাত পারঘাটা।'

এতক্ষণে বাঁধটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—শহরের কোন প্রান্ত এটা?

—দক্ষিণ পশ্চিম কোণ।

জায়গাটা তুলনায় জমজমাট। চা পান টিকিট কাটার ঘর, সাইকেল ওঠা-নানা এবং গুমটির ঘরের পেছনে বেশ খানিকটা মাটি ঘের দিয়ে ফুলের চাষ।

—সরকারি জমি লিজ নিয়ে চাষ হচ্ছে।... এ ফুল শহরে দেখেছেন?

অদ্ভুত ধরণের সূর্যমুখী ফুল। সাধনা আবার জানাল—'ওই যে পেছনে সার্কিট হাউসটার মাথা দেখা যাচ্ছে।'

পঞ্চানন বলে, 'পা গোদ হয়ে গেছে।...এবার রিকশা চাই।'

বিনায়ক 'অবশ্যই' বলে মুগ্ধ চোখে বড় নদীটাকে দ্যাখে। এখানে জল একটু ঘোলাটে ওপারের দূরত্ব বেশি। তবুও দূরে চড়ার মধ্যে বড় গাছপালা নিয়ে একটা দ্বীপ জেগে উঠেছে। মস্ত দ্বীপ। বসতি গড়বার দ্বীপ। ভোট ও প্রশাসনের দ্বীপ। আদমশুমারির আওতার দ্বীপ।

পঞ্চানন বলে 'কী হারে পলি জমছে।... সব মজে যাবে।'

বিনায়ক সাধনাকে বলে 'এটাই তো কোলকাতা হয়ে সমুদ্রে পড়েছে?'

—তার আগে অনেক জল মিশেছে এটার সঙ্গে।

ওরা এবার বাঁধটা টপকে শহর এলাকায় পা রাখতেই টাটকা ভাবটুকু লুপ্ত হয়ে গেল, দুর্গন্ধ, নোংরা ডোবার পচা জল ঢোলকলমির গাছ এবং খাপরার ঘিঞ্জি একটা মহল্লা। দূরে গোটা তিন রিকশা দাঁড়িয়ে। ধুলোর রাস্তাটুকু হেঁটে তবেই কাছে যাওয়া যাবে। পঞ্চানন বলে 'এই যে হাঁটছি এটাও নদী ছিল... দূরে সরে গেছে।'

বিনায়ক বস্তিটা দেখিয়ে বলে 'এরা কারা?'

পঞ্চানন, 'এটা মণ্ডল পাড়া। সবাই কনভারটেড এখানে। গরিব।... দেখছ না চারপাশটা একটু বেশি নোংরা।'

—কিসে কনভারটেড?

—পির-ফকির, ম্যাথর, রিকশা-টানিয়ে, কলন্দর—সবই আছে।

কিন্তু বিনায়ক দ্যাখে পথের লালচে কুকুরটা ডাঙ্গা হারিয়ে, পথভ্রষ্ট জলে পা দিয়ে আছে। কোথায় যাবে? বড় জল দিয়ে যাত্রী-বোঝাই ফেরিটার দিয়ে তাকিয়ে আছে ভয় ও কৌতূহলে।

আজ তিনটায় তাহলে বিনায়ক কাকে দেখতে পেল?

কারোই তিনটার ট্রেনে কোথাও যাবার কথা নয়। ৮১/২ কিলোমিটার নদীটাই কি চুপিচুপি লোকালের কামরায় ঢুকে গেছল? কিন্তু পৃথিবীতে কোনো নদী ৮১/২ কিলোমিটার হয় না। নদীর কোনো মাপ নেই। নদীকে কেউ জন্মাতে দ্যাখে না। মরতে দ্যাখে না। ফুরিয়ে গেলে অনুমান করে। কামরায় তবে বিনায়ক ডাকল কাদের? রিকশায় হোটেলে ফিরে পঞ্চানন বন্ধুকে বিদায়

জানিয়ে চলে এসেছিল হস্টেলে।

দুপুরের দিকে একটা ক্লাস আছে তার, এবং ব্যস্ত সাধনা মল্লিক রিকশায় সোজা বাড়ির পথে। নাকে-মুখে গুঁজেই ছুটতে হবে। বড় আন্দুলিপাড়ায় আজ মিটিং।

তিনজন বিনায়কের ইশারা বুঝতে পেরে, কামরায় ভিড় গুঁতিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। প্রধান পুরুষটির চোখজোড়া অদ্ভুত। শান্ত অথচ কিসের অতীত যেন। আলখাল্লার রং চাপা হলুদ-বাসন্তী বলা যায়। স্যাঙাত লোকটার কাঁধে ঝোলানো যন্ত্রটি অনেকটা রবারের মতো, তুর্কিদেশীয় খাটো লাল রঙের একটি কোট। ব্রেস্ট কোটের মতো। মেয়েছেলেটি মধ্যবয়সি কিন্তু ঘোর কালছে চোখের তারা দু'টিতে এখনও ভীষণ টান। হাতে কাঠ-খঞ্জনী, পানের রসে লাগানো ছোট্ট দু'টি ঠোঁটে জর্দার গন্ধ। কয়েকটা সস্তা চুড়ি। সাদা ফুল-ফুল খোলের শাড়ি। গরিব হিন্দু বউ-মেয়েরা যা পরে। স্যাঙাত তার যন্ত্রটা টুংটাংরি শুরু করতেই বিনায়কের নিঃশ্বাস-দূরত্বে মেয়েছেলেটি পায়ে খঞ্জনি ঠুকে ঠুকে, নাচনের মুদ্রায় হাত তুলে গলা ছাড়ল, 'আমি কাঙাল দয়াল গুরু/আমার মন তো কাঙাল নয়।' শাড়ি হিন্দু বউদের হলেও বাসন্তী বর্ণের একটুকরো কাপড় গলায় ওড়নার মতো পাঁটানো। বিনায়ক ফেট্টিবাঁধাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম?'

—মনোজ ফকির।

আগ বাড়িয়ে মেয়েছেলেটি হেসে— 'আমার নাম চাঁদবিবি!'

—কী গান এগুলো?

চাঁদবিবি দ্বিতীয় গানটি ধরে, 'ফকিরি' বলে একটা থামে।

—কোথায় নিবাস?

—মন্ডলপাড়া। মনোজ বলল।

—কোন মন্ডলপাড়া?

শহরের নাম বলতেই বিনায়ক বাঁধ টপকে ধুলোর পথে রিকশার দিকে হাঁটে। নোংরা গন্ধ, খাপরা, বস্তি।

বিনায়ক জানে অশানপুরে বড় ফর্কিরি মেলা হয় বাৎসরিক।

—আশাননগর যান না।

মনোজ মাথা নাড়ায় 'না' এর চিহ্ন। চাঁদবিবি হঠাৎ গান থামিয়ে জবাব দেয়— 'উনি নিতে চায় না।... অনেক খারাপ খারাপ লোক আসে ওখানে।'

মনোজ ফকিরের চোখের ছায়ায় চাঁদবিবির মন্তব্যে কোনো ঠিক-বেঠিক এর অনুভূতি নেই।

—এখন কোথায় চল্লেন?

—গড়হিঞ্চে।

গড়হিঞ্চে এ লাইনেই চার স্টেশন পর।

—সেখানে কেন?

—বায়না আছে গানের।... শীতলার মেলা... একমাস ধরে পানি ঢালা হয়।

গোধূলির মরা আলোতে ট্রেন হিঞ্চেতে দাঁড়াল। হাট-গঞ্জের ঠাসাঠাসি যাত্রীদের ঠেলা মানত, জল-ঢালা, ডালা-কুলো, বাঁশি, তালের পাখা থেকে কী নেই সেই ঠেলা-গুঁতোয়। জল-ঢালা মেয়ে-বউদের প্রত্যেকেই সাদা খোল ও গাঢ় লাল রঙের পাড় দেওয়া শাড়ি। থৈ থৈ ঢেউয়ের মতো প্ল্যাটফর্ম পেছনের মাঠ, টিকিট-কাটা গেটে ঠেলাঠেলি করছে। বহু কষ্টে এবং গুঁতিয়ে ঠেলে ছিটকে লাফিয়ে পড়তেই হলুদ বাসন্তী রং লালপাড়ের মধ্যে একাকার মিলেমিশে যায়। তারপর প্রচন্ড ঠেলাঠেলির মধ্যে ঢোকা-বেরোনোর মানুষ মাথায়-মাথায় একাকার হয়ে যায়। যতক্ষণ না গাড়ি ছেড়ে ফের ক্ষেত শুরু। মফঃস্বলে এত মানুষ থাকে?

হঠাৎ বিনায়কের সামনেই কামরার মধ্যে একটা চেনা কুকুর ডাঙা হারিয়ে জলে পা দিয়ে শুধু জলের সীমানায় এধার ওধার তাকায়। ফের দেখা ট্রেনের মধ্যে। ফের কেন?

দিবারাত্রির কাব্য : গল্প সংখ্যা ২০০১

চাঁদপাল ঘাটের পীনাস

নিজেই নিজেকে সতর্ক করল!

এই-সব অপরাধ ঘটাবার ঠিকঠিক আগের মুহূর্তগুলোতে স্থির বুদ্ধি ও ঠান্ডা মাথার প্রয়োজন। স্বাভাবিক চিন্তায় ভাবতে হয় চারপাশের তুচ্ছ টুকরো স্মৃতির কথা কিংবা ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারে হেসে সুন্দর ভদ্রতায় চুটকি বা জোক্ বানানো দরকার। মি. দণ্ডপাট বসলেন মস্ত টেবিলটার কোণায়, একেবারে ধার ঘেষে। হাঁটা ও খানিক আগের তিনতলার সিঁড়ি বাইবার ঘামটুকু যত্নে মুছে নিলেন রুমালে; কলম ও ডায়েরিটি পাশে শুইয়ে রেখে, চোখের হাসিতে 'ভালো তো!' দেয়ালে টাঙানো 'স্তব্ধতা বজায় রাখুন' -এর জন্য মহিলাটিও ঘাড় কাতিয়ে, ঠোঁট-কপোল ও ছড়ানো লিপস্টিকে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ভালোই!

মি. দণ্ডপাটের মনে হল মিসেস দাশগুপ্তকে আজ খাসা লাগছে দেখতে। হাল্কা গোলাপী রংয়ের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ - দুই হাতার প্রান্তে রুচিশীল কারুকার্য করা, গলায় আঁটোসাঁটো নকল মুক্তার মালা, শাড়ির রংয়ের সোয়েটের টিপ, চুলগুলোয় ডাই-শ্যাম্পু, বার বার কপাল ছেড়ে ফার্স্ট ব্রাকেটের মতো গালে এসে দাঁড়াতে, উনি দুই আঙ্গুলে ঘন ঘন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। হাল্কা জলরংয়ের পালিশ, যত্নেকাটা নখগুলোতে। চোখদুটি ঘন কালো। ঠোঁটের রংয়ে রুচির ছোঁয়া আছে। নাকটি ছোট, খাড়া এবং এত সরু - চশমাটা পিছলে দুচোখের উর্দ্ধদৃষ্টির ফাঁক খুলে দিয়েছে। কাজ কেমন চলছে উনি এবার জিজ্ঞেস করলেন ফিসফিস করে। মি. দণ্ডপাটও চাপা ভুল্যমে বললেন লাইব্রেরি-ওয়ার্ক সামনের মাসেই শেষ হবে। আপনার ? পাল্টা প্রশ্নে মিসেস ঠোঁট চেপে হাসলেন এমন, ন্যাজে-গোবরে হয়ে আছেন যেন। মাঝ-নদী।

এখন বেলা বারোটা পুরনো ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগারটির নির্জন পাঠকক্ষে দুটি-একটি পিপাসুরা জড়ো হয়েছেন। আলমারি, র‍্যাক ও গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রগুলোর ডাঁইয়ের আড়ালে খোপ-খোপ পরিবেশে কে কোথায় নিঝুম গবেষণায় বোঝা যায় না। দণ্ডপাট ভাবলেন 'স্তব্ধতা বজায় রাখুন' সতর্কটি না থাকলে ভল্যুম তুলে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করা যেত, তার রূপটি চাঁদের পক্ষকালের মতো কেন। পনের দিন আলো, বাকি অন্ধকার। ক' দিন বেশ আকর্ষণীয়, মোহময়ী লাগে মহিলাকে, আবার বেশ কিছুদিন ধরে ম্যাড়ম্যাড়ে, বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের গিন্নি মনে হয় - অনেকটা ঘামাচি-

কাঁধে ঘাম শুকোনো নুনের জেগে ওঠার মতো। মি. দণ্ডপাট ভেতর-ভেতর যতই সজাগ-সতর্ক হচ্ছেন, টেনশনে ডায়রি-কলমটা দ্বিতীয় স্থানে সরিয়ে, জলের বোতলটি নিয়ে ভিন্ন দরজা পেরিয়ে বারান্দার ওয়াটার-কুলারের কাছে গেলেন। চটজলদি খেয়াল হল, এ-ঘরের চেয়ারে-বসা লোকটি গোপন দৃষ্টিতে রিডিং রুমটি ফলো করে চলেছেন। দণ্ডপাট বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করছিলেন, পেছনে গোয়েন্দা লাগানো আছে। হয়তো মাথা ঝুঁকিয়ে একাগ্রে দ্রুত নকল করছেন, ছায়াটা আচমকা সরে গেল। চোখাচুখি ধরা পড়লে, ঝকঝকে দাঁতে কাছে দাঁড়িয়ে যত্নে বলেন, আপনি ? আপনিই জেরক্স করতে পাঠিয়েছিলেন ?

না, ধন্যবাদ।

দণ্ডপাটও সাজানো হাসিটি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেন প্রশ্নকর্তাকে। নিচে জেরক্স-এর সুবিধে জেনেও দেড়বছর রিডিংরুম ব্যবহারের মধ্যে একটি দিনও পাঠান না কাউকে। আসলে দণ্ডপাট বুঝে নেন, আড়ি পাততে এসেছিল।

কুলারে কী মোলায়েম ঠাণ্ডা জল। বোতলের শরীরটা পর্যন্ত আকড়ানো তালুকে আরাম দিচ্ছে। ঘরে চেয়ারে-বসা লোকটির গোঁফ আছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন না। মিচকি হেসে কার্ডটি নিয়ে দরকারি গ্রন্থ বা সাময়িকির নাম লিখে কার্ডটি রেখে দিলেন ড্রয়ারে এবং র‍্যাক ও আলমারির নির্দেশ দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেন। ছোট্ট 'হ্যাঁ' বা 'না' উচ্চারণে মনে হয় একটি শিলাখণ্ড - কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই।

দণ্ডপাট মশাই বোতল হাতে ফেরার সময় ভিন্ন অলি-গলি দিয়ে চলে এলেন। সামান্য সার্বিক দৃষ্টিতে হিসেব করলে সাকুল্যে পাঁচ-সাতজন আছে এখন; তিনটের পর কিছু ছাত্র-ছাত্রী ঢুকবে - শোনা যাবে জুতোর আওয়াজ, টাঙানো নির্দেশ ভাঙার জন্য দুচারবার গুঁফো লোকটার উঠে আসা ইত্যাদি। দণ্ডপাট এই মুহূর্তে বৃদ্ধ টেকো লোকটির নীরব হাসিকে অভিনন্দন জানালেন। অপরাধ ঘটাবার আগের মুহূর্তগুলোয় এ-ভাবেই স্বাভাবিক রাখতে হয় নিজেকে। টেকো লোকটি রিটায়ার্ড, খুবই সাধারণ একজন কলেজ-শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুব সফল ছিলেন না। গোল্লায় যাওয়া বড়লোক ঘরের ছেলে-মেয়েদের গোপনে সম্ভাব্য-প্রশ্ন বিক্রি করতেন। অসৎ উপায় খুঁজতে হয় এ-জন্য। কাগজে একবার ছোট্ট খবর বেরুতে, সাবধান হয়ে গেছলেন। গত আড়াই বছর ধরে উনি নিয়মিত আসেন। প্রচুর নোট করেন, জেরক্স করান তলা থেকে এবং দণ্ডপাটের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের বন্ধুত্ব হতে হতে, বেরিয়ে রাস্তাঘাটেও অনেক কথা হয়। ড্রয়ারে কার্ডভরে-রাখা গুঁফো কর্তাব্যক্তিটি যে আসলে কোনো বিদ্বান-পণ্ডিত নন, এককালের মারকুটে রাজনৈতিক কর্মী, পরিচয়টি জানাতে ভোলে না টেকো মানুষটি। মিসেস দাশগুপ্ত যে একজন ডিভোর্সি, বহু ঘাটের জলখাওয়া এবং ক'মাস ধরে লোকটির খপ্পরে পড়তে চলেছে, নিখুঁত তথ্য দিয়ে দণ্ডপাটকে বোঝান। গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতি, মোট কত অনুদান পায় সারা বছরে, কোন কোন দুষ্টচক্র এখানে বজায় আছে - সব খবর টেকোর নখদর্পণে। কিন্তু মি. দণ্ডপাট বেশ কিছুদিন টের পাননি আসলে লোকটি একজন সফল বশংবদ ও দালাল; ঐ গোঁফওয়ালা ইয়াকুব সাহেবেরই এজেন্ট।

এই ৫২ বছরে দণ্ডপাট তো আর কাঁচা খোকাটি নন। তিনিও জানেন জটিল কাজ কীভাবে

জাদুর মতো ঝুঁকি নিয়েই সারতে হয়। হঠাৎই তিনি পুরনো জায়গাটি বদলে জানালার একদম ধারে, ভিন্ন একটি খোপে গিয়ে বসলেন। মাথার ফ্যানটা ঠিকঠিক ঘুরছে তো -- দেখে নিলেন।

কব্জিঘড়িতে টের পেলেন বেলা একটা এবং আজকের তারিখটি পর্যন্ত। তিনি ভুলে গেছলেন দিন-ক্ষণ। কী ক্ষতি হয় ভুলে গেলে ? মনে মনে একধরনের দার্শনিকতায় নিজেকে স্বাভাবিক বানিয়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু দুপুরে এত ঝিম আলো কেন পৃথিবীর ? জানালায় চোখ ভাসিয়ে দিতেই টের পেলেন সেজেগুজে বেশ মেঘ জমছে। টেরই পাননি এতক্ষণ। চারদিক দম মেরে আছে।

জার্নালটা এতই পুরনো, ন্যাতনেতে সূঁচের মুখ পাতা কেটে গড়গড়িয়ে চলবে কিনা সন্দেহ। এই মুহূর্তে ধোঁকা দিতে একাগ্রে কিছু নকল করে যেতে হবে; দণ্ডপাট জানেন গোয়েন্দারা ছায়া হয়ে র‍্যাকের আড়ালে নিঃশব্দে সরু রাস্তা ধরে চলাচল করবে, যেন ঝড়ের সম্ভাবনায় চারপাশ সামলাবার মতলব করছে।

আপনার চাবি ? ফেলে এসছিলেন ? গুঁফো মানুষটি -- ইয়াকুব সাহেব -- মিচকি হেসে পাশে দাঁড়ালেন। থতমত তাকিয়ে দণ্ডপাট সরি। বলেই হাসলেন। লোকটি অধিক ভদ্রতা ও বিনয় ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস দণ্ডপাট লিখছিলেন পাশে জার্নালটি রেখে। দরকারি কিছু নয়, চিরকুটে মিসেস দাশগুপ্তের উদ্দেশে, ধন্যবাদ, টিক্ মেরে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। একটু জোক্ করছি মনে করবেন। ১. প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা-র থিওরিতে বিশ্বাস করেন ? হ্যাঁ বা না। ২. দক্ষিণের খোপের টেকো অধ্যাপকটি যে দাগি ক্রিমিন্যাল, বিশ্বাস করেন ? হ্যাঁ বা না। ৩. আপনি ১৫ দিন অন্তর সুন্দরী হন ? .... ৪. শুধু এই রিডিং রুমটাতেই কি দালাল স্তাবকরা গিজগিজ করছে .... ? ৫. স্বপ্নের দেশ বলতে সাগরপারের একটা দেশকেই বোঝায় ?....

মি ইয়াকুব চাবিটা রেখে চলে যেতেই দণ্ডপাট হাঁফ ছাড়লেন। ইস্। ভুল হয়ে গেছে। সিগরেট-এর প্যাকেট থেকে ধারালো সূঁচটি আলাদা করা হয়নি। চট করে বাথরুম ঘুরে আসতে হবে। দাশগুপ্তের জন্য ডায়রির পাতাটি ছিঁড়ে গুজলেন পকেটে। ঈষৎ ফ্যাস্ শব্দে একটা ছায়া সজাগ চাউনিতে দু-চারটে খোপ ঘুরে গেল। মানুষ এত নিঃশব্দে হাঁটতে পারে। দণ্ডপাট আজ সামান্য বিচলিত হচ্ছেন। গত ১ মাস ধরে ছোটখাট অপরাধগুলো সজাগ করিয়ে দিয়েছে - কর্তৃপক্ষ সতর্ক। সেই থেকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ লালবাজার, হাজত, কাগজে ছাপা হওয়া। ইয়াকুব সাহেব ঝি-কে মেরে বৌ শেখানোর মতো, বেয়ারা ছোকরাটাকে যখন শোনাচ্ছিলেন, মি. দণ্ডপাট সবে নিচে র‍্যাক সার্চ করিয়ে উপরে উঠে এসেছেন। সামান্য দাঁড়ালেন।

এখন মি: দণ্ডপাট জানালার সামনে সামান্য ঝুঁকে। যেন লিখে লিখে খানিক ক্লান্ত। আকাশ সাজছে-গুছছে। ঠিক নিচে রাস্তায় ঠ্যালা গাড়ির সারি। সবুজ ছড়াছড়া কলা, করোগেটেড টিন কিংবা বড়লোক বাড়ির হাগা-মোতার চিনেমাটির সরঞ্জাম, কোনো নতুন বইয়ের ফর্মার স্তূপ -- ঘেমেচুমে কুলিগুলো নিয়তির বাঁধা পশুর মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে। অজস্র বাস-টেম্পো-মিনি। হর্ণের শব্দে অসহিষ্ণুতা। মুখোমুখি আর একটা চারতলা বহু পুরনো বাড়ি -- চাতালে নাকি বলনাচের আসরে সাহেবসুবোরা আসতেন।

বাথরুমে যাওয়ার আগে জার্নালের নির্দিষ্ট পাতাটি খুঁজে বার করলেন কেবল, পড়ে দেখলেন

না। অপরাধ ঘটাবার আগে দ্রুত একবার চোখ বোলাতে হবে। একটু এলোমেলো ভেবে নেয়া যাক। মি. দণ্ডপাটের মনে আসে এক বৃদ্ধ ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতের কথা, যিনি বহু বছর আগে মিনমিনে গলায় বলেছিলেন, দুর্গা বানানে কেউ দীর্ঘ উ দিলে, কান ধরে একটা থাপ্পড় দেবে। অথচ মফস্বলে 'দূর্গা বিড়ি'-র বিজ্ঞাপন ছেয়ে ফেলেছে। কিছুতেই দণ্ডপাট শুদ্ধাচার ঘটাতে পারেননি। একবার ব্যানার-লিখিয়েওয়ালার মস্ত দোকানে ঢুকে বলেছিলেন -- আপনারাই কালপ্রিট! হ্রস্ব উ হবে দুর্গায়। বিড়ির ধোঁয়ায় শিল্পী তুলি হাতে চোখ কুঁচকে দীর্ঘ চুপ থেকে উত্তর দিয়েছিল, পার্টি যা লিখে দেবে, লিখব মশাই! ... সেখানে যান।

একজন শিক্ষিত, মোটা মতো মানুষ বসেছিল পাশে। বলে দিল - দুটোই হয়। ভীষণ রাগ হয় দণ্ডপাটের। আগবাড়িয়ে দালালি না করলেই কি চলত না ? আসলে শহরে এখন স্তাবক ও দালাল ছাড়া কেউ-ই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। তারাই গণ্যিমান্যি ও শক্তিমান।

বাথরুমের পথে পেছনের খোপে টুং করে চিরকূট-টা বাড়িয়ে দিতে মিসেস দাশগুপ্ত ঘাবড়ে যান। দু-বার মুখের দিকে তাকিয়ে হাতে নিলেন, পড়লেন, গালজোড়া মুহূর্তে কৌতূহলী হল। ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বোঝালেন, ফিরে আসুন, প্রশ্নের জবাব পৌঁছে যাবে।

বাথরুমের মধ্যে প্রথমেই সিগরেট প্যাকেট থেকে তীক্ষ্ণ সূচঁটি বার করে, খানিক পর এলেন বাইরে। বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে সিগরেট ধরালেন, চোখের কোণায় দেখে নিলেন ইয়াকুব-কে। দু-চারজন সাগরেদ নিয়ে ধান্দা-পানির আলোচনায় মশগুল। দণ্ডপাট চোখ তুলে মাঝে মাঝে পুরনো কড়ি-বর্গার ছাদ দেয়াল দেখছিলেন। আসলে, তিনি খুবই স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টায় ব্যস্ত। দু-চারজন সাহেব-সুবোর অয়েল-পেন্টিং জীবন্ত তাকিয়ে আছেন যেন!

যদিও ইয়াকুব সাহেবদের ঘিরে নীরবতা বজায় রাখার কোনো নির্দেশ নেই, মাঝে মধ্যেই সেল-ফোনের উৎপাত। দূরের খোপ থেকেই বাজনা শোনা যায়। দণ্ডপাট ভাবলেন, এইসব মহামান্য প্রতিকৃতিগুলো যখন অতীতে শহরের পথে পাল্কি বা ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন, নিশ্চয়ই রাস্তা সাফ রাকার জন্য সামনে হাঁক দিতে দিতে নেটিভ-রা ছুটত।

ঘড়ি দেখে তাগিদ বোধ করলেন ফিরে যেতে। এরপর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে ঢুকবে কাজ করতে। দ্রুত সিগরেটটি জুতোয় ঘষে, ইয়াকুবদের পাশদিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মিসেস দাশগুপ্তর উত্তরের প্রতি টান নেই এখন; টেকো অধ্যাপকটির পাশ দিয়ে চোখ না-ফিরিয়ে ফের নিজের টেবিলে চলে এলেন। আচ্ছা, খুলে এনে পাতায় চোখ বোলাবে, নাকি চোখ বুলিয়ে খুলবে পাতাদুটি ? উত্তেজিত যেহেতু, বুদ্ধিমান দণ্ডপাট কিছুটা সময় নিলেন। খানিক অংশ পড়েই ফেললেন, হাতে কলম পাশে ডায়রির পাতাটি -- খানিক আগের ছেঁড়া অংশটি ফ্যানের বাতাসে ঘাড় তুলছে। মনে ভাবলেন, এবার থেকে তিনি এই কু-কর্মের জন্য ডবলমূল্য হাঁকবেন। এতখানি ঝুঁকি নিয়ে বুদ্ধিমান গবেষকদের যখন তথ্য ও তত্ত্ব সাপ্লাই দিচ্ছেন, চড়া নোটের গোছা ছাড়া কি চলে ? এতো আর মামুলি পঁচিশ, তিরিশ কি চল্লিশ বছরের কথা নয় -- পৌনে দুশ বছরের কথা।

পাতাটি ছিল একটি প্রশংসাপত্রের রিপোর্ট। দর্পণ-টাইপের নাম; রেয়ার জার্নাল বলা যেতে পারে।

কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক ইস্ট সাহেব - সাগরপারের খাঁটি ধবল চামড়ার - কর্মজীবন ছেড়ে পাকাপাকিভাবে এ-দেশ ছেড়ে বিলাত রওনা দেবেন তাই নেটিভ বিত্তবান শহরবাসীরা কৃতজ্ঞতায় তাঁর মূর্তি স্থাপনের অর্থ তুলছিলেন। হাকিমসাহেব ভীষণ দয়ালু, সুদক্ষ বিচারক। কর্মজীবনে মাত্র ন'টি মূল্যবান ময়ূর-পালকের কলম ভেঙেছিলেন। ফাঁসির বিধানের নিয়ম, হুকমলেখা কলমটি চিরতরে ভেঙে ফেলতে হয়। দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে .... ইত্যাদি।

যে-সব দুর্জন নেটিভদের গলায় দড়ি জুটেছিল, সেই-সব খুনী-ডাকাতদের মধ্যে নীল চাষি, বা তাঁতিদের খেপানোর মানুষজনও ছিল কয়েকজন।

কালে-কালে ক্ষয় পেয়ে পাতাগুলো হলদে মুচমুচে। অক্ষরের কালি খেয়ে-খেয়ে অসংখ্য ছ্যাঁদা হয়ে গেছে বহু স্থানে। লোপ পেয়ে গেছে সঠিক অর্থ। মি. দণ্ডপাট তো এ-জন্যই পারিশ্রমিকের কথাটা ভাবছেন।

"মহামহিম করুণাসাগরসদ্বিচার -- তিমির হর -- মিহির ... সজ্জন ... মানস-রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট-দল-দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত ... ইস্ট নাইট প্রধান বিচারক দোদণ্ডাখণ্ড -- প্রবল -- প্রচণ্ড -- প্রতীপেষু।

কলকাতা নগর নিবাসিগণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম...অষ্টবর্ষ পর্যন্ত সদ্বিচার...এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন... পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানের দিগের বর্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতি বিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদ হইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখভোগে রাখিবেন। অস্মাদাদি...যদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমাদিগের বংশপরম্পরার জ্ঞাপনার্থে অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।...

প্রলিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেষোং স্মরণ কারিকাং।।"

এর ঠিক নিচেই ছিল 'সুখ্যাতিপত্রে স্বাক্ষরকারী'।।

প্রায় দেড়শজনের নাম। সব্বাই দেশ ও সমাজের মাথা। ফার্সি, বাঙালা ও ইংরেজী -- তিন ভাষায় রচিত, চতুর্দিক স্বর্ণমণ্ডিত, মূল্যবান চর্মে লিখিত, বিশিষ্ট নাগরিকদের বহু নাম আজও দণ্ডপাটের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

পুরাতন জার্নালটিতে আরও লেখা ছিল,

"৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ্ জাষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান করেন কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদায় মর্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় আদালত নানকগৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণচিত্রিত দৃতি নির্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজী বাঙালা পারসী ভাষাত্রয় সুরচিত সংকীর্ত্তিপত্র... শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল। ... তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বুল প্রদান দ্বারা স্বহস্তে ভারতীয় প্রথায় আতর দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করেন এবং ১৭ জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) "চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহন" করিয়া "গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহন করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।"

শেষ বাক্যটির ন্যাজের গোড়ায় মি: দণ্ডপাট কেন জানি তারাচিহ্নিত করলেন। তখনই দূর থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সতর্ক হতে হয়; জার্নালটি র‍্যাকে যথাযথ রেখে, তুলে নেয়া পাতা দুটি যত্নে মস্ত ডায়রির কভারের মধ্যে ঢুকিয়ে, উঁকি দিয়ে দেখলেন, মৃদু হাসিতে ১৮ বছরের যুবতীর মতো মিসেস দাশগুপ্ত আসছেন, হাতে স্পষ্ট একটি চিরকূট। উত্তর টিকিয়ে এনেছেন সম্ভবত। দণ্ডপাটের ভয় বা টেনশন ছাড়ল কিছুটা। তখন ডায়রির সাদা পাতায় তারাচিহ্নিত করে ফুটনোটটি লিখতে ভুললেন না... 'বর্তমানে শুধু পীনাস ও চাঁদপাল ঘাট বাতিল হয়ে গেছে।... উড়োজাহাজে সাগর পেরতে এখন যাত্রা করেন সবাই।'

খুব কাছে দাঁড়াতে, মিসেস দাশগুপ্তের শরীর থেকে বিরল গন্ধ আসছিল।

কঙ্কর লাশ

নদীতীরে গতকাল যে-অজ্ঞাতপরিচয় মড়াটি ভেসে এসেছিল পুলিশ কোনো হদিশই দিতে পারল না। এটি হত্যা নাকি স্রেফ দুর্ঘটনা-- শনাক্তকরণ খুবই মুশকিল। পচে, মাছে খেয়ে, জলে খসে দেহটি কিম্ভূত কিমাকার। প্রাগৈতিহাসিক মনে হয়। যেন শত শত বছর ধরে ভেসে এই কূলে এসে ঠেকেছে এবার। কেউ কেউ মন্তব্য করল - কোনো লখীন্দর হবে।

- মানে ?

বিশাল নদীতে মাঝেমাঝেই দেখা যায় মশারি-টাঙ্গানো কলার ভেলায় সাপেকাটা কোনো মৃতদেহ। কোন্ চোখের জলে, কোন্ আশায় কোথা থেকে ছাড়া হয় এগুলো - কেউ টের পায় না। অজানা গাঁয়ের মানুষ এদের বলে লখীন্দর। ঢেউয়ে, জলের দাপটে মশারি ও ভেলা কয়েকদিনের জলযাত্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, মড়াগুলো এখানে-সেখানে তীরে এসে ঠেকলে প্রবল পচা গন্ধ ওঠে। মানুষজন টের পায় এবং বলে - লখীন্দরের মড়া। পুলিশ এ যুক্তিতে নিঃসন্দেহ হল না। তবে?

নৌকাডুবি ? প্রায়ই হচ্ছে ইদানীং। বিশেষ করে তীর্থ এবং মেলা উৎসব থাকলে তো কথাই নেই। খড়ের গাদার মতো মানুষের ঠাসা টাল নিয়ে মোচার খোলাগুলো যখন ঢেউয়ে দোলে কিংবা ভুটভুটি সামান্য হেলে পড়ে, যে-যার উশৃঙ্খল বাঁচার চেষ্টায় যায় তলিয়ে। দশ বিশটা সাঁতরে ওঠে কিন্তু শিশু মহিলারা জলসমাধির হাত থেকে রক্ষা পায় না। সবার নাম পরিচয়ের হিসেব তো থাকে না কিন্তু দুর্ঘটনার খবর থানায় বা চৌকিতে আসবেই। সম্প্রতি পুলিশের হাতে এমন কোনো রেকর্ড নেই।

তাহলে কি প্রত্যন্ত গন্ড কোনো অস্পৃশ্য-টোলায় গণহত্যা ঘটল ? লাশ সরিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে ? বুলেট বা আগুনের চিহ্ন থাকত তাহলে। লোকটা হেসে বলে - থাকলেও কি এতদিনে জলদেবতা ধোয়া-পাখলা করে রাখেনি ?

বহুকালের প্রবাহিনী বিশাল নদীর দু-তীরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ, বর্ণ, গোষ্ঠীর বাস। সংঘর্ষ লেগেই আছে। ফসলের অধিকার থেকে রক্তের পরিচয় - যে কোনো মতলবে গণহত্যা

ঘটে। শবগুলোকে শনাক্তকরণ করা যায় না। কাউকে কাদায় পোঁতে, জলে ফেলে, গাদা করে জ্বালিয়ে দেয়, টুকরো টুকরো ছালায় ভরে অথবা সতীর ৫১ পীঠের মতো, দেহের নানা প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন দেশে। কুড়িয়ে জোড়া লাগাতে পুলিশের পেছন ফাটে। এমন ভুরি ভুরি মামলা আদালতে ধুলো খাচ্ছে। কিন্তু সংকটের সংবাদটাতো হজম করা যায় না। পুলিশ জানবেই। কৈ, এমন কিছু ঘটেছিল ?

পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় না।

তবে এমন একটি সম্ভাবনা যখন মুখিয়া থেকে দারোগাবাবু - সবাই মেনে নিয়ে স্নায়ুচাপ মুক্ত হতে যাচ্ছিলেন যে, হত দরিদ্র চামার-চণ্ডালের পরিবারের সন্তানদের যেমন ঘাট-খরচার অভাবে মুখে সামান্য নুড়োর আগুন ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, এটি তাদেরই একটি নমুনা; কোনো দহে আটকে ছিল, অতি বাসি হয়ে স্রোতে ঠেলে এসেছে এখানে, তখনই উদ্ধবের মুখে কাহিনীটি শোনা গেল। কিন্তু সব শোনা-টোনার পর টোলার সাধারণ মানুষ খানিকটা সহমত হলেও, পুলিশ গেল ভীষণ ক্ষেপে। এবং সন্দেহজনক ব্যক্তি হিবেসে উদ্ধবের ডাক পড়ল থানায়।

এমনিতেই উদ্ধবকে নিয়ে এলাকায় উঁচু জাতদের মধ্যে কিছু টকরাটকরি আছে। সে একবার অর্থবান ভূমিহার পরিবারের কুন্তীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী করে ফেলেছিল। এই গন্ডগ্রামে শস্যের দাপটে প্রেম-ট্রেম সুনজরে দেখেনা মানুষ। আর উদ্ধব জাতে মুচি। যদিও জাতব্যবসা করে না, দুটো পাশ দিয়েছে। কাহানী লেখে কিন্তু ও-সব কে পোঁছে। হাটে বাজারে গাওনা গেয়ে ছড়া কাটে, দু'চারজনের দস্তখত লিখে দেয় মাতৃভাষায় এবং বলে - কৃষ্ণ অর্থাৎ কিষণজি ছোটবেলায় ননী চুরি করে খায়নি। কেন খাবে ? গোয়ালাতো ছিল না, আসলে ছিল কিষাণ!

তো, আগের দিনকাল হলে কুন্তীর বাপ ধন্যু সিং ওকে স্রেফ ভয়সার সঙ্গে জোত লাগিয়ে ভুট্টার ক্ষেত চষিয়ে ছাড়ত। কিন্তু এখন গাঁও-টোলায় সামান্য ঠেলাঠিলি লাগলেই গুলি-বন্দুক বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ, আকবরের লোক, পলিটিশিয়ানবাবু - নানা নকশা শুরু হয়ে যায়। তাই ধন্যু গিয়ে পড়ল মুখিয়ার ঘরে - চাইল বিচার। কুন্তী তার মেয়ে, কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ফিল্মি দেখে, নতুন ঢঙয়ে পোষাক-আশাকে উৎসাহী - তাই বলে সব কিছু মূল্যবোধ বদলায়নি। তেল আর ঘিয়ের ফারাক থাকবেই।

বিচারে উদ্ধবের দুশো টাকা জরিমানা হয় নচেৎ বিশ ঘা লাঠি। উদ্ধব টাকা দিল না, দম্ভ দেখিয়ে লাঠির ঘা সহ্য করে মুখে হাসি-হাসি ভাব বজায় রাখল। ধন্যু সিং এটাকে মনে করল, নিজের জাত আভিজাত্য ও বংশের পরাজয়। তখন বাড়ির উঠোনে উদ্ধবকে টেনে এনে, ধন্যু পালোয়ান দিয়ে মেয়ের ঠ্যাং মুচড়িয়ে আহ্বান করল - চুথিয়া। তোর মহব্বতের যদি এতই জোস থাকে এসে ঠেকা।

কুন্তীর চিৎকার যন্ত্রণায় মা ফুলমতী মায়া-মমতা ও সমবেদনা চাপতে গিয়ে ভয়ে দোতলায় দাঁতকপাটি লাগিয়ে পড়ে রইল।

উদ্ধব এগিয়ে গেল না; মাথা নিচু করে চলে গেল উঠোন ছেড়ে। এই পরাজয় খানিকটা বদলার শান্তি এনেছিল ধন্যু সিং-এর বুকে। এরপর অঢেল পয়সায় মেয়ের চিকিৎসা করিয়েছে

কিন্তু খুঁড়িয়ে চলা থেকে রেহাই পায়নি কুন্তী। বাপ মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছে, কুছ পরোয়া নেই। মোহর ঢেলে মেয়ের সাদি দেবে। যেন আপশোস না করে।

ধন্যু কথা রেখেছিল। এখন খোঁড়া কুন্তীর তিন ছেলেমেয়ে। রাজরানীর মতো মোটরগাড়িতে গাঁওটোলার ধুলো উড়িয়ে রাজধানী থেকে বাপের বাড়ি আসে, দিন চার যেন উৎসব লেগে যায় বাড়িতে। শোনা যাচ্ছে জামাই এবার টিকিট পাবে চুনাওতে। ধন্যু সিং কথা দিয়েছে, ক্ষেতি-জমি দরকার হলে কিছুটা বেচে দেবে, পাশ বাবাজীবনকে করতেই হবে। দেশসেবার চেয়ে বড় গৌরব আর কী আছে।

তো, উদ্ধব নদীতীরের কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে কখন যে মিলেমিশে ছিল নজর রাখেনি কেউ। বর্ষাকালে নদীতীর খুবই দুর্গম - জংলা-ঝোপ, কাদা, কোথাও বুকসমান ঘাস। কিন্তু ভিড়টা কিছুই বাধা মানছে না। অচেনা বাসি মড়াটার শনাক্তকরণই এখন সকলের ধ্যান-ধারণা। মুখিয়া ভেবে নিলেন, উচ্চবর্ণের কাউকে গোপনে গুম করে বদলা নেওয়া হলো না তো ? যদি তাই হয়, হিসেব তবে সাত-দুই। ঘোপেঘাপে, পুলিশের সাহায্যে ইতিমধ্যে সাতজন অস্পৃশ্য পরিবারের কাপ্তেনকে হাওয়া করা হয়েছে এবং বদলায় কে বা কারা নটবর সিং এর গলা নামিয়েছিল ভাদুরিয়ার বিলে। আর এটি যদি তেমন হয়, তবে হিসেব সাত-দুই।

নদী এখানে বিশাল। বর্ষায় যেন ফেঁপে-ফুলে আলিশান হয়ে আছে। ও-পাড় গাছপালায় নীলাভ আবছা হয়ে আছে। শিল্পাঞ্চল ও বড় মোকাম ওদিকে, মাঝে মাঝে দিগন্তে ধোঁয়ার টুকরো দেখা যায়। এ-দিকটা কিছুটা অনুন্নত-- কেবল ক্ষেতি আর ক্ষেতি। ভালো জাতের মোষ পাওয়ার জন্য খ্যাতি আছে মুলুকটার। পক্ষকালের পশু হাটে নৌকা-ভুটভুটি আসে কেনাবেচার জন্য। জলে ভেসে মোষ, সাইকেল, মানুষ যায় গাদাগাদি।

দু-দুটো মোষের পিঠে প্যাংলা চেহারার দুটো ছেলে ডুব ঘাসে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে কৌতূহলী জনতাকে দেখছিল যখন, উদ্ধব মজায় চেঁচিয়ে, 'এটা কঙ্কর লাশ' বলেই খানিক দৌড়ে মোষের পিঠে চেপে ঘাস-জঙ্গলে জলার নির্জনতায় হারিয়ে গেল।

পুলিশের টনক নড়বেই। জিজ্ঞেস করল - কোন হারামি ?

- উদ্ধবুয়া!

- কার লাশ বলল ?

এবার রাষ্ট্রশক্তি নিঃসন্দেহ হল সাক্ষী-প্রমাণ মিলে গেছে। নামটা শ্রবণযন্ত্রে ক্রমাগত রিনরিন করল-কঙ্ক! কঙ্ক। কঙ্ক।

উদ্ধব ব্যাটাকে সহজে পুলিশ খুঁজে পায় না। থানার লোকদের সে বলে- গিরিফতার করবে ? ওয়ারেন্ট দেখাও।

কী আপদ! গ্রেপ্তারের কথা উঠছে কেন ? থানা বা চৌকি ডাকলেই কি তা গ্রেপ্তার হয় ? ওয়ারেন্ট ছাড়া কি থানামুখো হওয়া যায় না ?

উঁহু! উদ্ধব বলে, টৌপি চোদদের বিশ্বাস করি না।

আজেবাজে কথা শুনলে কার খোপড়ি না তেতে ওঠে! হাড্ডি চুরিয়ে না দিলে থানাবাবু দারোগা সিং-এর জ্বালা মেটে না। তবু এ-সব মামুলি শাস্তির দিনে, নিছক একটা মৃতদেহের শনাক্তকরণে কী দরকার মারধোরের। ছটুলালকে তাই বলা হল, শালাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আয় বাবা, কঙ্কটা কে জেনে নেব। বলা যায় না ওপরওয়ালাদের মর্জি কখন কোন বাতাসে ধুলো ওড়ায়! একটা পরিচয় দিয়ে জবাব তো খাড়া করা যাবে ? ডি.সি সাহেব খোদ রাজপুত, কুরমি থানাদারের গাফিলতি খুঁজে পেলে, স্রেফ খতরনক চৌকিতে দেবে ঠেলে। ডাকু এলাকায়। তখন 'সর্দার তোমার নিমক খেয়েছি' বলে রেহাই চাইলে, হাসতে হাসতে জবাব পাবে 'আব গোলি খা'।

অবশেষে ছটুলালই কাঁধে হাতফাত দিয়ে, উদ্ধবকে থানায় হাজির করালো। ভাঙ্গা ঠেকনো চেয়ারে বসার সুযোগ পেল উদ্ধব এবং ফ্রিতে একগ্লাস চা। ওর আশঙ্কা ভাঙ্গিয়ে দেওয়া দরকার। উদ্ধব তবু প্রথম দশ পনেরো মিনিট থানাদারের সামনে নয়-ছয় করল মজার মজার কথা বলে।

রাম নাকি ভরতকে আসলি খড়ম দেয়নি, বলেছিল বানিয়ে নিতে। প্রজারা তাই-ই আসল ভেবে নেবে।

রাবণ নাকি নিজে নয়, গোটা দশেক পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে সীতাকে নিজের পুরীতে আনিয়েছিল!

এতে তো কঙ্কর পরিচয় জানা যায় না। থানাদার ক্রমে লিবারেল মুখোশটি খুলতে থাকলে, উদ্ধব ধরতে পারল লাশের খোঁজটিই মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন সে মুখ খোলে। শর্ত ছিল উদ্ধবের বলার সময় কোনো আল-ফাল প্রশ্ন করা চলবে না।

থানাদার তো ভেতরে ভেতরে উদ্ধবের বেলেল্লাপনায় চরম অপমানিত। বুঝতে দিলেন না। উদ্ধবের কঙ্ক পরিচয় শুরু হল এভাবে, গ্রামীণ দেহাতি ভাষায়।

গ্রামে গুণরাজ নামে ব্রাহ্মণের একটি পুত্র জন্মায়। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ তার পিতামাতার মৃত্যু হয়। বাবা-মা -খাওয়া ছেলে। তখন প্রতিবেশীদের নানা সংস্কার। অপয়া ভেবে কেউ তাকে ছুঁয়ে দেখল না পর্যন্ত। আঙ্গিনায় পড়ে কাঁদে। কেউ কোলে টেনে নেয় না।

অর্ধেক দিন ধরে বেচারা জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছড়াচ্ছিল, বিনা দুধে মৃতপ্রায়, কেউ তাকে কোলে তুলল না। পাছে পিতৃত্ব ঘাড়ে চাপে, কেউ দেখেও যেন দেখতে পায় না! যে জন্মেই বাপ-মাকে খেয়েছে, তাকে কি বুকের দুধ খাইয়ে বাড়িতে আনা যায় ? মুরারি চণ্ডাল এতসব শাস্ত্র-টাস্ত্র জানত না। ব্যাটার আজন্ম কর্ম ছিল, শবের কাঠ জোগানো। চণ্ডালের ছায়া মাড়ালে জাত যায় সবার। সে এসে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিল। নিঃসন্তান, বৌ কৌশল্যা কুড়িয়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার আহ্লাদে আটখানা। চণ্ডাল পাড়ায় উৎসব লেগে গেল। কৌশল্যার দুধ নেই; এ আসে ও আসে - মাই দিয়ে যায়। মাগীর গর্বে আর ত্যানা জোটে না। এভাবেই পাঁচটা বছর কাটল। ছেলের নাম রেখেছিল চণ্ডালিনী, কঙ্ক। কথায় বলে কপালপুড়ির পুত সয় না। চণ্ডাল বস্তিতে বসন্তরোগে মুরারি কৌশল্যা দুটোই প্রাণ হারাল। কঙ্ক অনাথ। লোকে বলল, সংস্কারগুলো কি শাস্ত্রে এমনি-এমনি লেখা হয়েছিল? ফল তো হাতেনাতে। কঙ্কর জন্ম বাউনগর্ভে হলে কি হবে, পাঁচ বছর ধরে চণ্ডালদুগ্ধ আর অজাতের অন্ন খেয়ে পেট ভরিয়েছে! ব্রাহ্মণত্ব থাকল কোথায় ? আশ্রয় দিয়ে জাত-কুল খোয়াতে সাহস পেল না কেউ। তখন পাঁচ বছরের বাচ্চা চোখের জলে শ্মশানে ছাই মেখে মাটিতে পড়ে থাকে, ঘুমোয়, জাগে আবার কান্না করে। ছাই আর অশ্রুতে যেন ছোটখাট ভস্মলোচন।

ব্রাহ্মণ গর্গ ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত, সমাজের অবিসংবাদিত নেতা। খুবই শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। ইক্‌তাদার পর্যন্ত সমাজের নিদানের ওপর রুলিং দিতে সাহস পায় না। তো গর্গ নামাবলী গায়ে শ্মশানের পাশ দিয়ে নদীতে স্নানে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বালকের কান্নায় থমকে দাঁড়ালেন। এমন নির্জন ভয়াবহ স্থানে তো শিশুর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। খানিকটা এগিয়ে কঙ্ককে দেখে বিস্মিত হলেন। ভাগ্যিস শেয়ালে টেনে নেয়নি! নামাবলী দিয়ে ধুলোবালি মুছে, নদীর জলে বালককে চান করিয়ে, হাজির হলেন নিজের কুটিরে। ব্রাহ্মণপত্নী সাবিত্রীদেবী অবাক। লীলা নামে একটিমাত্র কন্যা তার। স্বামীর কোলে বালকটিকে দেখে আনন্দিত।

- কাকে আনলে ?

- মথুরার কৃষ্ণ।

- কী বলছ দিনদুপুরে। ভালোমন্দের ক্ষণ থাকে জানো ?

তখন গর্গর মুখে বৃত্তান্ত শুনে সাবিত্রীদেবীর উচ্ছাসে সামান্য গ্রহণ লাগল। আস্তে জিজ্ঞাসা করল - এর কুল ?

- অজ্ঞাত।

- বংশ।

- ভবিষ্যকর্মে বোঝা যাবে।

সাবিত্রীদেবী উচ্ছ্বসিত হলেন না কিন্তু স্বামীর দৃঢ় ও কঠিন উত্তরে নিশ্চুপ। গর্গের ঘরে শিশু প্রতিপালিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ সমাজও ব্যাপারটা প্রীতির চক্ষে দেখল না। কিন্তু নেতার বিরুদ্ধে সহসা ঘোট বাঁধতে সাহস নেই। কঙ্ক বড় হতে থাকে।

সুরভী নামে একটা গাই ছিল গর্গর, কঙ্ক দুপুরে গোচারণে যেত, বাঁশি বাজাত, আর সকাল সন্ধ্যায় খেলা করত লীলার সঙ্গে। ক্রমে বালক ১০-এ পড়ল। গর্গ দেখলেন এই অজ্ঞাতকুলশীল অত্যন্ত মেধাবী। তিনি কঙ্ককে মুখেমুখে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে থাকলেন। কঙ্কও দ্রুত শিখতে থাকল এবং ছড়া তৈরী করার প্রতিভায় অনেকেই মুগ্ধ হলেন। হেটো মানুষরা তো 'কবি কঙ্ক' নাম দিয়েই ফেলল।

গর্গ তখন নিজের বাড়িতে সমাজের সভা ডেকে প্রস্তাব দিলেন - কঙ্ককে সমাজে গ্রহণ করা হোক।

সভা স্তব্ধ। যেন বাজ নিক্ষেপিত হয়েছে।

- আমার প্রস্তাব, প্রতিভাময় গুণী ছেলেটিকে সমাজে গ্রহণ করা হোক। নান্দু বাউন সব ইতিহাস শুনে জবাব দিলেন - যে ছেলে পাঁচ বছর চণ্ডালের ভাত খেয়ে, তাদের সংসর্গে মানুষ, সেই হতভাগার ব্রাহ্মণত্বের কোনো দাবী থাকতে পারে না।

গর্গ বললেন - যদি তা পাপ হয়, সে ইচ্ছাকৃত করেনি। আপনাদের কাছে মমতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করছি।

- তাহলে মুসলমান এবং গোমাংসে ভক্ষণের পরও, জাতে নেওয়ার দাবী তুলতে পারেন আপনি।

গর্গ চুপ করে থাকেন।

সভায় চাপা গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু গর্গের সরাসরি বিরোধিতায় মুখ খুলতে সাহস পায় না অনেকেই।

- সংস্কার কি পাপ ? একজন প্রশ্ন রাখলেন।

গর্গ বললেন - সংস্কার পাপ নয়। কিন্তু হে পণ্ডিত, বলুন ব্রাহ্মণত্ব কি সংস্কার ? নাকি কর্মযোগ্য ?

- উভয়ত!

- তাহলে কর্মের ভাগ, কঙ্কর প্রতিভাকে বিচার করছেন না কেন ?

- আপনি সমাজপতি হয়ে, কুলের প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে পারেন না।

- কুল তো গর্ভের বস্তু। .... চির অন্ধকার। আর অন্ধকার মানে আলো নেই যে স্থানে। ... নেই এর বিচার কী করে হয় ? বিচার 'আছে' নিয়ে।

যুক্তির জটাজালে অন্যান্য সভ্যরা গর্গর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। ক্রমে যেন সভাভঙ্গ হয়। পরাজয় ও অপমান অহংবোধে দ্বিগুণ ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং গভীর ষড়যন্ত্রে গর্গ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্রমে টের পেলেন ভীষণ একাকী হয়ে গেছেন। ততই তাঁর ক্রোধ বাড়তে থাকে।

কঙ্ক তখন যুবক। সমাজের আলোড়ন তাকে ভাবিয়ে তোলে। আপনি জন্ম-পরিচয়ের কুহেলি কুরে কুরে খায়। বৃষ্টি শুকোতে থাকে এবং গর্গের নেতৃত্ব খোয়াবার জন্য, কঙ্ক নিজেকে সম্পূর্ণ অপরাধী ভাবতে থাকে ।

একদিন কঙ্ক নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে অনাহারে, শুকনো মুখে নিরাশ্রয় বৃক্ষতলে পড়েছিল। কাব্য, সংগীত কিছুই মনের উৎস থেকে উঠে আসে না। যেন চতুষ্পার্শ তাকে ছলনা করছে। বিকেল পড়ে এসেছে। বাতাসে হিমভাব ফুটে উঠছে, পাখ পাখালি ডাকছে গাছে, বহু বেদনা নিয়ে রোদটুকু গাছের মাথায় এমন গুটিসুটি দিয়েছে, যেন এক্ষুণি নিঃশব্দ চোখের জলে গোধূলির মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে।

কঙ্ক তন্দ্রার আবেশে স্পষ্ট দেখতে পেল - তাকে নরককুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, বড্ড ক,ট পাচ্ছে এবং যমদূতরা নির্মমভাবে মুগুর-পেটা করবার জন্য হিহি হাসছে। ঠিক তখনই এক রক্তগৌর পুরুষবর কঙ্ককে হাত ধরে উঠিয়ে বললে - আমার সঙ্গে আইস।

কঙ্ক টের পেল স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষটি স্বয়ং গৌরাঙ্গ। কঙ্ক রাত থাকতে থাকতে গর্গর গৃহত্যাগ করে সে চৈতন্যদেবকে দেখতে ছুটল। কিন্তু নদী তখন বর্ষাশেষের জলে ভীমাকৃতি হয়ে আছে নদীয়ায় পৌছন হল না তার। পথে নৌকাডুবি হওয়াতে কঙ্কর মৃত্যু হয়।

উদ্ধবের কাহিনী থানাদার এবং সিপাইরা নাকচোখ কুঁচকে শুনছিল। একজন ফস্ করে জিজ্ঞেস করে - চৈথ্না দেব কৌন ? উদ্ধব জবাব দেয় না।

- ওর কাছে কঙ্ক যাচ্ছিল কেন ? মাদারচোদ কি বড়িয়া লিডার ? এবারও উদ্ধব নিরুত্তর।

কেবল থানাদার ভাবছিলেন, এতো পুরানো কাহিনী। লাশ কি যুগযুগ ধরে জলে ভেসে বেড়ায় ? উদ্ধবের মতলবটা কী ? কী বোঝাতে চায় ?

পুলিশ এবারও নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

অটুট মাস্তুল

ইভান প্রমথনাথ গোমেজ মধ্যরাতে স্পষ্ট দেখলেন মিহি জ্যোৎস্নালোকে দূর নদীর জল থেকে লোকটি ধীরে ধীরে গীর্জার পেছনের মাঠটি ধরে নির্জন সমাধির দিকে এগিয়ে গেল। জানলাপথে তিনি স্পষ্ট দেখলেন। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধের চোখে ঘুম নেই কতদিন। সুতরাং এটা কোনো সুপ্তির চটকা নয়। এর দুদিন পরই বড় উৎসব তাদের, পুণ্যবান ছাড়া এ-সব ঘটনার মুখোমুখি সাধারণ মানুষ হতে পারে না। প্রমথনাথ ভীষণ উত্তেজিত । বাকি রাতটুকু প্রতিদিনের মতো ক্লান্ত, একঘেয়ে বোধ হল না।

পাশের বিছানায় দশবছরের পঙ্গু রোগিনী নিরুপমা - প্রমথনাথের স্ত্রী -- ঘুমোচ্ছেন মুখে যন্ত্রণার ছাপ নিয়ে; অবিবেচনায় তাকে দুবার ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন - নিরু, তুমিতো বিশ্বাস করবেনা ... কী দেখলাম বলোতো ?

নিরুপমা অসহায়ের মতো মৃদু আর্তনাদে বলেন -- ঈশ্বর, মরণ ভালো এচেয়ে ... সবে পাতাজোড়া লেগেছে ... তুমি কী গো ?

প্রমথনাথ দুঃখিত বোধ করলেন। কিন্তু সারাজীবন স্বামীকে অবিশ্বাস করেছে নিরু, পাদ্রি দা ক্রুজ- এর সেই সৈনিক-বন্ধুটিকে নাকি দেখেননি তিনি। ওটা ওনার ঘোর। সে কি আজকের কথা! তাই উৎসবের দুদিন আগে, নির্ঘুম রোগী ইভান প্রমথনাথ স্পষ্ট নদীর জল থেকে উঠে আসা মানুষটিকে দেখে উত্তেজনা চাপতে পারলেন না।

স্ত্রী সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন - একটু চোখ বোজাও, কাল উঠবে কী করে ?

- ঈশ্বর! সন্দেহ মানুষের শান্তি নষ্ট করে!

- আচ্ছা বাবা সন্দেহ করছিনা, দয়া করে চুপ কর!

প্রমথনাথ জানলাপথে গীর্জার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফিকে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল ওখানে যারা চলাফেরা করছে এখন, পরিচিত পৃথিবীর কেউ নন। প্রমথনাথ চিন্তার মধ্যে নিত্যদিনের পরিচিত মাতা মেরীর মূর্তিটিকে দেখে নিলেন। ওটি গীর্জার মধ্যেই আছে।

পরদিন বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও প্রমথনাথের রহস্যময় অভিজ্ঞতাকে বিশেষ পাত্তা দিল

না। উনি বুঝিতেই পারছেন না, এত নিরুৎসাহ উদ্বিগ্নতার মধ্যে উৎসবের আয়োজন চলছে কেন টুকটাক। মরুকগে। ইদানীং প্রমথনাথ ছেলে-মেয়ে-ছেলের বউ-নাতি, কারও চলাফেরা, ধ্যানধারণার সঙ্গে আপন মূল্যবোধ খাপখাওয়াতে পারেন না। চিরকালের অন্তর্মুখীন মানুষ, বুঝতে দেন না নিজেকে।

সকালটা বেশ ঝলমল করছে। তাদের বাড়ির চারপাশে বহু কারিগরের বাস। সকাল হলেই ধোপাপট্টি থেকে গাধাগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়। ওদের মুখ দেখলেই প্রমথনাথ ভাবেন, জীবগুলো এত বিষণ্ণ কেন প্রাণীজগতে ? আলো বাতাস কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানের কোনো প্রভাবই নেই এদের ওপর।

প্রমথনাথ লক্ষ্য করলেন, গীর্জার দিকে কিছু লোকজন চলাচল করছে বটে, উৎসবের মেজাজে নয়, কিছু যাচাই করতে চলেছে যেন, কি ু ঘটেছে নিশ্চয়!

— বৌমা ?

মাধবী বল্ল - ডাকছেন ?

— তিপুর স্কুলে কেক যাবে না ?

— ফি বছরই যায়।

— আজই যাবো তো ? ... কালতো বন্ধ! ... কে যাবে ?

— দেখি!

ছোট্ট দায়সারা জাবাব দিয়ে মাধবী রান্না ঘরের দিকে গেল। ছেলে উৎপলের চান হয়ে গেছে, খেয়েই ছুটবে। সে একটা ফ্যাকটরির কেমিষ্ট। কে যেন বাইরে থেকে 'ইভান দা' আছেন ডাকতে, উৎপল তোয়ালেটা গায়ে দিয়ে সদর দরজার কাছে গেল।

— কে ডাকছে নীলিমা ? প্রমথনাথ কৌতুহল চাপতে না পেরে, তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মেয়েকে জিজ্ঞেস করে। সে শুনতে পায়নি গোছের ভাব দেখিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল এবং মাধবীর সঙ্গে খানিকটা নিচুগলায় কথাবার্তা বলে, সদর দরজার চাপা উত্তেজনার উদ্দেশে বলল - সাতটা চল্লিশ হয়ে গেছে! সময়ের সতর্কতাটি দাদার জন্য। প্রতিদিন আটটা পঁচিশে বড় রাস্তায় চার্টার্ড বাস আসে।

বড় উৎসবটি কাল। প্রমথনাথ ভাবলেন গতবছর কেক বানানো, কেনাকাটা, উপাসনা এবং বাড়ি বাড়ি পাঠানোর কী কী ত্রুটি হয়েছিল। এ-বছর শোধরাতে হবে। মনে পড়ল, তিপুর স্কুলে পাঠানো কেকের পরিমাণ কম থাকায় অফিস ও চতুর্থশ্রেণীরা যৎসামান্য টুকরো পেয়েছিল। উৎপলের অফিসের চার বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল -- মাংসে ঝাল বেশি থাকায় দুজন মুখ শাঁ শাঁ করেছিল, এবার বউমাকে ব্যাপারটা ধরিয়ে দিতে হবে। মেরীর প্রসব-আস্তাবলটায় বেশ সুন্দর টুনির মালা এবং আলোর কসরৎ ছিল। ঐ ছোকরাটাকেই ডাকতে হবে এবারও।

— তিপু। হঠাৎ দাদু ডাকতে, তিপু বিরক্ত বোধ করে। তার এবার উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল। টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্টভালো হয়নি, অভিভাবকের ডাক পড়েছে, মুচলেকা দিলে তবেই ছাড়পত্র। সে মিথ্যে সাজানো অভিভাবকটি সম্ভাব্য কে কে হতে পারে ভাবছিল।

— ও তিপু ?

— কেন ?

— টিচার-স্টাফ মিলে এ-বছর কত তোমার স্কুলে ?

— বুক লিস্ট দেখে নাও।

— গত বছর শুনেছিলাম কেক কম পড়েছিল ?

— জানি না।

— নতুন কেউ কেউ ঢুকলে হিসেবটাতো নতুন করে বানাতে হবে।

ইতিমধ্যে মাধবী এসে 'কী বাবা' ? জিজ্ঞেস করে কেক সমস্যাটা জানতে পেরে, ছোট্ট জবাব — ভাববেন না আপনি!

এমন নিষ্প্রাণ দিন বহু বছর বোধ করেন না প্রমথনাথ। অথচ গতরাতেই তিনি অমন একটি পুণ্যময় দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছেন।

উৎপল শুধু অফিস বেরুবার সময় তিপুকে বলে গেল - কোনো ঝামেলায় জড়াবেনা। ... আমি সকাল সকাল ফিরব। পুলিশ আসতে পারে!

দিনের আলোয় গীর্জাটিকে মনে হয় পুরনো পাকাগাঁথুনিতে সুদূর ইতিহাসের কিছু গন্ধ লেগে আছে। কারুকার্য দেখলেই বোঝা যায় ভ্যাটিকানের অনুসরণ করেছে। সব কিছুই ধ্রুপদী। ক্রশ, ঘড়ি, চূড়া, খিলান, হলঘর - সব কিছুতেই চুপচাপ নীরব গাম্ভীর্য। পেছনে অনেকটা জমি- একেবারে নদীঘাট পর্যন্ত নেমে গেছে। একসময়ে প্রাচীর ছিল, এখন চলাচলের পথ, ঝোপঝাড়, মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সন্ধানে - রাত বিরেতে কেউ আসে না। কেবল উৎসবের দিনগুলোয় সমাধি, ঘাট, চত্বর-এর ঘাস-ঝোপ-ধুলো-পলাস্তরা পরিষ্কার রাখার নিয়ম। উৎসবের মধ্যরাতে ঘন্টাধ্বনি নদীর বাতাসে বহুদূর চলে যায় আজও।

ইভান তপন গোমেজ-এর স্কুলতো উৎসবের আগের দিন পথ চেয়ে থাকে, কখন উৎপলবাবু আসবেন। ইদানীং তপনের পিসিও আসে। বাড়িতে বানানো আসল কেক-এর স্বাদ ওরা গোমেজদের পরিবার থেকেই টের পেয়েছিল।

প্রমথনাথ খুবই সুভদ্র। পাঁচ কি চার পুরুষ আগে এখানে এসেছেন। খুঁটিয়ে কুলজি-পঞ্জী বলতে পারেন না। সম্ভবত এসেছিলেন নীলকুঠিতে চাকুরি নিয়ে। সে যাক পুরনো কথা। গত দশ বছরে কী বিপুল পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে। প্রমথ গোমেজ পাদ্রীদের নিষ্ঠার অভাব থেকেই ধরতে পারেন। যে-ভাবে নদীর ভাঙ্গন এবং অধিকারের জোর কমছে, - ইটকাঠ পাথর শেষ অবধি টেঁকে কিনা সন্দেহ। অথচ চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘরের শোক, আনন্দ কিংবা মিলনের মুহূর্তগুলো এখনো নির্ভর করছে পাদ্রীদের ওপর।

প্রমথনাথ মানুষটি খুবই সাধারণ ও নির্ঝঞ্ঝাটের। করে-কম্মে খাওয়ার মতো সাধারণ লেখাপড়া। পাটকলের হিসেব রেখেছে সারাজীবন, অসাধু উপায়ে দু-চার পয়সা কামানোর চেষ্টা করেনি। ডালভাত, আলুকুমড়ো এবং কৈ ল্যাটা পুঁটি খেয়েই বড় হয়েছেন। কোনো বিপদের আশঙ্কায় বুকে

কাঁধে ক্রশ এঁকেছেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটু আধটু মনোমালিন্য ঘটলেও কারো সর্ব্বনাশের চিন্তা নেই। মেঘজলবৃষ্টি কিংবা নিদাঘ বৈশাখের তপ্ত হওয়ায় বেল শেফালী বা কনক চাঁপার ভেসে আসা গন্ধে কোনো বড় ভাবনা আসেনি প্রমথনাথের। উৎপল বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি করছে। নাতি তপুটাও বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে। দাদু প্রায়ই বলে - দরকার পড়লে স্কুলে স্যারদের কাছে যাবে।

একটু আধটু খেতে ভালোবাসেন। নারকেল, তাল-ভাজা বড়ায় জিভটি এখনও সুড়সুড় করে।

উনি বিশ্বাস করেন সবার অন্তরেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। মানুষ জন্মেই পাপ ও পুণ্য - দুটি ঘরেই গঙ্গা-যমুনা খেলতে খেলতে যায় স্ত্রী নিরু যে পাকাপাকি পঙ্গু হবে - এটাই তাকে ধন্দে ফেলে দেয়। উৎপল মায়ের জন্য মুঠোমুঠো টাকা খরচ করছে। এখন তো কবিরাজি চিকিৎসা চলছে। মাঝে মাঝে ভাবনায় তন্ময় হলে, হঠাৎ গোপনে কী ভেবে যেন উনি ক্রশ আঁকেন। পঁচাশিটা বছর এভাবেই কাটল।

অন্তত পাঁচজন ফাদার-কে তিনি নামধাম ঠিকানাসহ মনে করতে পারেন, এই গীর্জাটায় যাঁরা সার্ভিস দিয়ে গেছেন। তবে এখন প্রমথনাথ উৎসব ছাড়া গীর্জাটায় যান না। কুলোয় না শরীরে। বিশেষ করে নির্ঘুম রোগে ভুগছেন বেশ কিছু বছর। ফাদার রডরিগ্স্ নাগাল্যাণ্ড থেকে বছর তিনেক ছিলেন। ভালো বাংলা বলেন, পান খেতেন খুব। প্রমথনাথের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়েছিল। ওনার উপস্থিতিতে প্রমথনাথ মনের ভেতরে অদ্ভুত শক্তি পেতেন। এবং এই ফাদারের কাছে গল্প শুনে ইভান প্রমথনাথ এক রাতে নদীর জলে আলোড়ন দেখতে পেয়েছিলেন। তখন রডরিগ্স্ চলে গেছেন। কিন্তু যাদুময় প্রভাব ইভান প্রমথনাথের মন থেকে যায়নি।

নীলিমা হঠাৎ এ-ঘর এসে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবীটা রেখে বলে গেল - কাল এটা পরে প্রার্থনায় যাবে।

ছোট্ট তৃপ্তি প্রমথনাথের শিরা-উপশিরায় বয়ে যায় - আমায় কেন ? ... রঞ্জুর (উৎপলের) বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে না কোনো দিন।

নিরু পাশ থেকে বলে - হয়েছে থাক। দুটো দিন কুলুপ আটো তো।

- সংসারে ছেলেপুলেরা এ-সবে খুশি থাকে।

- দিনে দিনে তুমিই তো বেশি ছেলেপুলে হচ্ছ।

প্রমথনাথ স্ত্রীর মন্তব্যে হাসেন। মধুর হাসি। যেন অনির্বচনীয় সুখদুঃখের হাসির মধ্যেই সংসারটায় দিনরাত তৈরী হয়ে চলেছে।

ফাদার বলেছিলেন - পবিত্র আত্মায় নিশীথ নির্জনে কেউ অপেক্ষা করলে মেরীকে দেখতে পাবে কারণ এই গীর্জার পবিত্র মাতা জীবন্ত।

এরপর ফাদার প্রমথনাথকে একটি অলৌকিক বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন এবং ইভান প্রমথ বৃদ্ধ বয়সে সামান্য বেদনাবোধ করেন, তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তেমনভাবে বোঝাতে পারেন না

পরিবারের সদস্যদের। ঐ গাধাগুলোর মালিক দুচারজন ধোপা, রিক্সাওয়ালা রামু, মুদিদোকানের ভানু যাদবরা অবশ্য প্রমথনাথের কথা বিশ্বাস করে। তারা অবশ্য মেরী নয়, চাক্ষুষ দেখেছে গাধার পিঠে শীতলাকে ।

সে-কথা যাক। গীর্জার বালক যীশু ও মাতা মেরীর মূর্তিতে যে বহু মানুষ আরোগ্য ও মনস্কামনা পূর্ণ করেছে - এ বিশ্বাস অঞ্চলের যে-কোনো মানুষের আছে। কিন্তু প্রমথনাথ স্বয়ং মেরীকে দেখেছিলেন - জীবনে একবার। রডরিগ্‌স্‌ বিদায় নেবার মাস তিনেক পর। ফাদার বলেছিলেন, গীর্জাটি খুবই পুরনো এবং নদী তার চেয়েও পুরনো। বিদেশী বণিকরা এটি তৈরী করেছিল এবং দিল্লীর বাদশা একবার যুদ্ধে জয়লাভ করে গীর্জাকে ধ্বংসও করে দিয়েছিল। তারপর বহু কেরেস্তানকে বন্দী করে নিয়ে যায় আগ্রায়। এমন কি তৎকালীন পাদ্রী দা' ক্রুজকে নিয়ে বাদশার আদেশ উন্মত্ত একটা হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হয়। মেরীর কি অদ্ভুত লীলা, হাতি তাঁকে পদপিষ্ট না করে শুঁড়ে তুলে আদর করতে থাকে। বাদশা দেখে ভয়ে দ' ক্রুজকে ছেড়ে দেন, উল্টে বহু ব্যয়ে গীর্জা ফের মাথা তোলে।

রডরিগ্‌স্‌ বলেছিলেন - এজন্যইতো সেই থেকে 'ডোমিংগো দা' ক্রুজ' উৎসব গীর্জায় হয়ে আসছে। ছোকরা-পাদ্রীরা জানে ? দেখবেন আমি চলে গেলে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

উনি একটি কাহিনী বলেছিলেন, শুনে প্রমথনাথের লোম খাড়া। গল্পটি যে খাঁটি সত্য, তাতো প্রমথনাথ চাক্ষুষ মেরীকে দেখেই বুঝেছিলেন এবং গত রাতে নদীর জল থেকে উঠে আসার ঘটনাটা।

রডরিগ্‌স্‌-এর গল্পটা এরকম।

এই গীর্জায় বর্তমানে মাতা মেরীর যে মূর্তি, আগে তা বিদেশী সৈনিক নিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধে যেতে হত। পাদ্রী দা' ক্রুজ এবং তাঁর এক বণিক বন্ধু, গোমেজ মূর্তিটির খুবই অনুরক্ত। বাদশার আক্রমণের সময় মূর্তিটির সরাসরি লাঞ্ছনার সম্ভাবনায় বণিক গোমেজ ওটিকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু জলরাশির প্রবল স্রোতে কারও কোনো সন্ধান পাওয়া গেলনা। ক্রুজ অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে গোমেজ ও মূর্তির উদ্ধারের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে দূর দূরান্ত থেকে দানের অর্থে গীর্জার সংস্কার চলতেই থাকে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসছে, এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাতে গীর্জার সামনে শান্ত নদীর জল ভীষণ আলোড়িত হয়ে উঠল। পাদ্রী ক্রুজ ঘুমিয়ে ছিলেন। অস্বাভাবিক আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনতে পেলেন যেন বহুকাল আগে জলে বিসর্জিত বন্ধু গোমেজ তাঁকে ডাকছে। পাদ্রী দ্রুত মশারি তুলে জানলায় ছুটে এলেন। আশ্চর্য। স্পষ্ট দেখলেন মিহি চাঁদের আলো পড়ে নদীর একটা অংশ যেন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে এবং স্পষ্টই একটি মনুষ্যছায়া ক্রমাগত গীর্জার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু খানিক পরই, সব কিছু গেল মিলিয়ে। কোথায় মানুষের ছায়া, কোথায় কি। নদীর সেই অংশটি স্বাভাবিক অন্ধকারে বিপুল জলরাশি নিয়ে পড়ে রইল।

পরদিন পাদ্রী দা' ক্রুজ দেখলেন গীর্জার চত্বরে অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষরা দলবেঁধে বলাবলি করছে 'গুরুমা এসেছেন'। পাদ্রী এগিয়ে দেখলেন, আশ্চর্য। প্রিয় মেরীর মূর্তিটি ফিরে এসছে।

যেদিন এই মূর্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিন অকস্মাৎ একখানি বড় জাঙ্ক অর্থাৎ বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ গীর্জার ঘাটে উপস্থিত। জাহাজের গ্রোমেল বল্লেন যে তাঁরা সমুদ্রে প্রবল ঝড়ে পড়েছিলেন; জাহাজ রক্ষায় অন্য পথ না পেয়ে মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা ও মানত করেন যে তিনি যেন কৃপা করে জাহাজটিকে কোনো নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দেন। কিছু পরে ঝড় থামলে গ্রোমেল সবিস্ময়ে দেখতে পান যে জাহাজখানি এই গীর্জার ঘাটে এসে লেগেছে। নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগ দেয় এবং মানত রক্ষার জন্য গ্রোমেল জাহাজ থেকে একটি মাস্তুল খুলে গীর্জায় উপহার দেন। সেই থেকে ঐ উৎসর্গীকৃত মাস্তুল গীর্জার প্রাঙ্গণে শোভা পাচ্ছে। দীর্ঘকাল, প্রায় তিন-চার শতক ধরে ঝড়-জল-রৌদ্র মাস্তুলের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

তো, ইভান প্রমথনাথ গোমেজ বৃদ্ধ বয়সে, নির্ঘুম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় একরাতে মেরী-কে স্পষ্ট দেখেছিলেন; গত রাতে উৎসবের আগে নদীর জল থেকে দেখেছিলেন একজনকে হেঁটে আসতে।

উৎসবের সকালে শীত ও টাটকা রোদে প্রমথনাথ যখন রোমাঞ্চিত, বাড়ির সদস্যদের নিঃশব্দ উদ্বিগ্নতায় সামান্য বিরক্ত বোধ করেন। নিজের চেষ্টায় স্নানাদি সেরে নতুন পোশাকে গেলেন উপাসনায়। বুঝলেন, কিছু গোলমাল হয়েছে এখানে।

শুনলেন মাস্তুল পরশু রাতে কে বা কারা চুরি করেছে, যেটি নাকি নানা ঝড়-জল-রোদে চারশ বছর অটুট ছিল। তিনি আরও শুনলেন, কে বা কারা মাস্তুলটির শরীরে গোময় লিপে, কেটে টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ছড়ানো ভস্মগুলো বাতাসেউড়িয়ে বলেছে- নিজের দেশে যা। ইভান প্রমথনাথ গোমেজ শরীরের রক্তস্রোতে বড় একটি ধাক্কা খেলেন। মাটি-বাতাস-মেঘ, শিউলি-বকুল ও ডাল-ভাত-ল্যাটা মাছের শরীরে একটি সন্দেহের গজাল কে যেন ঠুকে ঠুকে মর্মমূলে গাঁথছে। অলৌকিক জাহাজের গ্রোমেলকে তিনি স্মৃতিতেও আনতে পারেন না। কী তার নাম ছিল ? ছিল কিছু ? কোন বিদেশে তার ঘর ?

ইতিমধ্যে, আজন্ম পরিচিত ধোপা পাড়ার কয়েকজন, দু তিনটে গাধাকে পিঠে বোঝার দায়িত্ব দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল পেছন পথে। খুবই নিয়মনিষ্ঠ ভাবে।

কুদবানের উপস্থিতি

অনেক উঁচুতে, মিনারের মাথায় সুলতানকে উঠিয়ে আনা হলে, বিস্তীর্ণ দিগন্ত দেখে তাঁর মনে এই ভাবনাটিই জন্মাল 'আহাঃ! সর্বশক্তিমান আল্লা এ বিপুলরাজ্য ও শাসনদন্ডকে চিরস্থায়ী করুন', কিন্তু হঠাৎ সব কিছু ভুলে একটি প্রাণবধের হুকম দিলেন কেন -- টের পেলেন না। আল্লা রসুলের কথা স্মরণে এল না। তীব্র রক্তচাপে চোখমুখ লাল, গালের মাংস অসম্ভব কাঁপছিল। এমনি তাঁর কলজেটা পর্যন্ত সহানুভূতিতে সামান্যও ভিজল না মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ 'আ-ল-লা!' ক্রন্দন টুকু শুনতে পেয়ে।

উচ্চতায় মিনারটি ৬৫ফুটের মতো। সবে নির্মাণ শেষ হয়েছে। রাজমিস্ত্রী কুদবানের পূর্ব পুরুষ ছিল হিন্দুকুশের পশ্চিমে কোনো একটা অঞ্চলের প্রায় - যাযাবর জাতি; ঘোড়ার পিঠে লুঠপাঠ ছাড়া অন্য কিছুতে যাদের মন বসতো না। কিন্তু এখন কুদবানকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে -- হুজুর, সাকিন মোরগাঁ।

-- বংশ ?

-- জোলা। অপভ্রংশ প্রাকৃতে চলতি বাংলায় জবাব দেয় সে। গৌড় নগরের ছ ক্রোশ দূরে তার বাস। অধীনে প্রায় একশ মজুর এই ৬৫ ফুট উঁচু স্তম্ভের কাজে বেশ কয়েকটা রবিউল মাস কাটিয়ে দিয়েছে। দুর্গ এবং বড় মসজিদটা থেকে দূরে নির্জনে মজুর মিস্ত্রিরা ছাউনি গেড়ে পড়ে আছে কয়েকটা হিজরা।

আজ হাওদায় চেপে সুলতান যখন উজির-মোল্লা-পাইক সহ হাজির, নির্জন এলাকাটা সানাই-দগরের আওয়াজে গমগম করছে। প্রথম মিনারের মাথায় উঠবেন সুলতান, উদ্বোধন হবে। শুভদিন ও ক্ষণ গণকরাই ঠিক করে দিয়েছে। এত উঁচু কান্ডকারখানাটা কেন, নগরবাসীরা অনেকেই জানেনা। যে-সব দুঃস্থ পুরুষ-নারী মসজিদ কিংবা খানকায় দুটি অন্নের জন্য পড়ে থাকে, শীতের আক্রমণে ভোরের শিশিরে মরে থেকে কেউ কেউ কাঠ হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে গুজুর ফুসুর করল, নিশ্চয়ই নতুন মুয়াজ্জিন ওখানে উঠে আজান দেবে। যাদের লোভ পাইকের দলে নাম লেখানো, তারা ভাবলো ওটা নজরদারীর টং। ফের বোধহয় বড় লড়াই বাঁধছে। আসলে মিনারটি সুলতানের

জয়স্তম্ভ। যুদ্ধ জয়ের গৌরব চিহ্ন হিসেবে ক্রমাগত উঁচু হয়ে উঠছে। কিছুকাল আগে বড় একটা বিজিত পাহাড়ি রাজ্যের লুঠেরা সম্পত্তিরগনীমাহ্-র অংশ এর পেছনে ব্যয় হয়ে চলেছে।

উজির খুব ব্যস্ত। আমিরদের মধ্যে উল্লাস। পন্ডিত কায়স্থরাও খুশিতে নানা ফন্দি-ফিকির আটছে। শীতের সবে শুরু। হলতে পাতারা ঝরতে শুরু করেছে গাছগাছালিতে, বিল বা জলাভূমিতে উড়ে আসছে নানা ধরণের পাখি, মাঝেমাঝে চিতাজাতীয় বাঘের উৎপাতে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত। এসময়ে রাজধানীর বন্দর থেকে ছোটছোট নৌকোয় করে রপ্তানীমাল যায় ভাটির দেশে বড় বন্দরে। দালালরা ব্যস্ত। তাঁতি-জোলা, কুমোর গয়লাদের নাইবার-খাইবার সময় নেই। কেবল পিলখানার হাতিরা দল বেঁধে মনের সুখে কাঁচাপাতা খেয়ে বেড়ায় - তীর, বর্শা, বল্লমের আতঙ্ক নেই।

৬৫ ফুট উঁচুতে সানাই দগরের মৃদু অনুভূতি কানে গেলে, কুন্দবান একটা মজুরকে নিচ থেকে মাঝারি আকারের একটা পাথর তুলে আনতে বলল। লিখে রাখবে ফারসি অক্ষরে 'আল্লা সর্বশক্তিমান'। শীর্ষের গম্বুজটি মীনাপাতে কেমন ঝলমল করছে, ছোট্ট খোপের মধ্যে পাথরটি থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

দশমানুষ পরস্পর বেড় দিলেই তবে ধরতে পারবে, প্রায় ৬০ কি ৬২ফুটের মত ঘের। ভেতর দিয়ে প্রায় ৭৩ টি সিঁড়ি ভেঙ্গে তবেই উপরে উঠে আসা যাবে। কদম চূড়ায় গম্বুজটি সদ্য তৈরীর জৌলুসে আলোবাতাস নিয়ে গঠিত মাথা তুলে আছে। মাটি থেকে প্রায় ফুট চল্লিশ, মিনারটি প্রায় ১২টি খাঁজে বহুভূজ আকৃতির এবং বাকি উঁচুটা গোল, বৃত্তাকার। একদম গোড়ায় মাটি থেকে বেদীর মত পাথর-মোড়া। চওড়া সিঁড়ি। ঐ পথে ৬৫ ফুট গঠিত মিনারের মাথায় আলো অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে পাকদণ্ডীর মতো উপরে উঠে আসতে হয়। মাঝে মাঝে খোপকাটা ঘুলঘুলি।

সুলতানের হাতি যখন মিনারের নিচে দাঁড়াল, উনি ঘাড়টি সামান্য পেছনে ঠেলে, আসমানের দিকে তাকালেন। 'আ-ল্লা।' খুশি ও দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভরে গেল। ভক্তিভাবে সর্বশক্তিমানের কাছে নিজেকে তুচ্ছ বানিয়েও, ক্ষমতার অজানা শ্লাঘা বোধ করলেন। নতুন রাজ্যজয় সুলতানকে অতিরিক্ত শক্তি জুগিয়েছে। সৈন্যদের লুঠেরমাল ভাগ দিয়েও, রাজকোষে গনিমাহ্ যা জমাপড়েছে, প্রতিপত্তির ক্ষুধা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। ফিরতি পথে স্বর্ণাদির লোভে কিছু মন্দির ভেঙেছে -- কোনো ধর্মীয় বিরাগ ছিলনা। তাই ফিরেই তিনি জয়স্তম্ভ নির্মাণের হুকুম দিয়ে ক্ষমতাকে স্থায়ী রাখবার চেষ্টা করলেন।

চাঁদোয়ার নিচে সিংহাসনে বসলেন সুলতান। ওটা টেনে আনা হয়েছিল। রূপোর পাত্রে আহারাদি এক এবং অমাত্যদের পরামর্শে ঠিক হল বাছাবাছা চারজন বাহক শিবি ঘাড়ে করে সুলতানকে সরুপথে ৬৫ ফুট উচুঁতে ঠেলে তুলবে।

শিবিরের বাইরে বেশ খানিকটা দূরে দানের প্রত্যাশায় অর্ধোলঙ্গ একপাল মেয়ে সুলতানের জয়গানের উদ্দেশে করুণ সুরে ঘুনঘুন করছে এবং সুলতান উজিরের পরামর্শে কয়েকশ মন ভাত ও গোস্ত বিলিয়ে দিলেন।

এরপর উজির ও অমাত্যশ্রেণীর মধ্যে সামান্য বিতর্ক উঠল। মন কষাকষি তো লেগেই আছে এদের মধ্যে। উজির বললেন - শিবির মধ্যে সিংহাসনটি বসানো যাবে না। জনৈক আমির মামুন শা বিরোধিতা করলেন - তা কেন, সুলতান অতটা পথ কষ্ট করবেন ?

- গালিচার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

- উঁচু, ক্ষমতার আসন না থাকলে, সুলতানের ইজ্জৎ রইল কোথায় ?

- আপনারা কি মিনারের ভেতরের পাকদণ্ডী লক্ষ্য করেছেন ?

- আলবৎ করেছি উজির মহোদয়।

উজির মুহূর্ত খানেক নীরব। ধূর্ত অমাত্যদের এ প্রস্তাবে কিছু ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন যেন। বৃদ্ধ সুলতান জমিন ও আসমানের মাঝে দুর্ঘটনার কবলে পড়বেন না তো ? বাহক চারজনকে অমাত্যরাই কি নির্বাচন করবেন ?

- ভেবে দেখুন, সিংহাসনের অতিরিক্ত ভার যদি দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে ? মামুন শা হেসে জবাব দিলেন - সর্বশক্তিমানের কৃপায় সুলতানের কপালে কোনো মন্দ ঘটা খো নেই। ... আপনি নিজেই বেছেদিলেন না শক্ত সমর্থ চারটে খোজা।

উজিরের মুখে পাল্টা যুক্তি কিছু এল না। এইসব আমির-অমাত্যেরা জায়গির পেয়েছে, অর্থবান, যুদ্ধে সুলতানকে ঘোড়া ও অর্থ জুগিয়ে সাহায্য করে। সুতরাং সামান্য কারণে ওদের চটিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া উজির তো কম ক্ষমতাবান নয়। একটি ক্ষমতা তাই দ্বিতীয় ক্ষমতাকেও মেনে নিতে জানে। উজির প্রস্তাবে রাজি হলেন।

তাই, সুলতান যখন উপরে উঠতে শুরু করলেন, চতুর্দিকে জয়ধ্বনি জাগল। শিবির সামনে-পেছনে বর্শা-বল্লমসহ জনপাঁচেকের দু-দুটি দল চলল। তাদের প্রতিটি সিঁড়িভাঙ্গায় আনুগত্যের প্রকাশ।

এভাবেই শীর্ষে উঠতে, সুলতান বালকের মতো বিস্মিত। আল্লার সৃষ্টি দুনিয়াটা এত সুন্দর ? আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, চারদিকে যতদূর চোখ যায় - সবটা তারই অঞ্চল। একটি হুকুমে যা-কিছু লঙ্ঘন-অলঙ্ঘন ঘটাতে পারে। সুলতান পর্যাপ্ত ক্ষমতায় মাঝেমাঝে ছেলেমানুষের মতো অন্ধ হয়ে ওঠেন যখন, আমির-অমাত্যরা গণ্ডীকেটে বোঝান - আপনার এর বেশি এগনো ঠিক নয়।

সুলতান জানেন সে-সব উপদেশ, কখনো হেলায় উপেক্ষা করার প্রবল জেদ চাপে। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন - আপনারাই সুলতান, না আমি ?

আমিরদের মধ্যে কোনো প্রবীন হাসতে হাসতে উত্তর দেন — খোদাতাল্লার দুনিয়ায়, একজনই সুলতান। ... আমরা সবাই তাঁর গোলাম। সুলতান খুশি হন। মাঝে মাঝে বিরক্তও বোধ করেন। ভাবেন, হুকুমের কোন হাকিম থাকা ঠিক নয়। তাইতো, পরাজিত রাজ্যের তিরিশজন অমাত্যকে গুনে গুনে তিনি শিরচ্ছেদ ঘটিয়ে এসেছেন। ক্ষমা করেন নি।

কুন্দবান আজ বিশ্বাসই করতে পারছেনা, এত নিকট থেকে সর্বশক্তিমান সুলতানকে দেখতে পাবে। সিংহাসনে বসতেই এত উঁচুর বাতাস আতর ও নানা গোলাপ গন্ধে ভরে গেল। কুন্দবান বুঝতে পারল, সুলতান আসমানের এতটা উঁচুতে সিংহাসনে বসতে পেরে, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। হাতির হাওদায় চড়লেই মাটির মানুষের কাছে সুলতান বেশি আনুগত্য পান, তো এতটা উঁচুতে তার স্থানটি দেখে নিশ্চয়ই মুলুকের অধিবাসীরা বিস্মিত হবে।

কুন্দবান হঠাৎ আত্মগৌরবের চাপ সইতে না পেরে গর্বে সুলতানকে বলে -- হুজুর আপনার এই বান্দা এর চেয়েও অনেক উঁচু মিনার তৈরী করতে পারত।

সুলতান উজিরের দিকে তাকালেন। লস্করদের আগে আগে তাকেও সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে আসতে হয়েছে। তিনি দেখছিলেন উঁচুতে উঠলে পতাকা বা ধ্বজা কেমন ছোট দেখায়। বাতাসে শিবিরের কাপড় কাঁপছিল। উজির মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় কুন্দবানের এগিয়ে সরাসরি সুলতানের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা খেয়াল করলেন না।

-- তাহলে তা-ই করলে না কেন ?

সুলতানের কণ্ঠস্বরে উজিরের খেয়াল পড়ে ব্যাপারটায়। দেখতে পেলেন, মুখের পেশিগুলো উত্তেজিত হয়ে লাল মুখটি আরও বেশি উত্তেজনায় সুলতান স্থির তাকিয়ে আছেন কুন্দবানের দিকে।

কুন্দবান সামান্য থতমত খেয়ে জবাব দিল -- আমার কাছে অত মালমশলা ছিল না।

- ছিল না তো আমার কাছে চাইলে না কেন ?

সুলতান ভবিষ্যতে আরও উঁচুতে উঠে তাঁর মুলুক দেখার সুযোগ বঞ্চিত হতেই ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন। টের না পেলে বিষয়টা মামুলি হয়ে থাকত। কিন্তু কুন্দবানের কথায় সমস্ত প্রবৃত্তি সুলতানের একসঙ্গে টানটান হিংস্র হয়ে উঠল। জয়স্তম্ভ আরও উঁচু হতে পারত। পাশের রাজ্য থেকেও দেখা যেত নিশ্চয়। সামান্য একটা মিস্ত্রির অনবধানতায় আটকে গেল ? ফের তিনি হুঙ্কার দিলেন - জানালেনা কেন ?

কুন্দবান এর কোনো উত্তরই দিতে পারল না। সে নির্বোধের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সুলতান ক্ষিপ্ত স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে হুকুম দিলেন - এক্ষুনি এটাকে মাটিতে নিক্ষেপ করো। উপযুক্ত শাস্তি হোক।

সঙ্গে সঙ্গে ছ'সাতজন তরুণ সৈন্য ছুটে এল। কুন্দবান ত্রাহি চিৎকারে ভিক্ষে চাইল কিছু। ধস্তাধস্তির বোবা শব্দ উঠল এবং ভাসমান একটি আর্তনাদ শোনা গেল মাত্র 'আ-ল-ল্লা'।

নেমে আসার পরও সুলতানের উত্তেজনা প্রশমিত হল না। নিচে তখন সানাই দগর বাজছে, চলছে নানা তৎপরতা। ভিখিরিরা আরও কিছু প্রত্যাশায় আল্লাকে সুর করে ডাকতে থাকে। হাতিগুলো জলাভূমির দিকে চলে যায়, পিঠে তাদের বক পর্যন্ত বসতে সাহস পায় না-- মাহুত আছে। ঘোড়াগুলো মনের সুখে ঘাস খায়।

সুলতান উত্তেজনার রেশ টেনে ডাকলেন -- হিঙ্গা!

হিঙ্গা তার প্রিয় একজন খোঁজা, ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একজন। প্রতি রাতে বিভিন্ন ঘরে সুলতান ঘুমোলে হিঙ্গারই দায়িত্ব পাহারার। হিঙ্গা ছুটে এল।

- হুজুর।

- এক্ষুনি মোরগাঁ ছুটে যা।

হিঙ্গা ক্ষমতার খুঁটিনাটি সবই জানে। পলক অপেক্ষা না-করেই ছুটল। ঘোড়ায় উঠতে সে ভীষণ অভ্যস্ত, তবু এই মুহূর্তে দু-দুবার পা পিছলে পড়বার উপক্রম। দামি আরবি টাট্টু দ্রুত ছুটল

প্রান্তর দিয়ে। কিন্তু বর্ষা বিদায় নিয়ে গেলেও, মাঠঘাট শুকিয়ে ওঠেনি। ঘোড়াটা খানিক ছুটেই মন্থর হয়ে গেল।

কুদবানের রক্তাক্ত দলাপিণ্ড দেহটা নির্জনে পড়ে রইল। ওটা উড়ে পড়েছিল শিবিরের বিপরীত পাশে। সুলতান প্রাসাদে ফিলে এলেন। আহার স্নানাদির পর হঠাৎ তার মনে পড়ল হিঙ্গাকে মোরগাঁ যেতে হুকুম তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু উদ্দেশ্যটা বলেননি। এবং মোরগাঁয় পৌঁছে হিঙ্গারও ঠিক এই প্রশ্নটা মনে এল। তখন ক্ষমতার অন্ধক্রোধ ও বিকারের ভয়ে হিঙ্গা ছুটেছিল বটে, খালিহাতে ফিরে গেলেও তো রক্ষে নেই। ইতস্ততঃ ঘোড়া নিয়ে মস্ত বটের ছায়ায় হাঁকডাক করতে হিঙ্গার পোষাক দেখেই গ্রামীণ মানুষরা টের পেল সুলতানের প্রতিনিধির পরিচয়। সনাতন সার্বভৌম্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত। হিঙ্গার কাছে পূর্বাপর ঘটনার বিবরণ শুনে, বলে উঠলেন

- সুলতান নতুন করে মজুর মিস্ত্রি চাইছেন।

তকসিন অর্থাৎ শাসনের সর্বনিম্ন ভাগের তরফদার এসে হিঙ্গার কথামতো মজুর মিস্ত্রি সংগ্রহে নেমে পড়ল।

প্রাসাদে হিঙ্গা যখন সদলবলে হাজির সুলতান বিস্মিত এবং ভারি খুশি। উজিরকে দিয়ে হুকুম দেয়ালেন - যতটু ক্ষমতায় কুলোয় মিনার উঁচু করা হোক। মিস্ত্রি সম্মত হল। ওরা বিদায় নিলে, সুলতানের মনে এল কুদবানকে গোর দেওয়া হয়েছে কিনা। আমিরদের সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন এমন নৈমিত্তিক ভঙ্গিতে যেন বোঝাতে চাইছেন, মাঝে মাঝে গণ্ডি না ছাড়ালে ক্ষমতা কখনই ক্ষমতা হয়ে ওঠে না।

অদ্ভুত স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে মিনার প্রায় ৮৫ ফুট উঁচুতে উঠে থেমে গেল। যুদ্ধের সম্ভাবনায় সুলতান তখন অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত। তিনি খোজাদের কাঁধে চেপে এত উঁচুতে সর্বশক্তিমান আল্লার মুলুকটি দেখবার সময় পাননি। আঁরও ধনরত্ন সম্পত্তির জন্য তিনি সৈন্য পরিচালনা করলেন পশ্চিমের দিকে।

ততদিনে সাধারণ মানুষ জেনে গেছে এটি একটি জয়স্তম্ভ। কিন্তু কুদবানকে কবর দেওয়া হয়েছে কিনা, নিঃসংশয় হয়নি। নির্জন মাঠে তাঁকে ঘুরতে দেখে কেন রাতবিরেতে ?

মিনারের গম্বুজটা কয়েক শো বছরে খসে নিছক প্রত্নতত্ত্ব হলে, প্রচুর জন্ম ও মৃত্যুর পথ ধরে মুলুকের সব মানুষ বদলে যায়। ক্ষমতা গণ্ডি ছাড়ায় মাঝে মাঝে আনুগত্য আদায়ের জন্য কিন্তু মানুষ নিঃসংশয় হতে পারেনা আজও। কুদবানকে সত্যিই কবর দেওয়া হয়েছে কিনা। প্রায়ই দেখা দেয় কেন তালে ?

যাহাদের স্বাধীনতা

প্রায় ৭০ বছর আগে, গাঁয়ের বউ-ঝিরা জানতই না তাদেরই মুক্তির জন্য বিনোদকুমার অন্তরীণ অবস্থায় একটি খুনেরছক কষতে পালিয়ে যাবেন। ওনার আসল নাম কি, ঘনিষ্ঠরাও জানতোনা। কখনো প্রভাত, কখনো শ্রীকান্ত কখনো বা বিনোদ কুমার। তিনি সহসা 'কুমার' শব্দ উচ্চারণ করতে চাইতেন না। কারণ নারীর বাহুপাশে ধরা দেবেন না, শপথই যখন করছেন, যেচে 'কুমার' অলংকারটি আর কেন।

গণ্ডগ্রামের বউ-ঝিরা তখন যার যার খড়ের চালের সংসারে উদয়াস্ত পাকশালায় কাঠের উনুনে ডালে ফোড়ন দিচ্ছে, চলছে ঢেঁকিতে পাড়, মোটা কাপড়ের দীর্ঘ ঘোমটার আড়ালে মাটির দাওয়া লিপছে। তাঁতি, কুমোর বা কামার বাড়ির বউঝিরা খাটুনিতে হাত লাগাচ্ছে পুরুষ পাশেও। নয়তো সতীনের সঙ্গে কলহ-কোন্দল, স্বামীরহাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে কান্না, ফের মধ্যরাতে সলজ্জ মিটমাটের পর খুব সকালে শয্যাত্যাগ- পাছে মুখটিপে কেউ হাসাহাসি করে!

উনি ডেটিনিউবাবু হয়ে কবিরাজ বাড়িতে লতাগুল্ম সংগ্রহ করেন এবং গোপনে হপ্তায় একদিন এগারমাইল দূরের থানায় গিয়ে হাজিরা। গাঁয়েকলেরা-বসন্ত লেগেই আছে; ভয়ে রাত নামলে মানুষ ঘরের দরজা খোলে না। ব্যাটা করম আলির গাফিলতির সুযোগে সারা রাত হেঁটে বিনোদকুমার পরাধীন অন্ধকারে দিলেন পাড়ি।

মধ্যরাত্তিরে চৌকিদার ডাকে - কোবরেজমশাই ? ও কোবরেজমশাই ?

- কে ? করম আলি ?

- আজ্ঞে !

- আবার কে গেল ? কোন বাড়ির ?

- আপনার বাইরের দরজাটা খোলা।... কপাল পুড়ল আমার। হায় আল্লা। অনন্ত কবিরাজ থ। তিনি প্রথম জানতে পারলেন যে বিনোদকে দারোগাবাবু দূর সম্পর্কের শ্যালক সাজিয়ে রেখে গেছেন। আসলে এটি স্বদেশী। এতে কবিরাজের দেশভক্তির চাইতে ভয় হল, আঠারো ঘা উৎপাত। যেন ভবিষ্যতে নেমে না আসে। দারোগা একমাত্র করম আলিকে চুপিচুপি কবুল করিয়েছিলেন

গাঁয়ের একটি পাখিও যেন টের না পায়। চৌকিদার না জানিয়ে দারোগার অনুকম্পা কুড়িয়েছিল কিন্তু কর্তব্য অবহেলার দায় এড়ায় কী করে ? ভয়ে গাঁয়ের পথঘাট ঝিম মারে। কলেরার মৃতদেহরা ভূত হয়ে উড়ে যায়। আঁধারে একা 'জাগো, রাত ভালো না', হাঁক দিয়ে কীভাবে পথ হাঁটে ? গড়িমসির ফাঁকে যে পাখি শেকল কাটবেন, বুদ্ধিতেই কুলোয়নি। ধরিয়ে দিয়ে অনেক ইনাম-বকশিস জুটেছে জীবনে, এক ধাক্কায় সব বুঝি যায়। অবশ্য করম আলি জানে না। বিনোদবাবু কত উঁচু ডিগ্রির ডাকাত।

হাঁটা, নৌকো এবং শেষে ঘোড়ারগাড়িতে যখন বিনোদকুমার রেলষ্টেশনে, মনোরম রোদ-বাতাসে সারা পৃথিবী যেন জেঁকে বসেছে। ছ্যাকড়াগাড়ির চালক একবার পেছনে তাকিয়ে বলেছিল - বাবুর দামি জোতায় এত কাদা ? বিনোদকুমার হেসে - জোতা দামি দেখলে নাকি ? কেট্‌স-এর নাম শোননি ?

- বাবু কি এই দ্যাশের ?

বিনোদকুমার চকিতে জেলার ডায়লেক্টে ছোট্ট রসিকতা করেবল্লেন - মুড়াগাছার চৌধুরি তালুকদারদের কথা হোনোনি ?

- হ একটু-আধটু হুইন্যা থাকছি।

- বড় শরিকের বাড়ির... প্রভাত চৌধুরিকে খোঁজ কত্যি পারে যদি, মোর দেকা পায়া যাবা।... আইলাম ভগ্নিপতির বাড়ি... ভ্যাদোর কাদার দ্যাশ।

- তবে বাবু জুতাখানে বড্ড ভ্যাদোর লাগি গেছে!

বিনোদকুমার ওরফে প্রভাত চৌধুরি নিজের পায়ের দিকে তাকালেন। এমন জংলা কাদা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে চললে কিছুতেই লেপ্‌টে থাকে না।

ট্রেনের টিকিট কেটে ঠিক করলেন ... উঁহু, ঠিক করেই টিকিট কাটলেন, তার ছোটবেলার পুরনো শহরেই নামবেন। অনেক বছর হয়ে গেছে, আজ আর সহসা তাকে কেউ চিনতে পারবে না ওখানে। তারপর, যা কিছু ছক এবং পদ্মাপারের জেলাশহরটিতে। বিনোদকুমার সেখানে পা দেয়নি কোনো দিনই। তার ছোটবেলার শহর থেকেই গুপ্ত ড্যারায় জেলাশহরের অন্দি-সন্দি নিশ্চয়ই বলে দেবে। বন্দোবস্ত করে রাখবে উচ্চতর কাজটি। সিংগল লাইন, দিনে তিন-চারখানার বেশি ট্রেন চলে না। লাল-লাল কাঠের গাড়ি, কয়লা ধোঁয়ায় মেঘগুলো কু-ঝিক-ঝিক মিলিয়ে গেলেও কেমন নির্জন উলুবনের মাথায় পড়ে থাকে।

কবিরাজ লোকটিকে বিনোদকুমারের ভীষণ স্বার্থপর মনে হয়। খানিক নির্বোধও বটে। দারোগাবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সেই গর্বে দিনরাত বন্দোমাতরমওয়ালাদের প্রসঙ্গ উঠলেই নেন একহাত। অথচ, বিনোদকুমারের ওপর ছিটেফোঁটা সন্দেহ করতেই শিখল না। আপন ভাই সেজে নিশিকান্ত যখন কোবরেজ বাড়িতে দেড়বেলা খেয়ে-পরে থেকে গেল, যখন নিশিকান্ত চিরকুটে খবর এনেছিল হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগদিতে, তখনও কোবরেজ নিশিকান্তকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কলিযুগের শেষলগ্নে মানুষ এতই বামন হয়ে বাড়বে, একটা বেগুন গাছের তলা দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে সহজেই। এবং প্রতিটি জন্মান্তরের মধ্যদিয়ে ক্রমান্বয়ে দৈর্ঘ্য খোয়াতে খোয়াতে যাবে মানুষ।

ট্রেনে তিনি বার দুই বিস্মৃত হয়েছিলেন, বিনোদকুমার না প্রভাত তিনি। জীবনে একবারই ধরা পড়েছিলেন, পিটিয়েও মুখ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের উৎসের নাম পায়নি পুলিশ। বিখ্যাত উকিল বরদাকান্তর জন্য জামিন মিলেছিল। নিশ্চয়ই পুরনো শহর তাঁকে চিনতে পারবে না। ইচ্ছে করেই নকল গোঁফটি আজ আর লাগালেন না। কামরায় বেশ কয়েকজন চাষি পরিবার ছিল। তাদের কেউ কেউ কোনো তীর্থস্থান থেকে ফিরছে, একজন দাড়িওয়ালা কাঁচা-পাকা ধুলোট চুলের এক রুগ্ন বৃদ্ধ কামরার কোণে শুয়ে কাতরাচ্ছে। ডান পা-খানা ফুলে ঢোল, রস গড়াচ্ছে। ডাক্তার নাকি বলে দিয়েছে শহরে না নিলে পা কেন, বুড়োটাকেই রক্ষা করা যাবে না। মাছি ভ্যানভ্যান করছে। ঘোমটার আড়ালে নথনাড়া বউটা অসহায় অবস্থায় পুটুলি হয়ে বসে আছে। বাতাসে মাঝেমাঝে দুর্গন্ধ ঐ চাপা পা-খানা থেকে৷ এইসব আনপড় মানুষজনরা জানে না, তাদেরই মুক্তির জন্য জানলার ধারে বসা বাবুটি- বিনোদকুমার - কোমরে একটি পিস্তল গুঁজে নিয়ে চলেছেন। তীর্থ সেরে ফেরা পরিবারটি খুব নিচু গলায় আলোচনা করছিল, ভিটেমাটিতে পৌঁছে যদি টের পায় দাওয়ায় শুকোতে দেওয়া নারকেলের কাঠিগুলো কমে গেছে, তবে নির্ঘাৎ ফটিকের মা যে হাতাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। মামলার আমগাছটি তবে কুড়ুল চালিয়ে নামিয়ে দেবে। লাঠালাঠি হলেও স্বজাতির উৎপাত আর সইবে না। 'ফটিক' নামটি কানে যেতেই বিনোদকুমারের খানিকটা সম্বিৎ ফেরে। কে ফটিক, কোন গাঁয়ের ফটিক ইত্যাদি কৌতূহলের বদলে সজাগ হন ভেবে, তার পুরনো শহরে ফটিক নামে একজন ওয়াচার বা টিকটিকি ছিল। ধূর্ত এবং অসম্ভব বেহায়া। তারই কৌশলে সেবার বিনোদকুমারেরশ্রদ্ধেয় নেতা গোপেন শূর ধরা পড়েছিল নোট জাল করার জন্য। পুলিশ আচমকা হানা দিয়েছিল ড্যারায়, তখন নোটগুলোর একপ্রান্ত ছাপা হয়েছিল। ভাগ্যিস গুরুত্বপূর্ণ প্লেটটি গোপেনদা বুদ্ধিকরে পানা-ডোবায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফটিক! ফটিক কোথায় ? বিনোদকুমার নিস্পন্দ অভিনয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সজাগ হয়ে গেলেন। একমনে তিনি একটি ব্যক্তিহত্যার পরিকল্পনা সারছিলেন।

ট্রেন তাঁর পুরনো শহরে এসে দাঁড়াল। বিনোদকুমার ধারণাটা ফের ঝালিয়ে নিলেন, এতদিন বাদে শহরে তাঁকে কে আর চিনতে পারবে। থলি ও টিনের তোরঙ্গটি হাতে প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখতে পেলেন, যে ওয়াচার বা গোয়েন্দাটি তাকে চিনত, সেই দুরন্ত ফটিক অদূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি একঝলকেই চিনতে পেরেছেন, সুতরাং প্রতিপক্ষ মিস্ করবে না, এমন চকিত নতুন পরিস্থিতির সিদ্ধান্তে তিনি দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে কোথাও মুততে বসলেন এবং ফাঁকে থলি থেকে পরে নিলেন গোঁফটি। একটা নেড়ি কুত্তা তাঁকে ঘিরে ক্রমাগত লেজ নাড়তে থাকলে, উনি পকেটের পাউরুটিটা দিয়েও দিলেন না। ব্যাপারটাই হয়ত সন্দেহজনক হতে পারে। বেশ কয়েকজন লালমুখো রেলকর্মীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল ব্যস্ততায়। নিশ্চয়ই জজ-ম্যাজিস্ট্রেট কেউ এসেছেন গাড়িটাতে অথবা পরেরটায় আসবেন। গাড়িটায় কোনো সেলুন-কার ছিল ? বিনোদকুমার অযথা ভ্রান্ত ভাবনায় না গিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসেই একটা ঘোড়ার গাড়ি ধরলেন। সাবধানতার জন্য, সঙ্গের নির্দেশনামা ও ঠিকানাটাসহ কাগজপত্তরের কিছু অংশ দ্রুত খেয়ে ফেললেন। তিনি ফটিককে সনাক্ত করেই মুততে বসারমধ্যেই ভেবেছিলেন হয়তো পালাতে পারবেন না।

গাড়িটা যতক্ষণ না শহরের ভিড়ে ঢুকছে, বিনোদকুমার স্বস্তিতে ছিলেন না। বলা যায় না, চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে হয়তো ঐ চেহারাটি হেসে বলবে - কিছু খবর আছে ? আমি গড়পাড়

যাব।

আসলে বিনোদকুমার যাবেন গড়পাড়। ওখানে এক বাড়িতে গোপন আঁটঘাটের মধ্যে জেলসুপার লিউক সাহেবের হত্যার ছক চূড়ান্ত করতে হবে। শুধু কোমরে পিস্তল নয়, সঙ্গে ছ'মাস আগের ডাকাতির কিছু টাকার বাণ্ডিল আছে। গিয়েই হিসেব দিতে হবে। গাওদিয়ার পাটব্যবসায়ী ভুবন সাহার বাড়ির ডাকাতির টাকা-গয়না নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সতীশ মুস্তাফির প্রাণদণ্ড হয়েছে। এখনও দণ্ড প্রযুক্ত হয়নি, কারণ সতীশ ফেরার। তাই বিনোদকুমারের বিবেক যন্ত্রণা দিচ্ছিল হিসেবের পাই-পয়সা না মিটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত।

ঘোড়ার গাড়ি শহরের ভিড়ে ঢুকে খানিক ছুটবার পর আচমকা গাড়োয়ান মুখ বাড়িয়ে বলল - বাবু , আমি আপনাকে চিনি। বিনোদকুমার বোকাবোকা হাসিতে অচঞ্চল জবাব দিলেন - সং-যাত্রার লোককে সব্বাই চেনে। ... চালা বাপু, পালার লোক কখন পৌঁছে গেছে।

- আপনি স্বদেশিবাবু না ? ... পুরানবাজারে এক কম্পাউন্ডারের সঙ্গে থাকতেন না ?

সে তো এগার বছর হয়ে গেল। পুরানবাজার অর্থাৎ খানদানি বেশ্যাদের হেলথ চেকআপের কম্পাউন্ডার সুরেশ বলের সঙ্গে তিনি থাকতেন।

- বাবু, একটা পুলিশের লোক আমাকে বলেছে আপনাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যি।

শুনে বিনোদকুমার স্বল্পকাল চুপ করে রইলেন। প্রকৃত জনগণের সঙ্গে তাহলে ওয়াচার বা টিকটিকিরাই সংযোগ রাখে। তিনি শহরে আড়াই বছর কাটিয়েও জানতেন না শহরে মোট গাড়ি ও গাড়োয়ানের সংখ্যা কত। থানার সঙ্গে কী সম্পর্ক তাদের। লাইসেন্স নিয়ে কতপ্রকার হয়রানি হতে হচ্ছে। বাবুরা মত্ত অবস্থায় বাঁধা রেট না ছুঁইয়ে কীভাবে পুরনোবাজারে খানকিপট্টিতে সারারাত হৈ-হুল্লোড় সেরে ফেরে। ঐ গাড়িতেই ওঠে কিন্তু ব্যাচারা ভয়ে রেটের কথা তোলে না। এই গাড়োয়ানটা জানে না বাবুর কোমরে রিভলবার আছে। তাদের ওপর জুলুমের দিন খতম করতেই বাবু চলেছেন জেলসুপারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। ভীষণ কাঁঠালের গন্ধ আসছে। বোধ হয় নদীর ধার - হোটেলে খেতে হাঁক-ডাক দিচ্ছে ছোকরারা।প্রায় সবার মাথাতেই সাদা গোল টুপি। বিনোদকুমার ভাবছেন কী করবেন, গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বলল - আপনি এখানে নেমে চলে যান।

বিনোদকুমার স্থির ও নম্রগলায় জবাব দিলেন - কিন্তু তোমাকে তো পুলিশ হয়রান করবে ?

- আমি বলব বাবু নেমে গেছে। আমি কী করব ? তার কথামতো বিনোদকুমার নেমে সরে পড়লেন। ছোট্ট দোকানে ঢুকে আমসত্ত্ব কিনলেন। একটা বার্ড-সাই সিগারেট ধরিয়ে চারপাশের বাতাসে সুগন্ধি তামাকের ঘ্রাণ ছড়িয়ে, ভিড়ে গেলেন মিলিয়ে। স্টিমারঘাটায় তখন হাঁকাহাঁকি, যাত্রী ও কুলীদের ঠ্যালাঠেলি। তারা টেরই পেল না তাদেরই জন্য বিনোদকুমার এইমাত্র শহরে পৌঁছে গেছেন।

বিনোদকুমার যে-বাড়িটিতে আত্মীয় অতিথি পরিচয়ে শ্রীকণ্ঠ হলেন, মালিক ছিলেন ছোট আদালতের উকিল। খুবই গণ্যমান্য। জাতে কুলিন কায়স্থ। মাধব দত্ত বল্লেন, বিনোদদা, স্বপাক আহার করতে হবে কিন্তু।

- কেন ?

- শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য - খাঁটি বাউন - কায়েত বাড়ি খাবে ?

- ছোটবেলা বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে জাতও ছেড়েছি ভাই। ... অজ রঙ্গ করবার মানে হয় ?

- আপনি ছাড়লেই হবে ? দেশের মানুষ ধরে রেখেছে।...হরদম মক্কেলদের আনা-গোনা। ... যদি স্বপাক দেখে, বিশ্বাস করবে কিছুটা ... নইলে সন্দেহ করবে। ... শহরে বেশ কিছু ওয়াচার জড়ো হয়েছে।

শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য মোটা পৈতে ঝুলিয়ে কাঠের উনুন যখন ঠেলেন, বৈঠকখানা থেকে মক্কেলরা দেখে আর জিজ্ঞেস করে - উকিলবাবুর আত্মীয় বুঝি ?

- শুনলেন ভট্টাচার্য। ... আমার আত্মীয় হতে পারে ? রসিকতা করছেন ?

- তাও তো বটে !

- পারিবারিক গুরুদেবের ছোট ভাই।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আরামে ঘুম দেন শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য। ডেটিনিউ হিসেবে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার জো ছিল ? করম আলি আস্ত এক যমদূত। বকেয়া ঘুম পুষিয়ে নিলেন দু-একদিনে। তারপর, দিবানিদ্রায় স্বপ্ন হাজির হতে শুরু করল। দেখতে পেলেন দেশমাতা সিংহের পিঠে আসীন। অপূর্ব সুন্দরী, প্রহরণ হাতে চতুর্ভূজা এক দেবী। এর মুক্তির জনাই তো প্রভাত ওরফে শ্রীকণ্ঠ ওরফে বিনোদকুমার সংসার ত্যাগ করেছেন, নারী-কে আপন দুর্বলতা ঢাকতে শুধু মাতা হিসেবে বিচার করতে শিখেছেন এবং প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়েছেন দুর্গম পথে। এসব খবর কুলী-গাড়োয়ান বা চাষি-ছুতোর-কুমোর-কামাররা জানে না। গভীর রাতে, অতি গোপন অভিসারের মতো তিনজন আসেন। গুপ্তমন্ত্র পাঠ হয়। ব্লেড দিয়ে দেহ চিরে শরীরের রক্তে তিলক কেটে যে-যার একাগ্রতার পরিচয় দিলেন। তারপর অন্ধকার ঘরে মিটিমিটে আলোতে ফিসফাস কথাবার্তা শুরু হয়।

জেলের ভেতর থেকে বারে বারে খবর আসছিল সুপার লিউক সাহেব সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আসন্ন মুক্তির পথে উনিই এখন বাধা। তখনই খুনের সমস্ত প্ল্যান কষা হতে থাকে। বিনোদকুমার উৎসর্গীত সৈনিকের মতো স্থির ও দৃঢ় মুখচোখে ছক বানাতে থাকেন।

কিন্তু মুশকিল, লিউক নাকি প্রচণ্ড সাবধানী। ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চির মতো লম্বা, চওড়া হাড়ের দেহ, চোখদুটি ঘন নীল কোঁকড়ানো বাদামী চুল এবং ফর্সা কঠিন চোয়াল। লোকটা মোটেই বার হয় না। সারাদিনে একবার শুধু পশ্চিমের আকাশে গোধূলি মুছে যাবে-যাবে হয়ে উঠলে, মোটর চড়ে বড় নদীর পাড় দিয়ে জেলের চারপাশ চক্কর দেন কয়েকবার। বিনোদকুমার বল্লেন - আমি ঐ জেল-শহরে যাব।

- রিস্ক হয়ে যাবে ?

- অ্যাকশনটা করবে সুধীর আর ঐ শহরের স্থানীয় একজন।

- কে ?

- আসলে স্থানীয় ছেলেটি সুধীরকে সাহায্য করবে ।

- কিন্তু তাহলে ...

- এবার প্ল্যানটা পাকা হবে এভাবে ...। বলেই বিনোদকুমার সামান্য হাসলেন। তাঁর উজ্জ্বল চোখ, খাড়া নাকটি ভারি দৃঢ় ও কঠিন মনে হল।

- নদীর বাঁধে বিকেলে অনেক লোক জড়ো হয়। ... কথা বলতে বলতে বিনোদকুমার যেন স্বপ্নের কোনো হেঁয়ালি রেকর্ড করে গেলেন। 'সেই ভিড়ে মিশে থাকবে আমাদের দু'জন অ্যাকশন কর্মী। লিউক কুকুরটা যখন মোটর চালিয়ে ওই জায়গাটার কাছাকাছি আসবে, অন্য তৃতীয় একজন সাইকেল নিয়ে মোটরের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। লিউকের মোটর দাঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ থেকে ছুটে এসে গুলি করবে অ্যাকশনের কর্মীরা।...'

বহুদূরে নদীর বুক থেকে স্টিমারের একটি ভোঁ ভেসে এল। 'শঙ্খ সফেন' শহরের জেটিতে ভিড়তে আসছে। পাশের ঘরে বিনিদ্র লক্ষ্মীশংকর উকিল অনুমান করেন। তাঁর চেম্বারে বহু রাত ধরে আলো জ্বলে, জটিল কেস নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় - পাশের ঘরের আলো দেখে কেউই সন্দেহ করবে না। এই 'শঙ্খ-সফেন' একবার দিক ভুলকরে জেটিতে ভিন্ন একটা জলযানকে ধাক্কা মেরেছিল। এক ইংরেজ দম্পতি গুরুতর আহত হয়েছিল; 'শঙ্খ-সফেন'-এর নেটিভ মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করলে, লক্ষ্মীশংকর লড়েছিলেন বিপক্ষের হয়ে। তাইতো গভীররাতে ঐ স্টিমারের ডাকটি তাঁকে মধুর একটি স্মৃতির দরজায় দিল ঢুকিয়ে।

জেল-শহরে এসে প্রভাত কুমার স্থানীয় অ্যাকশন কর্মী এবং সাইকেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একটি বাচ্চা ছেলেকে বেছে নিলেন। ছেলেটি স্থানীয় এক কামারের বকে যাওয়া ছেলে। স্কুলের পথ থ্রি থেকেই বন্ধ, বিড়ি খায় এবং বিষয়টাকে খেলা ভেবে সে হাতে একটা বোমাও রেখে দিতে চাইল। ভীষণ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। এর বেশী মাথায় ছিল না তার। তবে প্রভাতকুমার দেখলেন ছেলেটি খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ। বোমা নিয়ে যাওয়ার জন্য বারণটুকু মেনে নিলেও মনের গোপনে ছোট্ট আপশোষ রাখল লুকিয়ে। শহরের ধারেই নদী, নদীর বাঁধ। বাঁধ ধরে দেশ-দেশান্তরে মানুষ চলাফেরা করে তারা জানতেই পারল না তাদের মন্দ ভাগ্যের হাল ফেরাতে জনৈক প্রভাতকুমার মহৎ একটি খুনের ছক কষে ছিপ ফেলেছেন।

প্রথম যেদিন প্রচেষ্টা হল, সেদিন কাজ হল না। সাইকেলটা অস্বাভাবিকভাবে পড়তে দেখেই লিউক কুকুরটা বেশ দূরেই গাড়িটা চট করে থামিয়ে দিল। নিশ্চয়ই তাঁর গভীর নীল চোখদুটি কিছু সন্দেহ করেছিল। সুতরাং কামারপুত্রের ব্যর্থতা তাকে আরো হুঁশিয়ার করে দিল। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে আসা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একা-একা প্রভাতকুমার গোঁফটি লাগিয়ে বার্ডসাই টানতে টানতে নদী উপভোগ করতে থাকলেন। ইস্পাতদৃঢ় তাঁর স্নায়ু; মরতে সামান্য বুক কাঁপে না।

তখন ঠিক হল ঐ-স্পটে আর কাজ হবে না। আর একটু দূরে কোথাও সুধীরদের অপেক্ষা করতে হবে। এবং পরদিন ছেলেটা ঠিক প্ল্যানমাফিক গাড়ি আটকে দিয়েই সাইকেল ফেলে পালাল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল কারণ সাইকেলটা ছিল চুরি করা। তাই সে উর্ধশ্বাসে বাঁধ ধরে ছুটতে ছুটতে ঝপাস করে নদীর জলে লাফিয়ে স্রোতে দেহটি দিল ভাসিয়ে।

ভিড়ের মধ্যে সুধীর এবং অ্যাকশনের লোকাল ছেলেটি রিভলবার নিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু কিছু ওলট-পালট ঘটল। কথাছিল গুলি ছুঁড়বে সুধীর। সে পাক্কা নিশানবাজ। দেশমাতার মন্ত্র

কানে-কানে ঢুকিয়ে দিলেই শরীরে অতিরিক্ত বল জন্মাত, খানিকটা ভয়ে পড়ত। শেষে নির্বিবেকে খুন করে আসত নিপুণ হাতে। তো সুধীর যখন গুলি ছুঁড়বে, অ্যাকশনের লোকাল ছেলেটির পাহারা দেবার কথা ছিল। কিন্তু তড়িঘড়িতে ঘটল উল্টো। পিস্তল চালাল সে এবং গার্ড দিল সুধীর। খুলিতে না ঢুকে, গুলিটা লিউক কুকুরটার চোয়াল ভেদ করে গেল বেরিয়ে, কাত হয়ে পড়ল সে এবং মুহূর্তে রক্তে পোশাক উঠল ভিজে। কাণ্ড ঘটিয়েই দু'জন ছুট। আর অকস্মাৎ অভাবিত ঘটনায় কিছু লোক পেছু পেছু তাড়া করল দু'জনকে। লাঠি, ঠিল-পাটকেল যে যা পারে, ছুটল দু'জনকে হাতে নাতে ধরতে। শান্ত শহরকে অশান্ত করার ঘোর বিরোধী এরা। অবশ্য, টের পায়নি তাদেরই সুদিন বা মুক্তির জন্য এরা গভীর রাতে অনেক তেল পুড়িয়ে এই খুনটির অপেক্ষা করেছে। দু'জন পালিয়ে গেল। ঐ কামারের ছেলেটি ধরা পড়ে। বেদম পেটানিতেও তার মুখ দিয়ে প্রভাতকুমারের চেহারার বর্ণনা বা বার্ডসাই এর গন্ধের খবর বার করানো যায়নি। শেষে কম বয়সের জন্য সাজার জরিমানা স্বল্পমেয়াদি হলে, ছেলেটি পরবর্তী জীবনে জাহাজের খালাসী হয়ে প্রচুর সমুদ্রযাত্রা করে, এমনকি লিউকের দেশেও আসে। তবে সে জানতো না কে লিউক, তার দেশ-ই বা কোন মুলুকে ছিল। গুলি খেয়ে লিউক কাত হবারপর, নানা বিশৃঙ্খল হৈ চৈ-এর পর তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জেলবন্দীরা তার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিল সাময়িক। বদলে, ডিউক কুত্তা স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল সুপার হিসেবে। এবং দেশ থেকে সুস্থ হয়ে কয়েক বছর পর গাল বাঁকা অবস্থায়, লিউক এ দেশে এলে অন্য কাজে নিযুক্ত হয়। ...

বিনোদকুমার জেলশহরের ঐ ঘটনার পর, অন্য প্রসঙ্গে ধরা পড়ে ১৩ বছর জেল খাটলেন এবং মুক্তিও ঘটেছিল তার। ৭০ বছর পর, আজ তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেই মারা গেলেন। গত ৫০ বছর ধরে তিনি কোনো স্মৃতিচারণ করেননি; প্রহরণধারিণী চতুর্ভুজা দেবীর ছবি ভেসে ওঠে কি না কিম্বা চলন্ত জীবনপর্বে নারী শুধুই মা হিসেবে থাকে কি না - তাঁর মুখে সামান্য হাসি ছাড়া কেউই গূঢ় অর্থ ধরতে পারেনি।

তাঁর মৃত্যুর পর আশপাশের বউ-ঝি, কোচোয়ান, রিক্সাওয়ালা বা সদাব্যস্ত মানুষজন হৈ হট্টগোলের মধ্যে কৌতূহলে সকলে উঁকি দিয়ে গেল একবার। বয়স ফুরোলে মানুষ যেমন মৃত হয়ে যায় একদিন - ঠিক তেমন ভঙ্গিতেই বিনোদকুমার শুয়েছিলেন। ছোট ভিড়টুকু জানতেই পারল না, তাদেরই বা তাদের পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য এমন মৃত্যুকে ডেকে আনতে চুপিচুপি গুপ্তমন্ত্রের আসরে বহুবার রিস্ক নিয়েছিলেন প্রভাতকুমার ওরফে শ্রীকণ্ঠ ওরফে বিনোদকুমার।

অদৃশ্য ভূতকে ক্ষমা

ধর্মপ্রাণ পীর খাঁ জাহান আলী যে-দিন টের পেয়েছিলেন মৃত্যু ডাক দিয়েছে অন্তরে, চলে যেতে হবে খোদাতাল্লার দুনিয়া ছেড়ে, তারিখটা ছিল ৮৬৩ হিজরীর ২৬ মে জেলহজ, বুধবার। তিনি অবিশ্যি জানতেন না ঐ তারিখের কত-কত বছর আগে প্রবল একটি প্লাবন হয়েছিল। ফুঁসে উঠেছিল সমুদ্র এবং জলপ্লাবিত স্থানে ক্রমে পলি জমে ক হাত যেন নতুন মাটি জন্মলাভ করেছিল। সে-রহস্যের কিনারা কিছু পর। কারণ, জীবিত অবস্থাতেই তাঁর সমাধিবেদীতে পাথরের গায়ে ফুটে উঠেছে 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, মহম্মদ তাহার রসুল অর্থাৎ প্রতিনিধি এবং হে ভগবান। আমাকে শয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা কর' এবং আমি তোমার দয়ার্দ্র করুণাময় নামে আরম্ভ করিতেছি, ইত্যকার নানা বাণী।

পীর সাহেব ফিরছেন বিশ্বস্ত কিছু সাথী নিয়ে ব্যাপারটি পরখ করে। তার প্রিয় এক মুবিদ জাফর আলী প্রায় ক্রোশ আষ্টেক দূরে বিষয়টি দেখতে পেয়েছিল এবং বয়ে আনা খবরের ভিত্তিতে দলটি বেরিয়েছিল সকাল সকাল। এখন বেলা ঢলবার মুখে।

পীর সাহেবের সঙ্গে আজ কোনো ঘোড়া নেই। সাধারণত তিনি বৃদ্ধ, অসমর্থ হয়ে উঠবার পর, গ্রাম-গ্রামান্তরে বিশাল নির্জন চরাচর ধরে ছোট্ট একটি ভুটানি ঘোড়ার পিঠে যাতায়ত করেন? সঙ্গে থাকে কখনো তিন অথবা পাঁচজন মুবিদ বা শিষ্য। তারা চলে পায়ে আর পাশে আস্তে দুল— কি চালে ঘোড়াটা হাঁটে। পীর প্রায় নব্বই এর দরজার পা দিয়েছেন, ছোটখাট দেহ, ধবধবে পাকা চুল ও দীর্ঘ আবক্ষ দাড়ি।

অদ্ভুত গোধূলি আলোতে পশ্চিম আকাশ এখন নিজুতি ভোরের রং মেখে আছে। করুণ ও প্রশান্তির একটি ক্যারাভান যেন জলাভূমির আকূল ও হাহাকার বাতাসে বারে বারে ফেলছিল গভীর শ্বাস। এখনও যেন দলটা চোখে দেখা অলৌকিক ঘটনাটি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেনা। গভী র পুকুরটিতে, আশ্চর্য, নেমে সকলেই একযোগে মন্দিরের মধ্যে যোগীটিকে দেখতে পেয়েছেন, স্পষ্ট অবয়ব। অথচ সামনেই পীর সাহেবের সমাধিপাথরে দেখা যাচ্ছে উৎকীর্ণ বাণীর মালা। এটা কোনো অশুভ ইঙ্গিত কী?

এখন দলটার চলার পথ নির্জন খু শবু-তে মম। পীর সাহেবের দেহে ছেঁড়া-ময়লা আলখাল্লা, গলায় প্রায় হাফ ডজন তসবী দানার মালা, চোখে সুরমা।

হঠাৎ খাঁ জাহান দলের একজন উলিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন --বলতো, আমি কে?

আউলিয়াটির নাম বুড়া খাঁ। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিল --আপনি এই মস্ত মুলুকের বাদশা!

পীরের চোখ বিস্ফারিত। বাদশা! চকিতে চলার গতি দিলেন থামিয়ে। তার চাউনিতে বুড়া খাঁর প্রতি ভৎর্সনা যেন ঝরে পড়ছে। আঙ্গুল তুলে নির্দেশ দিলেন ঐ দূরের বকটাকে দেখেছ?

মস্ত জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আউলিয়াটির চোখে পড়ল নির্জনতার সুযোগ স্বার্থে এক-ঠ্যাং তুলে ধবধবে পাখিটা পিঠ বাঁকিয়ে শেষ শিকারের আশায় ঝিম-মারা।

--আমি হুকুম করছি পাখিটাকে, উড়ে যা। এক্ষুনি উড়ে যা। যা।

পাখিটা বসেই রইল; তখন আপন হাসিতে 'তোবা! তোবা'। বলে দাড়িগাছায় হাত বুলিয়ে পীর বল্লেন --দেখো, তোমার বাদশার হুকুম সামান্য একটা পঞ্ছির কাছেও মান্য হয় না। আল্লাহর তুলনা নেই, স্বয় তিনিই দ্রষ্টা ও শ্রোতা, তিনি সকলের তুষ্টিসম্পাদন করেন, তিনিই সর্বপ্রধান প্রভু, বাদশা, শ্রেষ্ঠ সহায়ক। বলেই পীর তাচ্ছিল্যের হাসি দিলেন।

বুড়া খাঁ মুরশিদ এর তুচ্ছধর্মী সামান্য হাসিতে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। নিজেকে অবিশ্বাসী মনে হল। পীর তাকালেন না, খানিক পর আত্মস্থ হয়ে আপন মনে বিড়বিড় করলেন —ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, অর্থাৎ আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই যাব ফিরে। খানিক পরেই তিনি আসর-এর নামাজের উৎকণ্ঠায় তহরিয়ার ভঙ্গিতে তয়াম্মন শুরু করলেন।

যৌবনে খাঁ জাহান কিন্তু ভীষণ জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। শাসক হিসেবে বহু লড়াইয়ের মাঠে অতিথি হয়েছিলেন। যদিও স্বাধীন ভাবে নিজের নামে কেনো মুদ্রা খোদাই করেননি, একটানা বিশবছর ছিলেন একটা মুলুকের শাসন কর্তা। তারও আগে ছিলেন বাদশার উজির জং এর ময়দানে পেয়েছিলেন নানা উপাধি। তারপর একদিন সব ছেড়েছুড়ে মাত্র ১২জন শিষ্যকে নিয়ে চলে এলেন সমুদ্র লবন ও হিংস্র জঙ্গলের দেশে। প্রায় ৫০ বছরে সামান্য ১২ জন মুরিদ এখন ৩৬০যে রূপান্তরিত। জঙ্গল রাস্তা, দীর্ঘ কেটে বিশাল জনবসতির তিনি খাঞ্জালিপীর বা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষ।

এখন তো কালের অমোঘ নিয়মে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। দেহ জরাজীর্নতার পথে চলছে। কেউ কেউ তাকে বুজুরগ হিসেব শ্রদ্ধা করে। নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে নাকি খাঁ জাহানের বুৎপত্তি আছে। জনমত আছে তিনি নাকি নাগাড়ে চল্লিশ দিন উপবাসে থাকতে পারেন। এক-পায়ে স্থির হয়ে থাকেন দিনের পর দিন।

তয়াম্মুখ সেরে দলটা যখন আশ্রয়স্থল যাটগম্মুজ মসজিদ এর দিকে ফিরছে, খাঁ জাহান পীর এর মনে আচমকা অজ্ঞাত একটি ভয় জন্মলাভ করল।

সারাজীবন ধরে তিনি ভয় কাকে বলে জানেন না। জং বা যুদ্ধের ময়দানই হোক বা মানুষের মনের ভূমিকে বদলে দেওয়াই হোক --তিনি বরাবরই নিজেকে দীনদুনিয়ার সামান্য এক নফর মনে করেন। বোদপরস্তি বা পৌত্তলিকত্তায় তার তীব্র ঘৃণা। তিনি মানুষকে অন্ন-বস্ত্র দান করেন, নানা গম্বুজের মসজিদ তুলতে উৎসাহী করে তোলেন এবং আলো জ্বালিয়ে আঁধার দূর করবার মতো, বোদপরস্তিকে নির্মূল করে দিতে চান। এ-ভাবেই তো তিনি আজও অটুট বিশ্বাসে আছেন। যে আল্লাহর দুই দিব্য গুন ---জামাল ও জালাল-ই সমস্ত বিশ্বকে ঘিরে রয়েছে। এবং ঈশ্বরতত্ত্বের মূলকথা হল সাধনা বা আসগল। পীর সাহেব তো জীবনের লম্বা পথটাই সাধনায় নিমজ্জিত। কিন্তু আজ জীবনের একটা পড়ন্ত গ্রন্থীতে এসে তিনি যে ভয় পাবেন, দুর্বলহবেন, বুঝতেই পারেন নি। সত্যি বলতে কি, উনি যখন পুস্করিনীতে নেমে মন্দিরের মধ্যে উঁকি দিয়েছিলেন মনে হচ্ছিল হাতের 'আসা' বুঝি খসে যায় যায়। ভেতরে যোগীতো নয় যেন এক আজাজিল বসে আছে।

হঠাৎ খাঁ জাহান তাড়া দিলেন ---পা চালাও। পথ অনেকটা। কাল আবার যাহরেই এ-রাস্তায় ফিরতে হবে য়

বুড়া খাঁ বলে --কাল আপনি টাট্টুতে আসবেন।

— কেন ?

— আপনার শরীর ধকল নিতে পারবেনা।

হঠাৎই পীর সাহেব ভীষণ রুষ্ট ভাব ধারণ করলেন মুখভঙ্গিতে এবং এবং কিছুটা কঠোর স্বরে বল্লেন -মুনাফেক--দের মতো উচ্চারণ করোনা।

অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীদের মতো আচার তো কাফের-রা করে থাকে। মুরশিদের মুখ থেকে মুরিদের উদ্দেশে এতো চরম ভৎর্সনা। বুড়া খাঁ খুবই দুঃখ পেলেন মনেমনে। পীর সাহেবের হল কী আজ ? এতটা পথ বিনা ঘোড়ায় কি খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন ?

জলাভূমির এলাকা ফেলে ওরা মাটি জঙ্গলের পথে ওঠে। রাখালের দল গোধ করে ফিরছে য় দলটাকে দেখে হঠাৎই ছোড়াগুলো থমকে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। তুরক্‌দের কোনো দল নয়তো ? অহেতুক হাঙ্গামা না বাধিয়ে মজা পায় না ওরা।

পীর সাহেব এতক্ষণ বুড়ো খার আহত মুখটার দিকে তাকালেন করুণা হল। বল্লেন --কে ধকল নেয় বলতো আমাদের শরীরে ? দেহ না আত্মা ?

--কেন ? বুড়া খা হাসার অভিনয় করে।

—সমস্ত কষ্ট আমাদের বহন করে রূহ বা আত্মা। এ পবিত্র। আর আমার এই ভাঙ্গা জীর্ণ শরীরটা যা দেখছ, এতো অশুদ্ধ--জমদ। কাল আমার টাট্টুতে চড়বার কেন দরকার হবে ? রুহ কি পবিত্র নয় ভাঙ্গা বয়সে ?

বুড়া খাঁ নিজের অজ্ঞতাটুকু ধরতে পেরে ভীষণ লজ্জা পেল। পীরের প্রতি শ্রদ্ধায় মুখটি হাসি-হাসি হতেই খাঁ জাহান মৃদু স্নিগ্ধ হাসিতে পথ চলতে থাকে।

প্রথম যখন তিনি এলাকায় ঝড়ের মতো ক্রমাগত এগোতে থেকেছিলেন যেন জেহাদ ঘোষণার মনোভাব থাকত। অঞ্চলের সামন্ত বা জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। তিনি মুরিদদের নিয়ে অনেক দেউল চৈত্য ভেঙে ইট কাঠ পাথর সংগ্রহ করেছিলেন এবং অঞ্চলে জেগে উঠেছিল বিচিত্র লতাপাতা ও কারুকার্যের নানা-গম্বুজের মসজিদ। তিনি কত ছোট ছোট রাজা বা সামন্তদের যে পদনত করে নিজের বিশ্বাসে টেনে এনেছেন, হিসেব নেই। তাঁর নিজস্ব ধর্ম বাহিনী ছিল। তাদের কেউ কেউ গাজি সেজে আরও অধিক দুর্গম জনপদে অবিশ্বাসীদের খোঁজে চলে গেছে। কত যে ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে, কত যে শহীদ মাটিতে ঘুমিয়ে আছে —হিসেব নেই। খাঁ জাহান নিজের তদারকিতে ৬০ গম্বুজের একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে পাশেই থাকেন। তাঁর বর্তমান আস্তনা। আরও আর্থিক হয়েছে, কত যে শহীদ মাটিতে ঘুমিয়ে আছে —হিসেব নেই। খা জাহান নিজের তদারকিতে ৬০ গম্বুজের একটি মসজিদ নির্মাণ কাটিয়ে পাশেই থাকেন। তাঁর বর্তমান আস্তানা।

পীর খাঁ জাহান-এর স্মৃতিতে ভেসে উঠল, নিজের সমাধি বেদীর পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ ধর্মের বাণী। মাস তিন আগেই এর নির্মাণকার্য শেষ হয়, এমনকি মীনার কাজও পর্যন্ত। তারপর তিনি হুকুম দিয়েছিলেন জলসত্র খুলবার জন্য পুষ্করিণী খনন করতে।

আত্মশক্তিসম্পন্ন পীরদের মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম, মৃত্যুর, পূর্বে নিজনিজ সমধিস্থান প্রস্তুত করে যাওয়া। যতদিন আর বাকি বেঁচে থাকবেন, ওটা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, মৃত্যুর পর ওর মধ্যে শবদেহ সমাহিত করে তৈরী হবে সমাধিবেদী। এমন কি, কোন পাথর কি ভাবে বসিয়ে বেদী তৈরী হবে, কোন পাথরে কোন কোন বাণী উৎকীর্ণ হবে তা-ও সমস্ত ঠিক হয়ে থাকত। কেবল অনুচরবর্গ সমাধি গঠন করে নির্দিষ্টস্থলে মৃত্যুর তারিখটি মাত্র লিখে রাখত। খাঁ জাহানের গৃহটির মেঝে পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মীনা করা ইটে মণ্ডিত।

তালে আর রহস্য কোথায় ? কেন মুরিদের দল নিয়ে জীর্ন শরীরে একটা পথ হেঁটে গেছলেন ? আসলে দীর্ঘ জীবনের পথ শেষ করে। পীর সাহেব এই মুহূর্তে উপলব্ধি করছেন, তিনি আর পূর্বের মতো স্থির বিশ্বাসী থাকতে পারছেন না। নইলে আগামীকাল কেন তাকে রহস্যের টানে ফের ছুটতে হবে ?

মসজিদ ও সমাধি নির্মাণ করিয়ে তিনি জলাশয় খনন করাতে আরম্ভ করেছিলেন। সমাধি-স্থানের মুখোমুখি। কয়েক মাস ধরে অঞ্চলের শত শত মানুষ ভাত-কাপড়ের মজুরিতে কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বহু দূর খনন করিয়েও জল পাওয়া গেল না। শেষে আরও খনন করে পাওয়া গেল একটা মন্দির। যে-বিদ্বেষমন নিয়ে আজ এসেছিলেন তিনি, কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতেই পীর সাহেব হিন্দুযোগীর সাক্ষাৎ পেলেন। অথচ কোথা থেকে নূর আসছিল। তিনি যোগীর কাছে জল চাইতেই উৎসমুক্ত জল দ্রুতবেগে বের হতে থাকল ? পীর সাহেব এবং আউলিয়ারা বহুকষ্টে কূলে উঠে আত্মরক্ষা করলেন। তাই দীর্ঘপথ রহস্যময়তায় তিনি দুর্বল হতে থাকলেন, ক্ষোভ জন্মাতে থাকল। বৃদ্ধও দুর্বল হয়ে তিনি দৃঢ় ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। ফিরে আসতে আসতে কখনো মনে হল, ওতো জল নয় জলের ভ্রম অর্থাৎ জিবরাইল। তাকে পরীক্ষা করছে। কখনো ভাবলেন, ওটা আজাজিল বা শয়তান। তাঁর আসন্ন সমাধিস্থান

নির্বাচনে বোধ হয় কোথাও ত্রুটি হয়েছে। দলটা এভাবে ফিরে এল নানা ভাবনা চিন্তার সংঘর্ষে।

রাতে পীর সাহেব শুধু পাত্রখানেক দুধ পান করলেন, ঘুম এলনা। সমাধিস্থান নির্বাচনে ত্রুটি বা থাকবে কেন ? তিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন কোথায় দেহত্যাগ করবেন এবং স্থান নির্বাচন কোথায় হবে । তাঁর প্রার্থনা অনুসারেইতো স্থানটি নির্দেশিত হয়েছিল। সমাধিমন্দির স্থাপিত হয় এবং যে হেতু শবদেহ উত্তর শিয়রি থকবে, তাই সমাধি কক্ষটি দক্ষিণদ্বারি । হঠাৎ দেববাণী শুনলেন, মন্দিরের মধ্যে হিন্দুযোগী নয়, একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। বহুকাল আগে নাকি ফকির আশ্রম বানিয়ে ধ্যানে বসেছিলেন এবং যখন সম্বিত ফিরল, মন্দির মাটির তলে ঢুকে গেছে।

পরের দিনটিও ছিল ভারি চমৎকার । খাঁ জাহান চলেছেন যেন বাতাসে উড়তে উড়তে । বড্ড ধানের গন্ধ আসছিল। তিনিই তো উৎসাহিত করেছিলেন রাস্তা, দীঘি ও চাষ করতে । তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর প্রথম পদার্পণের অনেক পুকুর আজ শৈবাল ও ঝাঁঝিতে অতিরিক্ত রহস্যময়। বুড়াখাঁ আজ সঙ্গী হতে পারেনি আউলিয়াদের মধ্যে। বাহ্য রোগে ভীষণ ভুগছে ভোর রাত থেকে। এত সকালেই মনোরম ধানের ক্ষেতের ওপাশ দিয়ে কিছু দাগড়-নিকারার আওয়াজ এবং একসারি সৈন্যের ছাউনি ফেলার ইঙ্গিত পেলেন। এতো লেগেই আছে। আজ আর জং এর জন্য রক্তে দোলা লাগে না খাঁ জাহানের ।

আজ বেলা মাথায় নিয়ে দলটা ফের হাজির হয়ে সমাধির কাছে দেখতে পেলো যত নামছে, জলের কোনো পাত্তাই নেই। কোথায় সেই যোগী বা শয়তান আজাজিল ?

পীর সাহেবের মানুষজন ক্রমাগত পুকুরের ঝুনোমাটিতে কোদাল মেরেই চলেছে। দলটা হঠাৎ কাজ থামিয়ে পীরকে স্বাগত জানাতে উনি 'আসা' তুলে নির্দেশ দিলেন, কাজ চলুক । কর্মই মুক্তি।

গতকালের মন্দিরও যোগী আজ কোথায় ? অদ্ভুত । জলের তোড়ে কী কষ্টে যে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। সবই হল আজাজিল এর কর্ম্ম । পৃথিবীতে অশুভ শয়তানের বাচ্চারাইতো মানুষকে পথভ্রষ্ট করে । এদের সংখ্যাই বেশি। আজরাইল এর মতো প্রাণসংগ্রহকারী ফেরেস্তা কজন আছে ?

হঠাৎ কিছু কোদাল গেল থেমে । আউলিয়াদের নিয়ে পীর তখন মস্ত একটি বটের ছায়ায় বসেছিলেন। এত মোটা, গহন ও রহস্যময় গাছ পীর জীবনে বেশি দেখেননি। এমনিতেই বট-গাছ তার খুবই প্রিয়। মনে হয়, আল্লাহ এই বৃক্ষটি নির্মাণ করে মানুষদের আশ্রয়দাতার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। দিন-রাত কত পাখি এখানে নির্বিঘ্নে বংশবিস্তার করে চলেছে। কত কিছু পরিবর্তনের সাক্ষি এই বটগাছ।

হঠাৎ কয়েকজন ছুটে এসে জানাল, মস্ত একটা পাথর । ওটি স্থানান্তরিত না করলে, মাটি কাটা যাবে না। নানা কৌশল, চাপ ও ঠেলাঠেলি করেও, সামান্য নড়ানো যাচ্ছেনা পাথরটিকে ।

আউলিয়াদের নিয়ে পীর সাহেব নেমে এলেন। ফের তাঁর মধ্যে ভয়ের ঠাণ্ডা ভাবটি জেগে উঠল। এতক্ষণ তিনি নির্জন বটের ছায়ার ঠিক জাগ্রত বা নাসুত অবস্থায় ছিলেন না । যেন চারপাশে একটি সুষুপ্তির, আয়রন থাকে বলা হয় জবরত । রোদ ঝিম দিলে, জলাভূমি থেকে নীরবে বাতাসের গন্ধ উঠলে বা ধানক্ষেত ভরপুর চুপচাপ থাকলে দীর্ঘ ফাঁকাতে দাঁড়ালে যেমন

হয়, পীর সাহেবের তেমনই জবরুত চলছিল। তিনি জীবনের চূড়ান্ত-কথা ভাবছিলেন— যেখানে নফরত বা ঘৃণা নয়, ইস্‌ক বা ভালোবাসা চাই। চেরাগ বা সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো খুবই আকর্ষণ করে পীরকে। এইতো, জমিদার বা সামন্তদের এলাকা থেকে মূর্তিপূজা করা পর্যন্ত মাঝে মাঝে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায়। দীর্ঘজীবন পীর এ-দেশে থাকতে থাকতে কেমন যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠছেন ইদানীং। 'আশাহাল'-এর প্রকৃতে অনুভূতি টের পাচ্ছেন—মানুষেরজীবনে সংকল্পই হলে শ্রেষ্টকথা।

খাঁ জাহান চর্মচক্ষে দেখলেন মস্ত বিশাল কালো একটি পাথর মাটির নিম্নভাগ রুদ্ধ করে রেখেছে। অনবরত কোদাল চালিয়েও আঙুলখানেক মাটি কাটা যাচ্ছে না। পাথরে শক্ত শব্দ উঠছে আর মাঝে মাঝে টুকরো পাথর যাচ্ছে ভেঙ্গে। যেন পীর-এর সংকল্পকে বাধা দোয়ার জন্য মাটির তলে কোনো অলৌকিক শক্তি ওৎ পেতে আছে।

পীর বিস্ময় ও ক্ষোভে হুকুম দিলেন মজুরদের—সরিয়ে দাও। আল্লাহই তোমাদের ভরসা।

এতগুলো হাত-পেশি এবং সবল ধাক্কাতেও পাথরটি নড়লনা। কোনো প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ে যেন মাটি আগলে আছে। পীর বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন, তবু পাথর অনড়। খাঁ জাহান ঘনঘন মুরিদদের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং কী অদ্ভুত, তখনই কোথা থেকে ধবধবে চেহারার এক পুরুষ এসে হাজির। পাথরের নিচে মাটির স্তূপ তেমনি নিশ্চল।

মানুষটি খুবই সুদর্শন। চুলদাড়ি এবং দেহে ভষ্মমাখা। মিটিমিটি হেসে, আস্তে পীরকে জানালেন —এ পথের আমিই পারি সরাতে।

—তুমি? কী তোমার পরিচয়?

— যোগী

খাঁ জাহানের চোখেমুখে ক্রোধ ও ভয়মিশ্রিত ঘৃণা জন্মাল। অন্যসময় হলে তিনি যোগীকে কিছু বুজুরগ দেখাতে পারতেন। কিন্তু এত খননেও মাটি ফুঁড়ে পানি না ওঠায় তিনি কিছুটা সন্দিগ্ধ। এত আউলিয়াদের সুমুখে তাঁর কি পরাজয় ঘটবে? পবিত্র সমাধির সামনে অশুভ আত্মার দৌরাত্ম কি সামান্য বোদপরস্তির সাহায্যে নির্মূল করতে হবে? অথচ জল ফিনকি দিয়ে ওঠার মতো, তাঁর ভয় মনকে আক্রান্ত করছে।

খাঁ জাহান দাড়িতে হাত বুলিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে চললেন — কী যোগ কর? মানুষটি নীরব। শুধু হাসতে হাসতে মাটি থেকে দুহাত উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পীর সাহেব এ-কেরামতি জানেন। খুশি হয়ে বললেন— তুমি এখন কি নাসুতে আছ?

শব্দটি ঠিকঠিক না বুঝলেও, যোগী আন্দাজ করলেন। নাসুত মানে তো তাঁর ভাষায় জাগ্রত অবস্থা।

— না।

— তবে?

—সুষুপ্তি।

পীর এবার ভাষাটি না ধরতে পারলেও, আন্দাজ করলেন সুষুপ্তি মনে জবরুত। আর লাহুত? নিশ্চয়ই যোগীর ভাষায় 'তুরীয়'। পীরের দেহ রোমাঞ্চিত হল। তিনি দুপা এগিয়ে যোগীকে জড়িয়ে ধরলেন। মুরিদ-রা বিস্মিত। পীর বেদপরস্তি-কে আলিঙ্গন করছেন। এ-সব চোখে কী দেখছে? দু'জন দুজনকে জড়িয়ে দুমুখে তাকিয়ে ওদের দেহস্পর্শে উজ্বল আভা। একটা অসম্ভব মুহূর্ত যেন ঘোর দুপুরে স্থির হয়ে আছে।

পীর খাঁ জাহান পাথরটি তুলবার অনুমতি দিতেই যোগী স্বচ্ছন্দে মাথায় করে চলে গেলেন। একনাগাড়ে চার মাইল তিনি চললেন পীরের দলটির সঙ্গে। তারপর নামিয়ে বিশ্রামের পর আর তুলতে পারে না। পীর আশির্বাদ জানিয়ে যোগীকে বললেন—নির্জন এই নীলয়ের বাসিন্দা হও তুমি।

যোগীই প্রথম বাসিন্দা হল এখানের এবং যোগীর অদ্ভুত ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং পীর দেবমূর্তি বসাতে ৩৬০ বিঘা নিস্কর জমি দান করেছিলেন। বহু চৈত্য মন্দির ভাঙার দিনগুলো পেছনে বিস্মৃত হয়ে গেল। আউলিয়ারা মনে মনে হায় হায় করল।

.......পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকারী দলটার নেতা সি. মজুমদার সারা দিন ধরে খননের কাজ তদারকি করে, রাতে পঞ্চায়েত প্রধান দেবু সিংহের বাসভবনে যখন খানাপিনায় ব্যস্ত, পীর জাহান সম্পর্কে ছড়ানো গল্পটি এক বৃদ্ধ ছুতোর মিস্ত্রি বলছিল।

পাথরটি নিছকই কোনো বৃহৎ-বিশাল শিলাখণ্ড ছিলনা। পীর এত সব জানবেন কী করে? তিনি খবর রাখেন নি ৮৬৩ হিজরীর ২৬ জেলহজ্ বুধবারের কত যুগ আগে সমুদ্র ওখানে ফুঁসে উঠেছিল, মাটিতে ঢিপি হয়ে জমেছিল কত হাত পলি। আসলে, পাথরটির সম্মুখ ভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, মধ্যখানের বেধ ফুটখানেকের মতো। এটি একটি মূর্ত্তিস্তবক বা বুদ্ধদেবের অসংখ্য নিজমূর্তি ও তাঁর জীবনের ঘটনাসমূহ ভাস্কর শিল্পে সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হয়ে আছে।

এর পরেও কত হিজরীর কত রবিউল বা জেহজ্, ফের সমুদ্র ফুঁসেছিল, ক্ষেপেছিল লবনাক্ত, জল, বালি-মাটিতে চাপা পড়েছিল কোন্ কোন্ উজ্জল মুহূর্ত—পীরের জানা নেই। কথাও ছিলনা। কারণ এ-সবের আগেই তাঁর সমাধিপাথরের উৎকীর্ণ বানীর ফাঁকাস্থানটুকু অক্ষরবদ্ধ হয়ে গেছল 'প্রধান পুরুষ খাঁ জাহান আলীর এই সমাধি স্বর্গীয় কাননের অংশ বিশেষ। ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপালু হউন। ৮৬৩ হিজরীর ২৬ শে জেলহজ্ তারিখ।"

বহুযুগ পর নীলকুঠি নির্মাণের ইটের জন্য সাগর পারের সাদা চামড়া ইংরেজ, চৈত্য-মঠ-মসজিদ-মন্দির—সব ভেঙ্গে-ভুঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেলে, কোথাও বুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিষ্ণুর হাত ভাঙ্গে কোথাও, দরগা পড়ে ভাঙ্গা। আবার ফুঁসে ওঠা লবণাক্ত জলে সমুদ্র ঝুটি তুললে নীলকুঠিও ভগ্ন ও ক্ষয় হয়ে যায়।

কিন্তু দেবু সিংহের বাড়ি, অনেকক্ষণ বুড়ো ছুতোরের কাছে ইতিহাস শুনতে শুনতে মিঃ মজুমদার (এম. এ ইন ইতিহাস) হিংস্র মন্তব্য করে উঠলেন—আমাদের তাজমহলও তো তাই।.........ক্ষমা করা যায়? টিট্ ফর ট্যাট্ দরকার। ....যাই বলুন।

এর পর ছুতোরটি মাঝ রাত ধরে দ্বিতীয় মিথ বা নীলকুঠি সাহেবের ভুতের গল্পটি বলল।

মিঃ মজুমদার উৎসাহ দেখালেন না। দূর জ্যোৎস্নায় নদীর ধারে ভগ্ন নীলকুঠি থেকে সাদা চামড়ার মানুষটা গভীর রাতে ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক হাতে নির্বিঘ্নে ছুটে গেল অথচ ঢাকা থাকল গাছের ঘন ছায়ায় । কেউ চাক্ষুষ পরীক্ষায় বাইরে বেরুল না।

মজার দিনগুলি

'না-নু!'

......

'কৈ গেলিরে পুতা !'

....

'নানুরে রক্ত মাখাইয়া দিল কে!'

....

' বৌমা ! না-নু- রে রক্ত ......!'

আশ্চর্য ! চার-চারবার কে এমন কথার ছড়া কেটে উঠল ? ঠাকুরঘরের পাশে অন্ধকার কুঠরি থেকে ? অস্পষ্ট, ঘোর জড়ানো, কফে -লালায় পুরনো এঁদো গর্ত্তটা দিয়ে ? ও-ঘরে তো আজ আড়াই বছর ধরে শব্দ-ধ্বনি বা কোনো কথার জন্ম হয় না । সব হিম হয়ে আছে ।

'তাই না মঞ্জুলিকা ? মঞ্জু?'

'হ্যাঁ, তাই তো ! ঠিক শুনেছে ? মা'র গলা ?'

'শুনেছি মানে ? আমার কান এতটাই ট্যালট্যালে হবে ? বয়স হয়েছে বলে ...... ?

'রাগ কল্লে ? ঠিক তা বোঝাতে চাইনি !'

'মা-র গলা ভুল করব ?'

'কিন্তু...হঠাৎ আজ কী মনে করে ...... এটা সম্ভব ?'

'অসম্ভব বলেই তো ভয় পাচ্ছি ! নানু ফেরেনি?'

'না।'

'সেই-তো সাতসকালে গেছে ? ক'টা কলেজ ফর্ম তুলবে ?

বলে যায় কখনো ?

'কেন ? কেন বলে না গুয়োরটা !'

'মুশকিল ! বাঁধন সবে ছিঁড়ল .... বাপ মায়ের কথা মেনে চলবে ?'

'মানা-টানা নয় মঞ্জু ! ফর্ম তুলবে, চলে অসবে --এই তো ! যাগ্গে ! বেশি না বলাই ভালো ! ...... মাথা ঠিক থাকে না !'

'হ্যাঁ, সেই ভালো !'

'ঐ পুতপুত করেই তো গেলে !'

'কী আর করব ? বড় হয়েছে ...কলজে ঢুকতে যাচ্ছে ....নিজের ভালো বুঝে নিক .... দেরি তো হতেই পারে !'

'দেরি তো হত্যেই পারো্য ! ..... চমৎকার ! বলতে লজ্জা লাগে না ?'

'আমার তো স্পটে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না।'

'স্টার পেয়েও যদি গোয়াল চটকাতে হয় ! .... কমাদের কী হবে তালে ?'

'সংসারে স্টার তো তোমার ছেলেই এক পায়নি.... পথে নামলে টের পেতে !'

'পথে তো নামি না আমরা ! বড্ড তক্ক শিখেছ ?'

'ফের চেঁচাচ্ছে ? ...কাজটুকু ফুরিয়েছে বুঝি ?'

নিখিল এবার খাটো ! হ্যাংলামির জন্য খোঁচাটুকু পৌরুষের আঘাত ! কাজটুকু তার একার নৈবেদ্য ছিল !

অফিস ছুটি নেওয়া নিখিল ও মঞ্জু ঘরে দুপুর দরজা-জানলা টিভি-প্লেয়ার-জামা, কাপড়-শাড়ি-বিড়াল সব ঘুমন্ত ! এমনকি টেলিফোনটিও কায়দায় বিচ্ছিন্ন রাখা, যেন বেরসিক-বেহায়ার মতো যে-কোনো চরম উৎকণ্ঠায় ক্রিং ক্রিং হা-হা শব্দে কোনো কিছু চিড় না ধরতে পারে । নানু আজ তৃতীয় দিন --আটটায় বেরিয়েছে ; সাতটা-সাড়ে ছটাতেও বেরুতে হয়েছিল ।

নিখিল ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে । এখন এ বয়সে অফিস নয়, আপিস ! ছুটি পেয়েছে আপিস থেকে বড়বাবুকে জানিয়ে । কে না জানে ছেলেকে নিয়ে নির্ভর সিজ্ন-এ বাবাকে দু-চার দিন অফিস কামাই দিতে হয় ।

'বাবা হয়ে যাবে না একবারও ?'

'খবদ্দার !'

' কেন - রে নানু ?'

'কারও বাপ কলেজে যায় না ! .... মা, তোমরা .... !'

'মঞ্জু, জগৎটা তো একাই দেখবে পরে ...তৈরী হোক !'

'বাঁচার কী আছে মঞ্জু ? ..... বাস্তব !'

সারা দুপুর ....। নিখিল ও মঞ্জু । ঝি দুপুরের কাজ সেরে দিয়ে গেছে । আড়াই বছরের বিনিশব্দের ঘরটুকুর দেখভালের মহিলাটি --চলতি নাম আয়া --কুসুমমিকা মণ্ডল-সকালের ডিউটি সেরে, ঢুকবে ফের ঘোর বিকেলে, সন্ধ্যা মাথায় করে ।

নানু স্টার ।

নানু বাপ-মায়ের আদুরে ।

নানুই স-ব !

নানু মুখ রেখেছে !

ও কী কী হবে ? ...নানু অনেক কিছু হবে ! ..... ও এখন বড়, বুঝদার ! .... ও আলাদা ঘরে শোয় । ...... রাত জেগে গত ফাইন্যাল তৈরী করেছিল.... তবে ৭টা ম্যাস্টরের খরচা ভুলিয়ে দিতে পারেনি । আপিসে ব্রজর ছেলেটা পুষিয়ে দিয়েছে । নানুচ্চেয়ে ৫০ বেশি । মাত্র তিনটে মাস্টর ছিল ! তাও কেবল সায়েন্সে ।

নানু সেই কখ-ন বেরিয়েছে । ওর ঘরটা দুপুরে ফাঁকা । ওর বালিশের তলায় কিসের ছবি ? ঋত্বিক ? রবীনা ? অমন হয়-ই । দিনকাল কি আমাদের মতো।

'আমাদের বলতে ? ম-ঞ্জু কী বো-ঝা-তে চাইছ ?'

'কী আদিখ্যেতা হচ্ছে ? জানলা খোলা।'

'তিনতলার জানলার, উঁহু ! ন্যাংটো হয়েই জন্মায় ।'

'কী ভাষা ! তোমরটাই বুঝি তিনতলা?'

'স-রি ! খেয়াল করিনি।'

'বুড়ো বয়সে ...কী যে করো !'

ঘড়ির মৃদু শব্দে-চরণরেখায়-দুপুর চলে । দূরে, বহুদূরে কোথাও বুড়ো কোনো গাছ আপন দায়িত্বে থমথম করতে থাকে ! পাখির শব্দ হয়, তাতে লেখা থাকে দুপুর ঘনাচ্ছে। রোদ জ্বলে না, সরু শিসও তোলে না ; কখনো মেঘ কখনো ছিচ্ছিরে বারিষ .... প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা .... টায়ার চলতির আলপনা । কাঁঠালের গন্ধ ওঠে । তিনতলায় ওদের কোলের কাছে আসে, টের পায় না। টের পেতে চায় না ।

'মঞ্জুলিকা ! ম-ঞ্জু ! নানুর মা !'

'যাঃ ! এখন কেউ বেল টিপলে ?'

চারদিকে বেল বাজে, বেল মানে ঘন্টা । ঘন্টা ঢং ঢং বাজে । হৈ-হৈ বাজতে বাজতে যায়। মঞ্জুলিকা নিখিলকে ধীরে ধীরে ধারণ করতে থাকে নিয়তির মতো ।

তারপর ...। কিছু ঘুমের শব্দ । আত্মবিলাপের শব্দ ! বয়স-দুর্বলতার শব্দ ! ফোন ঠিকঠাক স্থানান্তরের শব্দ ! কলিংবেল চালু রাখার শব্দ । এবং দুপুর গড়িয়ে পিছলে চিকন যাদুবিদ্যার মধ্যে বাথরুমে বিকেলের চা-পূর্ব মুখচোখ ধোয়ার আওয়াজে মঞ্জুলিকা নিখিলের দিকে টেপা ঠোঁটে, নিছকই হাসির ইঙ্গিতে জানতে চাইল চায়ের সঙ্গে নিখিল বিস্কুট খাবে কিনা !

নানু আসবে । ঘড়ি দেখতে শুরু হয়ে যায় । খেতে দিতে হবে । কিন্তু স্টেশনে টুকটাক বাজার আছে । মঞ্জুলিকার মার্কেটিং ! নিখিল বেরুতে পারে কিন্তু মঞ্জুর মন ভরবে না ।

' স্টেশনে যাব।'

'কেন?'

'টুকটার। যাব আর আসব।'

'যাবেই বা কেন, আসবেই বা না কেন।'

'একদম জলখাবার নেই।'

তখনই নিখিল দুর্বল প্রস্টেটের অসহায় পেচ্ছাবটুকু সারতে বাথরুমে এবং আড়াই বছরের হিমঘর থেকে ...... ! লালা, কফ মেশানো থাকলেও, কোনো ভুল নেই। চার-চারবার !

অশুভ, অলুক্ষণে ছায়ার ইঙ্গিতে নিখিলের চোখেমুখে তখন দুপুরের অনুস্মৃতি চলটা হয়ে ঝরে। ধন্দের প্রলেপ লাগে।

'....রক্ত মাখাইয়া দিল কে?'

স্পষ্ট শুনল। জননীর কণ্ঠ বুঝতে ভুল হয় কখনও ? প্রথমে আচমকা না-বিশ্বাস হলেও, ধৈর্য, বুদ্ধি ও একাগ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখিল শুনল। তবে স্যত হয়ে ফুটে উঠবার ভয়ে দরজায় কান পাতল না। ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছু তফাতে। কী ভয় ? মাকে ভয় কিসের ? কিন্তু তিরিশ মাস তো কুঠুরিটায় কোনো কথার জন্ম হয়নি। বিছানায় বুড়ি অমন ভঙ্গিতে আড়াই বছর শুয়ে থাকার পরও কি তাকে মা বলা যাবে ? কোমার মধ্যে, যখন বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে, কোনো চিকৎসাতেই সম্পর্কটা তাজা হয় না ---তখনও কি নিখিলের মা ? প্রভাদেবী ?

সেরিব্রাল বা স্মৃতিগ্রাসী রোগ যখন প্রাণটুকু রেখে জীবনের অন্যসব লক্ষণ বরফে লুকিয়ে রাখে, আধুনিক বিজ্ঞানে ডাক্তার-নার্সরা তো কিছু লক্ষণ ফিরিয়ে দেয়। দিতে পারার নজির আছে।

প্রভাবতীর দেয়নি। আড়াই বছর ধরে, উঁহু, সূক্ষ্মভাবে, প্রথম সাত-আটমাস নিখিল মঞ্জু-নানুর আশাচ ছিল ওনার স্মৃতি ক্ষীণ সুতো হলেও ফিরে আসবে। সেই থেকে কুঠুরিটা বিচ্ছিন্ন। কুসুমিকা মণ্ডল বছরখানেক নিয়োজিত হয়েছে। ওর চাকরি এটা। স্বামী পর্যন্ত জানে, কুসুমিকা আয়া --প্রাইভেট আয়া।

কিন্তু আজই প্রভাদেবী, স্মৃতি ফিরে পেতে শুরু করলেন কীভাবে ? কেন? নানুতো সত্যিই জীবনে প্রথম বাহির হল। পাশ করেছে, মুখ রেখেছে কিছুটা পড়শীদের কাছে। এখন সেই জগৎটাকে হিসেব-নিকেশে বুঝে নিতে গেল, যেখানে বাকি মস্ত জীবনটা চষতে হবে। রক্ত কেন উচ্চারিত হচ্ছে ? অলুক্ষণে ইঙ্গিত ? ঐ একটিমাত্র সন্তান তাঁদের --নিখিল ও মঞ্জুলিকা বাঁচবে কী ভাবে !

যদি 'বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা না দিয়ে' মা যদি স্মৃতি ফিরেই পেতে থাকে, বড্ড সুখের কথা। কিন্তু মার ৮৫ বছরের স্মৃতিগুলো তো ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে পর পর সাজিয়ে রাখলে। কোন বিন্দু থেকে ফিরে পেতে শুরু করল। আজ মাত্র তটে দিন হল নানু নাকেমুখে গুঁজে ফাইলে মার্কশিট নিয়ে বেরুচ্ছে। অভিজ্ঞতার প্রথম দিনটা ফিরে মাকে খাওয়ার টেবিলে শুধু হেঁয়ালির মতো বলেছিল।

কুঁড়ি না ফুটলেই হত।'

'মানে?'

নানু মিতভাষী । ভাবে বেশি । যা বলে, যেন গেঁথে রাখছে কোথাও ।

'আমাদের আপিসে ব্রজর ছেলেরা ভালো করেছে, দু'টোতেই, বুঝলি নানু!'

'র‍্যাংক?'

'তিনহাজার।'

'তোমার কলিগের জমানো ক্যাপিটাল কত ?'

'কিসের জন্য ?'

'ফুল ফোটাতে?'

'হ্যাঁরে নানু, তোর র‍্যাংকও তো তাই, না ?'

'যা বোঝ না মঞ্জু!'

'বাবু নিখিল তুমিও বুদ্ধু । খাঁটি একটি চাঁদু !'

'হো-য়া-ট্ !'

'বাপি, এত সিরিয়াস হবে না । একটু র‍্যাগিং কল্লাম তোমায় !'

মঞ্জুলিকা চটপট ফেরার আশা দিয়ে গেলেও, বাস্তবে তা ঘটে না । শপিং বলে তাই-ই বোঝায় ! নানুও তো আসছে না । ছটা পর্যন্ত ফর্মের লাইন ? দাঁড়গ্যে ! এর পর পৃথিবীটা তো ওদেরই সামলাতে হবে । একটা ফোন করে দেবে, তাও না । ঘরে না-ঢোকা অবধি আজকাল নিশ্চিত থাকা যায় ?

কলিং বেল ! এই বুঝি ! উঁহু । কুসুমিকা মণ্ডল ।

'এত সকালে ? অফিস বেরোননি আজ?'

'না।'

' বৌদি?'

'শপিং-এ গেছে । নানুটাও ফিরছে না!'

মিসেস কুসুমিকা মণ্ডল সোজা ঐ কুঠুরিটার দিকে । টুকিটাকি শব্দ, জল, মোছা, সরানোর আওয়াজ --ঐ ঘর কিছুক্ষণের জন্য সচল । অথচ ও-ঘরে থেকে একটু আগেই তো । হ্যাঁ নিখিল কোনো কিছু রেচনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে । নিশ্চয়ই কুসুমিকা ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে আসবে উৎসাহে। এমন একটা বিষ্ময় !

নিখিল দাঁড়িয়েই ; প্রতিদিনের কুসুমিকার আচরণে, উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় পা বাড়ায় নিজের ঘরে। ব্যাপারটা আয়ার গোচরে আনা দরকার । হয়তো ও নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখতে পারবে ; রহস্যভেদ হবে খানিকটা ।

'কুসুমিকা ?'

কুসুম ?'

......

কেউ কি ডাকছে ? তাইতো ! কেন ডাকবে আমায় ? দু-দুবার ভুল শুনলাম !

'ডাকছেন আমায় ?'

'এ-ঘরে আসবে একবার ?'

নিখিল বেডরুমে বসে গিয়ে তৈরী হয় । কীভাবে বলবে ? ভয়টুকু প্রকাশ করবে ? ছেলে হয়ে মায়ের ঘরে ব্যাপারটা যাচাই করতে ঢুকল না ---ও যদি অন্য কিছু মনে করে বসে এর ?

কুসুম তো এবার স্পষ্টই শুনল উনি ডাকছেন । ভেতর ঘরে । কেন ? দুপুরে বৃষ্টি গেছে, এখনও রেশ ঝুলছে বাতাসে, বিকেল ডুব দিয়েছে সন্ধ্যায়, প্রদোষের অন্ধকার যেন বাড়ি ঘরের জটাজুটের মধ্যে তিনতলার সব কিছু চোরাগোপ্তা হয়ে উঠছে । কুসুমিকা অবুঝের ভান করে, দুষ্টুমিটুকু লুকিয়ে ঢুকে দেখে নিখিল বিছানায় পদ্মাসনে, সামনেই হাল্কা প্লাস্টিকের একটা চেয়ার ।

বসতে বসতে, 'বৌদি নেই ?'

'ঢুকেই শুনলেন তো !'

'বটে ! ডাকলেন কেন ? '

নিখিল কুসুমিকার আধুলিমা পর সবুজ ভেলভেটের টিপটা দেখে না, ভুরু দেখে না, চাপা ঠোঁটজোড়া লক্ষ্যে নেই, ঈষৎ শ্যামল গাত্রবর্ণ, কাঁধ, সিদ্ধহস্ত শরীরটার সঙ্গেই বিজড়িত আঙ্গুল, আংটি, নেইলপালিশ এবং তারই ডগার তলায় ময়লাগুলোর দিকেও তাকায় না । কেবল চোখে চোখ রেখে অশুভ অলুক্ষণে ব্যাপারটা, নানুর না-ফেরার দুশ্চিন্তা বলে যায় ।

কুসুম মিটিমিটি হাসে । বিশ্বাস করে না । কুঠুরির নৈমিত্তিক লক্ষণগুলো যথাযথই । তা'লে নিখিলের এগুলো ভনিতা, প্রস্তুতি বা প্রস্তাবের পথ তৈরী । কুসুম সাহসী অভ্যাসে কটাস করে ক্ষুদ্র একটি চোখ মারল একা ঘরের সুযোগে । নিখিল চোখ ঘুরিয়ে বলে স্পষ্ট সে মায়ের ডাকগুলো শুনেছে । কুসুমিকা ভেন্ন কায়দায় চলে যায় ।

'তালে আমারই হাত-যশ বলতে হবে !'

'কেন ?'

'৫০০ টাকায় কথা ফোটালাম ! .... মিনিমাম ২ চায় আজকাল এ-কাজে !'

'দুই হাজার ?'

'আজ্ঞে । তাতেই দেখুন টোকা দিতে শুরু কল্ল !'

'টোকা বলছেন কেন ?'

'স্মৃতি ফিরছে কিনা !'

নিখিল লম্বা শ্বাস ফেলল । কিন্তু স্মৃতি ফিরে পেলে নিছক নানুকে দিয়েই শুরু কেন ?

যেখানে গুটিয়ে গেছল, তা থেকেই তো মেলতে থাকবে ? আমি তো তার গর্ভ থেকে নেমেছিলাম । আমার সম্পর্কেও তার ক-ত স্মৃতি ! বাবার সম্পর্কে, দাদুর সম্পর্কে !

'দেখুন কী হয় ! ডাক্তারকে ফোন করেছেন ?'

'ঘরে ঢুকে কিছুই টের পেলেন না, এ-সবের ?'

'কাল ভালোভাবে নজর রাখব।'

কুসুম ওঠে । বেশ লম্বা । এখন সে মালিক-কর্মচারী সম্পর্কটুকু আঁচলে জড়িয়ে, চটি গলিয়ে ধাপ নামতে থাকে । ফাঁকি দিয়েছে আজ । সুযোগ নিয়েছে। তবু কুসুমিকা এখনও পুরো বিশ্বাস করল না নিখিলকে । একটা বুড়ো দামড়ার এত ভয় ? ঘরে ঢুকে কান পাততে পাল্লি না ?

সিঁড়ি দিয়ে দুলকি চালে লাফিয়ে নামতে-নামতে সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চোখে-চুমু ছুঁড়ে দিয়ে গেল । নিখিল পাল্লাটা তখনও কভার করেনি । তাতে কিছু অতিরিক্ত বেরিয়ে এলো না । কুসুমিকা নিজের ভ্রান্তিটুকু বুঝতে পারল । মতলব কিছু নয়, বৌদির সঙ্গেই দাদার কিছু ঘটেছে । বড্ড মনমরা লাগছিল যেন।

খানিক বাদে মঞ্জুলিকা, অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল শুনে, বিষ্ময়ে-দুর্ভা বনায়, তর্কে-তো দুপুরের জন্য খোঁচা লাগায় । কাজটুকু ফুরিয়ে গেছে বুঝি !

কিছু পরে, এ-অবস্থায় নানু।

'এত দেরি ?'

'হয়ে গেল !'

ফেনিয়ে জবাব দেয় না মাকে । বাথরুম, নিজের ঘরেই জলখাবার । মঞ্জুলিকা লুকিয়ে দেখে রোজকার মতোই পুরণো হয়ে এসছে ছেলে । সেই বাচ্চাকালের নানু । আবদার, বায়নাক্কার নানু ! কেবল মায়ের চোখে ধরা পড়ল, নানুর চোখেমুখে রক্ত লেপা রয়েছে ! হাল্কা রক্ত। অনেকটা ছালছাড়ানো মাংসবর্ণ।

'পেলি?'

'মাত্র একটাতে!'

'তাতেই সকাল থেকে রাত?''

তৃতীয় দিনে আজ নানু স্বাভাবিক। যদিও এই প্রথম রক্ত-লেপা ফুটে উঠতে দেখল, নানুর মধ্যে প্রথম দিনের শক্, আতঙ্ক, পৃথিবী দর্শন, বিরক্ত-অসন্তোষ আজ কিছুই নেই। সব পান করে টাইট্ পোক্ত হয়ে আছে। কেবল রক্তের দাগ নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়া।

পরদিন একা মঞ্জুলিকা সাক্ষী। দুপুর। তবু শরীর ছমছম করে।

'কৈ গেলিরে পুতা!'

....

রক্ত মাখাইয়া দিল কে?'

......

'বৌ-মা! না-নু-রে........!'

নিখিল নেই। আপিস কামাই বা তাঁর অদ্ভুত খেয়াল সম্পর্কে আজ মঞ্জু ভীষণ আকুল হলেও রোজ রোজ ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নানু তো বলেছিল, ফর্ম তুলেই সকাল—সকাল ফিরে আসবে আজ। ছেলেটার মুখ দেখলে কষ্ট হয়। কোনো কালে সামান্য আঁচড়টি পায়নি। কিন্তু আজ কিছুই নতুন লাগছে না। সব স্বাভাবিক হয়েই ঘরে ঢুকল।

'দেরি করলি?'

' কৈফিয়ৎ চেও না রোজ রোজ !'

এটাই নিয়ম, এমন ভঙ্গিতে নানুর বাথরুমে ঢোকা, চান মাথা মোছা, নতুন পোশাক, নিজের ঘরে বসা এবং বসা এবং টিফিন । মা দেখল ছেলে যেমন, তেমনই । বাড়তি হয়ে অদ্ভুত মজার আলো চোখেমুখে। মিস্ত্রির ফিনিসিং কাজ যেন । কেবল রক্তের দাগে ঘন পোঁচ একটু ।

আর প্রতিদিনের মতো নানু চুপচাপ এটা-সেটা নাড়ানাড়ি করে, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । ঠিক ঘুমিয়ে পড়া নয়, মঞ্জুর মনে হয়, পরদিন বেরোনর জন্য বুজে আট-দশ ঘন্টার অপেক্ষায় অচেতন হয়ে থাকে ।

ঠাকুমার ব্যাপারটা কি নানুর কাছে বলা যাবে ? নিখিলের প্রস্তাব মঞ্জুলিকা না- পছন্দ।

'শক্ পাবে !'

'মনে হয় না !'

'কেন ? কী জন্য মনে হয় না ?'

'দিব্যি তো বেরোচ্ছে ফিরছে । সেই নানু আছে ?'

'তিন দিনেই বদলে গেল ?'

মঞ্জু নিখিলকে জানায় না সত্যিই সে ছেলের চোখেমুখে রক্তের দাগ লেপটে থাকতে দেখে । রোজই তা ঘন হয় । রক্ষে, ছেলের অসুবিধে হচ্ছে না এতে, ফিরে কেঁদে ফেলছে না । সুন্দর মানিয়ে নিচ্ছে । কিন্তু ফেরার পর রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে মায়ের বুকে কী প্রচণ্ড হাউর সৃষ্টি হয় !

আটদিন পর নানু একটি দিনের জন্য বিশ্রাম নিল । বেরোল না । ফ্যাতরা একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবার ভালোর সন্ধানে ঠ্যালা-গুঁতো । মঞ্জু ভাবে, আজ দুপুরে নানু যদি ঐ ঘরের কথাগুলো টের পায় ? ও কি বিশ্বাস করবে, মানুষ আড়াই বছর দলপিণ্ড থেকেও স্মৃতি ফিরে পেতে পারে ?

'মাসী আজকাল আসে না রোজ?'

'কুসুম ? হ্যাঁ-বেলা পোষ্কার করে । কেন ?'

বিটকেল গন্ধ কেন ? দরজাটা ভেজিয়ে দাও !'

খেতে খেতে মঞ্জুলিকা অতিরিক্ত একটুকরো কাটা রুইমাছ পাতে তুলে দিল ।

'উঁহু!'

'কেন ? খাচ্ছিস না কেন ?'

'—'

'ঘুম হচ্ছে না ?'

'কেন হবে না ?'

'ফের বেরোবি কবে ?'

'কাল, পরশু, পরদিন। ধরো রোজই!'

'রোজই ? আট-দশদিন কী তালে কল্লি?'

নানু চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে কাঁটা চিবিয়ে রস আদায় করে।

বুঝলে মা! হঠাৎ হাসি। হাসলে ওর গালে টোল পড়ত। এ-একদিন সেটি মনে হচ্ছে মিলিয়ে গেছে। মায়ের খারাপ লাগে। আলগা শ্রী ফুটত।

'তোর যা র‍্যাংক, মোটা টাকা দিলে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও পাবি না ?'

'তুমিই বলবে শুধু ? শুনতে বল্লাম না?'

'বাপের মতো ঝামটাতে শিখেছিস, না ?'

নানু গোম খায়। পুরণো স্বভাব ওর তখন কেটে ফেললেও কথা আদায় করা যায় না। আজ হঠাৎ হেসে 'র‍্যাগিং কল্লাম একটু!'

মঞ্জু শুনে অবাক। নানু তা'লে বদলেছে। অন্য সময়ে ওর গোমর ভাঙতে দু-তিন দিন লাগত।

'ছাড় তোদের ফ্যাগিং-ম্যাগিং! কী বলছিলি ?'

'ফুল হবার অন্য ভ্যালু আছে মা! কুঁড়ি থাকা চিরকাল ভালো নয়।'

'মানে?'

'মানে-ফানে নেই। মনে হল বল্লাম।'

'এ-কদিন বাইরে বাইরে কী হত?'

'ফর্ম তোলা, জমা।'

'বাজে বকিস না।'

মঞ্জু বলে না ছেলেকে, সারা চোখমুখে কে রক্তের দাগ বুলিয়ে দিয়েছে। ও শুনলে মানতেই চাইতে না। প্রমাণ দিতে বলবে। প্রমাণ দিয়ে কি রং-এর কথা বোঝানো যায় ? ওটা তো যার চোখের মধ্যে লেগে থাকে!

'বাজে কথা না। ঘরে এসেও বা কী কত্তাম ?'

'কত বিপদ-আপদ! চিন্তা হয় না ?'

'মেয়েরা থাকছে, তো ছেলেরা !'

'তাই বল ! সব একলাইনে দাঁড়াতিস ?'

'কেন ? ওদেরটা ভেন্ন, আমরা আমাদেরটায় ।'

'যাদের ভালো নম্বর .....তুইও দাঁড়াতিস ?'

'ভালো নম্বর ? নম্বরের হাট ওখানে !'

মুখটা কেমন ছালছাড়ানো লাগছে ! দগদগে ....

'মানে ? বিড়বিড় করছ কি ?'

'কিছু নয় । আমাদের ভুল । ..... সত্যি বল তো নানু, সারাটা দিন কী করতি

'বিশাল লাইন !'

'তারপর?'

'ছেলেগুলো সব মস্ত একটা তাঁবুর মধ্যে । ..... মেয়েরা অন্য তাঁবুতে !'

'তারপর?'

'আকাশে মেঘ!'

'তো?'

'গনগনে রোদ !'

'তারপর ?'

'হাজার হাজার নাকের গরম বাতাস !'

'বুঝলাম !'

'মস্ত ঘন্টা !'

'ঘন্টা ? কী হয় ?'

'বাজে ।'

'তখন ?'

'পকেটের নম্বরগুলো বার করে টেবিলে জমা দিতে হত ।'

'তাই ?'

'তারপর ডাং দিয়ে সবগুলো ছিটকে দিত একজন ।'

'ওমাঃ ! কী বলিস ?'

'একজন হেঁকে বলত কুড়িয়ে আনো !..... যে যত বেশি কুড়োবে ......।'

'হুড়োহুড়ি হত না ?'

'তেল মেখে রীতিমত কুস্তি !'

'শেষে ?'

'মাইকে, যার-যার পার্টনার বাছতে বলত !'

'পার্টনার ? মানে ?'

'তুমি বুঝবে না ।'

মঞ্জুর চোখ গোলগোল হয়, কিছু দুর্গন্ধ অনুমান করে সে ।

'কোণায়-কোণায়, সারা তাঁবু জুড়ে ....!'

'চুপ-প কর !'

'কেন ? খারাপ ভাবছ কেন ?'

'প্লি-জ নানু !'

এ-ভাবে পার্টনার চয়েসের অভ্যেস থেকেই জীবনে ক্যারিয়ারটা ....!'

'শোনাতে হবে না আমায় !'

'প্রথম দিন ঘাবড়ে ছিলাম । কষ্টও পেয়েছি !"

'এখন ?'

নানু স্মিত হাসিতে, 'আই এনজয় !'

'তোকে ক্লান্ত লাগছে !'

রাতে খাবার টেবিলে তিনজন । ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন । হোম-সার্ভিসে ফোন করা হয়েছিল। মঞ্জু খানিক গম্ভীর । খেতে খেতে নিখিল নানুর দিকে, 'হিল্লে হল কিছু ?'

'করে তো ফেল্লাম !'

'এই স্টেটেই থাকতে পারবি ?'

'আলবৎ !'

'মোট প্যাকেজ ?'

'ছয় !'

'ছ লাখ ?'

'তালে কি ছ হাজোরে ধুতে চেয়েছিলে ?'

নিখিল চুপ । চিলির রসে মাখা আঙ্গুলগুলো শূন্যে পদ্মের পাঁপড়ির মুদ্রায় স্থির ।

'ব্যাংকগুলো লোন দিচ্ছে । প্রয়োজনে ধার করবে ?'

'শোধ ?'

অনেক পর, হাড় চিবুতে-চিবুতে নানু হেসে, 'পাবে তো দশগুণ ফিরে !'

'ততোদিনে আমি নেই ।'

'ততোদিন নয় ..... ক্যাম্পাস দিয়ে ঢুকতে দাও ! তুলে নেবো !'

'তুলে নিবি মানে ?'

'এখন সিক্রেট্ !'

'কেন ?'

'ভাববে তোমাকে র‍্যাগিং-ফ্যাগিং করছি !'

'না, ভাবব কেন ! বল !'

নানু হাসে, কথা বলে । ...... আকাশে মেঘ ...গণগণে রোদ ... হাজার হাজার নাকের গরম নিঃশ্বাস ...মস্ত বিরাট তাঁবু ...প্রতিটি পার্টনার আমি ১৮ বার ...... আমাকে সবাই ২১ বার ....!

'স্ট-প!'

'ঠিক আছে ! ক্যাম্পাসটা হোক .... শুনতে চাইলে বলে !'

গভীর রাতে ঘরময় পচা বাতাস ঘোরে । ঝেঁঝে ওঠে নাকের বাঁশি । দু-জনের ঘুম ভাঙে। আলো জ্বলে । প্রভাদেবীর ঘরে ঢুকে দেখে দুদিন হল মরে দলটার পচন ধরেছে । কুসুমিকা দু'দিন আসেনি ? সুযোগ নিয়েছে সে-তিন নির্জন সন্ধ্যায় কথা বলার ।

সম্পর্কে তো মা । সংস্কারের দায় আছে । লোক ডাকা, আত্মীয়স্বজন-এর প্রয়োজন; ছেলের ঘরে ঢুকে দেখে রক্তলেপা মুখটা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ! পুরণো পাতাকাটা চুলটা কীভাবে যেন ব্যাক্ব্রাস হয়ে ফুলে ফেঁপে আছে ।

শেষ রাতে পবিত্র শিশির যখন চরণ বিছিয়ে দেয় ঘাসে-পাতায়-ফুলের গর্ভকেশরে, নিখিল ও কিছু আত্মীয়র দলটা শবদেহ নিয়ে শ্মশানে হাজির হয় । নানু জীবনে প্রথম শ্মশান দেখল এবং ভারী মজা লাগল তার ।